সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পত্রিকাধ্যক্ষ । শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

দ্বিষষ্টিতম বর্ষ । প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বিষষ্টিতম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা

॥ বিষয়-সূচী ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বিষষ্টিতম বর্ষ

বিষয়-সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬২ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

কোটিবর্ষ

শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্ত্তী

প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার ফলে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন—আদিম প্রস্তরযুগে ভারতে নিগ্রোদিগের ন্যায় এক জাতির অসভ্য মানুষ বাস করত ; তার পর উত্তর-পূর্ব দিক্ থেকে অষ্ট্রিক জাতির লোকেরা ভারতে প্রবেশ ক'রে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে, আর উত্তর-পশ্চিম দিক্ থেকে আসে দ্রাবিড় জাতির লোকেরা। দ্রাবিড়দের সভ্যতা ছিল কিছুটা উন্নততর নাগর সভ্যতা, আর অষ্ট্রিকদের সভ্যতা ছিল গ্রাম্য। দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক সভ্যতার মিলিত প্রবাহে নিগ্রো আকৃতির জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভেসে যায়। এদের পরে আসে উত্তর-পশ্চিম দিক্ থেকে আর্যরা, আর উত্তর-পূর্ব্ব দিক্ থেকে ভোট-চীন জাতির লোকেরা।

বাংলার আদিম অধিবাসীদের মূলে রহিয়াছে দ্রাবিড় ও আর্য সভ্যতায় প্রভাবিত নিগ্রোবৎ জাতির, সুসভ্য কৃষিজীবী অষ্ট্রিক জাতির এবং আধুনিক কোলজাতীয় সাঁওতাল-মুণ্ডা-ভীল-শবরাদি নিম্নস্তরের অষ্ট্রিক জাতিগুলির রক্ত।

অষ্ট্রিক জাতির লোকেরা সরল, শান্তিপ্রিয়, কল্পনাপ্রবণ, কিছুটা অলস ও সংঘশক্তিহীন ছিল। কিন্তু তাহাদের প্রাণশক্তি ছিল অদম্য। দ্রাবিড়রা অষ্ট্রিকদের চাইতে কর্মঠ, অধ্যাত্ম-জীবনে অগ্রসর, শিল্পী ও সঙ্ঘশক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু এই সব অনার্য জাতিরা খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে বাস করত। শক্তিশালী শৃঙ্খলাশীল কর্ম্মকুশল সঙ্ঘবদ্ধ আর্য জাতির আগমনের ফলে পরবর্তী সময়ে খণ্ড, ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারত এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির গ্রন্থিতে বাঁধা পড়ে ও অনার্য সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম, আর্যসংস্কৃতি ও ধর্ম্মের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক সাধারণ ভারতীয়ত্বের আধারে বিচিত্র হিন্দুজাতির ও হিন্দু সভ্যতার সৃষ্টি হয়।

হিন্দুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ধান, পান, সুপারি, নারিকেল, সিন্দুর, হলুদ প্রভৃতির স্থান ও পুনর্জ্জন্মবাদে বিশ্বাস অষ্ট্রিক প্রভাবের ফল।

বঙ্গদেশে আর্যসভ্যতার বিস্তার হয় খ্রী-পূর্ব্ব ৪র্থ শতকে। তার আগে বাংলা দেশ অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় জাতির সভ্য ও অসভ্য অনার্যদের বাসভূমি ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্র জাতি ও তাদের রাজধানী পুণ্ড নগরের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির রচনাকাল খ্রী-পূঃ ১৫০০

হইতে ৮০০ শতক। বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে উত্তরবঙ্গীয় পুণ্ড্রজাতির এবং মধ্য ও পূর্ব্ব-বঙ্গীয় বঙ্গ জাতির উল্লেখ আছে। সূত্রগুলির রচনাকাল খ্রী-পূঃ ৬০০ হইতে ২৩০ শতক।

মহাভারতে (খ্রী-পূঃ ৬০০—২০০) পরাক্রমশালী পুণ্ড্ররাজ বাসুদেবের উল্লেখ আছে। পৌণ্ড্রক বাসুদেব পুণ্ড্র-বঙ্গ-কিরাতরাজ্য একত্রিত ক'রে এবং মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন ক'রে প্রবলপরাক্রান্ত হয়ে উঠেন। মহাভারতে বঙ্গীয় রাজগণের শৌর্য্যবীর্য্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

রাঢ় দেশের বিজয় সিংহের সিংহল যাত্রার কাহিনী আমাদের সুপরিচিত। অষ্ট্রিক জাতিরা নৌকায় নদীপথে ও সমুদ্রপথে যাতায়াত করত। কাজেই খ্রী-পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলার রাজকুমারের সমুদ্রপথে সিংহল-যাত্রা কাহিনী হলেও অবিশ্বাস্য মনে হয় না।

সেই প্রাচীন কালের আর একটি বাঙ্গালী উপজাতির পরিচয় মেলে গ্রীক লেখকগণের গ্রন্থে। গ্রীকগণ এই জাতির নাম বলেছেন 'গঙ্গরিডই' অর্থাৎ ভাগীরথীতীরবর্তী গাঙ্গেয় জাতি। এই গঙ্গাবিধৌত রাজ্যের বিপুল রণবাহিনীর খ্যাতি আলেকজাণ্ডারের রণসাধ প্রশমিত করেছিল। সুতরাং আর্য্যপ্রবেশের পূর্ব্বেই বাংলাদেশে সুসভ্য অনার্য্য জাতির নানা শাখা সুগঠিত শক্তিশালী খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল অনুমান করা যায়।

আর্য্যগণের সহজ সরল ধর্ম্ম ও জীবন ক্রমে অনার্য্য রক্ত ও সংস্কৃতির মিশ্রণ ফলে জটিল আকার ধারণ করল। বৈদিক যুগের শেষ দিকে আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডের উদ্ভব হল, পুরোহিত সম্প্রদায়ের হাতে ধর্ম্ম কর্ম্মের জটিল ব্যবস্থা গিয়ে পড়ায় তাঁরা প্রবল হয়ে উঠলেন, ক্রমে জাতিভেদের সৃষ্টি হল, উপনিষদের উন্নত আধ্যাত্মিক চিন্তা লোপ পেয়ে ক্রিয়াবহুল যাগযজ্ঞ ও পশুবধের নিষ্ঠুর প্রথা ও উচ্চ বর্ণের অত্যাচারমূলক প্রভুত্ব জনসাধারণের মনে বিদ্রোহ ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত করে তুলল। খ্রী-পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী প্রাচীন সভ্য জগতের এক মহা যুগসন্ধিকাল। এই সময়ে চীনে সমাজসংস্কারক কন্‌ফিউসিয়স ও লাওৎসে, ইরাণে ধর্ম্মসংস্কারক জরথুষ্ট্র, গ্রীসে মনীষী পাইথাগোরাস ও ভারতে উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড অবলম্বন ক'রে অহিংসার বাণীপ্রচারক বুদ্ধদেব ও মহাবীর ধর্ম্মগত ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা করেন।

রাজকুমার মহাবীর তরুণ বয়সে সংসারাশ্রম ত্যাগ ক'রে সংন্যাস গ্রহণ করেন ও বারো বছরের কঠোর সাধনায় সিদ্ধি লাভ ক'রে জিন বা বিজয়ী নামে খ্যাত হন। তার পর ধর্ম্ম-প্রচার সুরু করেন। মহাবীরের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নাম ছিল নির্গ্রন্থ (বন্ধন-বিহীন)। এঁরা দিগম্বর জৈন নামে পরে পরিচিত হন। পার্শ্বনাথ-প্রবর্ত্তিত শ্বেতাম্বর জৈনদের চতুর্যাম অহিংসা, সত্য, অচৌর্য ও অপ্রতিগ্রহের আদর্শের সঙ্গে জিতেন্দ্রিয়তা যোগ ক'রে মহাবীর তাঁর ধর্ম্মমত প্রচারে অহিংসা ও ইন্দ্রিয়জয়ই মানুষের দৈবশক্তি বিকাশে ধ্রুব পন্থা বলে নির্দ্দেশ দিলেন। বুদ্ধদেবও অহিংসার বাণী প্রচার করলেন; কিন্তু তিনি জৈনদের মত চরমপন্থী ছিলেন না। তিনি সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভের আদর্শ প্রচার করলেন; জৈনদের মত কৃচ্ছ্র সাধনের উপর তত জোর দিলেন না। যাই হোক্, উভয়েই বেদ-বিরোধী, জাতিভেদ-

বিরোধী, প্রাণীদের প্রতি অপরিসীম মমতাবোধসম্পন্ন; উভয়েই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের মতই উদাসীন ও নৈতিক চরিত্র গঠনের উপরই উভয়ে ধর্ম্মকে স্থাপনা করেছেন।

এই দুই তরুণ ক্ষত্রিয়রাজকুমার ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজজীবনে যে দিন বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুললেন, সে দিন স্বভাবতই তাঁদের উভয়ের দৃষ্টি পড়েছিল অনার্য অধ্যুষিত বঙ্গদেশে। মহাবীর এলেন বঙ্গদেশে রাঢ়ের মধ্য দিয়ে। রাঢ় দেশ তখন পথহীন জংলা দেশ; তার অধিবাসীরা ছিল হিংস্র অসভ্য, তারা কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল জৈন সাধুদের পিছে। এই নির্য্যাতনের কথা জৈন আচারাঙ্গসূত্র গ্রন্থে জানা যায়। রাঢ়ের উঁচু অনুর্ব্বর ভূমি ব্যাধ চোয়াড় প্রভৃতি হিংস্র অসভ্য জাতির বাসভূমি ছিল, তা মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীপাঠেও জানা যায়। সম্ভবতঃ এরা নিম্নস্তরের অসভ্য অষ্ট্রিক উপজাতিগুলির বংশধর। জৈন প্রজ্ঞাপনা গ্রন্থে রাঢ়ের প্রধান নগর কোডিবরিস বা কোটিবর্ষের উল্লেখ আছে। মহাবীর কোটিবর্ষ নগরে পদার্পণ করেছিলেন কি না, সঠিক জানা যায় না। তবে কোটিবর্ষনগর যে জৈনধর্ম্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কোটিবর্ষ তখন রাঢ়ের প্রধান নগর ছিল। কাজেই জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীরের পুণ্যচরণস্পর্শে কোটিবর্ষনগর গৌরবান্বিত হয়েছিল বলেই মনে হয়। মহাবীরের প্রধান শিষ্যদের অন্যতম ভদ্রবাহু কোটিবর্ষ বা কোটিকপুরের রাজা পদ্মরথের পুরোহিত ছিলেন, সম্ভবতঃ মহাবীর এঁকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ভদ্রবাহু জৈনসংঘের প্রধান কর্তা হন। তিনি জৈন কল্পসূত্র গ্রন্থ সংকলন করেন। জৈন কিম্বদন্তী থেকে জানা যায় যে, মগধসম্রাট্ মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত ভদ্রবাহুর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে ভিক্ষু হন এবং তাঁর রাজত্বকালে বারো বছরব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ হওয়ায় জৈনপ্রথামত গুরু ভদ্রবাহু সহ মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত শ্রাবণবেলা গোলা আশ্রমে গিয়ে তথায় উভয়ে অনুমান ২৯৮ খৃ-পূর্ব্বাব্দে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করেন। ভদ্রবাহু জৈনধর্ম্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র কোটিবর্ষনগর থেকে ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ ক'রে জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে চলে গেলে স্থূলভদ্র মগধের জৈনসঙ্ঘের অধ্যক্ষ হন। ভদ্রবাহুর অনুপস্থিতিকালে জৈনশাস্ত্রের জ্ঞান লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা হওয়ায় স্থূলভদ্র পাটলিপুত্রে জৈনদের সভা আহ্বান ক'রে ১৪ পূব্ব (প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ) ১২ অঙ্গে লিপিবদ্ধ করান। ভদ্রবাহুর অনুগামী জৈনরা মগধে ফিরে এলে স্থূলভদ্রের ভক্তদের সঙ্গে তাঁদের মতবিরোধ হয়। মহাবীরের অন্যতম প্রধান শিষ্য সুধর্ম্ম স্বামী ও তাঁর শিষ্য জম্বুস্বামী কোটিবর্ষনগর থেকে জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন। ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাস চার শাখায় বিভক্ত জৈন গোদাসগণ-নামীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। শাখা চারটির নাম কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া, তাম্রলিপ্তিকা ও দাসীখর্ব্বটিকা। চারটি শাখাই বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত। মৌর্য্যযুগের একটি ইষ্টকখণ্ডে লিখিত ব্রাহ্মী লিপি পাঠে জানা যায়, কোনও মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্ তাঁর পুণ্ড্রনগরস্থ মহামাত্যকে বঙ্গের দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাবর্গকে ধান্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করার আদেশ দিচ্ছেন। পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্দ্ধননগর পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির প্রধান নগর ছিল। বর্ত্তমান বগুড়া জেলায় মহাস্থানগড় খননের ফলে তথায় এই

নগরের অবস্থান ছিল ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। লিপিটি এইখানেই পাওয়া গিয়েছে। সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হয়েছে। সে সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কোটিবর্ষ ও তাম্রলিপ্ত, এই তিনটী প্রসিদ্ধ নগর সমধিক সমৃদ্ধ ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে দুর্ভিক্ষ বন্যা প্রভৃতির সময়ে প্রজাদের সাহায্যের জন্য আর্দ্রতাভেদ্য রাজ-শস্যভাণ্ডার মহাস্থানগড় খননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে। বঙ্গদেশে হীরক ও স্বর্ণখনি ছিল। তাম্রলিপ্ত প্রসিদ্ধ বহির্বাণিজ্য-বন্দর ছিল; এখান থেকে জাহাজে সমুদ্রপথে যাতায়াত ছিল। কোটিবর্ষ নগর অন্তর্বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। মৌর্য্যসম্রাটের অধীনে খণ্ডরাজ্যসমূহ সুসংহত শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ছিল এবং মৌর্য্য আমলের সুউন্নত শাসনপ্রণালী বঙ্গদেশেও অনুসৃত হত ব'লে ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন।

সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সভার গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্ সে সময়ের ভারতীয়দের উন্নত নৈতিক চরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সে সময়ে জীবনযাত্রাপ্রণালী সরল অনাড়ম্বর ছিল, নারীদের যথেষ্ট মর্য্যাদা ছিল। মদ্যপান গর্হিত বিবেচিত হত। চুরি দস্যুতা, মামলা মোকর্দ্দমা বিরল ছিল। কৃষকদের যথেষ্ট সমাদর ছিল, যুদ্ধকালেও তারা নির্বিঘ্নে শস্য উৎপাদন করত। লোক সত্যবাদী, সৎস্বভাব ছিল, সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকলেও শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক অধিকার ও দায়িত্ব যে জনসাধারণের অনেকাংশে ছিল, তা সভা সমিতি প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান থেকে জানা যায়। প্রজার সুখের দিকে লক্ষ্য রেখেই রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হত। মৌর্য্যদের সময় ভারতের প্রাচ্যখণ্ডে অর্দ্ধমাগধী প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, জৈনশাস্ত্রগ্রন্থগুলি এই প্রাকৃতেই লেখা হয়েছিল।

গুপ্ত যুগে বুধগুপ্তের সময় ৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এক ব্রাহ্মণ পরিবার পাহাড়পুরস্থিত জৈন বিহারের নির্গ্রন্থ দিগম্বর সংন্যাসীদের পূজাদি নির্ব্বাহ জন্য বিহার-স্থবির গুহনন্দী ও তৎশিষ্যগণের উদ্দেশ্যে বটগোহালি গ্রাম এক খণ্ড তাম্রশাসনমূলে দান করেন। এই তাম্রশাসনখানি পাহাড়পুর খননকালে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেও উত্তরবঙ্গে জৈন বিহারের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলছে।

আবার সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ চৈনিক পণ্ডিত ও পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ যে সমসাময়িক বিবরণ লিখেছিলেন, তাতে দেখা যায়, উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গ, সর্ব্বত্রই দিগম্বর নির্গ্রন্থগণের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে। এর পরবর্তী সময়ে পাল-রাজত্বকালে এদের অস্তিত্বের আর প্রমাণ পাওয়া যায় না। হয় ত এরা শৈব নাথপন্থী, অবধূত সম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্যে মিশে গিয়েছিল।

জৈন মহাবীরের রাঢ়দেশে আসার ও তদবধি বঙ্গের নানা স্থানে জৈন ধর্ম্মের প্রসার প্রতিপত্তির কথা যেমন জানা গিয়েছে, তেমনি তাঁর সমসাময়িক বুদ্ধদেবের কোটিবর্ষে আগমনের জনশ্রুতি থাকলেও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। আর বৌদ্ধ ধর্ম্ম ঠিক কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়, তাও জানা যায়নি। সংস্কৃতে লিখিত বৌদ্ধ বিনয়শাস্ত্রে পুন্ড্রবর্দ্ধন অবধি বৌদ্ধ ধর্ম্মশাসনের উল্লেখ আছে। কাজেই প্রাক্ অশোকযুগেই উত্তরবঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের

প্রতিষ্ঠা অনুমান করা যায়। বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে বঙ্গের সর্বপ্রথম উল্লেখ খ্রীষ্টীয় ২য় বা ৩য় শতকের নাগার্জ্জুনীকুণ্ড লিপিতে পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের বর্দ্ধিষ্ণু অবস্থা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, প্রাক্‌গুপ্ত কালেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম বঙ্গদেশে বহুল প্রচারিত হয়েছিল। ফা-হিয়েন উত্তরবঙ্গে আসেননি, কিন্তু তাম্রলিপ্তে তিনি ২২টি বৌদ্ধ মঠ দেখেছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গেও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধ বিহারসমূহ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাম্রশাসন থেকে জানা গিয়েছে।

হিউয়েনসাং পুন্ড্রবর্দ্ধন নগরে ২০টি বৌদ্ধ মঠ দেখেছিলেন। পুন্ড্রবর্দ্ধননগরের তিন মাইল দূরে ভাসুবিহার নামে বৌদ্ধ বিহার ছিল। সমতটে ৩০টির অধিক, কর্ণসুবর্ণে ও তাম্রলিপ্তে প্রতি স্থানে ১০টির অধিক বৌদ্ধ মঠ তিনি দেখেছিলেন। এ ছাড়া সমসাময়িক বিবরণ থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, গুপ্তযুগ থেকে পালরাজত্বকালের পূর্ব্ববর্ত্তী সময় পর্যন্ত জৈন, হিন্দু ও বৌদ্ধ, তিন ধর্ম্মই বাংলা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

বাংলাদেশে আর্য্যধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটে গুপ্তরাজত্বের সময়। ভারতবর্ষের ধর্ম্মজীবনে বহু মত ও পথের বৈচিত্র্য প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সম্প্রদায়গুলি পরস্পরের প্রতি অদ্ভুত সহনশীলতা ও ঔদার্য্য দেখিয়েছে।

এ দেশে ধর্ম্মের নামে মধ্যযুগীয় ইউরোপের মত হানাহানি কাটাকাটি হয়নি। ধর্ম্মবিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল সকলের ও ধর্ম্ম প্রগতিশীল ছিল বলেই যুগে যুগে নতুন পথে ধর্ম্মপ্রবাহ অব্যাহত গতিতে চলতে পেরেছে। 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথযুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সার্মণব ইব'—মানুষ রুচির বিভিন্নতাহেতু ঋজু কুটিল নানা পথ অবলম্বন করে; কিন্তু সকলেরই একমাত্র গন্তব্য স্থান ভগবান্; যেমন বিভিন্ন পথগামী নদীসকলের গন্তব্য স্থান সমুদ্র—ইহাই ভারতের শাশ্বত বাণী। কোটিবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রাক্‌গুপ্তযুগে বা গুপ্তযুগে কতটা আসন গাড়তে পেরেছিল জানা যায় না। তবে মনে হয়, জৈনধর্ম্মের এটা প্রধান কেন্দ্র থাকায় এবং গুপ্তযুগে রাজপোষকতায় হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুদয় হওয়ায় এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এ অঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

গুপ্তরাজত্বকালে কোটিবর্ষ আর রাঢ়ের অন্তর্গত নয়, পুন্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত। সে সময় পুন্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সুন্দরবন অবধি বিস্তৃত ছিল। রাঢ়ের সীমা সঙ্কীর্ণতর হয়ে উত্তরে গঙ্গা ও পূর্ব্বে ভাগীরথী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গুপ্তযুগের তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, পুন্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষবিষয়ের রাজধানী ছিল কোটিবর্ষ নগর। কোটিবর্ষবিষয়ের অন্তর্গত দুইটি মণ্ডলের নামের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে—হলাবর্ত্তমণ্ডল ও গোকলিকামণ্ডল। "ভুক্তি" বর্ত্তমানের বিভাগ, "বিষয়" জেলা ও "মণ্ডল" মহকুমার তুল্য। বায়ুপুরাণেও কোটিবর্ষবিষয়ের প্রধান নগর ব'লে কোটিবর্ষ নগরের উল্লেখ আছে। প্রাচীন অভিধান গ্রন্থসমূহে বাণপুর, শোণিতপুর, উমাবন (উষা ?-বন) প্রভৃতি নামে যে প্রসিদ্ধ নগরের উল্লেখ আছে, তাহাই কোটিবর্ষ বা কোটিকপুর। মধ্যযুগের দেবীকোট, দেবকোট বা দেওকোট এই কোটিবর্ষ নগরেই অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে

গঙ্গারামপুর থানার অদূরে পুনর্ভবা নদীতীরে রাজীবপুর মৌজায় যে বাণগড় নামীয় ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়, এখানেই প্রাচীন ভারতের এই প্রসিদ্ধ নগরের অবস্থান ছিল।

দামোদরপুর গ্রামে প্রাপ্ত চারিখানি তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, পঞ্চম শতাব্দীতে কোটিবর্ষ নগরে যে অধিকরণ বা বিচারালয় ছিল, তাতে বিষয়পতি বা জেলাশাসক এবং আরও চার জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সভ্য ছিলেন। এঁরা নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক ও প্রথম কায়স্থ নামে অভিহিত। সে কালে শ্রেষ্ঠী বা মহাজনদের যে নিগম বা কর্পোরেশন ছিল, তাতে যিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হতেন, তাঁকে প্রতিনিধিরূপে নেওয়া হত, সার্থবাহ বা বণিক্‌সংঘসমূহের যিনি প্রধান নির্ব্বাচিত হতেন, তাঁকে প্রতিনিধি নেওয়া হত, কারুশিল্পসংঘের যিনি প্রধান নির্ব্বাচিত হতেন, তাঁকে নেওয়া হত, আর প্রথম কায়স্থ সম্ভবতঃ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি বর্তমানের সেক্রেটারী বা প্রধান করণিক তুল্য। সমসাময়িক নারদ ও বৃহস্পতির ধর্ম্মসূত্র পাঠে ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন, ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে বিভিন্ন শিল্পী, বণিক্ ও ব্যবসায়ীদের নিগম ও সংঘ গঠিত হত এবং নির্ব্বাচন প্রথায় তাদের সভাপতি নিয়োগ হত, আর অধিকরণে তাঁরাই প্রতিনিধি হয়ে আসতেন। এই সংগঠন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। সভ্যগণ বিষয়পতির নিছক পরামর্শদাতা ছিলেন না, তাঁদের যৌথ কর্তৃত্ব ছিল। গ্রামাঞ্চলে অধিকরণের ভিন্নরূপ গঠন ছিল, তাও জানা গিয়াছে গুপ্তযুগের একখানি তাম্রশাসন থেকে। এক বা একাধিক গ্রাম নিয়ে যে অধিকরণ গঠিত হত, তাতে ঐ অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তি বা মহত্তরগণ, গ্রামের মণ্ডল বা গ্রামিক, গৃহস্থগণ বা কুটুম্বী, জনবসতিপূর্ণ দেশের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বা অষ্টকুলাধিকরণ, এই সব অধিকরণের সভ্য হতেন। বিচার ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ শাসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছাড়া তাঁরা ভূমিবিক্রয় ব্যাপারেও কর্তৃত্ব করতেন।

ভূমিক্রয়াভিলাষী ব্যক্তি অধিকরণ সমক্ষে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় ভূমির প্রকৃতি ও পরিমাণ, ভূমি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে এবং প্রচলিত মূল্য দিতে প্রস্তুত আছেন কি না, এই সব তথ্য জানালে অধিকরণ পুস্তপাল বা রেকর্ড কিপারগণের কাছ থেকে ঐ ভূমি সংক্রান্ত রিপোর্ট নিতেন। তার পর মূল্য নিয়ে ভূমি মাপজোখ ক'রে সীমাচিহ্নিত ক'রে দিতেন ও ভূমি বিক্রয়ের নিদর্শনস্বরূপ তাম্রশাসনলিপি খরিদ্দারকে দিতেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কি নাগরিক জীবনে, কি গ্রাম্য জীবনে, শাসনকার্য্যে জনসাধারণের সক্রিয় যোগ ও গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব ছিল।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয়, যদিও তৎকালে ভূমিতে রাজ অধিকার সূচিত হচ্ছে, তথাপি দেখা যাচ্ছে, জনসাধারণের প্রতিনিধির সম্মতি ব্যতীত রাজকর্ম্মচারী ভূমি হস্তান্তর করতে পারতেন না, পণের টাকা অবশ্য রাজকোষেই জমা হত। এ থেকে অনুমান করা যায়, গুপ্ত-যুগে ভূমিতে রাজার স্বত্ব স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু তৎপূর্ব্বকালে যে গ্রামবাসিগণেরই ভূমিতে অধিকার ছিল, সেই ঐতিহ্যও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তাই গ্রাম ও নগরের প্রধানগণের অনুমতি-মতেই ভূমি হস্তান্তর হত।

কোটিবর্ষনগর যে অন্তর্বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল ও তথায় যে অত্যুন্নত নাগর সভ্যতা ও শাসনব্যবস্থা ছিল, তার প্রমাণ-বহন কচ্ছে এই তাম্রশাসনগুলি। গুপ্তরাজগণের এই তাম্রশাসনগুলি ৪৪৪ থেকে ৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ কালের। নদীপথই অন্তর্বাণিজ্যের পক্ষে প্রশস্ত ছিল। তাই বিশাল ত্রিস্রোতার অন্যতম প্রবাহিণী পুনর্ভবানদীতীরে এই প্রসিদ্ধ নগরের অবস্থান।

সম্রাট্ বুধগুপ্তের একখানি তাম্রশাসনে পুনড্রবর্দ্ধনের উপরিক (গভর্ণর) মহারাজ জয়দত্তের নিযুক্ত কোটিবর্ষবিষয়ের আযুক্তক (বিষয়পতি) গণ্ডকের ও নগরশ্রেষ্ঠী ঋভুপাল, সার্থবাহ বসুমিত্র, প্রথমকুলিক বরদত্ত ও প্রথমকায়স্থ বিপ্রপাল আধিকরণিকগণের উল্লেখ আছে। শ্রেষ্ঠী ঋভুপাল অধিকরণসমীপে নেপালস্থিত সন্ কোশী নদীতীরে অধিষ্ঠিত কোকামুখস্বামী ও শ্বেতবরাহস্বামী দেবতাদ্বয়ের উদ্দেশ্যে ভূমিক্রয়ের আবেদন করেন। পুস্তপালত্রয় বিষ্ণু দত্ত, বিজয় নন্দী ও স্থাণুনন্দী আবেদন পরীক্ষান্তে রিপোর্ট দিলেন—শ্রেষ্ঠী মহাশয়কে তিন দীনার মূল্যের কয়েক কুল্যবাপ ভূমি বিক্রয় করা যেতে পারে। ঋভুপাল এই দুটি বিগ্রহের উদ্দেশ্যে বহু ভূমি উৎসর্গ করেছিলেন, স্বদেশেও ঐ দুই দেবতার নামে দুটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। হিলির অদূরবর্তী বৈগ্রামের গোবিন্দমন্দির ও উক্ত শ্বেতবরাহ ও কোকামুখস্বামীর মন্দিরদ্বয় গুপ্তযুগে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ও বিষ্ণুপূজার প্রতিষ্ঠা প্রমাণিত করছে। দীনার স্বর্ণমুদ্রা, ষোল রূপক মুদ্রার সমান। কুল্যবাপ অর্থ, এক কুলা ধান্যবীজে যতটা ক্ষেত্র বোনা যায়, ৮ দ্রোণে এক কুল্যবাপ। সে সময় নল দিয়ে জমি মাপ করা হত। বিভিন্ন স্থানে নলের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন মাপের ছিল। এখনও হাতরশির বিভিন্ন মাপ প্রচলিত আছে।

বাংলার অধিকাংশ লোক গ্রাম্য কৃষিপ্রধান জীবনই যাপন করত এবং তাদের জীবনযাত্রা সরল অনাড়ম্বর ছিল। ঘন বসতির চারি দিকে শস্যক্ষেত্র ও গোচর তৃণক্ষেত্র, গ্রামের প্রান্তে বনভূমি, গ্রামের মধ্যে মন্দির,, পুষ্করিণী, রাস্তা, নালা, গোপথ অনেকটা আজকালের মতই ব্যবস্থা। নগরগুলিতে সৌধমালা, পুষ্পোদ্যান, রত্ন অলঙ্কার প্রভৃতির শোভাসজ্জা, ব্যবসায় বাণিজ্যের কর্ম্মমুখরতা—এক কথায় ঐশ্বর্যবিলাসের কেন্দ্র ছিল নগরগুলি। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসে গুপ্তসম্রাট্গণের শাসনকাল এক অতি গৌরবময় যুগ। এ সময়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য, সর্ব্বক্ষেত্রেই চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়।

গুপ্তসাম্রাজ্য পতনের পর খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে পশ্চিমবঙ্গে এক প্রবল স্বাধীন রাজ্যের ক্ষণিক অভ্যুদয় হয়। পৌনড্রবর্দ্ধনভুক্তি মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের শাসনাধীন হয়। ক্ষণিক বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় বিকশিত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের কবলিত হয়। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুরাগী হইলেও ধর্ম্ম বিষয়ে সম্রাট্ অশোকের মতই সমদর্শী ও উদার ছিলেন।

সপ্তম শতাব্দীতে বাংলার রাজনৈতিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়ে এক শতাব্দীকাল মাৎস্যন্যায় প্রবল হয়ে ওঠে। অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে অরাজকতা দূর করার জন্য বাংলার

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ পুন্ড্রবর্দ্ধনবাসী গোপাল নামক জনৈক ক্ষমতাশালী নায়ককে রাজা নির্ব্বাচিত করেন। এই ভাবে বাংলায় পুনরায় স্বাধীন পালরাজত্বের প্রতিষ্ঠা হল। প্রজাসাধারণের নির্বাচিত এই পাল রাজা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

বাণগড়ে ১ম মহীপালদেবের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। তাতে পুন্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অধীন কোটিবর্ষবিষয়ান্তর্গত গোকলিকামণ্ডলান্তঃপাতি কুরটপল্লিকা গ্রাম মহীপাল গঙ্গাস্নানান্তে এক ব্রাহ্মণকে দান করছেন দেখা যায়। পোসলী গ্রামের শিল্পী মহীধর এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করেন। আমার মনে হয়, গোকলিকামণ্ডলের স্মৃতি পোর্টা থানার গোয়ালা মৌজা ও কুরটপল্লিকার স্মৃতি বর্ত্তমান পোষা থানার (কোচ) কুঁড়লিয়া গ্রাম নীরবে বহন করছে। পোষলীগ্রাম সম্ভবতঃ আধুনিক পোষা গ্রাম। এই তাম্রশাসনে জানা যায়, মহীপাল-দেব 'অনধিকৃত বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করেছিলেন। রাজ্যপাল অগাধ জলধিমূল-তুল্য গভীরগর্ত্ত জলাশয় ও কুলাচলতুল্য সমুচ্চ কক্ষসংযুক্ত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১ম গোপালদেব কামকারিগণের আক্রমণ পরাভূত ক'রে চিরশান্তি স্থাপন করেছিলেন। ধর্ম্মপাল-দেব ও দেবপালদেব সমগ্র উত্তরভারতে রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। ২য় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে অশান্তি ও আশ্রয়হানতার ইঙ্গিতও এই তাম্রশাসনে আছে। এই বাণগড়ে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে সংহিতা, মীমাংসা, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠের উল্লেখ আছে। পালরাজত্বকালের তাম্রশাসন শিলাপট্ট আদিতে জানা যায়, সেই সময়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ কাব্যাদি সর্ব্বশাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন, পালবংশের মন্ত্রিগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন ও শাস্ত্র শস্ত্র উভয় বিদ্যাতেই কুশলী ছিলেন। ১ম মহীপাল অধঃপতিত পালবংশের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে তাঁর নাম অনেক দীর্ঘিকা ও নগরের সাথে যুক্ত ছিল। মহাপালদীঘি, মহীপুর, মহীসন্তোষ প্রভৃতি নামের সাথে এই জেলার সকলেই পরিচিত আছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিনাজপুরাধিপতি রাজা রামনাথ বাণগড় থেকে একটি সুবৃহৎ কারুকার্যসমন্বিত প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারতোরণ, একটি লিপিযুক্ত সালঙ্কার প্রস্তরস্তম্ভ, মানসিকরূপে উৎসর্গীকৃত একটি মন্দিরের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ ও অন্যান্য কারুকার্য্যময় প্রস্তরাদি দিনাজপুর-রাজবাটীতে নিয়ে যান। এগুলি এখনও সেখানে আছে। স্তম্ভটির প্রান্তভাগ চতুষ্কোণ, উপরিভাগ দ্বাদশকোণবিশিষ্ট; তলদেশে চিত্রিত পাত্র থেকে পত্র-পুষ্প-লতা উর্দ্ধমুখে উঠেছে এবং আরও নানা কারুকার্য্য ও গণমূর্ত্তি দিয়ে স্তম্ভটি শোভিত। লিপিপাঠে জানা যায়, কাম্বোজবংশীয় জনৈক গৌড়পতি ৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বাণনগরে পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ বিশাল শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। স্তম্ভটি মন্দিরের সম্মুখে স্থাপিত ছিল, এটি দশম শতাব্দীর অপূর্ব্ব স্থাপত্য-নিদর্শন।

এই গৌড়পতি কে? ২য় বিগ্রহপালের সিংহাসন প্রাপ্তির আনুমানিক সময় ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ এবং তৎপুত্র ১ম মহীপাল আনুমানিক ৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং

২য় বিগ্রহপাল যখন রাজ্যহারা হন, সেই সময় বরেন্দ্রভূমি কাম্বোজবংশীয় গৌড়পতির অধীন ছিল ও তৎকালে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়।

পালনরপাল রাজ্যপাল রাষ্ট্রকুটতনয়া ভাগ্যদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। ইর্দ্রা তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়, নয়পালদেব রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে বর্দ্ধমানভুক্তির রাজধানী প্রিয়ঙ্গু থেকে ভূমি দান করছেন। ইনি নারায়ণপালদেবের ভ্রাতা ও কাম্বোজরাজকুলতিলক রাজ্যপাল ও ভাগ্যদেবী এঁদের পিতা মাতা। সম্ভবতঃ রাজ্যপালের মাতৃকুল কাম্বোজবংশীয় ছিল। তাই রাজ্যপাল, নারায়ণপাল ও নয়পাল কাম্বোজকুলীয় ব'লে অভিহিত হন। পালরাজ রাজ্যপালের স্ত্রীর নামও ভাগ্যদেবী ছিল। সুতরাং অনুমান হয়, রাজ্যপালের মৃত্যুর পর দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে পালরাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হয় ও কাম্বোজ-পালরাজ্যের রাজধানী হয় প্রিয়ঙ্গু। রাজ্যপালের অপর পুত্র ২য় গোপাল অঙ্গ-মগধে ও সম্ভবতঃ বরেন্দ্রে রাজত্ব করিতেন। কাম্বোজ পালরাজ নারায়ণপাল কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় বরেন্দ্র ২য় গোপালের হস্তচ্যুত হয়। এই কাম্বোজ-পালরাজগণেরই কেউ স্তম্ভলিপি-লিখিত গৌড়পতি হবেন। দিনাজপুর-রাজবাটীতে যে দ্বারতোরণটি রক্ষিত আছে, তার দু পাশে দুটি নাগের লম্বিত দেহ, নানারূপ সুন্দর নক্‌সা ও মূর্ত্তিসমূহ অঙ্কিত। এরূপ সম্পূর্ণ আকারে কারুকার্য্যময় পাথরের দরজা এই একটিই পাওয়া গিয়াছে, এ জন্য প্রাচীন কীর্ত্তির মূল্যবান্ আবিষ্কার এই নাগদরজা ঐতিহাসিকগণের চোখে সমধিক মর্য্যাদা লাভ করেছে। ক্ষুদ্র মন্দিরের প্রতিরূপটিও প্রাচীন "রেখা-দেউলে"র গঠনপরিচয় বহন করছে।

একাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্য্যনিদর্শন একটি নটরাজ গণেশমূর্ত্তি বাণগড় থেকে কলিকাতার যাদুঘরে নীত হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্য্যনিদর্শন একটি পঞ্চমুখ দশহস্তযুক্ত বদ্ধপদ্মাসন অপরূপ সদাশিবমূর্ত্তি বাণগড়সন্নিহিত শিববাটী থেকে পাওয়া গিয়েছে। মূর্ত্তিটী কালো পাথরের প্রায় সাড়ে চার ফুট উঁচু, বর্ত্তমানে কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। দক্ষিণ হস্ত-সমূহে অভয় ও বর মুদ্রা, শক্তি, ত্রিশূল ও খট্টাঙ্গ; বাম হস্তসমূহে সর্প, অক্ষমালা, ডমরু, নীলোৎপল, বীজপুর। পঞ্চরথ বেদীর মধ্যস্থলে শূলহস্তে দুই গণমূর্ত্তি, দক্ষিণ কোণে উর্দ্ধমুখ নন্দী ও বাম কোণে দাতৃদম্পতী। বালুরঘাট হাই স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক ঐতিহাসিক-প্রবর ৺নলিনীকান্ত ভট্টশালী উক্ত মূর্ত্তির পাদলিপির এইরূপ পাঠোদ্ধার করেছেন—

"পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীগোপালদেবের রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে তাঁহার মন্ত্রী শ্রীপুরুষোত্তম কর্তৃক এই পবিত্র সদাশিবমূর্ত্তি স্থাপিত।" তাঁর মতে ইনি পালনরপাল ৩য় গোপাল। কেউ কেউ মনে করেন, ইনি ২য় গোপালদেব। পালরাজত্বকালে দেবীকোট বিহার অন্যতম প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার ছিল। ধর্ম্মপাল-প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার ও রামপালপ্রতিষ্ঠিত জগদ্দল বিহারও বরেন্দ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পালরাজত্বকালে বরেন্দ্রে বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ও বিহারগুলি বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্মও এই যুগেই এবং বাংলাভাষার সেই উষাকালে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণ বৌদ্ধ চর্যাগান ও দোহা রচনা ও নানা রাগরাগিণীতে

সংকীর্ত্তন ক'রে বজ্রযান সহজযান প্রভৃতি বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের প্রচার করেন। বরেন্দ্রীর কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত পাঠে জানা যায়, অশীতিপরায়ণ ২য় মহীপালের সময় বরেন্দ্রে কৈবর্ত্তজাতীয় নায়ক দিব্য বা দিব্বোকের নেতৃত্বে প্রজারা বিদ্রোহী হয় ও কিছু দিনের জন্য উত্তরবঙ্গে কৈবর্তরাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে রামপাল বিভিন্ন সামন্তরাজ্যের সহায়তায় বরেন্দ্র উদ্ধার করেন। পালরাজত্ব সময়ে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে বাংলার নিজস্ব রীতি স্থাপিত হয়। বরেন্দ্রীর শিল্পিশ্রেষ্ঠ ধীমান্ ও তাঁর পুত্র বীতপালের প্রতিভা সে যুগের শিল্পকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেছিল।

সম্রাট্ আকবরের সমসাময়িক তিব্বতী পর্য্যটক লামা তারানাথের ইতিহাসে পালবংশীয় বাণপালনামক এক রাজার উল্লেখ আছে। ত্রিকাণ্ডশেষ নামক সংস্কৃত কোষগ্রন্থে দেবীকোটকে বাণাসুরের পুরী বলা হয়েছে। কিন্তু পালবংশের কোনও প্রামাণ্য বংশ-তালিকায় বাণপালের নাম পাওয়া যায় না। পুনর্ভবার পশ্চিম তীরে নারায়ণপুর মৌজায় পাতারী বিলের নিকট থেকে একটি সড়ক কুশমণ্ডী থানার মধ্য দিয়ে আগ্রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রেভিনিউ সার্ভে ম্যাপে এই সড়কের নাম বাণরাজার জাঙ্গাল ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। তারানাথের মতে বাণপাল পুনর্ভবাতীরে দেবকোটে রাজত্ব করতেন। স্থানীয় প্রবাদমতে বাণগড় বাণরাজার পুরী, নদীর অপর তীরে উষাগড়ে বাণের কন্যা উষার প্রাসাদ-চিহ্ন। একটি রাস্তার নামও উষাহরণ সড়ক। পৌরাণিক উষাহরণ কাহিনী এই গড়ের সহিত সংযুক্ত ক'রে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। সহস্রকর বাণাসুরের ৯৯৯টি কর যুদ্ধে কাটা পড়ায় যেখানে ঐ কর সকল দাহ করা হয়, তাহাই করদাহ নামে পরিচিত, এরূপ প্রবাদ আছে। প্রত্নবিদ্ পণ্ডিত বিনোদবিহারী রায় এরূপ প্রবাদের উৎপত্তির কারণস্বরূপ একটী মত প্রচার করেছিলেন। মতটি বিবেচনার যোগ্য।

তাঁর মতে বাণপালেরও কন্যার নাম উষা, উষার সঙ্গে শূরবংশীয় প্রদ্যুম্নশূরের পুত্র অনিরুদ্ধ শূরের প্রণয় হয় এবং উষা তাঁকে নিজপ্রাসাদে আশ্রয় দেন। বাণ জানতে পেরে অনিরুদ্ধকে বন্দী করেন। প্রদ্যুম্ন সংবাদ পেয়ে বাণপালের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করেন; উষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ হয় ও প্রদ্যুম্ন দক্ষিণ-বরেন্দ্রে রাজধানী স্থাপন করেন। প্রদ্যুম্নের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই বিজয় উপলক্ষে বরেন্দ্রশূর নামে পরিচিত হন। বাণপুরের অপর নাম 'উমাবন' ব'লে অভিধানকারগণ উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ উষাবন লিপিকরপ্রমাদে উমাবনে পরিণত হয়েছে। গঙ্গারামপুরের অদূরে কালাদীঘি নামক বিরাট্ দীর্ঘিকা বাণপালমহিষী কালারাণীর নামে প্রতিষ্ঠিত, এরূপ প্রবাদ। দীঘিটির আয়তন ৭৫ × ৩০ চেন।

বাণগড়ের ধ্বংসস্তূপ প্রায় তিন মাইলব্যাপী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে কয়েক বছর আগে এখানে খননকার্য্য আরম্ভ হয়েছিল। খননের ফলে মৃত্তিকাগর্ভে বাড়ী ঘরের চারটি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। পুরাণ নগর ধ্বংসের পর তার বুকে আবার নতুন নগর নির্ম্মিত হয়েছে। প্রাসাদ, মন্দির, প্রাচীর, ইঁদারা, নালা, জলনিকাশী গর্ত্ত, আর্দ্রভাণ্ডেস্ত শস্যাগার আবিষ্কৃত হয়েছে, সবগুলিই ইটের তৈরী। আর পাওয়া গেছে—পোড়া মাটির

নরনারীমূর্ত্তি, ষাঁড়, বানর, হাতী প্রভৃতি জীবজন্তুর মূর্ত্তি, নক্‌সা-কাটা মাটির কলস, শঙ্খ-পদ্ম-আঁকা মাটির টিকলি, মালা, লোহার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। মাটির মোহরে খৃষ্টাব্দের আরম্ভ সময়ের ব্রাহ্মী লিপি সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক আবিষ্কার। এই লিপির পাঠোদ্ধার হ'লে এ দেশের ইতিহাসে নতুন আলোকপাত হবে।

পালরাজত্বের শেষ ভাগে সেনবংশীয়দের অভ্যুদয় হয়। তাঁরা রাঢ় ও বঙ্গে পালরাজত্বের অবসান করেন; কিন্তু উত্তরবঙ্গে পালদের রাজত্ব কিছু কাল অক্ষুণ্ণ থাকে। বিজয়সেনের আমলে দক্ষিণ-বরেন্দ্রী সেন-শাসনাধীনে আসে। কিন্তু তাঁর রাজধানী ছিল রাঢ়ে। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষ ভাগে তাঁর নামের সঙ্গে গৌড়েশ্বর উপাধি যুক্ত দেখা যায়। কাজেই মনে হয়, বিজয়সেন ও তাঁর পুত্র বল্লালসেন গৌড়বিজয় সম্পূর্ণ করতে পারেননি। লক্ষ্মণসেনের সময় গৌড়ের নিকট লক্ষ্মণাবতী নামে সেনদের প্রথম রাজধানী উত্তরবঙ্গে স্থাপিত হয়। সেন-রাজত্বের নিদর্শনস্বরূপ দ্বাদশ শতাব্দীর মাত্র একখানি তাম্রশাসন তপন থানায় তপনদীঘির সন্নিকটে একটি পুকুরে আবিষ্কৃত হয়েছে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী বিল্বাহষ্টি গ্রাম হেমাশ্বরথ মহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ মহাদানাচার্য ঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন রাজধানী বিক্রমপুর থেকে এই তাম্রশাসন দ্বারা দান করছেন। এই ভূমিতে বৎসরে দেড় শত কপর্দ্দক পুরাণ মূল্যের শস্য উৎপন্ন হত। কপর্দ্দকপুরাণ ৩২ রতি ওজনের রৌপ্যমুদ্রা। সেনরাজত্বে বিনিময় কার্য্য কড়ি দ্বারা হত। এ কারণ ঐতিহাসিকেরা মনে করেন, আধুনিক স্বর্ণমানের মত কপর্দ্দকপুরাণ কাল্পনিক মান, প্রচলিত মুদ্রা নয়। তাম্রশাসনটিতে ভূমির পরিমাণ ও চতুঃসীমা লিখিত আছে। উন্মান, আঢ়াবাপ প্রভৃতি ভূমিমাপের উল্লেখ আছে। ৩২ হাতে এক উন্মান, ৪ আঢ়াবাপে এক দ্রোণ। এ কালেও বিভিন্ন মাপের নল দিয়ে জমি মাপা হত। রাজ-রাজণ্যক-রাজ্ঞী-রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, পুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহাসন্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত, অন্তরঙ্গ, বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাভৌরিক, মহাপীলুপতি, মহাগণস্থ, দোঃসাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌবল, হস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাধ্যক্ষব্যাপৃতক, গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক, বিষয়পতি, চাটভাট, জাতীয়লোকসকল, ক্ষেত্রকর, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণোত্তর, সকলকে সম্বোধন ক'রে 'মতমস্তু ভবতাম্' ব'লে ভূমি দান করছেন। বিভিন্ন রাজকর্ম্মচারীর এবং কৃষক, ব্রাহ্মণাদি ও নিম্নজাতীয় লোকের মত নিয়ে ভূমিদান সত্যি সত্যি হত না; কিন্তু প্রাচীন প্রথার মর্যাদারক্ষার্থ সম্মতিগ্রহণসূচক বাক্য সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রাচীনতর কালে ভূমিতে সাধারণের অধিকার ছিল, তারই আভাস পাওয়া যায় এই মতগ্রহণপ্রথায়। সেনরাজত্বের সময় উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও শাস্ত্র-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতাবলম্বী ও তদনুসরণে অবধূত, বাউল, নাথপন্থী, সহজিয়াপন্থী, শাক্ত তান্ত্রিক, ধর্ম্মপূজক প্রভৃতি যে সব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল, তাদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল ব'লে মনে হয়। বিজয়সেন বল্লালসেন শৈব ছিলেন, লক্ষ্মণসেন বৈষ্ণব ও তাঁর পুত্র-পৌত্রেরা সৌর হন। এ সময়ে উচ্চবর্ণের মধ্যে ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা ও সাধারণের মধ্যে প্রচলিত তন্ত্রমূলক ধর্ম্মের বিকার ও অবনতির ফলে নিম্নজাতীয়

হিন্দু বহুসংখ্যায় পরবর্তী সময়ে মুসলমান হয়ে যায়। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষ ভাগে অনুমান ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী রাজধানী নদীয়া আক্রমণ করলে লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরে আশ্রয় নেন। বখতিয়ার নদীয়া ধ্বংস ক'রে লক্ষ্মণাবতীতে আসেন এবং সেখান থেকে দেবকোটে এসে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। দেবকোট থেকে তিব্বতে ব্যর্থ অভিযান ক'রে বখতিয়ার ভগ্নমনোরথ হয়ে দেবকোটে ফিরে আসেন ও তথায় অল্পকাল পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। দেবকোটে বখতিয়ারের সমাধি আছে। দেবকোট বাংলার প্রথম মুস্লিম রাজধানী। উত্তরবঙ্গ মুস্লিম শাসনাধীনে এলেও সেনরাজারা আরও কয়েক পুরুষ বঙ্গে রাজত্ব করেন। রাঢ়েও মুস্লিম রাজত্ব কায়েম করতে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী লেগেছিল মনে হয়।

বীরভূম জেলা থেকে দেবকোট অবধি একটি বিস্তৃত সড়ক সুলতান গিয়াসুদ্দিন খিলজী (১২১১-১২২৭ খ্রীঃ) তৈরী করান। এই সড়ক বানের সময় বাঁধের কাজও করত। বাণগড়ের কাছে বাণ রাজার প্রতিষ্ঠিত ব'লে কথিত একটি শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর দিনাজপুরাধিপতি রামনাথ এক ক্ষুদ্র শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে একটি বৃহৎ পাথরের বৃষমূর্ত্তি স্থানান্তরিত হয়ে রংপুর কালেক্টরীর প্রাঙ্গণে রক্ষিত আছে। মন্দিরের অদূরে দুটি মুস্লিম দরগার চিহ্ন দেখা যায়। তার মধ্যে একটি সুলতান সাহের ব'লে অনুমিত হয়। দরগার দক্ষিণে অমৃতকুণ্ড জীয়তকুণ্ড নামে দুটি ক্ষুদ্র কুণ্ড হিন্দু রাজত্বের স্মৃতি বহন করছে। বাণগড় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পীর শাহ বোখারীর নির্ম্মিত একটি মসজিদ আছে। সুলতান গিয়াসুদ্দীন দেবকোটের টাকশাল থেকে নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। দমদমায় মুস্লিম আমলে একটি সেনানিবাস স্থাপিত হয়। সুলতান হুশেন সাহের সময় (১৪৯৭-১৫২১ খ্রীঃ) দমদমা সেনানিবাস ও ঘোড়াঘাট সেনানিবাস একটি বৃহৎ সড়ক দ্বারা সংযোজিত হয়। ওয়েস্ট মেকট সাহেব দেবকোট থেকে নিম্নলিখিত প্রস্তরলিপিগুলি সংগ্রহ করেন :—

সুলতান কয়কায়সের সময়ের একটি	৬৯৭	হিজরী	(১২৯৭ খৃঃ)
„ সেকেন্দর সাহের „ „	৭৬৫	„	(১৩৬৫ খৃঃ)
„ মুজাফর শাহের „ „	৮৯৬	„	(১৪৯৬ খৃঃ)
„ হোসেন শাহের „ „	৯১৮	„	(১৫১৮ খৃঃ)

পুনর্ভবার পশ্চিম তীরে পীর শাহ বাহাউদ্দীনের দরগা ও নিমাই শাহর সমাধি আছে। বঙ্গে মুশলিম অধিকারের সূচনায় এ অঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচার জন্য নামকরা বহু মুশলিম সাধু পীর এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধানতম শাহ আতাউল্লা ধলদীঘি নামে বিরাট দীঘিটির (৭৩ × ৩১ চেন) উত্তর পাড়ে মসজিদে সমাহিত হন। তাঁর সময় ১৩০০-১৩১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। মসজিদটি সম্ভবতঃ পীর জাফর খাঁ গাজীর নির্ম্মিত ও তাঁর আদেশে সুলতান রুকুনুদ্দীন কায়কায়সের পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরলিপি মসজিদের গায়ে স্থাপন করা হয়। অসম্পূর্ণ মসজিদটি সুলতান সেকেন্দর শাহ ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। উক্ত পীরের ভৃত্যবংশীয় ফকিরগণ বর্ত্তমানে পীরপালভোগী। এঁরাই ধলদীঘির ফকির নামে খ্যাত। ১২৬২ সালে করমানী শাহ ফকিরদীঘির দক্ষিণ পাড়ে একটি বড় মেলা বসান। মেলাটি এখনও এতদঞ্চলে

অন্যতম প্রধান মেলা। দীঘির উত্তর পাড়ে ভূগর্ভে চিল্লার মধ্যে সাধুগণের উপাসনার নির্জন স্থান ছিল।

যে অঞ্চল হিন্দুযুগে খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব্ব থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শিক্ষায়, সভ্যতায়, চরিত্রগৌরবে, শৌর্য্যে বীর্য্যে, শিল্পে বাণিজ্যে, সব বিষয়ে সমুন্নত ছিল, মুস্লিম আক্রমণে তা ক্রমে ক্রমে অবনতির পথে নেমে একেবারে নস্যকস্যের দেশে পরিণত হল। পতন ও অভ্যুদয়রূপ বন্ধুর পন্থায় যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী! যাত্রীদল আবার চলতে শুরু করেছে অভ্যুদয়ের পথে; অতীতের দর্পণে তারা চিনে নিক তাদের সত্যকার পরিচয়—অতীতের গৌরবময় স্মৃতি জাতির ভবিষ্যৎ স্বপ্নকে সফল করবার সাধনায় আশা দেবে, উৎসাহ দেবে, সাহস যোগাবে, নির্ভরতা জাগাবে। নইলে 'ঘরেতে বসি গর্ব্ব করি পূর্ব্বপুরুষের'—শুধু এ জন্য অতীতের আলোচনা নিরর্থক।

বাংলা সংবাদপত্রে বাংলা গ্রন্থপরিচয়*

১৮১৮—১৮৬৭ খ্রী:

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম. এ.

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত দিগ্‌দর্শনই বাংলা ভাষার প্রাচীনতম মাসিক-পত্র। দিগ্‌দর্শনে কোন বাংলা গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয় নাই। দিগ্‌দর্শনের একমাস পরে প্রকাশিত "সমাচারদর্পণে" বহু বাংলা গ্রন্থের সমালোচনা মুদ্রিত হইয়াছিল। এই জন্য ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দকে আমাদের আলোচনার এক সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অন্য সীমা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দকে অন্য সীমা নির্দ্দেশের কারণ এই—১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা গেজেটে প্রতি তিন মাস অন্তর এক একটি গ্রন্থতালিকা মুদ্রিত হইতেছে। এই রীতি এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। বাংলা দেশের বিভিন্ন মুদ্রাযন্ত্রে যে সকল গ্রন্থ ও সংবাদ-পত্রাদি মুদ্রিত হয়, তাহার এক তালিকা গেজেটের ত্রৈমাসিক পরিশিষ্টে পাইতেছি। অতএব ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান বৎসর পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মুদ্রিত সকল বাংলা গ্রন্থ ও সংবাদপত্রের তালিকা কলিকাতা গেজেটের বিভিন্ন ত্রৈমাসিক পরিশিষ্টে পাওয়া যাইবে। কিন্তু ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে প্রকাশিত সকল বাংলা গ্রন্থের সম্পূর্ণ তালিকা সঙ্কলন কষ্টসাধ্য। আমি ঐ সময়ের মধ্যে মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের এক তালিকা সঙ্কলন করিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে মুদ্রিত বহু গ্রন্থের সন্ধান সংবাদপত্রে প্রকাশিত গ্রন্থ বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ও স্থানভেদে গ্রন্থ সমালোচনা হইতে জানা গিয়াছে। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকটেও এই সমালোচনা প্রয়োজনে আসিতে পারে মনে করিয়া ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে মুদ্রিত গ্রন্থ সমালোচনা, গ্রন্থবিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি ক্রমশ: প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। নিম্নে সোমপ্রকাশ হইতে কয়েকখানি পুস্তক সমালোচনা ও বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত হইল।

সোমপ্রকাশ—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর সোমবার [১লা অগ্রহায়ণ, ১২৬৫ বাং] প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

সোমপ্রকাশ—২৮এ পৌষ, ১২৭০ সাল, ১৩৫ পৃ:

নূতন পুস্তক

আমরা এ সপ্তাহে কিষ্কিন্ধা কাণ্ড নামে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি সংস্কৃত রামায়ণের কিষ্কিন্ধা কাণ্ডের অনুবাদ। রাজপুর বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোলক

---

* শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য দীর্ঘকাল হইতে বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া গৌহাটীতে অধ্যাপনা করিতেছেন। তাঁহার বহু পরিশ্রমে সংবাদপত্র হইতে সংকলিত প্রাচীন মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের পরিচয় আমরা বর্ত্তমান বর্ষ হইতে ধারাবাহিকভাবে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিব। ইহাতে বাংলা সাহিত্যসেবিগণের গবেষণার যে প্রভূত সাহায্য হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। ইতি—পত্রিকাধ্যক্ষ।

নাথ ভট্টাচার্য্য ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। কলিকাতা বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।৹ আট আনা। পৃঃ ১৩৫।

সোমপ্রকাশ—৬ই মাঘ, ১২৭০, ১৫১ পৃঃ

নূতন পুস্তক

১ম। আমরা 'জানকী নাটক' নামে একখানি বাঙ্গালা নাটক প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাকবি ভব-ভূতি প্রণীত সংস্কৃত উত্তর রাম চরিত অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিয়াছেন সমুদায় বাঙ্গালা নাটক অশ্লীল বলিয়া হরিশবাবু স্ত্রীলোকদিগের পাঠার্থ এইখানি প্রণয়ণ করিয়াছেন, অনেকাংশে অভিলাষিত বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। লেখা মন্দ হয় নাই। ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১৲ টাকা।

২য়। নীতিসার পদ্য। কুমারখালি ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার একখানি সঙ্কলিত ইংরাজী পদ্য পাঠ হইতে ইহা অনুবাদ করিয়াছেন। পদ্যগুলি উত্তম হইয়াছে। ইহা বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইলে ছাত্রগণের সবিশেষ উপকার হইতে পারিবে। কলিকাতা বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত; মূল্য নির্দ্দিষ্ট নাই। পৃঃ ১৫১

সোমপ্রকাশ—১৪ই বৈশাখ, ১২৭১, ৩৬৯ পৃঃ

আমি বাঙ্গলা কাব্য নামে একখানি ঈশ্বর প্রেম বিষয়ক পদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছি। ইহার মূল্য ৷৵৹ দশ আনা। কালেজ ষ্ট্রীট গুপ্ত ব্রাদার্স দিগের ইউনিয়ান লাইব্রেরীতে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন।

শ্রীশশিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ—১৪ই বৈশাখ, ১২৭১, ৩৬৯ পৃঃ

বিজ্ঞাপন—

সম্প্রতি 'পাবনা দর্পণ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা আমাদিগের যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহাতে কাব্যনীতি ও বিবিধ সংবাদ লিখিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত বাবু রামসুন্দর. রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ মিশ্র দ্বারা এই পত্রিকা সম্পাদিত হয়। এই নবীন সম্পাদকদ্বয়ের যেরূপ উৎসাহ অনুরাগ ও ফল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে বোধহয় ইহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইবেক। যাঁহার প্রয়োজন হয় তিনি কলিকাতায় গুপ্ত ব্রাদার্স অথবা পাবনায় সম্পাদক দিগের নামে পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন। ইহার বার্ষিক মূল্য ২।৹ দুই টাকা চারি আনা ও ডাকমাশুল ৶৹ আনা

শ্রীগুপ্ত ব্রাদার্স

সোমপ্রকাশ—১৪ই বৈশাখ, ১২৭১ সাল ৩৬৯পৃঃ

বিজ্ঞাপন—

শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয় প্রণীত 'পুরাণ সংগ্রহে'র দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খণ্ড মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে, গ্রাহকগণ সত্বরে লইয়া যাউন।

জোড়া সাকো। শ্রীরাধানাথ বিদ্যারত্ন

সোমপ্রকাশ—১৪ই বৈশাখ, ১২৭১, ৩৭৫ পৃঃ

নূতন পুস্তক

আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, নিম্ন লিখিত পুস্তক দুইখানি আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে।

১ম। বীর বাক্যাবলী। ঢাকা দর্পণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র এখানি পদ্যে রচনা করিয়াছেন। অর্জ্জুনের প্রতি সুধন্বার উক্তি, মন্দোদরীর প্রতি দশাননের উক্তি, কুন্তির প্রতি কর্ণের উক্তি, কৃষ্ণের প্রতি শিশুপালের উক্তি, এবং দুর্য্যোধনের প্রতি ভীমের উক্তি, এই পাঁচটি বিষয় লইয়া পুস্তকখানি প্রণয়ণ করা হইয়াছে। পদ্যগুলির অনেক স্থল যথার্থ বীর রসাত্মক হইয়াছে। আমরা হরিশবাবুর বঙ্গভাষায় উৎসাহ ও অনুরাগ দেখিয়া পুনঃ পুনঃ সন্তুষ্ট হইতেছি। ইঁহার কবিত্ব শক্তিও ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে। এই পুস্তকখানির মূল্য ।০ আনা।

২য়। নীতি বিজ্ঞান। ঢাকা পোগস-স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু দীননাথ সেন ইহা লিখিয়াছেন। ইহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, স্বরূপ ও অভিপ্রেত এবং শরীর সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে মনুষ্যের কর্ত্তব্যতা বর্ণন করা হইয়াছে। লেখা মন্দ হয় নাই। ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

সোমপ্রকাশ—২১এ বৈশাখ, ১২৭১, ৩৮৬ পৃঃ

বিজ্ঞাপন—

পূর্ব্বে 'শিক্ষা প্রণালী' নামে কতকগুলি প্রবন্ধ সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি সেই প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া এবং আরও কতকগুলি নূতন প্রবন্ধ লিখিয়া "শিক্ষা প্রণালী" নামে একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছি। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা ষ্টানহোপ প্রেসে অথবা নর্ম্মাল স্কুলে অনুসন্ধান করিলে ঐ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইবেন। গ্রন্থখানি বার পেজি ফরমার ৩৬ ফরমায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

৪ঠা চৈত্র ১২৭০। শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা

সোমপ্রকাশ—২১শে বৈশাখ ১২৭১, ৩৯২ পৃঃ

নূতন পুস্তক

মেদিনীপুর জ্ঞানদায়িনী সভার বক্তৃতা। তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমানাথ তর্কবাগীশ বিদ্যার ফল বিষয়ক এক প্রস্তাব পাঠ করিয়াছেন। ইহাতে একটিও নূতন কথা দেখা গেল না।

"শরীর তত্ত্বসার" সোমপ্রকাশ—২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১২৭১, ইং ১৮৬৪, ৬ জুন ৬৬৫ পৃঃ।

বিজ্ঞাপন—

উক্ত নামধেয় একখানি অভিনব গদ্যগ্রন্থ আমাদিগের গ্রন্থালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে, মূল্য ৷৷৵০ আনা মাত্র গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ বসাক, বি. এ. মহাশয় উহা সুসাধু বঙ্গভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন। মনুষ্যের শারীরিক কার্য্য সকলের সংক্ষেপ বিবরণ, দ্বাদশটি চিত্র ও অপ্রচালত

শব্দার্থ সম্বলিত ইংরাজী নানা গ্রন্থ হইতে উহা সঙ্কলিত ও আয়ুর্ব্বেদসম্মত বিষয় সকল প্রকটিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সকল অংশেই পাঠযোগ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। এক্ষণে বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ উহার প্রতি কটাক্ষপাত করিলেই গ্রন্থকর্ত্তার শ্রম সফল হয়। গ্রহণেচ্ছুগণ আমাদিগের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

গুপ্ত ব্রাদার্স
নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী
৮৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

সোমপ্রকাশ—১লা আষাঢ়, ১২৭১, ৪৮১ পৃঃ ১৮৬৪, ১৩ জুন

বিজ্ঞাপন—

আমি ও আমার কয়েকটি বন্ধু একত্রিত হইয়া বাঙ্গলা ভাষায় ক্ষেত্রতত্ত্বের অতিরিক্ত ১ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত সংখ্যানুক্রমে, চোরবাগান, ৪৫নং ভবন স্কুল বুক প্রেসে মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল　　শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

১৮৬৪, ৩ জুন

সোমপ্রকাশ, ১লা আষাঢ় ১২৭১, ৪৮১ পৃঃ

বিজ্ঞাপন—

পূর্ব্বে "শিক্ষাপ্রণালী" নামে কতকগুলি প্রবন্ধ সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি সেই প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া এবং আরও কতকগুলি নূতন প্রবন্ধ লিখিয়া "শিক্ষাপ্রণালী" নামে একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছি। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কালকাতার ষ্টানহোপ প্রেসে অথবা নর্ম্মাল স্কুলে অনুসন্ধান করিলে ঐ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইবেন। গ্রন্থখানি ১২ পেজি ফরমার ৩৬ ফরমায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। মূল্য ২ দুই টাকা মাত্র।

৪ঠা চৈত্র, ১২৭০ সাল।　　শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা।

সোমপ্রকাশ—১লা আষাঢ়, ১২৭১, ৪৮১ পৃঃ

বিজ্ঞাপন—

নজিরাদি ও অবতারণিকা সম্বলিত ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের টীকা।

ঢাকা কলেজের আইনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র, বি. এল. ও এম. এ. দ্বারা বাংলা ভাষায় প্রচারিত হইল। মূল্য ৸৴৹ আনা মাত্র।

গ্রহণেচ্ছুগণ ঢাকায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট অথবা কলিকাতায় বেঙ্গল সেক্রেটরির আফিসে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

পুস্তক প্রাপ্তি। সোমপ্রকাশ। ১লা আষাঢ়, ১২৭১,৪৮৭ পৃঃ

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত পুস্তকখানি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১৮৫৯ সালের সটীক ১৪ (তামাদি বিষয়ক) আইন। ঢাকা কলেজের ব্যবহার শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এ, বি, এল, এম, এ, এতৎ সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রিভি কৌন্সেল, সদর দেওয়ানী আদালত, এবং হাইকোর্টের তামাদি বিষয়ক বহুতর নজীর ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়া গ্রন্থখানি চলিত ও সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সচরাচর যে সকল বাঙ্গালা আইন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে যেমন অতিকষ্টে দন্তস্ফুট করিতে হয়, ইহাতে সেরূপ হয় না। ইহা কমিটি পরীক্ষার্থীদিগের পক্ষে সবিশেষ উপকারক হইবে। গ্রন্থ ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার মূল্য ৳৶৹ আনা।

সোমপ্রকাশ, ১৫ই আষাঢ়—১২৭১, ১৮৬৪।২৭ জুন, ৫১৩ পৃঃ

"বিজ্ঞাপন।

ধাতু ও লিঙ্গ বিনির্ণয় সমেত শব্দদীধিতি অভিধান প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ও নূতন সঙ্কলিত শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন দেশ নগরাদির বর্ত্তমান নাম যত দূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ৮ পেজী ফর্ম্মার ১৭৮৮ পৃষ্ঠা হইয়াছে। মূল্য স্বাক্ষরকারীর প্রতি (ডাক মাসুল সমেত) ৩৷৹ টাকা এবং বিনাস্বাক্ষরকারির প্রতি ৪ টাকা। যাঁহার প্রয়োজন হয়, ঢাকা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে আমার নিকট মূল্য প্রেরণ করিলে অবিলম্বে পুস্তক পাইবেন। স্বাক্ষর করিয়া দুই মাসের মধ্যে পুস্তক গ্রহণ না করিলে বিনাস্বাক্ষরকারির মধ্যে গণনীয় হইবেন ইতি।

ঢাকা

৪ঠা আষাঢ় ১২৭১ শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়।"

সোমপ্রকাশ, ১৫ই আষাঢ়। ১২৭১।৫১৩ পৃঃ

বিজ্ঞাপন।

মূলাযোড়নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক স্বকপোলকল্পিত খলচরিত্র নামক গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় গদ্যে পদ্যে বিরচিত হইয়া অতি উত্তম কাগজে এবং উত্তম অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা। চিতপুর রোড বটতলা ২৪৬ সংখ্যক ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব দে এণ্ড কোং মহাশয়ের লাইব্রেরিতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন ইতি।

১৫ই আষাঢ়—১২৭১।৫১৯ পৃঃ

"দেশোন্নতি সংসাধনের উপায়"।

মেদিনীপুরের ইংরাজী স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী তত্রত্য জ্ঞানদায়িনী সভায় উপরি লিখিত শিরোনামের একটি প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন। উহা ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম, প্রস্তাবটী অতি মনোহর ও পরমোপকারক হইয়াছে, পাঠকগণের গোচরার্থ উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"১। আমাদের সর্ব্বসাধারণের ব্যয়ে একটি প্রধান শিল্প ও যন্ত্রবিদ্যালয় সংস্থাপিত করিতে হইবে। এই বিদ্যালয়ে বিবিধ মহোপকারী শিল্পকার্য্য, উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ ও তৎপরিচালনের শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে বাষ্পীয় যান, বাষ্পীয় পোত, বস্ত্রবয়ন যন্ত্র,

সূতার কল, কাগজের কল প্রভৃতি কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হয়, ও কেমন করিয়া চালাইতে হয় তাহা শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। ইউরোপ হইতে উত্তম উত্তম শিল্প ও যন্ত্রবেত্তা লোকদিগকে আনাইয়া এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত করিতে হইবে।

এই বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত করা বহু ব্যয়সাধ্য। ইহা সংস্থাপিত করা মুখের কথা নহে। কিন্তু আমাদের দেশের ধনী মহাশয়েরা উদ্যোগপরায়ণ হইলে অবশ্যই ইহা স্থাপিত হইতে পারে। আমাদের সকল সৌভাগ্য—সকল পুরুষার্থ এই বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করিতেছে। এবংপ্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে অল্পদিন পরেই দৃষ্ট হইবে এ দেশীয় কোন ব্যক্তি রেলওয়ের শকট চালাইতেছেন, কোন ব্যক্তি বা অর্ণবপোতের অধ্যক্ষ হইয়া দেশদেশান্তরে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেছেন। কোথাও দেখা যাইবে, এ দেশীয়েরা উদ্যোগী হইয়া বস্ত্রের কল সংস্থাপন করিয়া মানচেষ্টরের আর অপেক্ষা রাখিতেছেন না। কোনখানে লক্ষিত হইবে, এতদ্দেশবাসীরা বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান ও প্রশস্ত যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

২। এ দেশের কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধনার্থ স্থানে স্থানে কৃষিসমাজ ও কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে কৃষিকার্য্যের উৎকৃষ্ট রীতির শিক্ষা দিতে হইবে। এবং সমাজ হইতে কৃষকদিগকে পুরস্কার দান ও কৃষিকার্য্যোপযোগী উৎকৃষ্ট, যন্ত্রাদির সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। তাহা হইলেই ক্রমশঃ এখানকার কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধন হইবে। এবং আমাদের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

৩। যদিও এখানকার অনেককে বাণিজ্যে কিছু কিছু অনুরক্ত দেখা যায় বটে, কিন্তু তাঁহাদের বাণিজ্য কার্য্য বহু বিস্তৃত নহে ও তাহাতে উৎকৃষ্ট রীতিও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং সেই বাণিজ্য দ্বারা এ পর্য্যন্ত আমাদের সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শে নাই। বাণিজ্য বিস্তৃত না হইবার কারণ এই যে, আমরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হই, দলবদ্ধ হইয়া বাণিজ্য কার্য্যে ব্যাপৃত হই না। উৎকৃষ্ট না হইবার কারণ এই যে, অশিক্ষিত লোকে বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। অতএব আমাদিগকে বাণিজ্যের রীতি অবস্থাদি বিশেষ অবগত হইয়া দলবদ্ধ হইয়া ও বহু মূলধন লইয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের বাণিজ্য বহু বিস্তৃত হইয়া দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইবে এবং এ দেশের সম্পত্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

৪। যাহাতে আমাদের শারীরিক বল ও সাহসের সঞ্চার হয় আমাদিগের সর্ব্বাগ্রে তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। বহুলরূপে ব্যায়ামচর্চ্চা হইবার উপায় বিধান করিতে হইবে। নানা স্থানে ব্যায়ামের স্থান নির্দিষ্ট করিতে হইবে। এবং বিদ্যালয়াদিতে ব্যায়াম চর্চ্চার নিয়ম করিয়া দিতে হইবে। বালকদিগের মানসিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়, প্রত্যেক পিতামাতাকে তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। আমাদের একটি যুদ্ধবিদ্যালয় সংস্থাপিত করিতে হইবে। তাহা হইলে ক্রমশঃ আমাদের বলবীর্য্য লাভ হইবে এবং আনুষঙ্গিক সাহসেরও সঞ্চার হইবে।

কি বিদ্যাবল কি বুদ্ধিবল শারীরিক বলবীর্য্য ভিন্ন আমাদের কিছুতেই কিছু হইবে না। যখন রোম রাজ্যের সম্ভ্রান্তবংশীয় পেট্রিসিয়েনরা প্লিবিয়ানদিগকে নিকৃষ্ট বোধে অবজ্ঞা করিত, তাহাদের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিত এবং রাজ্যের অংশভাগী হইতে না দিয়া তাহাদিগকে অতি হীন অবস্থায় রাখিত, তখন সেই অবজ্ঞাত অত্যাচরিত প্লিবিয়ানরা কেবল বলবীর্য্য দ্বারা সমস্ত অত্যাচার নিবারণ ও আপনাদের অবস্থার উৎকর্ষসাধন করিয়াছিল এবং পেট্রিসিয়েনদিগের সহিত সর্ববিষয়ে সমতুল্য হইয়াছিল। অতএব যত দিন না আমাদের দৌর্বল্য ও ভীরুতা দূর হইবে, যত দিন না আমরা বলীয়ান্ ও সাহসসম্পন্ন হইব, তত দিনই আমাদের হীন অবস্থা থাকিবে।

সোমপ্রকাশ, ১৫ই আষাঢ়, ১২৯১। ৫১৯ পৃঃ

৫। বর্ত্তমান আহার দ্রব্য আমাদের দৌর্ব্বল্যের এক প্রধান কারণ। অতএব অসার বস্তুসকল পরিত্যাগ করিয়া পুষ্টিকর সারবান্ বস্তু ব্যবহার করিতে হইবে।

৬। আমাদের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক। এ দেশের, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের পরিচ্ছদ অতি জঘন্য। আমরা আমাদিগের পরিচ্ছদ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। এরূপ পরিচ্ছদ বনবাসী ঋষিদিগেরই শোভা পায়। এই পরিচ্ছদ আমাদিগকে অলস করিয়া তোলে। অতএব ধুতি চাদর ত্যাগ করিয়া ইজার চাপকান বা অন্য কোনপ্রকার উৎকৃষ্ট বস্ত্র সর্ব্বদা পরিধান করিতে হইবে। আমাদের স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অন্যে কি, আমরা নিজেই তাহাদের পরিধান বস্ত্র দর্শন করিয়া লজ্জিত হই।

৭। চিকিৎসা কার্য্যেও আমাদের নূতন প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে। বিলুপ্তপ্রায় এদেশের চিকিৎসাপদ্ধতি অনেক অঙ্গহীন দেখা যাইতেছে ও দিন দিন তাহাতে তত্রত্য লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইতেছে। ইউরোপীয় চিকিৎসার প্রতি এ দেশীয়েরা দিন দিন [পৃঃ ৫২০] অনুরক্ত হইতেছেন বটে, কিন্তু তাহা বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অতি দুঃসাধ্য হইয়াছে। আর ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রও এখন অনেক অসম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে। কিন্তু এদেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়বিধশাস্ত্র হইতে সংকলন করিয়া দেশীয় ভাষায় নূতনবিধ চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণয়ণ করিলে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অনেক অংশে সম্পূর্ণ হইবে। এবংপ্রকার চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া আমাদিগের একটি চিকিৎসাবিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, সেই বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্রেরা যে অধুনাতন ডাক্তার ও বৈদ্য অপেক্ষা অনেকগুণে উৎকৃষ্ট হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই এবং তাহাদিগের দ্বারা চিকিৎসাকার্য্য অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহিত হইবে। সুতরাং তদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের বিশিষ্ট উপকার দর্শিবে।

৮। এক্ষণে যাদৃশ শিক্ষা হইতেছে তদপেক্ষা বিস্তৃতরূপ জ্ঞানানুশীলন না হইলে আমাদের আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। আমরা যত দিন পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকিব, তত দিন আমাদের বহুলরূপে শিক্ষা লাভ হইবে না। যত দিন না আমরা অনুরক্ত হইয়া শিক্ষাকার্য্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া অসংখ্য বিদ্যালয় সংস্থাপন করিব, তত দিন আমাদিগের অভিপ্রেত

ফল দূরে পড়িয়া থাকিবে। যে পর্য্যন্ত না দেশীয় ভাষার বহুল অনুশীলন হইবে, যত দিন না তাহাতে ইউরোপীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, তাবৎ আমাদের দেশে আশানুরূপ জ্ঞানের বিস্তার হইবে না। অতএব আমাদের স্বয়ং শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে ও তাহাতে দেশীয় ভাষায় ইউরোপীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দিতে হইবে।

সোমপ্রকাশ—১৫ আষাঢ়, ১২৭১। ৫২০ পৃঃ

৯। এ দেশের ছাত্রেরা প্রায় সকলেই বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়াই জ্ঞানানুশীলন পরিত্যাগ করেন। সামান্য সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত হন এবং দেশের উন্নতিসাধনে জলাঞ্জলি দিয়া বৃথা গল্প আমোদ ও সুরাপানেই জীবন অতিবাহিত করেন। পঠদ্দশায় তাহাদিগকে কতই উৎসাহান্বিত কতই উদ্যমশীল দেখা যায়। তখন বোধ হয় যে, ইহারা নিশ্চয়ই দেশের দুরবস্থা দূর ও উন্নতি সাধন করিবেন। কিন্তু বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সমুদায় উৎসাহ সকল উদ্যম তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে তিরোহিত হইয়া যায়। এই দোষটি আমাদের সামান্য দোষ নহে ও উন্নতি সাধনের অল্প প্রতিবন্ধক নহে। সর্ব্বাগ্রেই আমাদের এই দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য। যত দিন না আমাদের এই স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইবে, তত দিন আমাদিগকে অতি হীন অবস্থায় কাল যাপন করিতে হইবে।

১০। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের মূর্খতা উন্নতি সাধনের সামান্য প্রতিবন্ধক নহে। যাহাতে তাহাদের বহুলরূপে জ্ঞান লাভ হয়, আমাদের তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। অধিকসংখ্যক স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন ও পরিবারমধ্যে স্ত্রীদিগের বিদ্যাচর্চ্চার উপায় বিধান করিতে হইবে।

১১। যে সকল কুসংস্কার ও কুরীতি আমাদের উন্নতির পথে প্রবল অন্তরায় স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে, সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে তাড়িত করিতে হইবে।

১২। সত্যধর্ম্ম প্রচার জন্য আমাদিগকে প্রাণপণে যত্ন করিতে হইবে। সত্যধর্ম্ম যেমন আমাদের পারত্রিক অনন্ত সুখের কারণ, তেমনি ঐহিক মঙ্গলেরও মূল। এ দেশে বহুলরূপে সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হইলে উন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ কুসংস্কার ও কুরীতি সকল আপনা হইতেই তিরোহিত হইবে। যে পর্য্যন্ত না এ দেশের বিশিষ্ট ধর্ম্মোন্নতি সাধন হইবে, যত দিন না উপধর্ম্মের শৃঙ্খল ছিন্নভিন্ন হইবে, তাবৎ এদেশের প্রকৃত ফল লাভ সুদূরপরাভূত থাকিবে।"

নূতন পুস্তক। সোমপ্রকাশ—১৫ই আষাঢ়, ১২৭১। ৫২০ পৃঃ

আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১ম। বিবিধ পুস্তক প্রকাশিকা, তৃতীয় খণ্ড। এই খণ্ডে সটীক রঘুবংশের নবম অবধি একাদশ সর্গ পর্য্যন্ত মূল ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, অনুবাদক আমাদিগের উত্তেজনাবাক্যে সতর্ক হইয়াছেন। এবারের ভাষা সরল ও অনুবাদ

উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কলিকাতায় সাহিত্য সংক্রান্ত এরূপ সাময়িক পুস্তক একখানিও নাই। এইখানি যদি রীতিমত চলে, সাহিত্যসংসারের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

২য়। রত্নমালা। এখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা পদ্য গ্রন্থ। ইহাতে বালকদিগের পাঠোপযোগী কয়েকটী পাঠ আছে। গ্রন্থকার সকল স্থলে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই বটে, কিন্তু পুস্তকখানি বালকগণের প্রীতিকর হইতে পারিবে। কালিকা প্রেসিডেন্সি প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ⁄৫।

৩য়। সুরাপানের ফল। এ দেশে সুরাপান করিলে যে বিষময় ফল হইয়া থাকে, ইহাতে তাহার কয়েকটি প্রমাণ আছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা এতৎসংক্রান্ত যে একখানি ইংরাজী পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এখানি তাহার অবিকল বাঙ্গলা অনুবাদ। আমরা সেই মূল গ্রন্থের সমালোচনকালে আমাদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছি।

৪র্থ। ব্যবস্থাসংগ্রহ। ইহাতে দায়, দান, উইল, বিক্রয় ও বন্ধক বিধানের সার এবং বঙ্গদেশের আইন সম্পর্কীয় ভূমিকা সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকখানি ৪ খণ্ডে ও ১৫ অধ্যায়ে বিভক্ত। শাস্ত্র, শরা, আইন, আচার ব্যবহার, সদর আদালতের নজির, সারকিউলার, অছিনিয়োগ, হিন্দু, মুসলমান, ইংলণ্ডীয় ও পর্টুগিজদের দায় এবং অধিকারের ক্রম প্রভৃতি ইহাতে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত এল্‌বরলিভ সাহেব ইহার সংগ্রহকর্ত্তা। গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক শ্রীযুক্ত রবিন্সন সাহেব ইহা বঙ্গভাষায় (৫২১পৃঃ) অনুবাদ করিয়াছেন। পুস্তকখানি বিশেষ উপকারক হইয়াছে। কলিকাতা ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ২॥৹ টাকা।

"শব্দদীধিতি। এখানি অভিধান। ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় এতৎসংগ্রহ করিয়াছেন, যে প্রণালীতে ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে আমরা সংগ্রহ-কর্ত্তার লিখিত ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। উদ্ধৃত অংশ এই :—'

"দিন দিন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও তৎসঙ্গে সঙ্গেই বিবিধ নূতন শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ ভাবপ্রকাশক শব্দের অত্যন্ত অভাব আছে, সুতরাং বাঙ্গালাগ্রন্থ প্রণেতামাত্রেই নূতন নূতন শব্দ প্রণয়ন ও অনেক অব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই সমুদয় শব্দের অর্থ প্রায় কোন অভিধানেই পাওয়া যায় না, তন্নিমিত্ত বাঙ্গালা পাঠকগণের নিকট এই ভাষা সময়ে সময়ে এক অভিনব ভাষা বলিয়া প্রতীয়মান হয় ; আমি সেই অভাব পরিহারে কৃতসংকল্প হইয়া প্রথমতঃ নানাবিধ বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া বহুসংখ্যক নূতন শব্দ সংগ্রহ করি। পরে নানাবিধ কোষ হইতে যাবতীয় প্রয়োজনীয় শব্দ সংগ্রহ করিয়া ধাতু ও লিঙ্গ সহিত শব্দদীধিতি নামে এই অভিধানখানি প্রচারিত করিলাম। ইহাতে ইতর ভাষাশব্দ প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রাচীন দেশ নগরাদির বর্ত্তমান নাম যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি। ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সুগমার্থ

ইংরাজী হইতে অনুবাদিত নূতন সঙ্কলিত শব্দের অর্থ মধ্যে মধ্যে ইংরাজীতেও লিখিত হইয়াছে।"

সোমপ্রকাশ—২২শে আষাঢ় ১২৭১ বাং, ইং ১৮৬৪।৪ জুলাই, পৃঃ ৫৩৫-৫৩৬।

নূতন পুস্তক

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১ম। বসন্তসেনা। সংস্কৃতে মৃচ্ছকটীক নামে যে একখানি প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংস্কৃত নাটক আছে, এখানি তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ। মৃচ্ছকটীক শব্দটি শ্রুতিকটু হয় বলিয়া অনুবাদক ইহার বসন্তসেনা নাম দিয়াছেন। বসন্তসেনা সংস্কৃত নাটকের প্রধান নায়িকা। কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের অন্যতর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি এই অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে গদ্য পদ্য উভয়ই আছে। গদ্য অপেক্ষা পদ্যগুলি অধিকতর মনোহর হইয়াছে। গ্রন্থখানি অবিকল অনুবাদ নহে। সংস্কৃতযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

২য়। মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ের সংক্ষেপ বিবরণ। শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গচন্দ্র গিবন সাহেবের রোমরাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস হইতে ইহা সংকলন করিয়াছেন। ইহাতে আরবদেশ ও আরবীয়দিগের বিবরণ, মহম্মদের জন্ম, চরিত্র ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম প্রভৃতির বিষয় লিখিত হইয়াছে। লেখাটী সহজ হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ—১৪ই ভাদ্র ১২৭১, পৃঃ ৬৫৮

বিজ্ঞাপন।

"বিধবা বিলাস" নামক একখানি নূতন নাটক প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতার চীনাবাজারে শ্রীনাথ ঘোষের পুস্তকালয়ে শ্রীরামপুর কলেজে শ্রীযুক্ত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে এবং সম্পাদকের নিকটে পাইতে পারেন। মূল্য ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

সোমপ্রকাশ—১৪ই ভাদ্র ১২৭১

নূতন পুস্তক

২য়। ভূগোলপট। কলিকাতার গুপ্তযন্ত্র হইতে এখানি প্রকাশিত হইয়াছে। একখানি পটাকার কাগজে ভারতবর্ষের ভূগোলবৃত্তান্ত সংক্ষেপে সংগৃহীত হওয়াতে পাঠার্থিগণের পক্ষে বিলক্ষণ উপকারক হইয়াছে। দেশ, নগর, নদী, পর্ব্বত, হ্রদ, সাগর, উপসাগর, প্রণালী, অন্তরীপ, দ্বীপ প্রভৃতি এবং পরিমাণফল, অধিবাসীর সংখ্যা, উৎপন্ন দ্রব্য, ধর্ম্ম ও শাসনপ্রণালী ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ৴১০ আনা। সমুদায় ভূখণ্ডের এরূপ এক একখানি পট হইলে বালকগণ অপেক্ষাকৃত অল্পপরিশ্রমে ভূগোল শিক্ষা করিতে পারে।

সোমপ্রকাশ—২১এ ভাদ্র ১২৭১, ইং ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪, পৃঃ ৬৮৭

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শ্রীযুক্তবাবু কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বংশীবাজারস্থিত নদীর পারের একতালা হাবেলীতে বালিয়াটিনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু

গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্তৃক "ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র" নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে গ্রেট, ডবল গ্রেট, স্মলপাইকা প্রভৃতি বিবিধ সুশ্রীক অক্ষর এবং ফুল বর্ডার ও হটপ্রেস ইত্যাদি অন্যান্য মুদ্রাঙ্কনোপকরণ সকল আছে। কেহ কিছু মুদ্রাঙ্কনার্থে আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলে আমরা তাহা অতি যত্ন ও ত্বরাপূর্ব্বক উত্তমরূপে মুদ্রাঙ্কন করিয়া দিব। এ স্থলে ইহাও বিজ্ঞাপ্য যে, উক্ত যন্ত্র হইতে "বিজ্ঞাপনী" নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক সম্বাদ-পত্রিকা শীঘ্রই প্রচারিত হইবে, যে কেহ তাহার গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন পত্রিকার আয়তন ৪ পেজি ফর্ম্মার ৩ ফর্ম্মা করা হইবে। মূল্য এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে। যথা—

মফস্বলীয় গ্রাহক গণের নিমিত্ত

অগ্রিম বার্ষিক	৮৲	(ডাকমাসুল সহ)
অগ্রিম ষাণ্মাসিক	৪॥০	ঐ
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	২॥০	ঐ

স্থানীয় গ্রাহকগণের নিমিত্ত

অগ্রিম বার্ষিক	৫৲
অগ্রিম ষাণ্মাসিক	৩৲
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	১৸০

যাঁহারা অগ্রিম মূল্য না দিবেন মফঃস্বলীয় হইলে তাঁহাদিগকে বার্ষিক ১০।০ টাকা এবং স্থানীয় হইলে ৭।০ টাকা দিতে হইবে।

ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

১২৭১, ৭ই ভাদ্র

সোমপ্রকাশ—২১ শে ভাদ্র, ১২৭১। ৬৭৩ পৃঃ

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতার স্কুলবুক ও বর্ণাকুলার লিটরেচর সোসাইটী।

উত্তম উত্তম ইংরাজী ও বাংলা পুস্তক দ্বারা শিক্ষার উন্নতি নিমিত্ত ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এই স্কুলবুক সোসাইটী সংস্থাপিত হয়। তদবধি ইহার সংস্থান ও উপায় অনেকাংশে সমুন্নত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে ইহাতে সকল শ্রেণীর উপযুক্ত প্রথম পাঠ্য অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পর্য্যন্ত পুস্তক সকল বিলাত হইতে আনীত হইতেছে। ঐ সকল পুস্তক কি সৈনিক, কি বিশুদ্ধ ইংরাজী স্কুল, সমুদয় বিদ্যালয়ের উপযোগী ও এইখানে লণ্ডন মূল্যের ন্যূনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানে কতিপয় নাগরী, উড়িয়া, উর্দ্দু প্রভৃতি বিশেষতঃ বাঙ্গালা পুস্তক অনেক আছে। মানচিত্র সকল এক্ষণে সংশোধিত ও পুনঃ প্রস্তুত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এই সোসাইটীর সাহায্য করিয়া থাকেন। লাভ স্বরূপ যাহা ইহাতে উৎপন্ন হয়, তদ্দারা অপেক্ষাকৃত অধিকতর বাঙ্গালা পুস্তকের স্বত্ব ক্রয় করা যায়। এতদ্দেশীয় যে সকল উত্তম গ্রন্থ প্রচারিত হয়, তাহা গৃহীত ও পরীক্ষিত হয়। উপযুক্ত বোধ হইলে

সোসাইটীর স্বত্বাস্পদীভূত না হইলেও তত্তৎগ্রন্থকারের ইচ্ছানুসারে বিক্রেয় পুস্তকের সূচীপত্রে তাহার উল্লেখ করা যায়।

গবর্ণমেণ্টের যে বুক-এজেন্সী ছিল, তাহা এক্ষণে ইহার অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালা অনুবাদ সমাজ ও ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ সমাজে সময়ে সময়ে অভিনব বাঙ্গালা পুস্তক রচিত এবং উপদেশপূর্ণ ও মনোরম ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হয়। ইহার সাহায্যে ও ব্যয়ে, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র দ্বারা সমাকলিত "রহস্যসন্দর্ভ নামে মাসিক পত্রিকা বহির্গত হয়।

এই সোসাইটীর তাৎপর্য্য যে, সাধারণে স্বল্পমূল্যে পুস্তক পায়। তাহার একটী নিদর্শন, ইতিপূর্ব্বে শ্রীরাজকুমার সর্ব্বাধিকারী দ্বারা প্রণীত একখানি বাঙ্গালা বড় ব্যাকরণ সহস্র মুদ্রায় ক্রীত ও ইহার ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহার মূল্য পাঁচ আনা মাত্র।

এই পুস্তকাগারে নানাজনসঙ্কলিত বহুবিধ ইংরাজী উর্দ্দু ও বাঙ্গালা বহুসংখ্যক অভিধান আছে ও মুদ্রিত হইতেছে। উড়িয়া অভিধান প্রস্তুত হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ইনস্পেক্টরদিগের অধীনে বাঙ্গালা দেশের প্রধান প্রধান স্থানে এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কোন কোন প্রদেশে ইহার এজেন্সি আছে।

এই সোসাইটীর মুদ্রিত ও অভিমত পুস্তকের সূচীপত্র (ক্যাটলগ) প্রার্থনা করিলে কলিকাতা লালবাজারের ১২নং পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

সোমপ্রকাশ, ২১ ভাদ্র, ১২৭১। ৬৮০ পৃঃ

নূতন পুস্তক।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে :—

১ম। বিলাপতরঙ্গ। বহরমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন এইখানি শোকসূচক পদ্যে রচনা করিয়াছেন। কবিতাগুলির ভাব যেরূপ উত্তম হইয়াছে, গ্রন্থকার তদনুরূপ কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদানে সমর্থ হন নাই। পুস্তকখানির ছাপা, অক্ষর ও কাগজ অতি উত্তম। বিশেষতঃ বাঁধানটী দেখিতে অতিশয় সুন্দর হইয়াছে। নানা বর্ণের কালি দ্বারা পুস্তকের স্থানে স্থানে শোভা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রামদাস বাবু এই পুস্তকখানি বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন। তাহার বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ আছে।

২য়। সুরাপানবিষয়ক প্রস্তাব। কলিকাতার কলুটোলাস্থ সুরাপাননিবারণী সভা হইতে এখানি প্রচারিত হইয়াছে। প্রস্তাবলেখক স্থানে স্থানে প্রাচীনের ন্যায় বাগ্‌বিন্যাস করিয়া প্রস্তাবটীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে দেন নাই। এখানিও বিনা মূল্যে বিতরিত হইতেছে।

৩য়। প্রশ্নোত্তরমালা। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় ভাগ ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রশ্ন ও উত্তর সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন। কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৶১০ আড়াই আনা।

৪৮। কলিকাতার "ফ্রীচর্চ্চ মিসনের" বিদ্বান্ মিসনরি রেবরেণ্ড জে, ডেবিডসন ডন সাহেবের লিখিত হুগলীর "ইয়ঙ মেন্স লিটরারি আসোসিয়েসনে" সত্য, ভ্রমপ্রমাদের হেতু ও সত্যান্বেষীর উপদেশ বিষয়ক প্রস্তাব।

সোমপ্রকাশ—২৮এ ভাদ্র ১২৭১, পৃঃ ৬৯৬

নূতন পুস্তক

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে :—

১। মানসাঙ্ক, প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এখানি সঙ্কলন করিয়াছেন। ছোট ছোট বালকেরা এতদ্দ্বারা অঙ্কপাত, যোগ ও বিয়োগ সহজে অভ্যাস করিতে পারিবে। কলিকাতা ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ⁄১০ আনা মাত্র।

২। কমন্স হাউসে কর্ণাটের বিষয় লইয়া যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার উত্তরদান পুস্তক। আগামী বারে বিস্তারিতরূপে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার ইচ্ছা রহিল।

৩। শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন দাস প্রণীত সংস্কৃত কোকিলদূত। এখানি সংস্কৃত ভাষায় পদ্যে প্রণয়ন করা হইয়াছে। কবিতাগুলি প্রাচীন কবিদিগের কৃত কবিতার ন্যায় মনোহারিণী না হউক, মধ্যকালের কবিকৃত পদাঙ্ক দূতাদির অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। এক্ষণে যেরূপ সংস্কৃতের অনুশীলন হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, এ সময়ে বিষয়ী লোকের সংস্কৃতে যে এত অনুরাগ ও গ্রন্থপ্রণয়নপ্রবৃত্তি দৃষ্ট হইল, ইহাতে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।

মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ ছন্দ ॥

যোগিনী সাধুর পুত্রে শুনিঞা মন্ত্রণা।
কোটালিয়া বলে মোরে দৈবের [১০৫] যন্ত্রণা॥
যোগিনী মানুষ নহে জানিল হৃদয়।
রাজার সম্পদ কিবা বিপদ নিশ্চয়॥
রড়ারড়ি যায় বীর কোথাহ ন রহে।
কোটালের নাসিকায় খর শ্বাস বহে॥
উলটিয়া পাছুভাগে ঘন ঘন চায়।
বচন না সরে মুখে হৃদয় শুখায়॥
আকুল চিকুরভার প্রবেশে নগরে।
শক্রধনু মাঝে যেন রক্তকলেবরে॥
দুরবস্থা কোটালিয়া দেখিয়া সভায়।
নগরে নাগরী লোক বিস্মিত হৃদয়॥
বল বুদ্ধি কোটাল বিক্রমে নাহি টুটে।
উপনীত হইল গিয়া নৃপতি নিকটে॥
দণ্ডবত প্রণাম করিয়া পুটাঞ্জলি।
দাণ্ডাইল গিয়া নৃপতির বরাবরি॥
নিবেদন করি শুন বসুমতীনাথ।
দক্ষিণ শ্মশানে যত জন্মিল প্রমাদ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

॥ করুণা ॥ কৌ রাগ ॥

দেব রক্ষ রক্ষত আপন ধরাধর
নিবেদিনু তোমার চরণে।
মোর বাক্য মিথ্যা নহে যোগিনীর রণ সহে
হেন বীর নাহি ত্রিভুবনে॥ধ্রু॥
শুন বসুমতীপ্রভু শ্মশানে বাড়িল রিপু
আমি নিজ সেবক তোমার।
বংশে বংশে কোটোয়াল গোঙাঞিল সর্ব্বকাল
রাজ্যের না দেখি নিস্তার॥
হাথী ঘোড়া পদাতিক বেঢ়িলাঙ চারি দিগ
মধ্যে পরদেশী সাধুসুতে।
জয় দিয়া তারে হানি হেন কালে নাহি জানি
যোগিনী আইল কোন পথে॥
হাথে দ্বাদশ শোভে রঙ্গিন চুপড়ি কাখে
কোলে করে সাধুর পোখানি।
দেখিয়া তাহার রূপ হৃদয় বাঢ়িল কোপ
আমি তারে কথিল কুবাণী॥
ক্রোধে ছাড়ে হুহুঙ্কার মৃত সাধু সুকুমার
উঠিয়া বসিল আচম্বিত।
দেবতা সুরের জায়া না বুঝি তাহার মায়া
মহামন্ত্র জানে হিতাহিত॥
[১০৬ক]গজদন্ত ধরি হাথে উপাড়িয়া মারে মাথে
সারথি পালায় রড়ারড়ি।
লাজে মহারথী রহে প্রাণপণে যুদ্ধ সহে
ক্ষিতিতলে যায় গড়াগড়ি॥
প্রবীণ লোহার ভাঙ্গে ঘোড়ার মুখানি ভাঙ্গে
না জানি কে কোথা করে রণ।
রাউত মাহুত পড়ে যেন রম্ভাবন ঝড়ে
অবিরত শুনি ঝনঝন॥
কুমারের চাক যেন ফিরে তিন লোচন
অতি কোপে অরুণ কিরণ।
দশনবর্জ্জিত মুখে বারেক যে জনে ডাকে
তার দেহে না রহে জীবন॥
বিপরীত শুনি কথা হৃদয় লাগিল ব্যথা
দুর্মুখ নৃপতি কাঁপে ক্রোধে।

সেবিয়া সারদাপদ আনন্দজনক গীত
বিরচিল মুকুন্দ পণ্ডিতে ॥০॥
॥ ঝাঁপামাল ॥
সাজলু রে দুর্ম্মুখ বীরবর
ক্রোধে লাফে প্রসারিত জানু।
তুঙ্গ তুরঙ্গম লোটন রক্ষিত রেণু সমর্চ্চিত ভানু ॥
বল বৃদ্ধ যোগিনীসুতা চরমুখে শুনি কথা
কলেবরে গলে ঘর্ম্মজল।
ধিক থাকুক জীবন মোর যুবতী প্রবলতর
রিপু ভেল শ্মশান ভিতর ॥
তিরতর কসপুরে সমীর তুরগ খুরে
ঘন দেই ধনুক টঙ্কার।
উরমাল ঝমঝম খড়্গে তার বৈসে যম
ছুরি কাছে হীরকের ধার ॥
নীরদ সন্নীরদ নিরবধি গলে মদ
ফলাকার ধায় আগু দল।
সিঙ্গা বাজে ঘন ঘন গুড় গুড় দগড়ন
রহি রহি পত্তি কোলাহল ॥
গজতুরগাধিরূঢ় উর্দ্ধ করি বান্ধে চূড়
লাফ দেই নৃপ বিদ্যমান।
সমর উৎকট বেশ চকিত কমঠ শেষ
ত্রাসে শচীপতি কম্পমান ॥
লাফ দেই নৃপসুত অভিনব যমদূত
করে ধরি খর করবাল।
বৈরী গঞ্জন দল যেন জলনিধি জল
দশ দিগে ধায় অবিশাল ॥
প্রবীণ সারথি রথী মহাশয় যুদ্ধপতি
বহুতর নৃপ করে মানে।
[১০৬] চণ্ডীপদ পুণ্ডরীক শ্রীমুকুন্দ চঞ্চরীক
কহে রণ করিব শ্মশানে ॥

॥ ছন্দ ॥

সাজ সাজ বলে বীর দুর্ম্মুখ ভূপাল।
জয়বীর ঢাক বাজে ফুকরে কাহাল ॥ধ্রু॥
বাদ্যের শবদে কিছু নাঞি শুনি কানে।
কেমত যোগিনী আছে দেখিব শ্মশানে ॥
যোগিনী বধিতে রাজা করিল গমন।
সচকিত হৈল রাজ্য দুর্ব্বার পাটন ॥
হাথী ঘোড়া পদাতিক পদধূলি উড়ে।
আৎসাদিত হৈল রবি অন্ধকার বেড়ে ॥
প্রথমে চলিল যত নৃপতির হাথী।
অঙ্কুশ ডাবুশ নেঙ্গা পিঠে যুদ্ধপতি ॥
কনকনির্ম্মিত জিন ঘন খেলে ধূলি।
অন্ধকার রাত্রে যেন পড়িছে বিজুরি ॥
সজল জলদ যেন পবনের গতি।
কমঠ বাশুলী ডরে কাঁপে বসুমতী ॥
পাছু তুরঙ্গম চলে সর্ব্ব দেহে পটু।
তিন লক্ষ ঘোড়া তার নব লক্ষ টাটু ॥
রজতের জিন পিঠে সোনার পাখর।
হীরার কড্যানি শোভে মুখের উপর ॥
বাঙ্গালী পাটের পাগ গমন সত্বর।
বাজন নূপুর পায় হাথেতে চামর ॥
যুদ্ধপতি চলে যত শূরবিশারদ।
সারথি সহিত চলে তিন লক্ষ রথ ॥
পদাতিক চলে যত তার নাহি লেখা।
প্রধান দলই চলে সিলিদার শেখা ॥
তাহার মহিমা আমি কি বলিতে পারি।
সিলির শবদে যার কাঁপে সুরপুরী ॥
তাহার গমনে চলে ষোল শত সিলি।
বীরজয়ঢাক কাড়া বাজে লক্ষ ঢুলী।
উঠই ইড়িক ডাল চলে এক লাখ।
পাঁচ শত গণ্ডা চলে তিন লক্ষ বাথ ॥
ঢেকি নিয়া [১০৭ক] চলে যত রণে অবিশাল।
লক্ষেক তবকী চলে নিযুতেক ঢাল ॥
মদন পাইক চলে পাইকের ঠাকুর।
লক্ষেক ধানুকী চলে রণে মহাসুর ॥
সাধাই চণ্ডাল চলে কিরণ কামার।
যাহার প্রতাপে কাঁপে মগধ বেহার ॥

আর যুদ্ধপতি চলে কেশব সাহিনী।
বার শত ঘোড়া যার না ছোঁঞে মেদিনী॥
ঘন ঘন পড়ে শিঙ্গা বিরল তেঘাই।
পাইক ছাওয়ালে যত করে ধাওয়াধাই॥
মড়িয়া পাটনি চলে তেকড়িয়া তেলি।
হালঙ্গ তেলঙ্গ বঙ্গ চমকিত ডিল্লি॥
ডোমের নন্দন নিতা বলে মহাবলী।
রণারণ ঝাঁপবালা চলিল সিহলি॥
ধরা পরা সিবা মুচি চারি ভাই রতা।
যাহার প্রতাপে কাঁপে কামরূপী মাতা॥
মাধাই কুশল চলে বারই বারণা।
চরণে তোড়রমল্ল ষোল কোশে হানা॥
পেলিলে সরসা মুঠি নাহি ছোঞে মাটি।
নিযুতেক নেঞা চলে অযুতেক জাঠি॥
নকড়্যা বাগুদি চলে ছকড়্যা তিয়র।
হাতে নেতফালি শোভে মাথায় টেপর॥
ফলা সাট যারে দুহেঁ হরষিত মনে।
মিলিব সংগ্রাম আজি চণ্ডিকার সনে॥
ধনা কাপড়ি চলে তিন ভাই গদা।
আগু দলে বাস্যা শুনে যুদ্ধের বারতা॥
পায় মোজা দিয়া খোজা অন্তরে হরিষ।
পাথরিয়া চাপে লাখ যুঝার মহিষ॥
ছুটিল মহিষ যেন শূন্যে খসে তারা।
শতেক কাহন পাইক চলিল কাগুরা॥
আপনা আপুনি রাওয়ারাই মহারোল।
আঠার কাহন পোদ দুই লক্ষ কোল॥
ধাইল বাঙ্গাল রাজু হাথে করি শেল।
চৌদ্দ সত্তরা যার চলিল খাস খেল॥
[১০৭] দামা দড়মসা বাজে দগড় কাঁসর।
ষোল শত চলিল রাজার পাট ঘর॥
দোকড়িয়া কুমার চলে তেকড়িয়া হাড়ি।
রণমুখী রাজার বাষট্টি চলে রাণ্ডি॥
ধাইল অনেক সৈন্য না শুনে বচন।
নীচ ভুমি দেখি যেন জলের গমন॥
ঘোড়ায় রাউত চলে রণে মহারঙ্গ।
অনল ঝাঁপিতে যেন উড়িল পতঙ্গ॥
পঞ্চ পাত্র চলিল রাজার কাছে কাছে।
সাহলু গাহলু চলে যেন তালগাছে॥
আপুনি সাজিল রণে জানিল ত্রিপুরা।
অনুচিত যুদ্ধ আমি করিব একেলা॥
হাথে খড়্গ করি চণ্ডী উনমত্ত কায়।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা সহায়॥০॥

॥ পঠমঞ্জরী ॥

চণ্ডী রণ সমুৎসুক　　খড়্গে ঝিকেক ঝক
চিন্তে হরি মৃত্যুঞ্জয়।
উরে নন্দী মহাকাল　　হনুমান ক্ষেত্রপাল
আজি সৃষ্টি হইল প্রলয় ॥ধ্রু॥
নেঞা তবক টাঙ্গি　　রণেতে দানব রঙ্গি
কাছিল যুগল খর খাণ্ডা।
ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবী সতী　　মধুমতী ভগবতী
উরে চণ্ডী মৃড়ানী চামুণ্ডা॥
অতি চণ্ডা চণ্ডরূপা　　চণ্ডোগ্রা প্রচণ্ডতপা
চণ্ডবতী চণ্ডনায়িকা।
বিশালাক্ষী মহামায়া　　কালিকা বিজয়া জয়া
উগ্রচণ্ডা চামুণ্ডা চর্চ্চিকা॥
শূল হাথে উরে গৌরী　　মহেশের রূপ ধরি
তৃতীয় নয়ান বৃষবাহা।
সুচ্ছন্দ কবরি বন্ধ　　তথি শোভে মকরন্দ
বিভূতি ভূষিল সর্ব্বদেহা॥
নরসিংহরূপ তনু　　করে শোভে শর ধনু
শৃগালবাহিনী শিবদূতী।
করযুগে খাণ্ডা ফলা　　গলায় নৃমুণ্ডমালা
সাজ সাজ বলে ভগবতী॥
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা　　প্রকৃতি ভাবিনী দুর্গা
দুর্গপ্রভাবিনী শৈলজাতা।
মহিষ নিশুম্ভ শুম্ভ　　ধূম্রলোচন চণ্ড
মুণ্ডবিনাশিনী জগন্মাতা॥

উন কোটি কাত্যায়নী শ্মশানে নৃপতিমণি
সেনাপতি বেঢ়িল সকল।
চণ্ডীপদসরসিজ শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজ
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

॥ ঝাঁপামাল ॥

যুদ্ধ অঙ্কুল রে [১০৮ ক] প্রধান নৃপতিবর
জয়ধ্বনি বিজিত নির্ঘাত।
দানব সংহতি সাধু পিয়ে যত পুষ্পমধু
ভগবতী পুরে সিংহনাদ ॥
ক্ষিতি ধরণী ভাই পার্শ্বে তুরগ বই
ধানুকী নিকটে ফলাকার।
সমর সারথি মেলি মথিয়া তবক সিলি
ঢোকীনিয়া বহে দাবাদার ॥
দিমিকি দিমিকি দণ্ডি মেলাই ক্ষেপাই চণ্ডী
হয়ারূঢ় নন্দী মহাকাল।
পবনজ হনুমান ধনুকের সন্ধান
ফলাকার রহে ক্ষেত্রপাল ॥
রাউত মাহুত যত রথী রণবিশারদ
মুণ্ডাইয়া যায় পদে পদে।
বসুমতীপতিপুত্র খাঁচিয়া ধবল ছত্র
কুঞ্জর তেজিয়া চাপে রথে ॥
আনাআনি গালাগালি শ্রবণে লাগিল তালি
আগু হইল প্রধান দলই।
কৌতুকে উরিল চণ্ডী রণে হৈয়া কাণ্ডাকাণ্ডি
ঘন সিঙ্গা বরোঙ্গ তেঘাই ॥
গুড় গুড় দগড়ধ্বনি সুনাদ কাঁসর বেণি
রুধিরাকাঙ্ক্ষিনী ভগবতী।
উভয়ত কাট কাট পত্তি মারে ফলাসাট
হাথাহাথি হৈল চর্ম্মপতি ॥
দানবের শুনি সিলি সৈন্য করে কিলিকিলি
বৈসে দেবী সরোরুহাসনে।
ত্রিপুরাচরণবর সরোরুহ মধুকর
শ্রীযুত মুকুন্দ সুবচনে ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

উঠে বীরজয়ধ্বনি সচকিত রণভূমি
শ্বাস বহে ঝঞ্ঝা পবন।
ঘন ঘন ঝন ঝান অবিরত হান হান
বিলম্বিত তিক্ষ্ণ কিরণ ॥
প্রমত্ত কুঞ্জরবর পৃথুতর মহীধর
ডাবুশ হানিল দেবীমুণ্ডে।
হস্ত পদ সাবধান চক্রে করি দুইখান
শুণ্ডে ধরি করিমুণ্ড ছিণ্ডে ॥
ক্রোধিল ক্ষত্রিয় বল বলে চারি দিগাসল
চাঁদমুখ করিল তুরঙ্গ।
সহিতে না পারে রণ প্রধান দানবগণ
বিমুখ হইয়া দিল ভঙ্গ ॥
ধায় নন্দী মহাকাল ক্রোধে হৈয়া চৌতাল
কাট কাট ছাড়ে বীরডাক।
প্রকুপিত[১০৮] রথীবল বাজে সিঙ্গা ভেরি ঢোল
দগড় বরোঙ্গ ভেরি ঢাক ॥
আগে যায় ক্ষেত্রপাল পাতিয়া মহিষা ঢাল
হনুমান পুরিল কোদণ্ড।
পদাতিক রহে সব চরণে তোড়রমল্ল
বেনকে করিল খণ্ড খণ্ড ॥
মাহুত তেজিল হাথী হাথী লোটাইল ক্ষিতি
কামানে বিন্ধিল শূলে দানা।
কারে কেহ নাহি ছাড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে
কাট কাট শুনি ঝনঝনা ॥
পড়িল সারথি রথী শোণিতের বহে নদী
কার নাহি তিলেক বিষাদ।
পত্তি করে কিলিকিলি মথিয়া তবক সিলি
দাবাসিনী যেন বজ্রাঘাত ॥
থর বহে রক্তনদী চমকিত নরপতি
রণমুখী হৈল মহামায়া।
উলানি উঠানি রণ সচিন্তিত দেবগণ
কারে কেহ নাঞি করে দয়া ॥

ভাসে গাণ্ডি মুণ্ডি পত্তি   হয় হস্তী চর্ম্মপতি
দানব করয়ে জয়ধ্বনি।
চণ্ডীপদসরোরুহে   শ্রীযুত মুকুন্দ কহে
রণভূমি যায় নৃপমণি ॥০॥

॥ শ্যামা রাগ ॥

রুঠলু চামুণ্ডা চণ্ডী বৈরীমুণ্ড লোটে।
ধনু আসি খরতর   ধরিয়া কর্পর
চাপিয়া সিংহের পিঠে ॥
শশিচূড়কান্তা   সমরদুরন্তা
বিপরীত যুগল চিন্তা।
বিজলিতবসনা   বিগলিতরসনা
হরিহর বিক্রম হন্তা ॥
পুলকিতগাত্রা   সচকিতনেত্রা
প্রবিকট দশন জ্বলা।
সমরপ্রচণ্ডা   সুললিতকণ্ঠা
বিভূষিত নরশিরোমালা ॥
যোগিনী শঙ্খিনী   রণভূ রঙ্গিণী
ঘন ঘন পুরে সিংহনাদ।
ভূতল সঙ্গত   নিবদ নিসদ
প্রলয় যেন উৎপাত ॥
আকুলিতচিকুরা   জয় জয় মুখরা
প্রলয় মনুজ বরদাতা।
রুধিরাকাঙ্ক্ষিত   হৃদয় আনন্দিত
সকল ভুবনজনমাতা ॥
ঘণ্টা ঘোর্ঘোর   উর মাল নূপুর
রন রন কম্পিত পৃথ্বি।
বিস্মিত সাধুসুত[১০৭ক] নয়ান নিমেষিত
ত্রিপুরাকৃতি বহু মূর্ত্তি ॥
ঝিকিত কৃপাণা   কুলরিপুত্রাণা
আগত দশ দিগে দানা।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে   ত্রিপুরাচরণে
ধরণী তরণি তরবালা ॥০॥

॥ সারঙ্গ রাগ ॥

ধরণীর ক্ষিতিপাল   বহে খর করবাল
যুদ্ধ দেখি দেবতা পলায়।
কোপকূপে হুতাশন   কৃপাণি শিখরে যম
হয়খুরে সমীর লুকায়।
তুরগে কুঞ্জরে হানে   রাউত মাহুত জনে
সারথি বিরথি দুই দলে।
কারে কেহ নাহি সহে   রুধিরে কন্দর বহে
পড়িয়া লোটায় ক্ষিতিতলে ॥
মৃদঙ্গ পটহ বাজে   প্রবন্ধে কবন্ধ নাচে
রণভূমি করে অবতার।
নিহিত দানবমুণ্ড   শোণিত প্রভব কুণ্ড
দেবগণে লাগে চমৎকার ॥
হান হান করে ধ্বনি   পাতালে চকিত ফণী
ত্রিদেব সভয় শচীনাথ।
ঘন বাজিখুর তালি   গগনে উঠিল ধূলি
আৎসাদিল দিনকরনাথ ॥
চামুণ্ডা মুণ্ডের মালা   গলে বাম ভুজে ফলা
শাণিত দক্ষিণ করে খাণ্ডা।
নেঙ্গা ধরি দুই হাথে   তুরগ তেজিয়া রথে
রুষিয়া উঠিল প্রচণ্ডা ॥
রুষিল ক্ষত্রিয় বল   বলে চারদিগে গেল
এক যোগ করি দশ বিশে।
সন্ধান পুরিয়া বিন্ধে   কেহ কারে নাহি নিন্দে
দেখিয়া দুর্মুখ নৃপ রোষে ॥
ডাবলে উপাড়ে খাণ্ডা   হানে হয়ারূঢ় গণ্ডা
হস্ত পদ মহিষ নিনাদি।
প্রাণপণে নন্দী রহে   দানব সম্মুখ নহে
রথ তেজি পলায় সারথি ॥
আকর্ণ পুরিয়া ধনু   বিন্ধে রিপুজন তনু
পবননন্দন হনুমান।
নেঙ্গা খাণ্ডা গজ ঢাল   পাতে নন্দী মহাকাল
ঝনঝনা কৃপাণে কৃপাণ ॥

পেতি জলে ধক ধক নাচে মৃগ ঋতুক
অস্থি পেশীত টানাটানি।
থেঁথেঁ থেঁথেঁ করে রব ভসলে আগলে সব
কিচিকিচি গিধিনি শকুনি ॥
প্রবীণ লোহার ডাঙ্গে ঘোড়া রথখানি ভাঙ্গে
রাউত পাথর ত্রাসে কাটে।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে দুর্মুখ চিন্তিত মনে
ভঙ্গ দিল নৃপতির ঠাটে ॥০॥

॥ বারাড়ী ॥

ত্রিপুরা করতল পেখি রি[১০৯]পু বল
সকল কম্পিত ওলা।
চতুরধিক দশ ভুবন কম্পিত
যুদ্ধ ঝম্পিত ওলা ॥
ত্রিপুর ঘাতিনী মহিষমর্দ্দিনী
সমরে নাম্মিত ওলা।
নেপ্পা খরতর শিখর কর্পর
কতি দূরে নৃপ ধাওলা ॥
উগ্রচণ্ডিকা চামুণ্ডা চচ্চিকা
কালিকা কাটে মহামায়া।
প্রলয়কালে ঘন ঘোর গরজন
শোণিত পিয়ে শিবজায়া ॥
পত্তি গুড়ি গুড়ি মাহুত রড়ারড়ি
রাউত হামাকুড়ি দেওয়ানা।
মুকুন্দ কহে চণ্ডী চরণপঙ্কজ
যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়ানা ॥

নগর সমুখে যায়।
উলটি পাছু না চায় ॥
মন্ত্রী যত জন সঙ্গে।
সকল মাতঙ্গ তুঙ্গে ॥
হস্তী ঘোড়া পত্তি রথ।
পড়িল আছিল যত ॥
পড়িল ধবল ছত্র।
পলায় নৃপতিপুত্র ॥
যোগিনীনন্দিনী ডাকে।
শুনিঞা চমক লাগে ॥
রহ রহ ক্ষিতিনাথ।
বারেক করহ যুদ্ধ ॥
মজিল রাজসমাঝ।
আর জিয়া কোন কাজ ॥
সাহস যে নাহি করে।
বিফল জীবন ধরে ॥
সবে মরে রণমাঝে।
অমর নাগরি ভজে ॥
পৃথিপতি কাঁপে ত্রাসে।
মুখে না ভারতী খসে ॥
উপনীত হৈল ঘরে।
কুলুপ দেই দুয়োরে ॥
আসনে নৃপতি বৈসে।
পরিজন যত পাশে ॥
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে।
দুর্মুখ চিন্তিত মনে ॥

॥ একপদী ॥

নৃপ অদ্ভুত।
রিপু নিন্দিত ॥ ধ্রু ॥
দূরে কৈল যত লাজ।
ছাড়িল বিক্রম নিজ ॥
জীবনে কাতর বড়।
গজারূঢ় দেই রড় ॥

॥ বিভাস রাগ ॥

নগরে যুবতীগণ মাংসের পসার।
মায়াদহে পরদেশী সাধুর কুমার ॥
আসিয়া কথিল মিথ্যা সভামত যত।
সেই সে হইল মোর বিপদের পথ ॥
বিষাদে ক্রন্দন করে বসুমতিপতি।
না জানি ললাটে মোর কি লিখিল বিধি।

পদাতিক রথ যত লেখা নাহি জানি।
কোটী কোটী ঘোড়া হাথী সাজিল আপনি॥
শুনিল সকল না গণিল হিতাহিত।
বিপদ সময় বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত॥
[১১০ক]পিতৃপিতামহভূমি দুর্ব্বার পাটন।
রক্ষিতে নারিল আমি ছার কুনন্দন॥
হস্তী ঘোড়া পত্তি রথ পড়িল সকল।
ক্ষিতিতলে একেলা জীবনে কোন ফল॥
অবলা অবল নহে দুর্ব্বল পুরুষ।
বিধাতার বিপাকে পর্ব্বত হয় তুষ॥
পরের গোচর নহে দেখিল আপুনি।
প্রলয় করিল রাজ্য আসিয়া যোগিনী॥
যদি পুন রণে মরি দুঃখ বিমোচনে।
পরে রাজ্য লয় যেন না দেখি নয়ানে॥
পুরুষ লক্ষণ নহে না কর বিষাদ।
উপদেশ কহি শুন বসুমতীনাথ॥
কুঠারি বান্ধিয়া গলে শুন নরেশ্বর।
যোগিনীর ধর গিয়া চরণকমল॥
যদি বা রক্ষিবে রাজ্য জীবে বা আপুনি।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধ বাণী॥০॥

॥ নিশা পালা সাঙ্গ ॥

॥ ছন্দ ॥

পঞ্চ পাত্র বলে শুন নৃপতিনন্দন।
বিষাদে বিক্রম টুটে স্থির কর মন॥
কনকনির্ম্মিত ঘর বিগত বিলাপ।
সমাজের মাঝে রাজা প্রচণ্ড প্রতাপ॥
রাজার রাজ্যের কিবা মঙ্গল ভাবনা।
সাত পাঁচ দশ জনে করয়ে মন্ত্রণা॥
বন্ধু পরিজন বলে যোগিনী অসেব্য।
তাঁহার সম্ভাষে চল লৈয়া ভাল দ্রব্য।
শুনিয়া নৃপতি দেশে পড়িল ঘোষণা।
বিপরীত সজ্জ ধরে গলিতযৌবনা॥

হস্তী ঘোড়া খাণ্ডা ফলা সঙ্গে কোন যশ।
নৃমূর্ত্তি যোগিনী নহে বস্তু কুরঃপর॥
বুঝিল যোগিনী কভু নহে হীনবল।
ইঙ্গিতে রাজার ঠাট পড়িল সকল॥
সিদ্ধের যোগিনী তাঁর বাক্য ঋদ্ধি সিদ্ধি।
আসুরী খেচরী কিবা দেবের যুবতী।
চরণকমল তাঁর সেবে যেই জন।
কোন কালে নহে তার অকালমরণ॥
শক্তিরূপে ভক্তি করে বিশেষে প্রচুর।
গ্রহদোষে আসন্ন আপদ যায় দূর॥
অনুমানে সুরপতি শচীর সংহতি।
আচম্বিত হইল তথি আকাশভারতী॥
সত্য সত্য শুন রে দুর্ম্মুখ নরেশ্বর।
চিন্ত হস্তী ঘোড়া পত্তি আপন মঙ্গল॥
অসিত বিক্রম দূরে [১১০] তেজ অভিমান।
শ্মশানে পড়িল সৈন্য পাব প্রাণদান।
স্বকর্ণে শুনিল রাজা অন্তরীক্ষবাণী।
নেঙ্গা খাণ্ডা ফলা ছুরি তেজিল আপুনি॥
বসুমতীপতিপুত্র মন্ত্রণা সহায়।
সুবর্ণ কুঠারি বান্ধে আপন গলায়॥
গুড় গুড় দগড় বাজে সিঙ্গা বাজে ঘন।
যোগিনী সম্ভাষে চলে নৃপতিনন্দন॥
দামা দড়মসা কাড়া মৃদঙ্গ মাদল।
মর্দ্দক কাঁসর বীণা বাজে অবিরল॥
চলিল দুর্ম্মুখ রাজা করি কোলাহল।
ভুজঙ্গনাথের ফণা করে টলটল॥
ঐরাবতারূঢ় ডরে কাঁপে পুরন্দর।
ত্রিপুরা জানিল রাজা জীবনে কাতর॥
সেবকবৎসলা বলে লজ্জা দুই আঁখি।
সরস বিরস যোগীসুতা অধোমুখী॥
প্রধান দুর্নীত পাত্র বুঝে হিতাহিত।
নৃপ সঙ্গে সংগ্রামে শ্মশানে উপনীত॥
দুর্ম্মুখ দুর্নীত রাজা পাত্র দুই জনে।
দণ্ডপাত হইয়া পড়ে যোগিনীচরণে॥

পদাতি সারথি রথী রাউত মাহুতে।
প্রণাম করিয়া ডরে রহে পুটহাথে ॥
রুক্মিণীনন্দন বলে জোড় করি হাথ।
দেখ মাতা গলায় কুঠারি ক্ষিতিনাথ ॥
যোগিনীচরণপদ্মে লোটায় ভূনাথ।
সেবক দোষের স্থানে ক্ষম অপরাধ ॥
পতঙ্গ বাড়বানলে কভু নহে বাদ।
আমার কুগ্রহদোষে ফলিল প্রমাদ।
সিদ্ধের যোগিনী তুমি কিবা মায়া ধরি।
আমি চর্ম্মচক্ষু নর চিনিতে না পারি ॥
নিবেদি তোমার পায় আমি পাপী নর।
বিচারিয়া যথোচিত করো ফলাফল ॥
রাজার বচনে চারিদশলোকেশ্বরী।
ঈষত হাসিয়া বলে পাতিয়া চাতুরী ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

শুন হে নৃপতি স্তুতি না বল সমুখে।
সতত সন্তোষ আমি প্রণত সেবকে ॥
পরদেশী সাধু নাহি জানে অবসাদ।
তোমার পাটনে কোন কৈল অপরাধ ॥
[১১১ক] মোর দাসীসুতে তুমি তারে দিলে বলি।
ত্রিভুবনে জানে আমি বিবাদে বাশুলী ॥
প্রতিপক্ষ জন বুঝে জয় পরাজয়।
আগে খাণ্ডা লয় পাছে বলে সবিনয় ॥
চিত্রের ছাগল যেন না যায় গণন।
বুঝিতে নারিল আমি সকল দুর্জ্জন ॥
হৃদয় কর্কশ মুখে মধুর ভারতী।
কোন কালে নহে তার পরলোকে গতি ॥
চাতুরী না করে নর চতুর নিকটে।
মুনিজন প্রমাণ বচন অকপটে ॥
অচেতন নরে ভাণ্ডে সচেতন নর।
ভাল মন্দ যত কথা দেবতাগোচর ॥
উচিত ভাবিয়া মোরে দেহ শাপ বর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

কি বলিব শুন নৃপ তোমার সেবকে।
অবিলম্বে চল পাছে দেখে ভিন্ন লোকে ॥ধ্রু॥
যোগীর নান্দনী আমি যোগীর কামিনী।
নিষ্ঠুরভাষিণী পঞ্চকুলভিক্ষাশিনী ॥
নরপতিশিরোমণি তুমি নররাজ।
প্রণাম করিয়া মোরে কৈলে কোন কাজ ॥
রাজা পাত্র কোটয়াল রাজ্যখানি ভাল।
দুর্মুখ দুর্নীত দুরাচার দুরবার ॥
প্রতীত না যাই আমি পরের বচনে।
দেখিল শুনিল নিজ নয়ন শ্রবণে ॥
যোগিনীর বোলে রাজা কাঁপে থরথর।
মুকুতা গাঁথিল যেন চক্ষে পড়ে জল ॥
বিনতি করিয়া বলে চণ্ডীর চরণে।
ক্ষেম দোষ বারেক শরণাগত জনে ॥
মায়াবিনী জননী তোমার প্রতি ভয়।
মন স্থির নহে মোর দেহ পরিচয় ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

শুনি সকরুণ বাণী হরষিত নারায়ণী
পরিচয় দেন ক্ষিতিনাথে।
[১১১]মৃতাসনে ত্রিনয়নী নৃমুণ্ডমালিনী ধনী
সরক্ত কর্পর কাতি হাতে ॥ধ্রু॥
অরুণ মণ্ডলোজ্জ্বল কনক কুণ্ডল
শ্রবণে কপোল বিভূষণ।
উজ্জ্বল প্রলয়কালে ললাট নয়ন জলে
রবি শশী সহজে লোচন ॥
উদয় যেন কোটী ভানু ঈষত প্রকাশে তনু
কোটী চাঁদ জিনিঞা বদন ॥

দুর্মুখ দুর্নীত পাত্র দেখে অতি বিপরীত
গুণদত্ত দাসীর নন্দন ॥
সমুদ্র শোণিত জল রত্নবিরচিত ঘর
ত্রিপুরা বসিয়া তথি মাঝে।
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর দেবতা প্রণতিপর
মুকুটে উইলা দ্বিজরাজে ॥
অরুণ কিরণ বাস বিকট দশনভাস
মুখর কিঙ্কিণী কটিদেশে।
বিশালাক্ষী দরশনে রাজা পাত্র দুই জনে
মূর্চ্ছিত পড়িলা তরাসে ॥
টল টল করে ক্ষিতি সিংহের উৎকট মূর্ত্তি
প্রাণ রাখ জননী নৃনাথে।
অকারণে অচেতন ভয় নাহি নন্দন
ত্রিপুরা ধরিল তার হাথে ॥
দেখিয়া যোগিনীরূপ সম্বিত পাইল ভূপ
প্রকাশিত নয়নযুগল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥•॥

॥ পয়ার ॥

প্রণতি করিয়া বলে পৃথিবীর নাথ।
ত্রৈলোক্যজননী মোরে ক্ষম অপরাধ ॥
রাজার বচনে দেবী মনে পরিতোষ।
শুন নৃপ তোমার ক্ষেমিল যত দোষ ॥
গুণদত্তে দেহ দান আপন দুহিতা।
গুণবতী রূপবতী যার নাম বিদ্যা ॥
চণ্ডীর বচনে রাজা হরষিত চিত্তে।
জামাতা বলিয়া পান দিল গুণদত্তে ॥
চন্দনের তিলক সুগন্ধি পুষ্পমালা।
দেখিয়া সন্তোষ চিত্ত সেবকবৎসলা ॥
শুভক্ষণ হইল আদেশিল ভগবতী।
অধিবাস করাহ যেমত আছে বিধি ॥
[১১২ক]বলে নৃপ শুন চণ্ডি মনে নাহি শর্ম্ম।
অশৌচ থাকিতে কভু নহে শুভকর্ম্ম ॥
রণেতে পড়িল জ্ঞাতি যদি পায় প্রাণ।
তবে আমি গুণদত্তে করি কন্যাদান ॥
ইঙ্গিতব্য সাধব চণ্ডীর ধরে পায়।
শ্রীযুক্ত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা সহায় ॥•॥

॥ সুই রাগ ॥

ত্রিপুরা তব পদকমলে প্রণাম।
দাসীর নন্দনে যদি বিবাহ করাবে তুমি
মৃত সৈন্য দেহ প্রাণদান ॥ধ্রু॥
যোগিনীরূপিণী সতী ভগবতী কৃপানিধি
তুমি মাতা তৃতীয়রূপিণী।
যে জন তোমারে সেবে কভু দুঃখ নাহি লভে
মুনিজন বচন প্রমাণি ॥
মাতা, শৃগাল কুক্কুর বাঘ গিধিনি শকুনী কাক
রক্ত চিল বিবিধ প্রকারে।
করিল রুধির পান তাহার কেমতে প্রাণ
কোনরূপে জীবন সঞ্চারে ॥
মাতা, মৃত প্রাণ বল বীর্য্য পাব এই কোন সজ্জ
মায়াবিনী শুন গো জননী।
যার বোলে হয় নয় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়
দেব সুর নর সিদ্ধা মুনি ॥
শুনিঞা সাধুর বোল হাসে চণ্ডী খল খল
কনক কলসে মন্ত্রে জল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ।•॥

॥ পয়ার ॥

জপিয়া ত্রিপুরামন্ত্র ছাড়ে হুহুঙ্কার।
মূর্চ্ছিত লোক দশ দিগ অন্ধকার ॥
হাড়ে হাড়ে হয় যত দিয়া রড়ারড়ি।
সঞ্চরিল মল মূত্র পবনের নাড়ি ॥
মন্ত্রিত জল চণ্ডী পেলিল প্রবন্ধে।
যার যেবা মস্তক লাগিলেক কন্ধে ॥

মাংস শোণিত হয় দেহের নির্ম্মাণ।
হস্ত পদ কণ্ঠ মুখ নাক চক্ষু কান ॥
দশন অঙ্গুলি নখ ভ্রূযুগ সুন্দর।
শ্বাসপবন বহে নহে উজাগর ॥
পরমপুরুষ পদ্ম দশশত দলে।
নয়ান মেলিয়া প্রাণী উঠে কোলাহলে ॥
দণ্ডবত প্রণাম করে দেখিয়া যোগিনী।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধবাণী ॥০॥

॥ মঙ্গল রাগ ॥

আদেশিল নরনাথ বান্ধিতে ছান্দলা।
অধিবাস করাইল শুভক্ষণ বেলা ॥
করিল মাতৃকা [১১২] পূজা গণেশ পূজিয়া।
বসুধারা দিল দান মঙ্গল পড়িয়া ॥
মৃদঙ্গ পট্টহ বাজে শঙ্খ মাঝে মাঝে।
কাঁসর মুহরি দণ্ডি ডিণ্ডিম বাজে ॥
নান্দীমুখ কর্ম্ম আদি কৈল গুণদত্তে।
রাজা রাণী বরিলেক হরষিত চিত্তে ॥
রূপসী রাজার কন্যা বিদ্যা নামখানি।
গোধূলি সময় দুইঁার করিল ছামুনি ॥
দুর্মুখ নৃপতি সাধু দিল কন্যাদান।
অর্দ্ধরাজ্য নানা ধন হস্তী ঘোড়া মান ॥
গুণদত্ত বলে দেব দেহ এক দান।
কারাগারে যত বন্দী করিব ছোড়ান ॥
জামাতার বোলে সত্য করিল নৃপতি।
অনল পূজিয়া দেখে ধ্রুব অরুন্ধতী ॥
বিবাহ দেখিয়া লোক ধনি ধনি ঘোষে।
বর কন্যা নিল ঘরে পরম সন্তোষে ॥
কন্যাদান শেষে বাজে অবিরল বীণা।
ব্রাহ্মণ গণক ভাটে দিলেক দক্ষিণা ॥
আনন্দে বিহ্বল লোক রাজা রাজরাণী।
বিসরিল যত শোক যোগীর নন্দিনী ॥
কন্যা বর একযোগে করিল ভোজন।
যোগিনী যৌতুক দিল সুবর্ণ কঙ্কণ ॥
পরিতোষে গেলা চণ্ডী সুরনিকেতনে।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥০॥

॥ ছন্দ।

রজনী প্রভাতে নৃপতি পরিপন্থী।
একযোগে সাধু আনাইল যত বন্দী ॥
প্রণাম করিয়া বন্দী দাণ্ডায় দক্ষিণে।
একে একে জিজ্ঞাসিল বসি সিংহাসনে ॥
ঘর কোন্ দেশে বন্দী বলহ নির্ভয়।
কি তোমার নাম তুমি কাহার তনয় ॥
কনকনগরে ঘর নাম সিংহরায়।
ছয় মাস আছে বন্দী নাহি কোন দায় ॥
জনক গোপালদাস নাহিক সহায়।
নিবেদিল ঠাকুর তোমার দুই পায় ॥
সাধুর বচনে কৈল নিগড় মোচন।
চারি পণ দিল কড়ি যুগল বসন ॥
সুখে ঘর চল মোরে করিয়া কল্যাণ।
জিজ্ঞাসিয়া করে যত বন্দীর ছোড়ান ॥
কারাগারে ধূসদত্ত পরাণের ভয়।
মূষিকের মাটি যত তুল্যা দেই গায় ॥
ছুটিল অনেক বন্দী নাহি দেখে বাপ।
[১১৩ক] চণ্ডীর চরণে দোষ কত কৈল পাপ।
আর বন্দী নাহি জিজ্ঞাসিতে কেহ কহে।
গরিষ্ঠ পাপিষ্ঠ এক আছে কারাগৃহে ॥
আদেশিল সাধব ত্বরিত আন তারে।
টুটি চিপা দিয়া তারে পিঠে ঢেকা মারে ॥
দুই পায় নিগড় সঘনে পড়ে উঠে।
উপনীত করিল নিঞা সাধুর নিকটে ॥
বর্দ্ধমানে ঘর মোর নাম ধূসদত্ত।
জনক উৎসাকর নাম স্বদেশে মহত্ত্ব ॥
আইল পাটনে দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে।
দ্বাদশ বৎসর বন্দী আছি অকারণে ॥০॥

॥ ধানসী রাগ ॥

অকারণে নিরুদ্ধ না করে নরপতি।
কে আছে তোমার ঘরে বল কোন জাতি ॥
যুবতী যুগল মোর আছে এক দাসী।
সুমতি সকল কাল সহজে রূপসী ॥
বণিকের কুলে জন্ম আপনার দেশে।
পরিবার যতেক সুরথ নৃপ পোষে ॥
যুবতী যুগল দাসী বল তিন নাম।
শুনিঞা তোমার মুখে করিব ছোড়ান ॥
এ বোল শুনিঞা বন্দী কহে সত্যবাণী।
সত্যবতী রুক্মিণী আর নাম চেটী পানি ॥
বন্ধন ঘুচাইল তার হৈয়া অনুকূল।
নাপিত আনাইয়া ঘুচাইল নখ চুল ॥
স্নান করাইয়া দিল যুগল বসন।
ব্রাহ্মণবন্ধনে দুহেঁ করিল ভোজন ॥
মুখশুদ্ধি করিয়া বসিয়া একাসনে।
বাপে পোয় পরিচয় কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

সত্যবতী বিমাতা রুক্মিণী সত্য মাতা।
গুণদত্ত নাম মোর তুমি জন্মদাতা ॥
দুই জনে পরিচয় পরিতোষ মনে।
প্রণতি করিয়া ধরে বাপের চরণে ॥
বাপে পোয়ে দরশনে মুখে দেই চুম্ব।
স্বদেশে চলিব বাপা না কর বিলম্ব ॥
রাজার বল্লভা নারী সুমুখী দুর্ল্লভা।
যুবতীর অগ্রগণ্য কলধৌতনিভা ॥
শুনিঞা চিন্তিত মনে কান্দে অধোমুখী।
বিদ্যা নামে দুহিতা বঞ্চিল মোরে বিধি ॥
দুর্ল্লভা জনমভূমি নন্দনের বরে।
বিদ্যা নামে রূপসী আইল গন্ধবরে ॥
কে তো[১১৩]মারে কৈল মন্দ কোন পরমাদ।
শুন গো জননী তুমি না কর বিষাদ ॥

জামাতা চলিব দেশে শুনিঞা শ্রবণে।
তোমারে এড়িব হেন নাহি লয় মনে ॥
মায়ের বচন শুনি বলে গুণবতী।
পতি গতি যুবতী সৃজিল সেই বিধি ॥
স্ত্রী পুরুষে দুহেঁ কেহ কারে নাহি ছাড়ে।
মায়ামোহে জনক জননী মন পোড়ে ॥
কহিতে কহিতে খসে নয়নের জল।
মায়ে ঝিয়ে গলাগলি বিষাদে বিহ্বল ॥
মুখে জল দিয়া সখী করায় চেতনা।
দেখিয়া রাজার মনে বাঢ়িল বেদনা ॥
চেতন পাইয়া বিদ্যা মুখে দেই বারি।
প্রভুর নিকটে গেল লৈয়া সখী চারি ॥
দাণ্ডাইল চাঁদমুখী আতাঞ্জলি দিয়া।
ভোজন করিবে বলে ঈষত হাসিয়া ॥
ভোজন করিব প্রিয়ে ইথে নাহি আন।
স্মরিতে জননী অন্তরে পোড়ে প্রাণ ॥
থাকিবে চলিবে প্রিয়ে কি তোমার মনে।
চলিব আপন দেশে কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

॥ কৌ রাগ ॥ বারমাসী ॥

মুকুলিত বকুল সুনাদ পিকবোলে।
স্ত্রী পুরুষে পরিতোষ এক নিকেতনে ॥
নহে অতি তপ্ত নহে অতি সুশীতল।
মলয় পবন বায়ে মদনের বল ॥
আমি রাজার কুমারী কুমারী।
মধুমাসে বঞ্চিব সুখদ বিভাবরী ॥ধ্রু॥
কুসুম সুগন্ধি ফুল চন্দন বিলাসে।
বিদগ্ধ পুরুষ নারী বৈশাখ মাসে ॥
পিকরঙ্গ রব তরুডালে পাত ঘুচে।
তরুণের মলয়জ তরুণীর কুচে ॥
বুঝ সর্ব্ব কলা নাথ বুঝ সর্ব্ব কলা।
ভুবনে দুর্ল্লভ সুখ মদনের খেলা ॥ধ্রু॥
জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রে জলযন্ত্র ঘরে।
একত্র থাকিব রত্ন পালঙ্ক উপরে ॥

কর্পূর তাম্বুল খাব হাস্য পরিহাসে।
রজনী দিবস গোঙাইব রতিরসে ॥
না ভাবিহ আন প্রভু না ভাবিহ আন।
জীবনে মরণে [১১৪ক] দুহুঁ একই পরাণ ॥
আষাঢ় মাসেতে রবি প্রচণ্ড কিরণ।
দীঘল দিবস তথি তৃষ্ণাকুল মন ॥
সুশীতল পবনে নিদ্রায় চক্ষু ঢুলে।
পুণ্যবতী সে যুবতী পতি যার কোলে ॥
না ভাব বিষাদ প্রভু না ভাব বিষাদ।
ভুঞ্জিবে স্বর্গের সুখ যেন শচীনাথ ॥
তরুণ জলদগণ উরিলা আকাশে।
হুড় হুড় গরজন শ্রাবণ মাসে ॥
বিজুরি বিকশে ঘন দাদুরির ধ্বনি।
বড় পুণ্য যার কোলে নিবসে তরুণী ॥
থাকিব রাত্রি দিনে নাথ থাকিব রাত্রি দিনে।
মশারিতে বঞ্চিব রতনসিংহাসনে ॥
ভাদ্র মাসের মেঘে ক্ষিতি জলশাই।
যুবতী হইয়া নাথ তোমারে বুঝাই ॥
দিবা নিশি বরিষে কর্দ্দম প্রতি নাছে।
বিদগ্ধ পুরুষ থাকে যুবতীর কাছে ॥
রাজার নন্দিনী আমি রাজার নন্দিনী।
দাসী হইয়া তোমাকে যোগাব অন্ন পানি ॥
আশ্বিন মাসের মেঘ ক্ষীণ জল বহে।
আনন্দিত লোক ভগবতী প্রতি গৃহে ॥
ছাগল মহিষ মেষ কেহ দেয় বলি।
দশমী পাইয়া লোক করে জলকেলি ॥
শুন একমনে প্রভু শুন একমনে।
বাজাইয়া ঢাক ঢোল যুবতী বাথানে ॥
হিমকর সুখদ মুগধ জলপান।
অর্জ্জনে যতেক লোক করিব পয়ান ॥
কার্ত্তিক মাসেতে ইন্দ্র নাহি ধরে চাপ।
যুবতীর কোলে যুবা পাসরে মা বাপ ॥
নহ অগেয়ান নাথ নহ অগেয়ান।
রাজার জামাতা তুমি বড় ভাগ্যবান ॥
আঘণ মাসের বায়ু সহজে শীতল।
রবিকর সুখদ ঈষত তপ্ত জল ॥
পাষাণকঠিন যুবতীর পয়োধর।
রজনী শয়নে কোলাকুলি বক্ষে নর ॥
নিবেদি তুয়া পায় প্রভু নিবেদি তুয়া পায়।
বড় দুঃখ হৃদয় তেজিতে বাপ [১১৪] মায় ॥
গুণবতী যুবতী সহজে প্রিয়ম্বদা।
উন্নত যৌবনবতী যাহার বনিতা ॥
ধরণীমণ্ডলে তারে কেহ নহেধিক।
ধনের ঠাকুর যত সকল রসিক ॥
থাকিব বুকে বুকে প্রভু থাকিব বুকে বুকে।
পৌষ মাসের রতি বঞ্চিব কৌতুকে ॥
রজনী বাঢ়ে টুটে প্রতি দিন।
মাঘ মাস যায় দিনে দিনে টুটে হিম ॥
কুন্দ কুসুম ফুটে সকল নূতন।
যুবতী নিকটে যুবা জুড়ায় মদন ॥
বলি সবিনয় নাথ বলি সবিনয়।
এ পাটনে নিবস বৎসর পাঁচ ছয় ॥
ফাল্গুন মাসেতে সভাকার পরিতোষ।
কথ কাল বুঝ শ্বশুরের গুণ দোষ ॥
যথোচিত কথিলে না লয় মোর মনে।
বার মাসে ষড় ঋতু কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

চলিব দেশেরে প্রিয়ে চলিব দেশেরে।
না জীব পরাণে আমি মায় না দেখিলে ॥
না যাব দেশেরে তুমি নহ কাপুরুষ।
আনাব তোমার মাতা পাঠাইয়া মানুষ ॥
কমলসম্ভব দেব দুর্ম্মুখ ভূপতি।
রাণী মোর জননী দুর্ল্লভা নাম সতী ॥
পৃথিবীবিখ্যাত বিদ্যা নাম গুণবতী।
তব পদে কহি আমি করিয়া প্রণতি ॥
বাপে পোয় একু ঠাঞি না ভাব অসুখ।
আমার হৃদয়বাগে তুমি মধুভুক ॥

স্বদেশ বিদেশ কিবা যেই জন বলি।
ময়গল গজকুম্ভ বিবাদে কেশরী ॥
গন্ধ তৈল লবে নিত্য স্নান পুণ্যজলে।
ভোজন শুধিবে মুখ কর্পূর তাম্বূলে ॥
শচীর ঈশ্বর যেন সুরনিকেতনে।
ভাল মন্দ করিবে বসিয়া সিংহাসনে ॥
বিদেশে রহিলে প্রিয়ে তোমার বচনে।
ঘুষিতে মায়ের গুণ না জীব জীবনে ॥
কি বলিতে পারি নাথ তোমার চরণে।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

[১১৫ক] ঠাকুর হে, তব পদে করিয়ে প্রণাম।
তুমি দেব দয়ানিধি   পাইয়া তোমারে বিধি
নিজ দেশ যাব বর্দ্ধমান ॥ ধ্রু ॥
তুমি মহাশয় রাজা   আমারে জানিবে প্রজা
নিবেদিল তোমার চরণে।
মনুষ্য পাঠাইয়া ঘরে   উদ্দেশ করিবে মোরে
অনুগ্রহ যদি থাকে মনে ॥
ঘন পড়ে কাড়া সিঙ্গা   চারিধিক দশ ডিঙ্গা
ধনে রাজা করিল পূর্ণিত।
বলে শুন বৈবাহিক   মনে কিছু না করিহ
যত আমি কৈল হিতাহিত ॥
শ্বশুরচরণযুগে   সাধব বিদায় মাগে
নিজ মুখে করিয়া বিনতি।
কুশলে থাকিহ তুবি   বধূ সঙ্গে চিরজীবী
অশংসিল রাজার যুবতী ॥
রাজা রাণী প্রিয় ভাষে   নগরে যতেক বৈসে
যুবতীরে না করিহ রোষ।
সহজে অলপ গুণ   যতেক কামিনীগণ
বড় পুণ্যে নাহি থাকে দোষ ॥
খ্যাতি রাজা ত্রিভুবনে   ত্রিপুরার নিদেশনে
তুমি মোরে করিলে কল্যাণ।
লংঘিলে তোমার বাক্য   কভু নহে সুখ মোক্ষ
আমি সাধু নহি অগেয়ান ॥
তবক কাহাল শঙ্খ   ঘন বাজে মৃদঙ্গ
ঢাক ঢোল পট্টহ কাঁসর।
বরোঙ্গ মুহরি ভেরি   মধুর ডিণ্ডিম হেরি
দড়মসা গুড় গুড় দগড় ॥
পরিজন কাছে কাছে   রাজা রাণী অনুব্রজে
উপনীত মায়াদহতীরে।
বিদায় করিয়া পুন   ডিঙ্গা চাপে যত জন
বর কন্যা চাপে মধুকরে ॥
ব্রাহ্মণ বিখ্যাত গুণ   জন্মদাতা বিকর্ত্তন
হারাবতী হৃদয়ধারিণী।
চণ্ডীপদসরোরুহে   শ্রীযুত মুকুন্দ কহে
তুষ্ট যারে বিশাললোচনী ॥ • ॥

॥ ছন্দ ॥

শ্বশুর শাশুড়ী দুই চরণকমলে।
বিদায় হইয়া সাধু চলিল দেশেরে ॥
বিদ্যা নামে গুণবতী মা বাপের পায়।
বিদায় লইয়া সতী কান্দে উভরায় ॥
রাজা রাণী কান্দে মোহে যত পুরাজন।
বিলম্ব না করে চলে সাধুর নন্দন ॥
রাজা রাণী পুরীজন উর্দ্ধমুখে চায়।
নেত্তের আঁচলে বিদ্যা মায়েরে ফিরায় ॥
ডিঙ্গার উপরে সাধু উলটিয়া চাহে।
দুর্ব্বার পাটনে লোক কান্দে উভরায়ে ॥
মায়াদহ মেলানি বাহিল সদাগর।
দেখিতে দেখিতে নহে নয়নগোচর ॥
উলটিয়া গেলা [১১৫] লোক দুর্ব্বার পাটনে।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥০॥

॥ পয়ার ॥

মায়াদহ এড়াইল সাধুর প্রধান।
ঈষত লীলায় গেল বাবুর মোকাম ॥

পিতা পুত্রে দুহেঁ সাধু শিবানীরে জপে।
নিবসে পদ্মিনী যথা সিংহলের দ্বীপে ॥
কেহ যন্ত্র বায় কেহ হরিগুণ গায়।
কড়ি যোঁক শঙ্খ কাঁকড়াদহ বায় ॥
সতত সাধব দুহেঁ সেবে হরগৌরী।
রামসেতু এড়াইল কাঞ্চননগরী ॥
বেণী রাজার পাট দিয়া যায় সদাগর।
সঙ্কেতমাধব যথা গঙ্গাসাগর ॥
দেবতা পূজিল তথা করপুট করি।
এড়াইল মগরা পাটন তড়বড়ি ॥
সিলিদার পেলে সিলি যেন ঝনঝনা।
মানকৌর এড়াইয়া পাইল ষমখানা ॥
ঈষত পবনে কুল কুল ডাকে জল।
এড়াইয়া যায় সাধু বুড়া মন্তেশ্বর ॥
আইল অনেক দূর জলদুর্গপথে।
প্রবেশিল চারিদশ ডিঙ্গা দেবনদে ॥
নায়ের নফর যত সাধু তার পিতা।
এড়াইয়া যায় সাধু কুলিয়া গোচিতা ॥
নাইকুলি এড়াইয়া পাইল বাঘণ্ডা।
রুক্মিণীনন্দন তথা পূজিল চামুণ্ডা ॥
অন্তরে হরিষ বড় দুই সদাগর।
এড়ায় ডিঙ্গলহাট চাঁচুয়ানগর ॥
দাসীর নন্দনে আছে ত্রিপুরার কৃপা।
জাঙ্গিপাড়া দিয়া যায় দ্বারহাটদ্বীপা ॥
গুণদত্ত সদাগর পূজিল ত্রিপুরা।
বৈদ্যপুর এড়াইয়া পাইল দশঘরা ॥
জাড়গ্রাম বাহে সাধু নাহি করে হেলা।
মহুলা উত্তরে সাধু দুই প্রহর বেলা ॥
হিরণ্যগ্রাম জাড়গ্রাম এড়াইয়া যায়।
যামদহে গিয়া সাধু বাজনা তোলায় ॥
কাহাল ফুকরে শঙ্খ দণ্ডি মুহরি।
ঢাক ঢোল কাঁসর দগড় বাজে ভেরি ॥
দড়মসা বরোঙ্গ সঘনে সিঙ্গা পড়ে।
কাহাল ফুকরে পত্তি ডিঙ্গার উপরে ॥
তবকী তবক ছোঁড়ে বাজে সিন্ধুযান।
কেহ গীত গায় কেহ হানে ধূলবাণ ॥
জয় জয় কোলাহল পুরে সিংহনাদ।
সিলিদার পেলে সিলি যেন বজ্রাঘাত ॥
দুই দিকে বাহ বাহ পড়িল বিতণ্ডা।
চলিল পবনগতি নূতন বরণ্ডা ॥
[১১৬ক] ত্রিপুরাচরণ ভাবে সাধুর প্রধান।
বড়সৌলা দিয়া ডিঙ্গা গেল বর্দ্ধমান ॥
পাটন হইতে সাধু আইল বর্দ্ধমানে।
বার্ত্তা জানাইল গিয়া নৃপতির স্থানে ॥
ত্রিপুরা রক্ষিত তিন মুকুন্দনন্দনে।
রামানাথ চন্দ্রশেখর সনাতনে ॥
শুনিঞা সন্তোষ মনে ত্রিপুরার দাসী।
পতি পুত্র আইল দেশে দ্বিতীয়ার শশী ॥
ডিঙ্গা নির্ম্মঞ্ছিতে যায় সাধুর নন্দিনী।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধবাণী ॥০॥

(ক্রমশঃ)

পর্ত্তুগীজ মিশনারী ও বাংলা গদ্য

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(গ) মানোএল-দা-আসসুম্পসাঁউ ও বাংলা গদ্যের নূতন সম্ভাবনা

সমসাময়িক ও সমশ্রেণীর পাদ্রী মানোএল-দা-আসসুম্পসাঁউ বাংলা গদ্য ও খ্রীষ্টানী প্রচার-ধর্ম্মী সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ বলিয়া তাঁহার দুইখানি গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব আলোচনার যোগ্য। তাঁহার জীবনকাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ জানিবার উপায় নাই। এভোরা নগরীর অধিবাসী অগাস্তীনীয় সম্প্রদায়ভুক্ত এই খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী ১৭৩৪ হইতে ১৭৫৭ খ্রীঃঅব্দ পর্য্যন্ত বা তাহারও কিছু কাল পরে বাংলা দেশে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৭৩৪ খ্রীঃঅব্দে তিনি ভাওয়ালের সন্নিকটে নাগরী গ্রামের সন্ত নিকোলাস দে তোলেন্তিনো নামক রোমান ক্যাথলিক প্রচারকেন্দ্রের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন এবং সম্ভবতঃ ১৭৫৪ খ্রীঃঅব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই অঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীঃঅব্দে ব্যাণ্ডেলের অগাস্তীনীয় গির্জ্জারও তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন[৩৭]। ইহার পরে তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। তিনি যে অতি আয়াস সহকারে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez' পাঠেই বুঝা যায়। বাস্তবিক এই সন্ন্যাসী যেমন সর্ব্বপ্রথম বাংলা গদ্যের বৈয়াকরণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হন, তেমনি গদ্য ভাষায় খ্রীষ্টানী সাহিত্য রচনা করিয়া বাংলা গদ্যের প্রস্তুতি-পর্ব্ব অনেকটা মসৃণ করিয়া আনেন। তাঁহার সাহিত্যিক কৃতিত্ব তিনটি। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত দোম আন্তোনিওর 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদের' তিনি পর্ত্তুগীজ অনুবাদ (ভাবানুবাদ ?) করেন এবং 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামক গুরু-শিষ্য-সংবাদসম্বলিত খ্রীষ্টানী প্রচারপুস্তিকায় নানা উপাখ্যান উপকথার সাহায্যে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার ব্যাকরণ-শব্দকোষ বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। সুতরাং প্রথম মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের গ্রন্থকার (রোমান হরফে মুদ্রিত) এবং প্রথম বৈয়াকরণ বলিয়া তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

মানোএল কবে দোম আন্তোনিওর 'ব্রাহ্মণ রোমানক্যাথলিক সংবাদের' ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার নির্দ্দিষ্ট তারিখ জানা যায় না। দুইখানি প্রাচীন পর্ত্তুগীজ গ্রন্থে মানোএলের যে বিবরণী আছে, তাহাতে এই গ্রন্থের মানোএলকৃত কোন পর্ত্তুগীজ অনুবাদের কথা নাই। দিয়াগো বারবোসা মাসাদো ১৭৫২ খ্রীঃঅব্দে Bibliothica Lusitana বা পর্ত্তুগীজ লেখকদের যে জীবনীকোষ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহাতে 'কৃপার শাস্ত্রের' উল্লেখ

৩৭ শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ,' প্রবেশক, পৃ. ।০।

আছে মাত্র[৩৮]। ১৮৪০ খ্রীঃঅব্দে ইনোসেন্সিয়ো দা সিলভা 'Diccionario Bibliographico Portuguez' গ্রন্থেও মানোএলের ব্যাকরণের উল্লেখ করিলেও 'ব্রাহ্মণ রোমানক্যাথলিক সংবাদের' অনুবাদ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। ১৮৮০ খ্রীঃঅব্দে A. C. Burnell 'A Tantative list of Books and Mss. relating to the Vocabulario এবং Cathecismo do Doutrina christaa-র কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনিও 'রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' সম্বন্ধে নীরব। দোম আন্তোনিওর গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া ১৮৫০ খ্রীঃঅব্দে 'Catalogo dos Manuscriptos da Bibliothica Publica Eborensa' নামক এভোরার সাধারণ গ্রন্থাগারের যে হস্তলিখিত পুথির বিবরণী বাহির হয়, তাহাতে সঙ্কলয়িতা কুন্হা রিভারই উক্ত পুস্তিকাকে হস্তলিখিত পুথির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। তবে ইহার অনুবাদের একটা অনুমানিক তারিখ পাওয়া যাইতে পারে। ফাদার আম্ব্রোসিয়ো ১৭২৬ খ্রীঃঅব্দে ভাওয়ালের খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রচারের যে বিবরণী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দোম আন্তোনিওর গ্রন্থ এবং তৎসংশ্লিষ্ট পর্ত্তুগীজ অনুবাদের উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহার মতে মিশনের কোন এক পাদ্রী ব্রাহ্মণগণের সহিত বিচার করিবার জন্য এই বাংলা পুথির পর্ত্তুগীজ অনুবাদ করিয়াছিলেন। মানোএলের ঢাকায় আগমনকাল জানা না থাকায়, এই পাদ্রী তিনিই কি না, অনুমান করা যাইতেছে না, এবং এভোরায় যে-পুথি ও অনুবাদ রক্ষিত আছে, তাহা এবং রিভারির উল্লিখিত অনুবাদ একই বস্তু কি না বুঝিবার উপায় নাই।

মানোএলের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। ঢাকার নাগরী গ্রামে বসিয়া মানোএল ১৭৩৪ খ্রীঃ অব্দে গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই বিতর্কিকা রচনা করেন এবং ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে ইহা পর্ত্তুগীজ অনুবাদ সহ লিসবন হইতে মুদ্রিত হয়। বলা বাহুল্য যে, ইহার বাংলা অংশটুকুও রোমান হরফে মুদ্রিত। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, ইহার পর্ত্তুগীজ অংশটুকু মানোএলের রচনা; বাংলা অংশ সম্ভবতঃ ভাওয়ালের কোন দেশীয় খ্রীষ্টানের অনুবাদ[৩৯]। অবশ্য এই সংবাদ তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে চন্দননগরের ফরাসী পাদ্রি ফাদার গেরেঁ (Guerin) কর্ত্তৃক শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের' এক অভিনব সংস্করণ হইতে। গেরেঁ উক্ত সংস্করণের লাতিন ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধ মানোএল পর্ত্তুগীজ ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন এবং কোন এক দেশীয় ব্যক্তির দ্বারা বঙ্গানুবাদ করাইয়া লন। "অনুবাদের কালে বৃদ্ধ ফাদার মানোএল মাঝে মাঝে যখন ঝিমাইয়া পড়িতেন, তখন দেশীয় অনুবাদক তাঁহার অজ্ঞাতে খ্রীষ্টানধর্ম্মবিরোধী নানা গালগল্প নিজেই জুড়িয়া দিত।"[৪০] গেরেঁর এই উক্তি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। যিনি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করিবার মতো ভাষাজ্ঞান অর্জ্জন

---

৩৮ "Cathecismo do doutrina christaa ordenando modo de Dialogo em idioma Bengalla e Portuguez" (ব্রা. রো. সংবাদ, পৃ. ১।৶০)

৩৯ শ্রীসজনীকান্ত দাস—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পৃ. ১৭।

৪০ ঐ, পৃঃ ১৭।

করিয়াছিলেন, শব্দকোষ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, দোম আন্তোনিওর পুথির ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে 'কৃপার শাস্ত্রর অর্থভেদের' মতো পুস্তিকা রচনা করা একেবারে দুঃসাধ্য ব্যাপার নহে। তাঁহার রচনার ভাষাতে যে বৈদেশিক স্বাদগন্ধ পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন বাঙ্গালী এই পুস্তিকার রচয়িতা নহেন।[৪১] তবে হয় তো অনুবাদ কার্য্যে কোন দেশীয় খ্রীষ্টান তাঁহাকে সহায়তা করিয়া থাকিবে। ইহার ভাষায় লাতিন ও পর্ত্তুগীজের প্রভাব রহিয়াছে।[৪২] এবং বহু স্থলে ফিরিঙ্গীসুলভ পদসমূহের স্থানবিপর্য্যয় রহিয়াছে; ভাষা দোম আন্তোনিওর তুলনায় দুর্ব্বল, খঞ্জ ও কথ্যভাষার অধিকতর নিকটবর্ত্তী। ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে, মানোএল-ই ইহার রচয়িতা, ইহা কোন দেশীয় খ্রীষ্টানের অনুবাদ নহে। মানোএল লোকমুখে ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার ভাষা কথ্যভাষার অনুরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু "পাদ্রী মানোএলের বাংলায় যে তখনকার দিনের ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত বাংলা ভাষার একটা সত্যকার প্রতিচ্ছায়া মিলিতেছে"[৪৩]—ইহাও বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, মানোএলের ভাষার পদবিন্যাস ও বাক্যগঠন বিশুদ্ধরূপে সাধু ভাষার কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত, শুধু স্থানে স্থানে আঞ্চলিক উপভাষার প্রভাব রহিয়াছে। দোম আন্তোনিওর ভাষা অপেক্ষা মানোএলের ভাষায় উপভাষার ছায়া পড়িয়াছে সমধিক, তাহা স্বীকার্য; কিন্তু বাক্য-বিন্যাস সাধুভাষার অনুগত, এ কথা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। এমন কি, ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে শ্রীরামপুর হইতে ফাদার গেরে ইহার যে দ্বিতীয় পরিমার্জ্জিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার ভাষা আদৌ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, বরং খ্রীষ্টানী ঢং আরও উৎকটরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সংস্করণের ভাষা সম্বন্ধে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য; "পাদ্রি গেরাঁ ৫৮ হইতে ৯৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে অংশ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ভাষা ও ভাব উভয় দিক্ দিয়া সে অংশ সম্বন্ধে এক কথায় সমালোচনা করা যায়—বর্ব্বর!" মানোএলের অনেক পরে রচিত কেরীর 'ধর্ম্মপুস্তকের' ভাষাও যে প্রয়োগ-যাথার্থ্যের দিক্ দিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা মনে হয় না।

মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বাংলা ভাষায় অনেক স্থলেই পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই। "ইস্পিরিতো সান্তো"-র বাংলা প্রতিশব্দ দিতে পারেন নাই, "The world, the devil and the flesh"—ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, "দুনিয়া, ভূত, শরীর;" Holy Mother Church-এর বাংলা হইয়াছে "সিদ্ধী মাতা ধর্ম্মঘর"—যত্র

৪১ শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র প্রবেশকে (পৃ. ।।৶০) ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৪২ ঐ।

৪৩ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র প্রবেশকে (পৃ. ৸০) এবং মানোএলের ব্যাকরণের ভূমিকায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৩০) ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মত পোষণ করিয়াছেন। শ্রীসজনীকান্ত দাস তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে (১ম) মানোএলের ভাষাকে "ভাওয়ালে প্রচলিত মৌখিক ভাষা" বলিয়া (পৃ. ১৮) গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের অভিমত কতদূর যথার্থ, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

তত্র এইরূপ উদাহরণ মিলিবে। তাঁহার মূল বক্তব্য: পিতা, পুত্র, 'ইস্পিরিতো সান্তো'—এই ত্রিস্বরূপের অভেদত্ব ও অত্রয়বোধ; এই সূক্ষ্ম ত্রিতত্ত্ব (Trinity) আলোচনা করিবার মতো চিত্ত-প্রকর্ষ ও ভাষাবোধ তাঁহার কত দূর আয়ত্ত হইয়াছিল, তাহাও বিবেচ্য। যদিও তিনি ছিলেন অগাস্তীনীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী এবং 'Rector da Missao de S. Nicolas do Tolentino em Bengalla', অর্থাৎ বাংলা দেশের সন্ত নিকোলাস দে তোলেন্তিনো প্রচার-কেন্দ্রের পরিচালক, তথাপি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মতত্ত্বকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিবার মতো চিত্তের নির্ব্বিকল্প ভাবাবস্থা ও ভাষাজ্ঞান তাঁহার না থাকিবারই সম্ভাবনা। দোম আস্তোনিও বিতর্কপ্রসঙ্গে ধর্ম্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম তার্কিকতা সযত্নে পরিহার করিয়াছেন; প্রতিপক্ষকে পর্য্যুদস্ত করিতে হইলে স্বমত প্রতিষ্ঠার সূক্ষ্মত্ব অপেক্ষা প্রতিপক্ষের ধর্ম্মমতের ছিদ্রান্বেষণ আবশ্যক; সে দিক্ দিয়া দোম আস্তোনিও সফলকাম হইয়াছেন। কিন্তু মানোএলের কার্য্যক্রম আরও দুরূহ ছিল; তাঁহাকে পূর্ব্ববাংলার সুদূর ভাওয়ালে বসিয়া এবং প্রায় নিরক্ষর দেশীয় খ্রীষ্টানদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছে। বাংলা গদ্য তখনও অতি দুর্ব্বল, পদচ্ছেদী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য বা বাক্যাংশের দ্বারা কোন ক্রমে মনোভাব ব্যক্ত করা যাইত মাত্র। সুতরাং এতগুলি অসুবিধা সত্ত্বেও এই গ্রন্থে মানোএল সিদ্ধি ক্রুশ, ভগবৎতত্ত্ব, মেরীমাতাতত্ত্ব, খ্রীষ্টানধর্ম্মের মৌলিক তত্ত্ব, দশ অনুজ্ঞা, পাঁচ অনুজ্ঞা, সাত সাক্রামেন্তাস (অর্থাৎ রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিবিধ 'সংস্কার') ধর্ম্মমতের গূঢ় রহস্য প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বক্তব্যকে সরল করিবার জন্য বহু আখ্যান বা 'প্যারাবেলের' সাহায্য লইয়াছেন।[৪৪] আখ্যানগুলির সহিত প্রায়ই বাংলা দেশের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই, সবগুলির পশ্চাৎ পটে পর্ত্তুগীজ জীবনধারার যোগাযোগ রহিয়াছে।

যদিচ এই পুস্তকটি খ্রীষ্টান ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক, এবং বাংলা গদ্য ভাষার প্রাণধর্ম্ম আবিষ্কারেও মানোএলের বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখা যায় না, তথাপি ইহার মধ্যে তৎকালীন পূর্ব্ববাংলার জনজীবন সম্বন্ধে কয়েকটা অস্পষ্ট ছায়াভাস লক্ষ্য করা যাইবে। হিন্দু সম্প্রদায় আগন্তুক খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রতিকূল মত পোষণ করিতেন; ফলে রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট ধর্ম্ম সম্প্রদায়, উভয়েই হিন্দুর ধর্ম্মাচার ও জীবনচর্য্যার উপর প্রবল আঘাত হানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি, মানোএল ক্রোধের বশে পৌত্তলিক গ্রীক ও রোমক জাতিকেও 'হিন্দু' নামে অভিহিত করিয়াছেন[৪৫]। মুসলমানগণও খ্রীষ্টানধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন; কিন্তু হিন্দুর সুদৃঢ় দার্শনিকতা ও ধর্ম্মমতকে বিচূর্ণ না করিলে খ্রীষ্টানধর্ম্ম বাংলায় প্রসারিত হইতে পারিবে না, ইহা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। উপরন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদের ভীতি থাকাই স্বাভাবিক। মুসলমানধর্ম্ম রাজধর্ম্ম; রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকদের বাংলায় আসার অন্ততঃ এক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই আরবসাগর হইতে শুরু করিয়া চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যপ্রসঙ্গে মুসলমান ও পর্ত্তুগীজ বণিক্‌দের মধ্যে ভয়াবহ কলহ দ্বন্দ্ব

---

৪৪ এই গ্রন্থে এইরূপ ৩১টি আখ্যান আছে। ৪৫ কৃ. শা. অর্থভেদ, পৃ. ২২০।

চলিয়াছিল। সেই স্মৃতি তখনও মলিন হইয়া যায় নাই। তাই মানোএল সম্বন্ধে মুসলমান-বিরোধিতা এড়াইয়া চলিতেন। মাত্র দুই এক স্থলে তিনি মুসলমানকে 'অনাস্থিক' অর্থাৎ নাস্তিক বলিয়াছেন, কিন্তু প্রায় কোথাও কটূ মন্তব্য করেন নাই। তাঁহার চারি দিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধিতা উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল; তাই তাঁহার শিষ্যদিগকে তিনি হিন্দু আচার ব্যবহার হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু বহু স্থলে মুসলমানধর্ম্ম সম্মত শব্দ ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। কয়েক স্থলে ঈশ্বর অর্থে 'খোদা' এবং উপবাস অর্থে পুনঃ পুনঃ 'রোজা' শব্দের প্রয়োগের পশ্চাতে দুইটি যুক্তি দেখা যাইতেছে; প্রথমতঃ মুসলমান শাসকশক্তির প্রতি আশঙ্কাবশতঃ প্রায়শই মুসলমান ধর্ম্মের যৌক্তিকতার দিক্‌টি কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই বোধ হয় ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই তাহাদের বোধগম্য মুসলমানী প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই গ্রন্থটি হইতে তৎকালীন সমাজ-জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাস ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। মানুষের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক যৌন জীবনের প্রতি মানোএলের মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান-সুলভ আন্তরিক ঘৃণা ছিল। তাই তিনি 'মহানরক' বর্ণনা প্রসঙ্গে 'কামদী' অপরাধ অর্থাৎ যৌনাপরাধের মলিন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টানধর্ম্মের 'আদিম পাপ-ভীতির' মধ্যে প্রচণ্ডতম ছিল দেহভীতি—আত্মার উপর উত্তপ্ত দেহাচারের বিজয়ী হইবার আশঙ্কা। সুতরাং আলোচ্য তত্ত্বগ্রন্থেও লেখক অন্ততঃ সাতটি যৌনাপরাধ ও তাহার সুকঠোর শাস্তির উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি, তিনি এক স্থানে অস্বাভাবিক যৌনাপ-রাধের[৪৬] ইঙ্গিত করিয়াছেন। অবশ্য আখ্যানগুলির কোনটি-ই বাংলাদেশের সমাজ জীবনের সহিত যুক্ত নহে; তাহা হইলেও মানোএলের মনোভাব নিছক আখ্যানকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে নাই; মূলে যে কোন প্রকার নৈতিক অনাচারের ইঙ্গিত নাই, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ, ব্যাণ্ডেল চার্চ্চের নৈতিক শিথিলতা সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল[৪৭]। সেই জন্যই বোধ হয় মানোএল যৌনাপরাধের প্রতি এত নির্ম্মম হইয়াছিলেন।

১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিরতিশয় অবনতি ও লোলুপ মুনাফাকারীদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাই মানোএল যখন চৌর্য্যাপরাধ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন, "যে লাভুয়া, সেও ডাকাইত"—তখন তৎকালীন উপদ্রুত সাধারণ বাঙ্গালীর মনোভাবই যেন অনাবৃত ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আলোচ্য গ্রন্থ ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে রচিত হইলেও ইহার নানা স্থানে সমসাময়িক ভাওয়াল-বাসী জনজীবনের কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে।

মানোএলের Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez বা বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে 'কৃপার শাস্ত্রে'র সহিত একই বৎসরে লিসবনে মুদ্রিত

---

৪৬ কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, পৃ. ২২০।

৪৭ Campos—History of Portuguse in Bengal, p. 237

হয়। এ দেশে গ্রীয়ার্সন সর্ব্বপ্রথম তাঁহার Linguistic Survey of Indiaর ৫ম খণ্ডে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্ত্তুগালে মুদ্রিত পর্ত্তুগীস্ গ্রন্থের তালিকায় ইহার উল্লেখ আছে। দিয়াগো বারবোসা মাসাদো Bibliothica Lusitana (1752) নামক অভিধানে বলিয়াছেন যে, ১৭৩৫ খ্রীঃ অব্দে মানোএলের 'Cathecismo do Doutrina Christaa Ordinaudo por modo de dialogo em idioma Bengalla e Portuguez' রচিত হয়। আমাদের অনুমান, এখানে শুধু 'কৃপার শাস্ত্রে'র কথাই নাই,[৪৮] 'Dialogo em Idioma Bengalla' হইতেছে বাংলা ব্যাকরণ। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে ইনোসেন্সিয়া দা সিল্‌ভা Diccinario Bibliographico Portuguez নামক অভিধানে বলিয়াছেন যে, Libraria Jesus নামক গ্রন্থাগারে তিনি মানোএলের ব্যাকরণের একখণ্ড দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তখনই তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছিল। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে A. C. Burnell তাঁহার A Tentative List of Books and Mss.relating to the History of Portuguez গ্রন্থেও এই ব্যাকরণ-শব্দকোষের উল্লেখ করিয়াছেন।

বাংলা গদ্যের বিবর্ত্তন ইতিহাসে মানোএলের Vocabulario বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মিশনারী সম্প্রদায় শুধু ধর্ম্মৈষণার জন্য যে কি নিদারুণ পরিশ্রম করিতে পারিতেন, শুধু এই ব্যাকরণেই তাহার বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যাইবে। দেশের ভাষা শিক্ষা ও দেশবাসীর মনোভাব অধিগত করিবার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ভাষাজ্ঞান ও বৈয়াকরণ বোধ। মানোএল যদিও সংস্কৃত জানিতেন না এবং ভাওয়ালের বাহিরের বাংলা ভাষার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল না, তথাপি তিনি বাংলা ভাষার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। লাতিন ছাঁচে বাংলা ব্যাকরণ রচনার চেষ্টা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত; বহুস্থলে তিনি ভাওয়ালের মৌখিক ভাষাকে প্রামাণিক বলিয়া ধরিয়াছেন, তথাপি তিনি ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রয়োগ পরিহার করিয়া প্রায় সর্ব্বত্র সাধু ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়াছেন। শব্দরূপ, ধাতুরূপ, অব্যয়, ক্রিয়ার অনুশীলন, বাক্যযোজনা প্রভৃতির উদাহরণ তিনি এই ব্যাকরণে দিয়াছেন। একজন বিদেশীর পক্ষে, সংস্কৃত সম্বন্ধে অনবহিত হইয়াও বাংলা ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্যগুলি যে পরিমাণে ধরিতে পারা স্বাভাবিক, মানোএল ততটুকু পরিয়াছিলেন। ভুল ত্রুটি অনেক আছে। বাংলা বর্ণমালা সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য কৌতুককর সন্দেহ নাই[৪৯], এবং য়ুরোপের লাতিন ভাষা ভাঙ্গিয়া ব্রাহ্মণগণ বাংলা ভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন—এই অভূতপূর্ব্ব ভাষাজ্ঞানের হাস্যকর অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।[৫০] তথাপি হালহেড্ সাহেবের প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও যে আর একজন বিদেশী বাংলা ব্যাকরণের শব্দ, ধাতু, অব্যয়, বাক্য-বিন্যাস পদ্ধতি, শব্দপ্রয়োগ প্রভৃতি

---

৪৮ 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিকে'র প্রস্তাবনায় ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন বলিয়াছেন, "আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মানুএল-কৃত ব্যাকরণ ও শব্দকোষের কথা মাসাদোর অভিধানে নাই।"

৪৯ তাঁহার মতে "বাংলা অক্ষর সৃষ্টিটা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণদের একটা মূর্খতার পরিচয়।"—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মানোএলের ব্যাকরণ, পৃ. ১।/০ ও পৃ. ৩৯ দ্রষ্টব্য।

৫০

আলোচনা করিয়াছেন, বহু বাংলা-পর্তুগীজ শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন,—তাহার জন্যই তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

অবশ্য এই ব্যাকরণ শুধু পর্তুগীজ পাদ্রিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তিনি তাঁহার ব্যাকরণের Prologo-তে শুধু Ao Leytor, E Missionarionova অর্থাৎ পাঠক ও নবীন প্রচারকদের সম্বোধন করিয়াছেন। ধর্ম্ম প্রচারের জন্যই ইহার সৃষ্টি, এবং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর মধ্যে ইহার প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল! সুতরাং বৃহত্তর বাংলা ভাষা ও বাঙালী সমাজের সহিত এই ব্যাকরণের যোগ না থাকাই স্বাভাবিক। শুধু ভাষার বিকাশ, ধর্ম্মতত্ত্ব ও ব্যাকরণ প্রভৃতির ইতিহাস নির্ণয়ের জন্যই ইহার মূল্য শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হইবে।

(ঘ) বেস্তো দে সিলভেস্ত্রা

এই প্রসঙ্গে নিছক ঐতিহাসিক ক্রমপর্য্যায় রক্ষার জন্য খ্রীষ্টানধর্ম্মবিষয়ক আরও দুইখানি পুস্তিকার উল্লেখ করিতে হয়। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে পর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক বাংলা গদ্যের ইঙ্গিত দিয়াছি, তাহার সমস্তই অগাস্তীনীয় সম্প্রদায়ের রচনা। এদেশে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার[৫১] পূর্ব্বে প্রটেস্টাণ্ট্ মতাবলম্বী বিশেষ কোন ধর্ম্মসংস্থা ছিল না। জন জ্যাকারিয়া কিয়ারনাণ্ডার (John Zacharia Kiernander)[৫২] নামক এক প্রটেস্টাণ্ট পাদ্রী ডাঃ কেরীর পূর্ব্বেই কলিকাতায় আসিয়া প্রটেস্টাণ্ট মত প্রচার করিয়াছিলেন বটে,[৫৩] কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ দেশীয় ভাষা জানিতেন না। তাঁহার সহকর্ম্মী বেস্তো দে সিলভেস্ত্রা[৫৪] নামক গোয়াবাসী এক পর্তুগীজ 'প্রার্থনা' ও 'প্রশ্নোত্তরমালা' (The Book of Common Prayer ও The catechism) নামক দুইখানি পুস্তক অনুবাদ করেন এবং লণ্ডন হইতে তাহা রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। এই অনুবাদগ্রন্থ দুইটির তারিখ সম্বন্ধে সংশয় আছে। নগেন্দ্রনাথ বসু 'বিশ্বকোষে' বলিয়াছিলেন যে, ইহা ১৭৬৫ খ্রীঃঅব্দে অনূদিত হইয়াছিল[৫৫]। কিন্তু এই তারিখটি ঠিক নহে। কারণ, ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সিলভেস্ত্রা প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই এবং এই মতের পাদ্রী-পদও গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য ঠিক কবে তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রটেস্টাণ্ট মত গ্রহণ করেন, তাহা জানা যায় না,

---

৫১ ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত।

৫২ ক্যালকাটা ব্যাপটিষ্ট্ মিশন প্রেস প্রকাশিত 'John Zacharia Kiernander' পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

৫৩ ক্লাইভ ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে ট্রাঙ্কেবা মিশনের প্রচারক ডেনিশ পাদ্রী কিয়ারনাণ্ডারকে প্রটেষ্টাণ্ট মত প্রচারের জন্য কলিকাতায় আহ্বান করিয়াছিলেন।

৫৪ সিলভেস্ত্রা ১৭৬৬ খ্রীঃ অব্দে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। (Careyর Oriental Christian Biography, vol. II দ্রষ্টব্য।) ইনি ফরাসী, পর্তুগীজ, বাংলা ও হিন্দুস্থানী ভালই জানিতেন; ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

৫৫ বিশ্বকোষ, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ১২৭।

বিভিন্ন মিশনারী লেখকদের মধ্যেও মতৈক্য নাই। কেরী ও হাইড এবিষয়ে বিভিন্ন তারিখ দিয়াছেন[৫৬]; তবে ১৭৬৬ খ্রীঃঅব্দের পূর্ব্বে যে নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং পুস্তিকা দুইটি ঐ তারিখের পরে রচিত হওয়াই সম্ভব। ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় সেই জন্য কেরী ও হাইডের বিভিন্ন তারিখ অনুসরণ করিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, বেস্তোর এই দুইখানি অনূদিত পুস্তিকা ১৭৬৬ হইতে ১৭৬৯ খ্রীঃঅব্দের মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে।[৫৭]

দুঃখের বিষয়, শুধু নামোল্লেখ ভিন্ন এই দুইখানি পুস্তিকার আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। মানোএলের কিঞ্চিদধিক তিরিশ বৎসর পরে লিখিত এই গ্রন্থ দুইটির ভাষারীতির কত দূর উন্নতি হইয়াছিল, রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মত্যাগী প্রটেস্টাণ্ট পাদ্রী কি ভাবে খ্রীষ্টানতত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। শুধু এইটুকু ইঙ্গিত করা যায় যে, প্রটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ও রোমান ক্যাথলিকদের মতো বাংলা ভাষার সাহায্যে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য সাহায্য লইয়াছিলেন একজন পর্ত্তুগীজ রোমান ক্যাথলিকের—যদিও তিনি পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

একদা সমগ্র নিম্নবঙ্গ 'হার্ম্মাদের ডরে' কাঁপিয়া উঠিত, পরে সেই পর্ত্তুগীজ পাদ্রীগণের সঙ্গে বাংলা গদ্যের সেতুবন্ধন রচিত হইল; বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ধর্ম্মপ্রচারণার অতি স্থূল ব্যবহারিকতার উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই; কি ক্যাথলিক, আর কি প্রটেস্টাণ্ট, কোন সম্প্রদায়ই এই প্রয়োজনবাদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। উপরন্তু বাঙ্গালী জাতির প্রাণচেতনা ও মনোধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না। ফলে, তাঁহাদের গদ্যচর্চ্চা জাতির প্রাণের সহিত যোগাযোগ রাখিতে পারে নাই। নাগরী গ্রামের 'সিদ্ধী মাতা ধর্ম্মঘর' এবং শ্রীরামপুরের মিশনের বাহিরে পাদ্রীদের দৃষ্টি ধাবিত হয় নাই। তাই এই পুস্তকগুলিতে বিপুল প্রয়াস দেখা গেলেও ইহারা কোন প্রকারে বিবর্ণ স্মৃতিতলে প্রস্তরীভূত হইয়া বিরাজ করিতেছে, বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে অপরিচিত আগন্তুকের মতো কোন প্রকারে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

---

৫৬ Carey-র Oriental Christian Biography (vol II) এবং Hyde-এর Parochial Annals of Bengal দ্রষ্টব্য।

৫৭ Dr. S. K. De. History of Bengali Literature in the 19th Century, p. 78.

বাঙ্গলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

৬। বিদ্যাসুন্দরের কেলিকৌতুক

জ। বিদ্যার মান ও মানভঙ্গ

গোবিন্দদাস বিদ্যার মানভঙ্গ প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন নাই। কৃষ্ণরাম হইতেই আমরা এই প্রসঙ্গের অবতারণা দেখিতে পাই। নায়ক নায়িকার প্রণয় বর্ণনায় 'মান' একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করে। মান না বর্ণনা করিলে প্রেমের গভীরত্ব দেখান যায় না। কৃষ্ণরাম মানভঞ্জন প্রসঙ্গ এই ভাবে আরম্ভ করিয়াছেন—

"কামিনী করিয়া কোলে যামিনী প্রভাত। জাগাইতে পূর্ব্বক যতন অতিশয়।
এইরূপে বহুদিন করে গতায়াত ॥ সখীর অসাধ্য সাধ্য সুন্দরের ভয় ॥
দৈবযোগে একদিন রমণীরতন। রুষিয়া রসিক রসে হইয়া বঞ্চিত।
নিদ্রায় আকুল (হয়ে) না হয় চেতন ॥ বিধু পান পাক মুখে না দিল কিঞ্চিত (?) ॥
যুবতী যতেক ঠাঞি সভার এমতি। বিমলার (গৃহেতে) আইলা নিশাযোগে।
স্বপ্নেও কুসুমশর করে উপক্রতি ॥ কহে কৃষ্ণরাম শ্যামচাঁদ পদযুগে ॥"

ইহার পর তিন দিন তিন রাত্রি সুন্দর অনাহারে মালিনীর গৃহে দেবীর আরাধনায় মগ্ন রহিলেন। তাহার পর চতুর্থ দিনে সুন্দর—

"করি সন্ধ্যা অনুভবে জপ সমাশ্রিত তবে সুধাকর সুধা জানি সুমুখী মুখের বাণী
দান করে দক্ষিণা হাটক। সুন্দর আপনি করে সাধ।
যে কিছু ভোজন পরে যামিনী জায়ার ঘরে জিজ্ঞাসয় বারে বার উত্তর না পায় তার
যায় যেন সাজিয়া নাটক ॥ জানিল আপন অপরাধ ॥
বিদ্যার বঞ্চন একা তিন রাত্রি নাহি দেখা চাতুরী কতেক আছে নাক কচালিয়া হাঁচে
লেখায় (?) হায়ন তিন বোধ। কামিনী শুনিয়া অচিরাত।
মানিনী হইয়া অতি না করে ভারতী সতী না বলিয়া 'জীব জীব' চিন্তিয়া কান্তের শিব
যুবতী পতির প্রতি ক্রোধ ॥ কাণে দিল কনকের পাত ॥"

সুন্দরের বিদ্যাকে কথা বলাইবার এই কৌশল ও বিদগ্ধা বিদ্যার অনুরূপ কৌশলে তাহার প্রত্যুত্তর দিবার এই উদাহরণ কৃষ্ণরাম নিঃসন্দেহে পাইয়াছিলেন চৌরপঞ্চাশৎ অথবা সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর হইতে। চৌরপঞ্চাশতের এই বিখ্যাত শ্লোকটি কৃষ্ণরাম ও তাঁহার পরবর্তিগণের আদর্শ—

"অদ্যাপি তন্মনসি সংপরিবর্ততে মে১
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ—
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা॥

রামপ্রসাদ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কৃষ্ণরামের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঠিক তাঁহার অনুসরণ না করিয়া কেবলমাত্র বলিতেছেন যে, সুন্দর একদিন ঔদাস্যভরে বিদ্যার গৃহে না যাওয়ায় অভিমানিনী বিদ্যা মান করিলেন—

"একদিন কৈল কবি ঔদাস্য উদয়।
না গেল সে দিন বিদ্যাবতীর আলয়॥
পতির বিরহে সতী অতি দুঃখযুতা।
জাগিয়া যামিনী পোহাইল নৃপসুতা॥
পরদিন উপনীত সুন্দরীর বাসে।
কান্তমুখ হেরি মুখ যত্নে ঢাকে বাসে॥
ধরি হাত দিয়া মাথে কত দিল কিরা।
না কহে বচন রামা নাহি চায় ফিরা॥
নয়নসলিলে ভাসে অঙ্গের বসন।
মানভঙ্গ না হয় বিমর্ষ বিলক্ষণ॥
বিচারিল মনে মনে এক যুক্তি আছে।
কপটে নিকটে গিয়া তৃণ দিয়া হাঁচে॥
মৌনব্রত ভঙ্গ ভয়ে না কহিল জীব।
তাড়ঙ্গ দোলায় বালা চিন্তা করে শিব॥"

'তাড়ঙ্গ' বা 'তাটঙ্ক' ও 'কনকপত্র' উভয়ই কর্ণভূষণ। কৃষ্ণরাম সংস্কৃত শ্লোককে হুবহু বজায় রাখিয়া বিদ্যাকে দিয়া 'কনকপত্র' ধারণ করাইয়াছেন। রামপ্রসাদ কর্ণস্থ তাটংককে দোলাইয়াছেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বলরাম বিদ্যার মানের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মানভঙ্গ প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন নাই। তিনি লিখিতেছেন—

"একদিন দৈববশে মালিনীর ঘরে।
নিদ্রা যায় নৃপসুত খট্টার উপরে॥
নিবাড়িয়া যায় দূর তৃতীয় প্রবেশ।
কুমারের নাহি হয় নিদ্রা অবশেষ॥
জাগিয়া কুমারী আছে কুমারের আশে।
কি কারণে কুমার না আইসে মোর পাশে॥
সুলঙ্গ দুয়ার ঘন করে বিলোকন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষেণেক শয়ন॥
মানিনী হইয়া বিদ্যা করেন রোদন।
নিদারুণ হৈল প্রিয় কিসের কারণ॥
কিবা সে আপন কাজ সাধিবার তরে।
সাধিয়া আপন কাজ গেল নিজ ঘরে॥
দিবস করিল রাতি রাতি কৈল দিন।
হেন বুঝি বিধি মোরে কৌতুক বিহীন॥"

ইহার পর মানভঙ্গ প্রসঙ্গ নাই, একেবারেই বিদ্যার গর্ভ প্রসঙ্গ। মনে হয়, এখানে কিয়দংশ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

মধুসূদন চক্রবর্তী বিদ্যার মানের যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা অতি সামান্য।

১। কাশ্মীরের 'চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা'য় এই পাঠ আছে। নির্ণয়সাগর হইতে প্রকাশিত 'বিহ্লন কাব্যে'রও এই পাঠ। বঙ্গদেশে প্রচলিত 'চৌরপঞ্চাশৎ'-এর পাঠ—"অদ্যাপি তন্মুখশশী পরিবর্ততে মে," কিন্তু কৃষ্ণরাম সুন্দরের রাজসভায় শ্লোকপাঠ প্রসঙ্গে উপরে উল্লিখিত কাশ্মীরী পঞ্চাশিকার অনুসরণ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের বর্ণনা হইতে মনে হয়, তিনি বঙ্গদেশীয় পাঠের অনুসরণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র চোরের শ্লোকপাঠ প্রসঙ্গে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে পাঠ আছে, "অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ত্ততে মে"।

"একদিন শুন ভাই আসর কথন।
বিলম্ব করিয়া আইল রাজার নন্দন॥
রাজার নন্দিনী অতি হইল মানিনী।
মৌন করি হেটমুখী মেলিল নয়নী (?)॥
তেজিল অঙ্গেতে যত ছিল অলঙ্কার।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল রাজার কুমার॥
কোপেতে লোহিত হইল বদন সুন্দর।
উদয় কালেতে যে রকত সুধাকর (দিবাকর?)
কি করিব মনে মনে ভাবএ কুমার।
শ্রীযুত কবীন্দ্র কহে কর পরিহার॥"

ইহার পর মধুসূদন সুন্দরকে দিয়া বিদ্যার মানভঞ্জনের চেষ্টা করাইয়াছেন। কিন্তু—

"শুনিয়া না শুনে কথা নৃপতির সুতা।
সুন্দর উপায় ভাবে মনে পায়া ব্যথা॥
শুনিব অশিব কথা ভাবিয়া সুন্দর।
নাসিকায় কাঠি দিয়া হাঁচিল সত্বর॥
শুনিয়া না দিল রামা উত্তর মঙ্গল।
তুলিয়া কর্ণেতে দিল মকর কুণ্ডল॥
কুশলে থাকয়ে যদি নৃপতিকুমার।
তবে সে পরিতে পারি যত অলঙ্কার॥"

দ্বিজ রাধাকান্ত অতিবিস্তারিত ভাবে বিদ্যার মান ও মানভঞ্জন প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। একদিন সুখনিশি যাপন করিবার পর বিদায়কালে সুন্দর পররাত্রিতে উপবনে বিহার করিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন; বিদ্যা হাসিয়া অনুমতি দিলেন। কিন্তু সুন্দর কৌতুক বাড়াইবার জন্য বিদ্যাকে বঞ্চনা করিতে মনস্থ করিলেন। বিদ্যা রাত্রিতে সখীগণ সহ সুড়ঙ্গপথে মালিনীর গৃহে আসিলেন এবং তথা হইতে পুষ্পবনে অভিসারে গেলেন। সখীগণ কুসুমশয্যা রচনা করিল, বিদ্যাকে স্বর্ণ আভরণ ছাড়াইয়া পুষ্প আভরণে সজ্জিত করিল, উৎকণ্ঠায় বাসকসজ্জিতা বিদ্যা রাত্রি যাপন করিলেন, প্রিয়তম আসিল না। এদিকে সুন্দর নিজেই নিজ অঙ্গে রতিচিহ্ন অংকিত করিয়া বিদ্যার নিকট উপাস্থত হইলেন। বিদ্যা দারুন মানে নম্রমুখী হইয়া রহিলেন। অনেক মিনতি করার পর—

"চতুর নাগরবর হাঁচিল প্রকারে।
ধর্ম্মনষ্ট হয় জীব না বলিলে তারে॥
বিদগ্ধা রাজার কন্যা কিছু না কহিয়া।
কর্ণের কনকপত্র পরিল তুলিয়া॥"

তাহাতেও মানিনী বিদ্যার মানভঙ্গ হইল না। সখীগণ অনেক অনুনয় করিল, কিন্তু বিদ্যা টলিলেন না। সুন্দর মালিনীর গৃহে ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর বিদ্যার মনে অনুশোচনা হইল, সুন্দরের জন্য আবার তাঁহার মন ব্যাকুল হইল। ইতিমধ্যে মালিনী ফুল লইয়া উপস্থিত হইয়া বিদ্যার অবস্থা বুঝিয়া চাতুরি করিয়া বলিল, কুমার নিজ দেশে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছেন। তখন বিদ্যা মালিনীকে ধন দিয়া তুষ্ট করিয়া সুন্দরকে আনিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। মালিনী গৃহে আসিলে সুন্দরও মালিনীকে বিদ্যার মানের কথা বলিয়া তাহার মানভঞ্জন করাইয়া তাহার সহিত পুনর্বার মিলন করাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। মালিনী ছল করিয়া তাঁহার নিকট হইতেও অর্থ আদায় করিয়া মিছামিছি পথে ঘুরিয়া আসিয়া জানাইল যে, বিদ্যা সম্মত হইয়াছেন। এদিকে বিদ্যা সখী কমলাকে সংবাদ লইবার জন্য মালিনীর গৃহে পাঠাইলেন। কিন্তু সুন্দর—

"পুনর্ব্বার বিদ্যার চরিত্র জানিবারে।
হাসিয়া নাগরবর ধরে কমলারে॥
মদনবিলাস চিহ্ন করি সর্ব্বগায়।
মধুর বচনে তুষি করিলা বিদায়।"

বিদ্যা সখীর অঙ্গে রতিচিহ্ন দেখিয়া তাহাকে উপহাস করিলে, সে নিজ নিরপরাধত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কবি যাহা বলাইয়াছেন, তাহাতে তাহার নির্দোষত্ব প্রমাণ হয় না, বরং সে যে নায়ক কর্তৃক উপভুক্তা হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ পায়। যাহা হউক, রজনীতে সুন্দর বিদ্যার গৃহে উপস্থিত হইলে কিছুক্ষণ মানের পালা চলিল, শেষে চারি চক্ষে মিলন হইল, মান দূর হইল।

দ্বিজ রাধাকান্ত প্রসঙ্গটি অতিরিক্ত বিস্তারিত করিতে গিয়া কবিত্ব ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। অনুকরণের ত্রুটি ঢাকতে গিয়া নূতনত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

এইবার আমরা মানভঞ্জন প্রসঙ্গটি কবিগণ কিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া পরিশেষে সমস্ত প্রসঙ্গটির ভারতচন্দ্র কি রূপ দিয়াছেন, তাহা দেখাইব। কৃষ্ণরাম বলিতেছেন, বিদ্যা সুন্দরের কথা বলাইবার কৌশল ব্যর্থ করিয়া দিলে সুন্দর তাঁহার বিদগ্ধতা দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন এবং—

"সুন্দর সুন্দর বর মন্দ মন্দ মনোহর ভাঙ্গিল বিরোধ ক্রোধ রতিপতি উপরোধ
হাসিয়া রসিকবর ভূপ। আর কতক্ষণ সয় ভর।
বসিয়া বিদ্যার পাশ বদনের হরে বাস নয়ানে নয়ন মিলে চিত্র বদলিয়া নিলা (?)
তুষিয়া ভাষায় অপরূপ॥ দম্পতি কম্পিত কলেবর॥"

রামপ্রসাদ লিখিতেছেন, বিদ্যা সুন্দরের কথা কহাইবার কৌশল ব্যর্থ করিলে—

"অপ্রভিত যুবরাজ অধোমুখে রহে। হের হিমকর প্রিয়ে বদন তুলা॥
মৃদু মৃদু হাসি পুনরপি কিছু কহে॥ ক্রোধে প্রিয়তমে তব তবে কিবা কাজ।
রোদন করহ প্রিয়ে না করি নিষেধ। আহারে ও ব্যবহারে কার আছে লাজ॥
আমার হৃদয়ে সবে এইমাত্র খেদ॥ ফিরা দেহ মদাপত চুম্ব আলিঙ্গন।*
গলিত সাঞ্জন ধারা তাহে ম্লান মুখ। আর কেন জানা গেল চরিত্র যেমন॥
চিরদুঃখ গেল চিত্তে চান্দের কৌতুক॥ কবিবর বিনোদ বৈদগ্ধ্যগুণে ভাষে।
সহজে কলঙ্কী সে তবাস্য সম নহে। ফুরাইল মান ফিরে ফিক্‌ফিক্‌ হাসে॥
লজ্জা ভয় দুই হেতু দিবা গুপ্তে রহে॥ আবেশে অধিক আরো আঁট্যা ধরে গলা।
কদাচ না কহি কান্তে মিথ্যা বাক্যগুলা। আলিগণ বলে মা গো এত জান ছলা॥"

মধুসূদনের বিদ্যা মানান্তে অনুতপ্তা হইয়াছিলেন এবং উভয়ের নয়নে নয়নে মিলন হইলে মানভঞ্জন হইল। দ্বিজ রাধাকান্ত সম্ভবতঃ এক্ষেত্রে মধুসূদনের নিকট ঋণী।

---

* কোপস্ত্বয়া হৃদি কৃতো যদি পঙ্কজাক্ষি
সোঽস্তু প্রিয়স্তব কিমত্র বিধেয়মন্যৎ।
আশ্লেষমর্পয় মদর্পিত পূর্বমুচ্চৈ-
র্মদ্দত্তং মম সমর্পয় চুম্বনং চ॥

ভারতচন্দ্রের মানভঞ্জন প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার ও অপূর্ব কাব্য। একদিন দিবাভাগেই সুন্দর বিদ্যারগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, বিদ্যা গভীর নিদ্রামগ্না, সখীগণও গৃহের বাহিরে নিদ্রিতা। বিদ্যাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া সুন্দর কামাকুল হইয়া উঠিলেন ও দিবসে রতি উপভোগ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বিদ্যার নিদ্রাভঙ্গ না করিয়াই তিনি তাঁহার সহিত উপগত হইলেন। রতি সাঙ্গ হইলে বিদ্যা অন্ধকার গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সুন্দর দিবসেই নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার সহিত উপগত হইয়াছেন।

"অতিবিতি ঘরে যায়　　সুন্দরে দেখিতে পায়
　　অভিমানে উপজিল মান।
দিবসে নিদ্রার ঘোরে　　আলুথালু পেয়ে মোরে
　　এ কর্ম্ম কেবল অপমান॥
ঘৃণা লজ্জা দয়া ধর্ম্ম　　নাহি বুঝে মর্ম্ম কর্ম্ম
　　নিদারুণ পুরুষের মন।
এত ভাবি মনোদুখে　　মৌন হয়ে হেঁট মুখে
　　ত্যজে হার কুণ্ডল কঙ্কণ॥"

এখানে ভারতচন্দ্র বিদ্যার আভিজাত্যের অপূর্ব নিদর্শন দিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা রামপ্রসাদ বা অন্যান্য কবির বিদ্যা অপেক্ষা অনেক বড় হইয়া গিয়াছেন। তাহার পর কবি যে ভাবে মানভঙ্গ প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভাব ও ভাষায় অনবদ্য।

"সুন্দর বুঝিল মর্ম্ম　　ঘাটি হইল এই কর্ম্ম
　　কেন কৈনু হইয়া পাগল।
করিনু সুখের লাগি　　হইনু দুঃখের ভাগী
　　অমৃতে উঠিল হলাহল॥
কি করি ভাবেন কবি　　অস্তগিরি গেল রবি
　　রাত্রি হৈল চন্দ্রের উদয়।
করিবারে মানভঙ্গ　　কবি করে কত রঙ্গ
　　ক্রোধে উপরোধ কোথা রয়॥
ছল করি কহে কবি　　হের যে উদিত রবি
　　বিফলে রজনী গেল রামা।
তোর ক্রোধানল লয়ে　　চন্দ্র আইল সূর্য্য হয়ে
　　হের দেখ পোড়াইছে আমা॥
কেবল বিষের ডালি　　কোকিল পাড়িছে গালি
　　ভ্রমর হুঙ্কার দিছে তায়।
সেই কথা দূত হয়ে　　ঘরে ঘরে ফেরে কয়ে
　　মন্দ মন্দ মলয়ের বায়॥
ফুল হাসে মোর দুখে　　সুগন্ধ প্রফুল্ল মুখে
　　সব শত্রু লাগিল বিবাদে।
ভরসা তোমার সবে　　তুমি না রাখিলে তবে
　　কে রাখিবে এমন প্রমাদে॥
অপরাধ করিয়াছি　　হুজুরে হাজির আছি
　　ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।
বুকে চাপ কুচগিরি　　নখাঘাতে চিরি চিরি
　　দশনে করহ খণ্ড খণ্ড॥
আঁটিয়া কুন্তল ধর　　নিতম্ব প্রহার কর
　　আর আর যেবা মনে লয়।
কেন রৈলে মৌনী হয়ে　　গালি দেহ কটু কয়ে
　　ক্রোধ কৈলে গালি দিতে হয়॥
এরূপে সুন্দর যত　　চাতুরি কহেন কত
　　বিদ্যা বলে ঠেকেছেন দায়।
জানেন বিস্তর ঠাট　　দেখাইব তার নাট
　　কথা কব ধরাইয়া পায়॥
ভাবে কবি মহাশয়　　লঘু মধ্য মান নয়
　　সে হইলে ভাঙ্গিত কথায়।
গুরু মান বুঝি ভাবে　　চরণে ধরিলে যাবে
　　দেখি আগে কতদূর যায়॥
চতুর কুমার ভাবে　　জীব বাক্যে মান যাবে
　　হাঁচিলেন নাকে কাঠি দিয়া।
চতুরা কুমারী ভাবে　　জীব কৈলে মান যাবে
　　জীব কব কথা না কহিয়া॥

জীব বুঝাবার তরে আপন আয়তি ধরে দেখি ক্রিয়া বিদগ্ধায় বাখানে সুন্দর রায়
তুলি পরে কনককুণ্ডল। পায়ে ধরি ভাঙ্গিল কন্দল॥"

ইহার পর ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের কেলিকৌতুকের আর একটি বর্ণনা করিয়াছেন—"সারীশুক বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ"। এই প্রসঙ্গে আছে, সুন্দর সুড়ঙ্গপথে বিদ্যাকে মালিনীর গৃহে লইয়া গেলেন। সেখানে সুন্দরের পড়া শুককে দেখিয়া বিদ্যা গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আপনার সারীকে লইয়া গেলেন। সারীশুকে বিবাহ দিয়া দুজনে কৌতুকভরে পরস্পরকে 'বেহাই-বেহানী' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। উভয়ে রতি-রসে মত্ত হইলে বন্ধদ্বার গৃহে—

সাড়া পেয়ে হীরা বলে কি শুনিতে পাই। কপাটেতে খিল আঁটা দেখিতে কে পায়।
সুন্দর বলেন শুকে দাড়িম খাযাই। ডেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভৃঙ্গ মধু খায়॥

তাহার পর একদিনের ঘটনা। বিদ্যার মনে দিবাসম্ভোগের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। একদিন সুযোগ ঘটিয়া গেল।

"দিবসে সুন্দর ছিলা বাসায় নিদ্রায়। ধীরে ধীরে তার মুখে করিল চুম্বন॥
সুড়ঙ্গের পথে বিদ্যা আইলা তথায়॥ সিন্দুর চন্দন সতী পতিভালে দিয়া।
নিদ্রায় অবশ দেখি রাজার নন্দন। দ্রুত গেল চিহ্ন রাখি নয়ন চুম্বিয়া॥

নারীর স্পর্শ পাইয়া সুন্দর জাগিয়া উঠিলেন মদনাকুল হইয়া বিদ্যার গৃহে গিয়া দেখিলেন বিদ্যা খাটে বসিয়া দর্পণে মুখ দেখিতেছেন।

"সুন্দরে দেখিয়া বিদ্যা হাসি দেই লাজ। দর্পণে দেখহ প্রভু সত্য হয় নয়।
এস এস প্রাণনাথ একি দেখি সাজ॥ দর্পণে দেখিয়া কবি হইলা বিস্ময়॥
কে দিয়াছে কপালেতে সিন্দুর চন্দন। বিদ্যা বলে প্রাণনাথ বুঝিনু আভাস।
নয়নে পানের পিক দিল কোন্ জন॥ মালিনীর বাড়ী বুঝি দিনে হয় রাস॥"

এইরূপে বিদ্যা মনের ঝাল মিটাইয়া সুন্দরকে নানারূপ ভর্ৎসনা করিলেন। সুন্দর তাহার চমৎকার উত্তর দিলেন।—

"সুন্দর কহেন রামা কত ভর্ৎস আর। লাভে হৈতে হৈলা দেখি কলহান্তরিতা॥
তোমা বিনা জানি যদি শপথ তোমার॥ ভাবি দেখ বাসসজ্জা নিত্য নিত্য হও।
তোমারি সিন্দুর এই তোমারি চন্দন। উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা এক দিনো নও॥
তোমারি পানের পিকে রেঙ্গেছে নয়ন॥ কখন না হইল করিতে অভিসার।
এমনি তোমার দাগে দেগেছি কপাল। স্বাধীনভর্তৃকা কেবা সমান তোমার॥
ধুইলে না যাবে ধোয়া জীব যতকাল॥ প্রোষিতভর্তৃকা হৈতে বুঝি সাধ যায়।
এমনি তোমার পানে রেঙ্গেছি নয়নে। নহে কেন মিছা দোষ দেখাহ আমায়॥
তোমা বিনা নাহি দেখি জাগ্রত স্বপনে॥ তোমা ছাড়ি যাব যদি অন্যের নিকটে।
আপন চিহ্নিতে কেন হইলা খণ্ডিতা। তবে কেন তোমা লাগি আইনু সঙ্কটে॥"

সুন্দরের কথায় বিদ্যা সন্তুষ্ট হইলেন, উভয়ে মিলন হইল। ভারতচন্দ্র ইহার পর বিদ্যার ঋতুর কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

"বিদ্যার হইল ঋতু সখীরা জানিল। খুদমাগা কাদা থেঁড়ু নারিনু রচিতে।
বিয়া মত পুনর্বিয়া সুন্দর করিল ॥ পুথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে ॥"

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ, উভয়েই বিদ্যার ঋতু ও পুনর্বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন, "কতকাল গৌণে বিদ্যা নবকুসুমিতা।" ইহা হইতে মনে হয়, তিন জন কবিই বিদ্যার এই ঋতুকে প্রথম রজোদর্শন বলিতে চাহিয়াছেন। তাহার কারণ, রজোদর্শনের পূর্বেই কন্যার বিবাহ দিবার প্রথা পূর্বে প্রচলিত ছিল। কিন্তু যে ভাবে বিদ্যা ও সুন্দরের মিলন বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে বিদ্যাকে রীতিমত যুবতী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যার প্রথম রজোদর্শনের কথা একেবারে হাস্যাস্পদ ব্যাপার। তবে বিবাহের পরে প্রথম রজোদর্শনে যে পুনর্বিবাহের পদ্ধতি প্রচলিত আছে, ভারতচন্দ্র ও কৃষ্ণরাম সম্ভবতঃ তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন; রামপ্রসাদ 'নব কুসুমিতা' শব্দটি দ্বারা অসম্ভবত্বের সূচনা করিয়াছেন।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

নারায়ণং নমস্কৃত্য [ইত্যাদি শ্লোক]॥
অথ কলঙ্কভঞ্জন পালা লিখ্যতে।
এই কথা জেবা নর করয়ে শ্রবণ।
তাহার কলঙ্ক কৃষ্ণ করেন ভঞ্জন॥
বৃকভানুসুতা রাই বিরল মন্দিরে।
কেহো পাছে জানে বল্যা কান্দে ধীরে২॥
কান্দিতে২ বলে জা করিলে শ্যাম।
তোমার লাগিয়া হইল কলঙ্কিনী নাম॥
কলঙ্কিনী নাম হবে তারে নাই ভয়।
হেন অপযশ জেন যুগে২ রয়॥

ভণিতা—

কবিচন্দ্র বলে রাধার আর কেহো নাঞি।
রাধাকে তরাতে কেবল ঠাকুর কানাঞি॥

৯ম পত্রের শেষ,—

কলঙ্কিনী বলিয়া সভাই দিতো গালি।
তা সভার মাথে দিলাম কলঙ্কের ডালি॥
আমি হইলাম [বৈদ্য] নারিলে চিনিতে।
সহস্র ধারা করিলাম কলঙ্ক ঘুচাইতে॥
এখন নিশ্চিন্তে…থাক ঘরে।
বিরলে আসিব আমি তোমার মন্দিরে॥
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম করিয়া ভাবন।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গান

৪৫৯। প্রহ্লাদচরিত্র।

রচয়িতা—দ্বিজ শঙ্কর কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৩, অসম্পূর্ণ। শেষ পত্রের কতক অংশ নাই। দোভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩×৪॥০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।

অথো প্রসাদচরিত্র লিখ্যতে॥
মন দিয়া প্রসাদচরিত্র শুন সর্ব্বে।
ব্রহ্মার বরেতে জিনে দৈত্য দেবতা গন্ধর্ব্বে॥
শুনিঞা ভেদের কথা মহারাজা কোপে।
ত্রাসে চমকিত দেব তিন পুর কাঁপে॥
ভয়ে কাঁপে সুরাসুর জত দেবগণ।
ক্ষীরোদে কৃষ্ণের ঠাঞি লইল শরণ॥
হইল আকাশবাণী না ভাবিহ ক্লেশ।
যজ্ঞ দান কৃষ্ণে বিপ্র করিব উদ্দেশ॥
জবে দুঃখ দিব মোর ভক্ত প্রসাদেরে।
তবে গিয়া তার পরে বধিব তাহারে॥

ভনিতা—

১। শ্রীকবি শঙ্কর গান ব্যাসের আদেশে।
স্বপ্নে কৃপা কৈল প্রভু ব্রাহ্মণের বেশে॥
২। দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয় প্রসাদ মরিবার নয়
বৈষ্ণবের কি করে আগুনে॥

৪৬০। গুরুদক্ষিণা।

রচয়িতা—শঙ্কর। পত্র ১-১৫, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্ক্তি, শেষ পৃষ্ঠায় ৪ ও অন্য এক পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্ক্তি লেখা। পরিমাণ ১১×৫ ইঞ্চি।

লিপিকাল ১২৭২ সাল। পুথির মধ্যে কিছু কিছু সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

শ্রীশ্রীরাধামাধব॥
অথ গুরুদক্ষিণা লিখ্যতে॥

কংসধ্বংস করি কৃষ্ণ মথুরা নগরে।
ভক্তগণ লয়া কৃষ্ণ মথুরা নগরে॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র ভাবিয়া অন্তরে।
বিদ্যা অনুশীলন ধর্ম্ম জানাতে সংসারে॥
অবন্তী নগরে জাব পঠন কারণ।
গুরুপুত্র ছলে শঙ্খা করিব নিধন॥
বরুণে দর্শন দিব নব সংখ্যা বর।
পাপী উদ্ধারিব যমজাতার ভিতর॥
এত বিচারিয়া মনে দৈবকীনন্দন।
রতন পালঙ্ক মধ্যে করিল শয়ন॥

কৃষ্ণ ও বলরাম গুরুগৃহে গিয়া নিম্নোক্ত বিদ্যাসকল শিক্ষা করেন,—

অক্ষর পড়িয়া কৃষ্ণ পড়িলা অভিধান।
সর্ব্বশাস্ত্র পড়ি দোহে হৈলা বুদ্ধিমান॥
কথো গ্রন্থ পড়ি হরি সকল জানিল।
চারি বেদ পড়ি দোহে জ্ঞান উপজিল॥
চৌষট্টি দিবসে চৌষট্টি বিদ্যা শিখিল।
বিদ্যাশিক্ষা দেখি গুরু ত্রাস উপজিল॥
কাব্য অলঙ্কার পড়ে নাটক নাটিকা।
পুরাণ ভারত পড়ে আউটিয়া টীকা॥
নানা রসকলা হরি শিখিলা নৃত্য গীত।
বহু বিদ্যা শিখিলেন শৃগালচরিত॥
শৃগালচরিত্র আর কাকচরিত্র পড়ি।
ফারসি নাগরি উড়্যা শিখিলা গারুড়ি॥
ক্ষেত্রিবিদ্যা শিখিলেন ছত্তিঁশ আতর।
পৃথিবীর জত বিদ্যা নহে অগোচর॥

ভনিতা—

কৃষ্ণের চরিত্র এই জ্ঞানের প্রকাশ।
শঙ্কর রচিল জার কুলচণ্ডায় বাস॥

শেষ—

গুরুদক্ষিণা পড়ে জে বা না দেয় দক্ষিণা।
তার ফলাফল বলি শুন সর্ব্বজনা॥
জতেক সাধিল বিদ্যা বৃথা তার প্রায়।
পরিণামে সেই নর অধোগতি জায়॥
নানা দুঃখ হয় কষ্ট পায় বহুতর।
এ পুথি দক্ষিণা দিবে জথাশক্তি জার॥
কহেন শঙ্কর এই বড়ই বিষম।
গুরুদক্ষিণা জে বা না দেয় সে বড় অধম॥

ইতি গুরুদক্ষিনা সমাপ্ত॥ সন ১২৭২ সাল তাঃ ৭ ফাল্গুন॥ বেলা এক পহরের সময়ে সমাপ্ত হৈল॥

৪৬১। **অঙ্গদরায়বার।**

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ২-১১, অসম্পূর্ণ। দুভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। ৮ম পত্রের ২য় পৃষ্ঠার অর্দ্ধাংশ নাই এবং প্রত্যেক পত্রের খানিকটা অংশ নষ্ট হইয়াছে। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৮ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০২ সাল।

২য় পত্রের আরম্ভ—

জানকীনাথের মর্ম্ম জানে হনুমন্ত।
জেন সর্পমধ্যে দর্প করি উঠিলা অনন্ত॥
বোলে কোন্ কার্য্য মহাশয় ভাবিয়াছ মনে।
আমি জাইয়া গালি দিয়া আসিব রাবণে॥
হনুমানের কথা শুনি জাম্ববানে কয়।
গোসাই হনুমান্‌কে জাইতে···উচিত নয়॥

শেষ অংশ—

আনন্দের অবধি নাহি প্রভু রঘুনাথ।
অঙ্গদের অঙ্গেত দিলেন পদ্মহাত॥
শ্রীরাম বলেন শুন বালির কুমার।
সংসারে এ সব কীর্ত্তি রহিল তোমার॥

ইচ্ছুক হইয়া এহা শুনে জেহি জন।
সেহি ত আমার প্রিয় লক্ষ্মণ যেমন॥
ভক্তিভাবে জেহি জন শুনে বার বার।
শক্রভয় যমভয় নাহিক তাহার॥
রসিক জনের মনে শুনিতে আনন্দ।
রায়বার রচনা করিল কবিচন্দ॥

ইতি অঙ্গদরায়বার সমস্তর্মাত ইতি সন ১২০২ সন তিরিখ মাহে ২ ফাগুন ই পুস্তক শ্রীরাধাকৃষ্ণ দপ্তরি শ্রীরামচ···

৪৬২। প্রসাদচরিত্র।

রচয়িতা—দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৬, ৮-১৩, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। ১ হইতে ৩ পত্রের কতক অংশ নাই। পরিমাণ ১৩।০×৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪০ সাল।

আরম্ভ—

৺৭ শ্রীশ্রীরামঃ।
প্রসাদচরিত্র লিখ্যতে॥
শুকদেব বলেন শুন রাজা পরিক্ষিত।
মন দিয়া শুন রাজা গোবিন্দ [চরিত]॥
·········মন দিয়া শুন সর্ব্বে।
ব্রহ্মার বরে দেব গন্ধর্ব্ব জিনে পূর্ব্বে॥
শুনিয়া ভায়ের মরণ মহারাজা কোপে।
ত্রাসে চম·········লোক কাঁপে॥
ভয়ে কাঁপে উপদ্রুত জত দেবগণ।
ক্ষীরোদে কৃষ্ণের গিয়া লইল শরণ॥
হইল আকাশবাণী না করিহ ত্রাস।
···বিপ্র জবে করিল উদেশ॥
জবে দুখ দিব মোর ভক্ত প্রসাদেরে।
তবে জাঞা বধিব তাহারে॥

ভনিতা—

শ্লোকার্থ সঙ্গীত গাথা ব্যাসের বর্ণন গাথা
কবিচন্দ্র বক্রবর্ত্তী ভাষে॥

শেষ—

শ্রীকৃষ্ণ বলেন বাছা অসুরকুমার।
ভুবনে রহিল কীর্ত্তি এ সব তোমার॥
শ্রদ্ধা করিয়া ইহা শুনে জেই জন।
সেই মোর প্রিয় বটে তোমার সমান॥
··· ··· ···
প্রসাদচরিত্র আপনে রচিল কবিচন্দ্র॥

ইতি সন ১২৪০ সাল তারিখ ৩ স্রাবন বুধবার রোজ তিথি প্রীতিপদ। দিবা গতায়াং পুস্তকং লিখিতং শ্রীপিতাম্বর দাস বাবাজী সা° ছান্দার। পাটক শ্রী [অস্পষ্ট]।

৪৬৩। বৈষ্ণববন্দনা।

রচয়িতা—দৈবকীনন্দন। পত্র ১, ৩-৭, অসম্পূর্ণ। দুভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। মধ্যদেশে ছিদ্র। প্রাচীনত্ববশতঃ ভাঁজ বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্ পত্র হইয়াছে। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩×৩ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১০৯ সাল। পুথির সর্ব্বত্র জএর আকৃতি পুরাতন।

পুথির প্রথম হইতে ৩য় পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় ৮ম পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত 'দৈবকীনন্দন কবিরাজ-বিরচিত বৈষ্ণবাভিধান' আছে। ইহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও অশুদ্ধিপূর্ণ। তাহার পরে বৈষ্ণববন্দনার আরম্ভ এই—

আহির রাগ॥
প্রান গোরাচান্দ মোর ধন গোরাচান্দ।
মিনতি করিঞা তৃন ধরিঞা দশনে।
নিবেদন করো এহি বৈষ্ণবচরনে॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নিত্যানন্দ অবতারে।
যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে॥
বৈষ্ণব জানিতে নাহি দেবের সকতি।
মোই কোন হও নিচ সিস্থ অল্পমতি॥
জিহ্বার আরতি অতি মনের বাসনা।
তেঞি সে করিতে চাহো বৈষ্ণববন্দনা॥
যে কিছু কহিব গুরু বৈষ্ণব প্রসাদ।
ক্রমভঙ্গে মোর কেহো না লবে অপরাধ॥

শেষ—

বৈষ্ণববন্দনা পঢ়ে স্থনে জেই জন।
অন্তরমলিন ঘুছে শুদ্ধ হয় মন॥
প্রভাতে উঠিআ স্থনে বৈষ্ণববন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনই জাতনা॥
দেবের দুল্লভ প্রেম ভক্তি সেহি লভে।
দৈবকিনন্দন কহে এহি সব লোভে॥
... ...
বৈষ্ণব হয়েন যদি জাতে জবন।
বন্দনা করিএ তবে বৈষ্ণবচরন॥

ইতি বৈষ্ণববন্দনা সমাপ্ত॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। শ্রীগুরবে নমঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ গতি॥ শকাব্দা ১৬২৪ সন ১১০৯ সাল ৩ মাঘ রোং শুক্রবার লিখিতং শ্রীমণীরাম দেবশমন পুস্তকমিদং সাকিম চলিশাপাড়া প্রগনে ব্রকুনপুর সরকার জ...জ॥ শ্রীহরিহর সাধু।

৪৬৪। বৈষ্ণববন্দনা।

রচয়িতা—দেবকীনন্দন। পত্রসংখ্যা ১-১০, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। শেষ পৃষ্ঠার ৪ পঙ্‌ক্তি অতীব আধুনিক হস্তাক্ষর। পরিমাণ ৮×৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ও লেখকের নাম ধাম প্রভৃতি কিছুই নাই।

আরম্ভ—

শ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত [ইত্যাদি শ্লোক]
আহির রাগ॥

প্রাণ গোরাচান্দ মোর ধন গোরাচান্দ।
শচীর দুলাল গোরা অখিলের প্রাণ॥
মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করি গুরু বৈষ্ণব চরণে॥

শেষ—

বৈষ্ণবের বন্দন পড়ে শুনে যেই জন।
অন্তর মালিন্যত্ব ঘুচে শুদ্ধ হয় মন॥
দেবের দুর্ল্ভ সেই প্রেমভক্তি লভে।
দেবকীনন্দন কয় এই সব লোভে॥
সমাপ্ত গ্রন্থ॥

৪৬৫। বৈষ্ণববন্দনা।

রচয়িতা—দৈবকীনন্দন। পত্র ১-৫, ৮-৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। লিপি সুন্দর ও শুদ্ধ। পরিমাণ ১০×৩৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। শেষ অংশ—

বৈষ্ণববন্দনা পঢ়ে শুনে যেই জন।
অন্তরে মলিন ঘুচে শুদ্ধ হয় মন॥
প্রাতঃকালে উঠি পঢ়ে বৈষ্ণববন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনই যন্ত্রণা॥
দেবের দুর্ল্ভ প্রেমভক্তি সেই লভে।
দৈবকীনন্দন কহে এই সব লোভে॥

ইতি বৈষ্ণববন্দনং সংপূর্ণ॥ বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ [ইত্যাদি শ্লোক]॥

৪৬৬। বৈষ্ণববন্দনা।

রচয়িতা—দৈবকীনন্দন। পত্রসংখ্যা ২-৫, অসম্পূর্ণ। দুভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩।০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপি-কাল প্রভৃতি নাই। নরোত্তম দাস-রচিত 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র প্রথম পত্র এতৎ সহ রক্ষিত আছে।

শেষ—

বৈষ্ণববন্দনা পড়ে শুনে জেই জন।
অন্তরের মলিন ঘুচে শুদ্ধ হয় মন॥
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে শুনে বৈষ্ণববন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনই যন্ত্রণা॥
দেবের দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি এই লভে।
দৈবকীনন্দনে কহে এই সব লোভে॥
ইতি বৈষ্ণববন্দনা সংপুন্ন॥

৪৬৭। বৈষ্ণববন্দনা।

রচয়িতা—দৈবকীনন্দন। পত্রসংখ্যা ১-৫, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। ১ম ও শেষ পত্র একভাঁজ ও অপর তিনখানি পত্র দুভাঁজ করা। প্রত্যেক পত্রের খানিকটা করিয়া অংশ নাই। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৬ × ৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

শেষ অংশ—

বৈষ্ণব বন্দনা পড়ে শুনে জেই জন।
অন্তরমলিন ঘুচে শুদ্ধ হয় মন॥
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণববন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় যমের যন্ত্রণা॥
দেবের দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি সেই লভে।
দৈবকীনন্দন কহে এই সব লোভে॥

ইতি বৈষ্ণববন্দনা সম্পূর্ণং ইতি শ্রীভরথচন্দ্র দাস বৈষ্ণববন্দনা লিখি···প্ত বেলা দুই প্রহরের···।

৪৬৮। বৈষ্ণববন্দনা।

রচয়িতা—দৈবকীনন্দন। পত্রসংখ্যা ১-৮, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ৯৸০ × ৩।০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

আরম্ভ—

৺৭শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
ধন গোরাচাঁদ মোর প্রাণ গোরাচাঁদ।
বান্ধিলে জীবের মন দিয়া প্রেমফাঁদ॥
মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে।
নিবেদন করি কিছু বৈষ্ণবচরণে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে।
জতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে॥
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন জন হঙ নীচ অল্পমতি॥

৪৬৯। বৈষ্ণববন্দনা।

রচয়িতা—দৈবকীনন্দন। পত্রসংখ্যা ১-৬, সম্পূর্ণ। ১ম হইতে ৩য় পত্র জলছাপযুক্ত ইংরেজী কাগজ এবং শেষের ৩ পত্র বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১০॥০ × ৪ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। শেষ—

বৈষ্ণববন্দনা পড়ে শুনে জেই জন।
অন্তরে মলিন ঘুচে শুদ্ধ হয় মন॥

প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণববন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনও যন্ত্রণা॥
দেবের দুর্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে।
দৈবকীনন্দন ভনে এই সব লোভে॥
ইতি বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থ সমাপ্ত॥

৪৭০। বৈষ্ণববন্দনা।

রচয়িতা—দৈবকীনন্দন। পত্রসংখ্যা ১-৫, অসম্পূর্ণ। দুভাঁজ করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৫ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩×৩৷৹ ইঞ্চি। শেষ অংশ অসম্পূর্ণ। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

১ম পত্রের ২য় এবং ২য় পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার লেখা ভাল। ইহাতে চএর আকৃতি একটু পুরাতন ধরনের। তাহার পর হইতে বালকোচিত আঁকাবাঁকা লেখা। পঞ্চম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার পর তাহাও আর অগ্রসর হয় নাই। সুতরাং উদ্ধৃতি অনাবশ্যক।

৪৭১। বৈষ্ণববন্দনা।

রচয়িতা—দৈবকীনন্দন। পত্রসংখ্যা ১-৯, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১২৷৹×৪৷৷৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৫ সাল।

শেষ—

প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণববন্দনা।
কোনো কালে নাই পায় কোনই যন্ত্রণা॥
দেবের দুর্লভ ধন ভক্তি করি লভে।
দৈবকীনন্দনে কহে এই সব লোভে॥

ইতি বষ্টববন্দনা সমাপ্ত॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]॥ ইতি সন ১২৩৫ বার সএ পত্রিস সাং তাং ২৫ মাঘ॥ লিখিতং শ্রীকাত্রিক দেবসম্মা সাঃ কাটাবুনি পঠনাথ জজ্ঞেসর মুস্তধর সাঃ আোল-পুর ই পুথি জে চুরি করে তার……॥

৪৭২। স্বরূপবর্ণন।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস। পত্রসংখ্যা ১, ৩-৭, অসম্পূর্ণ। দুভাঁজ করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৮ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১২৷৷৹×৪৷৷৹ ইঞ্চি। মধ্য ও শেষ অংশ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ॥

জয়২ গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
অদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত বৃন্দ॥
জয়২ শ্রোতাগণ শুন হইয়া একমন।
গৌরচন্দ্র অবতার হইল যে কারণ॥

ভনিতা—

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জার আশ।
স্বরূপবর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥

৭ম পত্র—

পূর্ব্বে গর্গ মুনি বলি জার ছিল খ্যাতি।
সেই জন পুন্ন বস্ত্র কেশব ভারতী॥
পূর্ণমাসী বলি জারে শাস্ত্রেতে কহএ।
সেই সে মাধব পুরী জানিহ নিশ্চয়॥
বৃন্দা দেবী বলি পূর্ব্বে নাম আছিল জার।
সেই সে ঈশ্বর পুরী করিল নির্দ্ধার॥

এই পুথির মধ্যে 'বৈষ্ণববন্দনা'র ৮ সংখ্যক একখানি শেষ পত্র আছে। তাহার লিপি-

কাল '১১৬৩ সাল মাহ জৈষ্ট ৪ রোজ বুধবার'। এবং 'রাধারসকারিকা'র ২সংখ্যক একখানি পত্রও আছে।

৪৭৩। বৈষ্ণবমাহাত্ম্য।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস। পত্রসংখ্যা ১-১৮, সম্পূর্ণ। ইংরাজী জলছাপযুক্ত মোটা কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি, কোন কোন পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১১৸০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৭ সাল।

আরম্ভ—

৺৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য [ইত্যাদি শ্লোক]।
প্রথমে বন্দিব গুরুচরণারবিন্দ।
নিরবধি ঝরে যাহে কৃপামকরন্দ॥
অজ্ঞানতিমির নাশে জার বাক্যামৃতে।
বিষম সংসারবন্ধ খণ্ডে জাহাঁ হৈতে॥
তবে ত বন্দিব কৃষ্ণচরণকমল।
কোটি চন্দ্র জিনি দিব্য কান্তি নিরমল॥

মধ্য—

বৈষ্ণবের অবশেষ ভুঞ্জে জেই জন।
মহাবৈকুণ্ঠে তার হয়েত গমন॥
বৈষ্ণব অধরামৃত জে বা করে পান।
সেই জন কৃষ্ণভক্ত মহাভাগ্যবান্॥
জন্মজন্মান্তরে সেই কৃষ্ণের ভকত।
বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট পানে জেই অনুরক্ত॥

শেষ—

যমের যন্ত্রণা ভয় সব এড়াইবে।
শ্রীকৃষ্ণভজন কর সব দূরে জাবে॥
বিষয় বিষম ফণী দংশে নিরন্তর।
ইহাতে থাকিয়া কেনে মজাহ সকল॥
সত্য২ সত্য এই শাস্ত্রের প্রমাণ।
বৃন্দাবনদাস ব্যাখ্যা কর অবধান॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদে ধরি আশ।
বৈষ্ণবমাহাত্ম্য কহে বৃন্দাবন দাস॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবমাহাত্ম্য সম্পূর্ণ॥ লিখীতং শ্রীমদনমোহন দাষ দেবস্য॥ সন ১২০৭ সাল॥ তারিখ ২ আশ্বীন মঙ্গল বার সমাপ্ত হইল ইতি জিলা বিরভূম পরগনে খটঙ্গা মোকাম সিহুড়ি।

৪৭৪। চৈতন্যচৌত্রিশা।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস। পত্র ১-৩, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ৮।০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত চৌত্রিশ অক্ষরে চৈতন্যদেবের রূপ ও গুণের বর্ণনা করা হইয়াছে।

আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥
কলিযুগে মহাপ্রভু করি অবতার।
করিলেন কত শত পাতকী উদ্ধার॥
কেবল বঞ্চিত হৈঞা রৈলু পাপী মুঞি।
কি করিব আমার উপায় কিছু নাই॥
খোল করতাল লৈঞা কীর্ত্তনবিলাস।
খলবুদ্ধি সভাকার হইল বিনাশ॥
খেমি অপরাধ দয়া কৈলা সভাকারে।
খিতিতলে মো পাপীর নহিল উদ্ধারে॥

শেষ—

হইলেন গৌরচন্দ্র ষড়ভুজ মুরুতি।
হইয়া প্রবোধিলেন প্রভু শ্রীবাসের প্রীতি॥

হরিধ্বনি শুনি সভে হয় প্রেমাবেশে।
হিয়া পাষাণ মোর কিঞ্চিৎ না পরশে ॥৩৩॥
ক্ষিতিমাঝে করিলা প্রভু সুখবিলাস।
ক্ষেণ মাত্র নাহি তার অন্যত্র প্রকাশ ॥
ক্ষমার সাগর গৌর পিরিতিসদন।
ক্ষোভিত হইঞা মাগে দাস বৃন্দাবন ॥৩৪॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচৌতিসা সংপুর্ন্ন ॥

৪৭৫। সংক্ষেপ বৈষ্ণববন্দনা।

রচয়িতা—যদুনন্দন দাস। পত্রসংখ্যা ১, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। ১ম পৃষ্ঠায় ১১ এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৪ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ৯৸০ × ৪৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১৩ সাল।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকান্তজা নিস্তারকর্ত্তা ॥
বন্দ গুরুপদ অমুল সম্পদ
জে দেই বিপদ বিনাশি।
জাহার কৃপাতে মিলএ সাক্ষাতে
প্রেমচিন্তামণিরাশি ॥
... ...
গৌরপদতল সুথল কমল
বন্দন করিয়া আমি।
জার নাম নিতে পতিত দুর্গতে
নয়নে গলএ পানি ॥

শেষ—

জতেক বৈষ্ণব কতেক বন্দিব
সভার চরণধুলি।
শিরেতে ধরিয়া বন্দনা করিয়া
গোবিন্দবিলাস বলি ॥
নাহি লএ দোষ সদাই সন্তোষ
ঠাকুর বৈষ্টব মোর।
এ জদুনন্দন দাস এই গুণ
শুনিয়া ভৈ গেল ভোর ॥

ইতি সংক্ষেপবৈষ্টববন্দনা সমাপ্ত লিখিতং শ্রীজশোদাদুলাল বসু সন ১২১৩ সাল তা° ॥ তারিখ ১৮ পৌষ।

৪৭৬। বৃন্দাবনধ্যান।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস। পত্র ১-৪, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ এবং শেষ পৃষ্ঠায় ১৯ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ৮৷০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥
শ্রীবৃন্দাবন জয় [ইত্যাদি সংস্কৃত অংশের পর]
বায়ব্য হইতে যমুনা আইলা বৃন্দাবনে।
শ্রীবৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করি মথুরা প্রদক্ষিণে ॥
গোকুল প্রদক্ষিণ করি গেলা পূর্ব্বমুখে।
প্রয়াগে গঙ্গার সনে গেলা বহু সুখে ॥
শ্রীবৃন্দাবনের বায়ব্য কোণে ভদ্রবন।
অষ্ট ক্রোশ যমুনা পার বিচিত্র কানন ॥
নানা বৃক্ষ নানা লতা যমুনার ধার।
তাঁহা গোচারণ কৃষ্ণ করেন আপার ॥

শেষ—

চৌরাশী ক্রোশ বেষ্টিত শ্রীব্রজমণ্ডল।
তাহার মধ্যে সংক্ষেপে কহিল এহি স্থল ॥
সাধনের যোগে স্থান নির্ণয় করিবে।
মুঞি সে অধম জন দোষ না লইবে ॥
শ্রীরূপরঘুনাথ পদে জার আশ।
বৃন্দাবন ধ্যান কহে কৃষ্ণদাস ॥
ইতি শ্রীবৃন্দাবনধ্যান সম্পূর্ণঃ ॥

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ-গভর্মেণ্টের শিক্ষাবিভাগ হইতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে যে, যদি কেহ স্থানীয় ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে রেকর্ড আপিসে তাঁহাকে এই বিষয়ে কাজ করিবার জন্য সুযোগ দেওয়া হইবে। গভর্মেণ্টের পত্রখানি আংশিক ভাবে উদ্ধৃত করা হইল।

I am directed...to request you to take appropriate action for the encouragement of research in regional and local history....I am to add in this connection that this Government will be glad to give all possible facilities to the scholars who intend to carry on researches on regional and local history in the State Records Office.

Yours faithfully,
(Sd) J. Elloy,
Assistant Secretary to the
Government of West Bengal.

সভাপতির ভাষণ

এ বৎসর আমাদের পরিষদের পক্ষে শুভ বৎসর বলতে হবে। আমাদের পতনোন্মুখ মূল পরিষৎ-মন্দিরের দিকে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং মুখ্য মন্ত্রী ডক্টর শ্রীবিধানচন্দ্র রায় স্বয়ং পর্যবেক্ষণ ক'রে মেরামতের আংশিক ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। আমরা আশা করছি, শীগ্‌গির সংস্কার-কার্য শেষ ক'রে আমরা পাঠাগারের পুথি ও গ্রন্থ-রক্ষার সুব্যবস্থা ও সম্পূর্ণ পুথি ও গ্রন্থ-তালিকা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রস্তুত করার কাজে হাত দিতে পারব। আমাদের স্থায়ী সভা-মন্দির রমেশ-ভবনও অচিরাৎ রাহুমুক্ত হবে। যদিও তদ্দ্বারা আমাদের মাসিক আয় অনেকখানিই কমে যাবে—আমরা ভরসা রাখব বাংলাদেশের শিক্ষিত জনগণের প্রতি। তাঁরা দলে দলে এগিয়ে এসে সভ্যরূপে পরিষদের সেবার ভার গ্রহণ করবেন, এবং তাঁদের সাহায্যে পরিষৎ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে—এই বিশ্বাস আমার আছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের দাক্ষিণ্যের ওপর আমাদের মন্দির-সংস্কার, যাদুঘর-সম্প্রসারণ ও রক্ষণ এবং পুথি-পুস্তকাগারের সুব্যবস্থা নির্ভর করছে, পরিষদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সভ্যদের আগ্রহ ও উৎসাহের দ্বারা পরিচালিত করতেই হবে।

আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি—তরুণ সাহিত্যসেবীরা পরিষদের সেবা করতে আগ্রহশীল হয়েছেন। আমরা কয়েক বছর থেকেই তাঁদের সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। বঙ্গীয় সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির এটি বৃহত্তম ও মহত্তম প্রতিষ্ঠান। এর রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু পরিচালনের দায় সমস্ত বাঙালী জাতির, বিশেষ ক'রে তরুণ সাহিত্যসাধক সম্প্রদায়ের। তাঁরা দলে দলে এসে যোগদান করবেন, পরিষদের বিস্তারের নতুন নতুন পথ ও উপায় উদ্ভাবন করবেন, এর পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করবেন, তবেই এই জাতীয় সংস্কৃতি-মন্দিরটি সগৌরবে বেঁচে থাকবে। আজ যাঁরা আছেন, কাল তাঁরা থাকবেন না, কিন্তু পরিষৎ থাকবে। পরিষদের দীপমালা যুগে যুগে প্রজ্বলিত রাখবেন যে নূতনেরা, আমি আবার তাঁদের আহ্বান করছি। তাঁরা দলে দলে আসুন, গ্রহণ করুন দায়িত্ব, পরিষদের ক্রমবিস্তারে সহায় হোন।

আমার সহকর্মীদের ও সভ্যদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। পরিষৎ-মন্দিরে ব'সে গবেষণার কাজ করার কিছু কিছু অসুবিধা আমরা লক্ষ্য করছিলাম, বর্তমান সম্পাদক মশাই সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। গবেষণার আকর-ক্ষেত্র হিসাবেই পরিষদের সর্বাধিক গৌরব। এখানে যে সব উপকরণ আছে, তা অন্যত্র নেই। অথচ এগুলির সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ ব্যবহার এতাবৎকাল হয় নি। আশা করছি, পরিষৎ-কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় একনিষ্ঠ গবেষকেরা এর পর তা করবার সুযোগ পাবেন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ও দেখাদেখি কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় জীবনে পরিষদের গুরুত্ব অনুভব ক'রে আরও উদার হবেন—এই বিশ্বাসে তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোটের উপর, অনেক শুভ সূচনা নিয়ে আমরা নূতন বৎসর আরম্ভ করতে পারব যে সকল মনীষী প্রায় ষিষষ্টিবর্ষ পূর্বে এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং যাঁরা সমগ্র জীবনের সেবা দ্বারা পরিষৎকে গৌরবময় প্রতিষ্ঠা দান করেছেন এবং বর্তমানে যাঁরা একে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁদের সকলকে প্রণাম নিবেদন ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসজনীকান্ত দাস
সভাপতি

॥ লোকরঞ্জক বক্তৃতামালার বিবরণী ॥

সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে কিছু দিন অন্তর অন্তর বিভিন্ন বিষয়ে লোকরঞ্জক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, প্রাদেশিক বা লোকসাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পণ্ডিতগণকে বক্তৃতা করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। পরিষদের প্রথম অবস্থা হইতেই এইরূপ বক্তৃতামালার ব্যবস্থা ছিল এবং এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যদুনাথ সরকার প্রমুখ বহু বিশিষ্ট মনীষী পরিষদে বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিয়াছেন। সাম্প্রতিক কালে নানা অসুবিধার কারণে নিয়মিতভাবে এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমান বর্ষে রমেশভবন সুসংস্কৃত হওয়ায় পুনরায় নিয়মিত বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা হইতেছে। জনসাধারণের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের বক্তব্যকে উপস্থাপিত করিয়া তদ্বিষয়ে উৎসাহ বর্ধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। জনসাধারণ, বিশেষতঃ পরিষৎসদস্যগণের আন্তরিক উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পাইলে এই বক্তৃতামালার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা যাইবে। এই সকল বক্তৃতার মধ্যে কোন কোন বক্তৃতার বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার পত্রিকায় স্থান পাইবে। গত অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ হইতে পরিষদে অনুষ্ঠিত বক্তৃতাবলীর একটি তালিকা নীচে দেওয়া হইল—

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬২। *বিষয় :	গুজরাতের মন্দির ও স্থাপত্য।
বক্তা :	শ্রীনির্মলকুমার বসু।
২৪ " " *বিষয় :	ভারতের কয়েকটি যাযাবর জাতি।
বক্তা :	শ্রীনির্মলকুমার বসু।
১লা পৌষ " বিষয় :	মহারাষ্ট্র-সাহিত্য।
বক্তা :	শ্রীপ্রভাকর মাচোয়ে।

ভারতের কয়েকটি যাযাবর জাতি। ২৪শে অগ্রহায়ণ। অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু ॥ কোন কোন বিজ্ঞানীদের ধারণা, যাযাবরত্ব মানুষের প্রাথমিক অবস্থা। সে যুগে মানুষকে খাদ্যের অন্বেষণে সচল জীবন যাপন করতে হতো, তার পর কৃষি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মাটির টানে মানুষ এক স্থানে বাসা বাঁধলো। কৃষিসভ্যতার পরেও যারা ভ্রাম্যমাণ রয়ে গেল, তারা ঘটনাচক্রে ওই ফেলে-আসা-যুগের স্মৃতিটাকেই বহন করে চললো—কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন যাযাবর জাতির জীবন ও জন্মবৃত্তান্ত অনুধাবন করলে পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিক মতকে একমাত্র

---

* চিত্র সহযোগে।

সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। ভারতে এমন বহু গ্রাম আছে, অর্থনৈতিক দিক্ দিয়ে যে সব গ্রাম স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়—প্রয়োজনানুযায়ী নিজস্ব কামার, তাঁতি, কারিগর বহু গ্রামে নেই এবং তা থাকা সম্ভবপরও নয়। এক গ্রামে সারা বছরে লোহার যা কাজ হয়, তার জন্য হয়তো একটি কামারপরিবারকে পোষণ করা সম্ভব নয়—সারা-বছরে কামারের হয়তো তিন মাসের কাজের সংস্থান থাকে, তার ফলে কামারকে বাধ্য হয়ে চতুর্থ মাসে অন্য গ্রামে কাজের সন্ধানে ঘুরতে হয়। এই ভাবে পাঁচটি গ্রামে ঘুরে তার বছরের কর্মসংস্থান হয়—এই সব শিল্পনিপুণ যাযাবর শ্রেণী সংস্কৃতি, ভাষা ও জীবনধারার দিক্ দিয়ে অন্যান্য গ্রামবাসীর সমগোত্রীয় হলেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবিপর্যয়ে যাযাবরজীবন যাপন করছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যাযাবর অর্থাৎ যাদের সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার এবং বহু ক্ষেত্রে ভাষা স্বতন্ত্র, তাদের সংখ্যাও বিরল নয়—উড়িষ্যা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর বা পশ্চিমভারতের যে সব অঞ্চলে চাষযোগ্য ভূমি কম, সেই সকল অঞ্চলে এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

হাজারীবাগ জঙ্গল অঞ্চলে কিছু মানুষ পশু শিকার করে অথবা মধু, মোম এবং দড়ি সংগ্রহ করে কাছাকাছি গ্রামে বিক্রয় করে। এরা 'বিরহোড়' নামে পরিচিত। নৃতত্ত্বের বিচারে এরা অন্যান্য মুণ্ডাভাষাভাষী গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। এদের নাক মোটা ও বড়, কপাল সামান্য উঁচু, রঙ কালো। ছেলেদের পরিধেয়, কোমরে একটু দড়ির সঙ্গে ঝোলানো কাপড়ের এক টুকরো ফালি, তবে শহরের অনতিদূরে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ঘরে জামা, গহনা পরার রীতি আছে। আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে লব্ধ শিকারে ক্ষুন্নিবৃত্তি প্রায়ই হয় না। শিকারলব্ধ বড় জন্তু বা জীবিত ময়ূর এরা অধিক লাভের আশায় নিজেরা না খেয়ে গ্রামে বিক্রী করে আসে। শিকার ভিন্ন এদের প্রধান জীবিকা দড়ি তৈরী করা। জঙ্গল থেকে মহুলান (কাঞ্চন জাতীয়) নামে একপ্রকার লতা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। সেই লতা পাকিয়ে দড়ি তৈরী করার কাজে পরিবারের সকলেই হাত লাগায়। এই দড়ি নিকটবর্তী গ্রামে বা হাটে বিক্রয় হয়—এই দড়ির ব্যবসাই এখন এদের প্রধান ভরসা। এই দড়ির সাহায্যে বিরহোড়দের শিকারের লম্বা জাল প্রস্তুত হয়। দৈহিক শ্রমই হোল বিরহোড়দের একমাত্র অবলম্বন, বিবাহের সময় মেয়েদের শ্রমকুশলতা একটি বিশেষ গুণ বলে বিবেচিত হয়। আধুনিক চিকিৎসা ইত্যাদির উপর এদের আদৌ বিশ্বাস নেই, নিজেদের মধ্যে ঝাড়ফুঁক, গুনিন জাতীয় লোক আছে—এদের সমাজে তারা রীতিমত মান্য। আর্থিক দিক্ দিয়েও এদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল। বিরহোড়দের গ্রামে জ্ঞাতি ও কুটুম্ব একই সঙ্গে থাকে, তবে ওরই মধ্যে কুটুম্ব সম্পর্কিত পরিবার একটু দূরে ঘর বাঁধে। এদের ঘর বলতে জঙ্গলের ডালপালা ও গাছপাতা দিয়ে তৈরী তাঁবুর আকৃতি মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই। শক্ত ডাল দিয়ে তৈরী কাঠামোর উপর পুরু করে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে ঘর তৈরী হয়। ঘরের উচ্চতা সাধারণতঃ ৮ ফুট, নিচের ব্যাস ১০ ফুটের মত এবং ২ থেকে ২॥ ফুট একটা দরজা দিয়ে প্রায় শুয়ে শুয়ে ঘরে প্রবেশ করতে হয়। ঘরের চার দিকে নালা কেটে দেওয়া

হয়, বৃষ্টির সময় ছাদ বেয়ে জল সেই নালা দিয়ে গড়িয়ে যায়। এই গৃহ নির্মাণের ব্যয় প্রায় ২৷৷• টাকার মত এবং এক বেলার দেহশ্রম।

মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ তীর্থ তিরুপতির নিকটে আর একদল যাযাবরের সন্ধান পাওয়া যায়—এরা বিরহোড়ের ধরণেই ঘর নির্মাণ করে। তবে সেগুলি আকৃতিতে অনেক বড় ও শক্ত। ঘরের শিখরদেশ কোণাকৃতি। এদের ঘরে বিদেশীদের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ—ঘরে ঢুকলে ঘর অপবিত্র হয়ে যায়, তখন তারা নতুন ঘর বানিয়ে বাস করে। এদের চেহারার মধ্যেও মুণ্ডাভাষাভাষী জাতিদের কিছু ছাপ আছে। তবে মেয়েদের চেহারায় অনেক সময় পার্শ্ববর্তী তেলেগু অঞ্চলের সভ্য মানুষের সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। এরা তেলেগু ভাষাভাষী—ভাষার অভিন্নতার ফলে পরিবেশের সঙ্গে এদের সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে গুজরাটের কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে সমুদ্রতীরে গোপগ্রাম। গ্রামের সমাজ ও অন্যান্য প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। গ্রামবাসী মেচ্ জাতীয় লোকেরা নিজেদের রাধারাণীর বংশধর বলে দাবী করে। এই গ্রামের সন্নিকটে যে সকল যাযাবরের বসতি, তাদের আদি বাসস্থান খুব সম্ভব রাজস্থান। এদের মধ্যে এক দল লোক কামার—সমুদ্রের ধারে উঁচু টিলার ঢালে তাঁবুর মত ঘর বানিয়ে বাস করে—হয়তো কোন দিন তাঁবুতে বাস করার অভ্যাস ছিল। অপর শ্রেণীরা মজুর—এদের স্থানীয় নাম বঞ্জারা বা লম্বাডি—এরা ঘর-বাসী নয়। এক একটি পরিবারের যা কিছু সঞ্চয় এক স্থানে জড়ো করে সেই সম্পত্তিকে বেষ্টন করে জীবন-যাপন করে। তৃতীয় এক জাতের যাযাবরেরা প্রধানতঃ পশুপালক।

কচ্ছ উপদ্বীপে 'ওয়াঘড়ী' নামে একটা আধা যাযাবর শ্রেণী দেখা যায়—এদের ঘরও হাজারীবাগের বিরহোড়দের ধরণের। তবে কোন কোন ঘরের দেওয়াল মাটির। ওয়াঘড়ীদের মধ্যে অনেকে স্থায়িভাবে এক স্থানে বসে পড়েছে। এরা জঙ্গল থেকে দাঁতন সংগ্রহ করে শহরে বিক্রয় করে—দাঁতনের ব্যবসা এদের একচেটিয়া। পার্শ্ববর্তী গ্রামে ওয়াঘড়ীদের সম্বন্ধে চোর বদনাম আছে।

কাশ্মীরের 'গড্ডী' নামে এক যাযাবর জাতি উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ঘি বিক্রী করে বেড়ায়।

উপরোক্ত যাযাবর জাতিগুলির প্রায় অধিকাংশই হিন্দু। উড়িষ্যায় 'মাকড়-খিয়া-কুলহ' অর্থাৎ 'বাঁদর-খেকো-কোল' নামে একটি গোষ্ঠী বাঁদর খাওয়ার অপরাধে হিন্দুদের কাছে অপাংক্তেয় হয়েছে।

এই সকল যাযাবর গোষ্ঠীগুলি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দিক্ দিয়েই আধুনিক সমাজের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। কেউ দড়ি, কেউ দাঁতন, কেউ ঘি বিক্রয় করে জীবন ধারণ করে। এই সব গোষ্ঠীর মধ্যে একটা স্বভাবজাত সুনির্দিষ্ট শ্রমবিভাগ আছে। এক জাতির কাজ অন্য জাতি কোন অবস্থাতেই করতে চায় না—করলে পরে জাতে ছোট হয়ে যাবে বলে এদের ধারণা। এই সুনির্দিষ্ট শ্রমবিভাগ মেনে নেওয়ার ফলে জাতিগুলি নিজস্ব জীবিকাকে অবলম্বন করে এখনও টিঁকে আছে।

মহারাষ্ট্র-সাহিত্য। ১লা পৌষ। শ্রীপ্রভাকর মাচোয়ে।

মহারাষ্ট্র প্রাকৃত থেকে মারাঠী ভাষার উদ্ভব। মারাঠী ভাষার প্রাচীনতম লিপি গৌতমেশ্বর মূর্তির তলায় খোদিত শিল্পীর নামলেখা এক ছত্র শিলালিপিতে পাওয়া গেছে। মহানুভবী সাহিত্য সম্ভবতঃ প্রাচীনতম মহারাষ্ট্র সাহিত্য। মহানুভবী সম্প্রদায় বাংলা দেশের বাউলদের সমধর্মী। এরা গ্রন্থপূজক—জাতবিচার মানে না। নিজেদের সম্প্রদায়ের পুথি গুপ্ত রাখতো বলে এদের সাহিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। মাধুর্যরস হলো মহানুভবী সাহিত্যের মূল রস।

পরবর্তী যুগে জ্ঞানেশ্বরের রচনার মধ্যে আমরা যে বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই, সেটা হলো প্রসাদগুণ, সন্ত-সাহিত্যের মধ্যে জ্ঞানেশ্বরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'জ্ঞানেশ্বরী' (গীতাভাষ্য) আজও মহারাষ্ট্রে বিশেষ আদৃত।

মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন ঘটে তুকারাম ও রামদাসের হাতে। শিবাজীর গুরু রামদাস সাহিত্যে প্রথম ওজস্বী রস নিয়ে এলেন। সেখানে ভাষার বাছবিচার নেই, শব্দচয়নে ব্রাহ্মণসুলভ অনুদারতা নেই। এই মনীষীর হাতে মারাঠী ভাষা এক প্রবহমাণ ভাষা হয়ে উঠলো।

মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা ইংরেজ আগমনের পর থেকে। এর পূর্বে যা হচ্ছিল, তার অধিকাংশই প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদ। ইংরেজ আগমনের পর বাংলাদেশের মতই মহারাষ্ট্রে উগ্র ইংরেজীয়ানা ও তীব্র জাতীয়তাবাদ, এই দুটি বিপরীতধর্মী ভাবধারা দেখা দিল, জাতীয় ভাবধারার নায়ক ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। এই জাতীয় ভাবধারা ক্রমশঃই বিদেশবিদ্বেষী সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়ে পড়ে; এই সময় রাণাডে ও গোখেলের নেতৃত্বে এক প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়।

মারাঠী ভাষার মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তন সাহিত্যে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করলো। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে 'দর্পণ' নামে প্রথম মারাঠী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এরই কিছুকালের মধ্যে মহারাষ্ট্র সাহিত্য-পরিষদ্ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। এই সময় নাটক উপন্যাস রচনা কিছু কিছু হলেও বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্যের উপরই ঝোঁক পড়ে বেশী। ব্যুৎপত্তিকোষ, চরিত্রকোষ, বিশ্বকোষ, জ্ঞানকোষ এর প্রমাণ। ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা ছাড়া একমাত্র মারাঠী ভাষাতেই বিশ্বকোষ সম্পাদিত হয়েছে।

কবিতার ক্ষেত্রে ইংরেজোত্তর প্রথম যুগে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্রাউনিং-এর রোম্যাণ্টিক প্রভাবের প্রাধান্য ছিল—এই গীতিকাব্যকে মারাঠীতে 'ভাবগীত' বলা হয়। বিংশ শতকের প্রথম যুগে কেশবসুতের কবিতায় একরাষ্ট্র পরিকল্পনা অর্থাৎ সর্বভারতীয় চেতনা পরিলক্ষিত হয়। ১৯১৩-১৪ সালে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির প্রত্যক্ষ প্রভাব মারাঠী কবিতার উপর পড়ে—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ও ঔপনিষদিক প্রভাবও দেখা যায়। বিনোবা ভাবে, কাকা কালেলকর, জাবদেকর এঁদের রচনায় গান্ধী-প্রভাব সহজেই প্রতীয়মান। সমাজবাদী ভাবধারায় পুষ্ট কবিদের মধ্যে গোরে ও অচ্যুত পটবর্ধনের

নাম উল্লেখযোগ্য। সাম্যবাদী লেখকদের বিশেষ দান মারাঠী সাহিত্যে নেই, এঁদের মধ্যে একমাত্র অন্নাভাও সাঠে আর অমর শেখের নাম উল্লেখযোগ্য। বোরকরের অসমাপ্ত রচনা 'মহাত্মায়ন' আধুনিক মহারাষ্ট্র-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। অতি আধুনিক যুগ এলিয়টের প্রভাবধর্মী। দেশপাণ্ডে, মারধেকর এঁদের মধ্যে বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। এই আধুনিকপন্থীরা অন্তর্মুখী, একান্তবাদী বাংলা দেশের জীবনানন্দ দাশের সমগোত্রীয়।

মারাঠা নাটক মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের গর্বের বস্তু। ১৮৪৩ সালে প্রথম নাটক রচিত হয়। নাটকের সঙ্গে মারাঠা সমাজের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সবাক্ চলচ্চিত্র আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত মারাঠী মঞ্চ জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। নাটকের মধ্যে বিদেশী সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি পেয়েছে। লর্ড কার্জনের কার্যের প্রতিবাদে খাদিলকর-রচিত 'কীচকবধ' বাংলাদেশের 'নীলদর্পণে'র সঙ্গে তুলনীয়। প্রথম যুগের নাটক ছিল 'অপেরা' জাতীয়। নাটক মাত্রেই শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য গান থাকা চাই। পরবর্তী যুগে ইবসেন ও বার্নাড শ-এর প্রভাবে নাটক নূতন ধারায় বিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক যুগে মহারাষ্ট্র-নাটক-জগতে মামা বারেরকর ও আত্রের নাম বিশেষ জনপ্রিয়।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে হরিনারায়ণ আপ্তের অছুৎ, বালবিধবা, কিষাণ প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাস মহারাষ্ট্রে অত্যন্ত জনপ্রিয়। আদিবাসীদের কাহিনী নিয়ে উপন্যাসও মারাঠী সাহিত্যে রচিত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে। '৪২এর আন্দোলন এবং নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক অবস্থার পটভূমিকায় দুখানি উপন্যাস মারাঠা সমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মারাঠী উপন্যাস ক্রমশঃই ঘটনাপ্রাধান্য ছেড়ে ব্যক্তিপ্রধান ও বাতাবরণ-প্রধান হয়ে উঠছে। ভারতের কয়েকটি সজীব ভাষার মধ্যে মারাঠী অন্যতম। এ ভাষায় আজও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনবরত নূতন নূতন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে ও সেই পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এবং আজও এই ধারা অপ্রতিহত রয়েছে।*

শ্রীনির্মলকুমার বসু
সম্পাদক

---

* মূল ভাষণ হিন্দীতে প্রদত্ত।

॥ একষষ্টিতম বার্ষিক কার্যবিবরণী ॥

। শোক-সংবাদ ।

পরিষদের বিগত বার্ষিক অধিবেশন ৪ ভাদ্র ১৩৬১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সেই দিন হইতে আজ ৭ আশ্বিন ১৩৬২ পর্যন্ত আমরা যে সকল খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী ও হিতৈষী বন্ধুবর্গকে হারাইয়াছি, সর্বপ্রথমে তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গের নিকট আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

আজীবন-সদস্যগণের মধ্যে গণপতি সরকার পরলোক গমন করিয়াছেন। পরিষদের সহিত তাঁহার বহুকালের যোগ ছিল। অতীতে তিনি পরিষদের কোষাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এবং মৃত্যুকালেও তিনি পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি-পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদ্ এক বিশিষ্ট হিতৈষীকে হারাইল।

সাধারণ-সদস্যগণের মধ্যে আমরা অনিলচন্দ্র গুপ্ত, জয়দেব নাগসরকার, ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায়, শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত, মৃণাল সেনগুপ্ত এবং জীবনকৃষ্ণ মিত্রকে হারাইয়াছি।

বিগত এক বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং জীবনানন্দ দাশপ্রমুখ কয়েক জন রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবিকে হারাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সরকারী চারু কলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং আমাদের প্রাক্তন সদস্য স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন।

। আনন্দ-সংবাদ ।

অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি রাজশেখর বসু এবং ৬২ বর্ষের মনোনীত সহকারী সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এই বৎসরের রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে আমরা উভয়কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

বিগত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে পরিষৎ-মন্দিরের কালজীর্ণতার কথা উল্লেখ করিয়া দেশের জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, এই বৎসরে আমাদের সেই আবেদন বহুলাংশে ফলপ্রসূ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বদান্যতায় দশ হাজার টাকা পাইয়া কালজীর্ণ পরিষৎ-মন্দিরকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার কাজে ব্রতী হইয়াছি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ব্যক্তিগত আগ্রহের ফলে সময় থাকিতে এই কার্য

আরম্ভ করা সম্ভব হইয়াছে। ডাঃ রায় পরিষদ্‌গৃহ পরিদর্শন করিয়া পরিষদের জরাজীর্ণ অবস্থা দেখিয়া যথাশীঘ্র এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই বদান্যতার জন্য পশ্চিম-বঙ্গ-সরকার ও মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের পর গৃহসংস্কার কার্যে আর হাত দেওয়া হয় নাই। দীর্ঘ ১৭ বৎসর পর পরিষৎ-মন্দির সুসংস্কৃত ভবনে পরিণত হইতে চলিল। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য বর্ষে রেশনিং বিভাগ রমেশ-ভবন ছাড়িয়া দেওয়ায় পরিষৎ-মন্দিরের সহিত রমেশভবনেরও সংস্কারকার্য সম্ভব হইয়াছে। সুসংস্কৃত পরিষদ্‌গৃহে আবার নূতন প্রেরণায় বহু স্থগিত ও নূতন কার্য সুরু করিবার প্রয়াস চলিতেছে। আশা করি, আপনাদের সকলের সহযোগিতায় এই কার্যে আমরা সফলকাম হইতে পারিব।

অতঃপর আমাদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণ সম্বন্ধে বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বান্ধব ও সদস্য।

১৩৬১ সালের ১ বৈশাখ হইতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্যগণের পরিচয় ও সংখ্যা নিম্নরূপ :

বান্ধব : একজন মাত্র বর্তমান আছেন—রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

বিশিষ্ট-সদস্য : শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, শ্রীযদুনাথ সরকার ও শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজীবন-সদস্য : (১) রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, (২) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, (৩) শ্রীবিমলাচরণ লাহা, (৪) শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, (৫) শ্রীসত্যচরণ লাহা, (৬) শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, (৭) শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, (৮) শ্রীহরিহর শেঠ, (৯) শ্রীমেঘনাদ সাহা, (১০) শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, (১১) শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, (১২) শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, (১৩) শ্রীরঘুবীর সিং, (১৪) শ্রীহিরণকুমার বসু, (১৫) শ্রীবীণাপাণি দেবী, (১৬) শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, (১৭) শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, (১৮) রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, (১৯) শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, (২০) শ্রীইন্দ্রভূষণ বিদ্, (২১) শ্রীত্রিদিবেশ বসু, (২২) শ্রীজগন্নাথ কোলে, (২৩) শ্রীমহিমচন্দ্র ঘোষ, (২৪) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (২৫) শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন, (২৬) শ্রীহরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (২৭) শ্রীসজনীকান্ত দাস, (২৮) শ্রীনির্মলকুমার বসু, (২৯) শ্রীসুধাকান্ত দে, (৩০) শ্রীবিভূভূষণ চৌধুরী।

দ্রষ্টব্য : ইঁহাদের মধ্যে শ্রীসুধাকান্ত দে ও শ্রীবিভূভূষণ চৌধুরী ১৩৬১ বর্ষে সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন।

অধ্যাপক-সদস্য : বর্ষশেষে ৯ জন।

সহায়ক-সদস্য : বর্ষশেষে ৭ জন।

সাধারণ-সদস্য : কলিকাতাবাসী ৮৩৯ জন ও মফঃস্বলবাসী ৭৯ জন—মোট ৯১৮ জন।

সর্ববিধ-সদস্য এবং বান্ধবের মিলিত সংখ্যা ৯৬৮।

আলোচ্য বর্ষে আমরা ২২৪ জন নূতন সদস্য লাভ করিয়াছি। তন্মধ্যে ৮ জন মফঃস্বল-

সদস্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইহার পূর্ববৎসর অর্থাৎ ১৩৬০ বঙ্গাব্দে আমরা ১৭৪ জন নূতন সদস্য লাভ করিয়াছিলাম। আলোচ্য বর্ষে আমরা মোট ১৫৮ জনকে হারাইয়াছি। তন্মধ্যে ৬ জন মৃত, ৯১ জনের চাঁদা দীর্ঘকাল বাকী থাকায় নিয়মানুসারে তাঁহাদের নাম সভ্যপদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে, ৬১ জন পদত্যাগ করিয়াছেন।

পদত্যাগকারিগণের মধ্যে স্থান ত্যাগ ও বই আদানপ্রদান ব্যাপারে অসুবিধার জন্য ২৫ জন, বিভিন্ন অসুবিধার জন্য ৩৩ জন এবং অসুস্থতার জন্য ৩ জন পদত্যাগ করিয়াছেন।

। কর্মাধিকারী ।

সভাপতি: শ্রীসজনীকান্ত দাস। **সহকারী সভাপতি:** শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীগণপতি সরকার (মৃত, মাঘ ১৩৬১ ; পদ শূন্য), রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলকুমার দে। **সম্পাদক:** শ্রীনির্মলকুমার বসু। **সহকারী সম্পাদক:** শ্রীকুমারেশ ঘোষ, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমনোমোহন ঘোষ। **পত্রিকাধ্যক্ষ:** শ্রীত্রিদিবনাথ রায়। **কোষাধ্যক্ষ:** শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। **পুথিশালাধ্যক্ষ:** শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। **গ্রন্থাধ্যক্ষ:** শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য। **চিত্রশালাধ্যক্ষ:** শ্রীশুভেন্দু সিংহরায়।

কার্যনির্বাহক সমিতি: (সদস্যগণের পক্ষে) ১। শ্রীঅতুল সেন, ২। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ৩। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৪। শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, ৫। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৬। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৭। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৯। শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১০। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, ১১। শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ১২। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১৩। শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ, ১৪। শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, ১৫। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৬। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, ১৭। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৮। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীসুশীল রায়, ২০। শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

শাখা-পরিষৎসমূহের পক্ষ হইতে: ২১। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন (নৈহাটি শাখা), ২২। শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় (মেদিনীপুর শাখা), ২৩। শ্রীমাণিকলাল সিংহ (বিষ্ণুপুর শাখা), ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া শাখা)

। কার্যনির্বাহক সমিতির কর্মসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(ক) সুচারুরূপে বিভিন্ন কার্য পরিচালনার জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, আয়ব্যয়, গ্রন্থাগার, চিত্রশালা ও ছাপাখানা উপসমিতি গঠিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া পরিষদের নিয়মাবলী সংশোধনের জন্য পৃথক্ একটি উপসমিতি গঠিত হইয়াছে এবং তাহার কার্যও প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে।

(খ) ১৩৬২ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহক সমিতিতে নির্বাচনের জন্য মতি গণনার কার্যে শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্তী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীহেমরঞ্জন বসু সহায়তা করেন।

(গ) কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের এবং ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের বাংলা গ্রন্থাবলী পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ঘ) স্বর্ণকুমারী দেবী ও লীলা দেবী স্মৃতি-পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

১। স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পুরস্কার ৫০৲ টাকা—শ্রীসুধাংশুকুমার পাল।

২। লীলা দেবী স্মৃতি-পুরস্কার ১০০৲ টাকা—শ্রীউষা বসু।

(ঙ) আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পক্ষ হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে নিম্নলিখিত প্রতিনিধি প্রেরিত হন:

(১) ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস: শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও শ্রীনির্মলকুমার বসু।

(২) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিং দাস পুরস্কার সমিতি: শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য।

(৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়:

শরৎচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা সমিতি: শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সরোজিনী পদক সমিতি: শ্রীসজনীকান্ত দাস।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা সমিতি: শ্রীমনোজ বসু।

কমলা বক্তৃতা সমিতি: শ্রীনরেন্দ্র দেব।

জগত্তারিণী পদক সমিতি: শ্রীসুশীলকুমার দে।

(চ) ভারতীয় সীমা কমিশনের নিকট পরিষদের বক্তব্য পেশ করা হইয়াছে।

(ছ) পরিষদের চিত্রশালার তালিকা মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(জ) পরিষদে সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী ও চিত্রশালার সংগ্রহাবলী নিম্নলিখিত প্রদর্শনীতে প্রেরিত হয়:

(১) প্রেসিডেন্সী কলেজ শতবার্ষিকী প্রদর্শনী।

(২) কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের বিদ্যাসাগর প্রদর্শনী।

(৩) জাতীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত 'কেরী প্রদর্শনী'।

(ঝ) ভারতীয় ভাষা-কমিশনের নিকট পরিষদ্ তাহার বক্তব্য পেশ করিয়াছে।

। অধিবেশন।

আলোচ্য বর্ষে সর্বসমেত চৌদ্দটি মাসিক ও বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল; নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল:

(১) ষষ্টিতম বার্ষিক অধিবেশন, ৪ ভাদ্র ১৩৬১, (২) প্রথম মাসিক অধিবেশন,

২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৬১, (৩) দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন, ২৩ পৌষ, ১৩৬১, (৪) তৃতীয় মাসিক অধিবেশন, ২২ মাঘ, ১৩৬১, (৫) চতুর্থ মাসিক অধিবেশন, ২২ ফাল্গুন, ১৩৬১, (৬) পঞ্চম মাসিক অধিবেশন, ১৯ চৈত্র, ১৩৬১, (৭) ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন, ২৩ বৈশাখ, ১৩৬২, (৮) সপ্তম মাসিক অধিবেশন, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২, (৯) অষ্টম মাসিক অধিবেশন, ১৭ আষাঢ়, ১৩৬২, (১০) কবিবর মধুসূদন দত্তের স্মৃতিতর্পণ উপলক্ষ্যে তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হইয়া মাল্যদান, ১৪ আষাঢ়, ১৩৬২, (১১) 'ইউরোপ ও ভারত' বিষয়ে বক্তৃতা—ফাদার পি. ফালোঁ, ৪ ভাদ্র, ১৩৬১, (১২) 'প্রাচীন তমলুকের সভ্যতা' বিষয়ে বক্তৃতা : বক্তা—শ্রীপরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, ১১ ভাদ্র, ১৩৬১, (১৩) 'কাঁসাই নদীর তীরে প্রাচীন সভ্যতা' বিষয়ে বক্তৃতা : বক্তা—শ্রীমাণিকলাল সিংহ, ১৮ ভাদ্র, ১৩৬১, (১৪) 'প্রাচীন তামিল সাহিত্য' বিষয়ে বক্তৃতা : বক্তা—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৫ ভাদ্র, ১৩৬১।

। গ্রন্থাগার ।

আলোচ্য বর্ষে ৮৪ খানি গ্রন্থ ক্রীত এবং ৩৪৩ খানি গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থাগারে মোট ৪২৭ খানি পুস্তক ও পত্রিকা সংযোজিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী তাঁহার স্বর্গত স্বামী সতীশচন্দ্র বাগচীর সংগৃহীত ১৯৩ খানি বাংলা গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে ৫ খানি দৈনিক সংবাদপত্র, ১১ খানি সাপ্তাহিক এবং ৩৫ খানি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত পাওয়া যাইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বসমেত ২৫৫০০ জন অর্থাৎ প্রত্যহ গড়ে ৮৫ জন পাঠক পাঠাগারে গ্রন্থ ও সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়াছেন। ২৪৪০০ জন সদস্য ২৬৬৪০খানি গ্রন্থ অর্থাৎ দৈনিক গড়ে ৪০ জন সদস্য ৭৪ খানি গ্রন্থ গৃহে পড়িবার জন্য লইয়া গিয়াছেন।

। পুথিশালা ।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথিশালায় ১৭ খানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৬ খানি সংস্কৃত পুথি এবং ১ খানি বাংলা পুথি। যাঁহারা পুথি উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।—

শ্রীঅক্ষয়কুমার গোস্বামী— ১০ খানি
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত— ৫ খানি
শ্রীনিমাইচাঁদ শীল— ১ খানি
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত— ১ খানি

এই ১৭ খানি পুথি তালিকাভুক্ত হইয়া বর্ষশেষে পুথিশালায় সর্বপ্রকার পুথির সংখ্যা নিম্নরূপ হইয়াছে—

বাঙ্গালা পুথি—৩২৯৭
সংস্কৃত পুথি—২৪৬৫
তিব্বতী পুথি— ২৪৪
ফার্সী পুথি— ১৩

মোট—৬০১৯

আলোচ্য বর্ষ হইতে পুনরায় বাঙ্গালা প্রাচীন পুথিগুলির বিবরণ লেখার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইতিপূর্বে ৪০০ শত পুথির বিবরণ লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ৪০১ হইতে ৫৩১ সংখ্যক পুথি পর্য্যন্ত ১৩২ খানি পুথির বিবরণ লিখিত এবং তাহার কিয়দংশ পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।

পূর্ব পূর্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং পরিষদের সদস্যগণ স্বতন্ত্রভাবে ৮৩ খানি পুথি ব্যবহার করিয়াছেন।

। গ্রন্থপ্রকাশ ।

(ক) সাধারণ তহবিল হইতে হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলীর 'চিন্তাতরঙ্গিণী' ও 'বিবিধ কাব্যাদি' প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ২২, ২৮, ২৯, ৪৪, সংখ্যক পুস্তিকার পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে।

(খ) লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে।

(গ) ঝাড়গ্রামরাজ-তহবিলের অর্থে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', বিহারিলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল', মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সীতারাম' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় রামকৃষ্ণ দাসের 'শিবায়ন পুথি' এবং শ্রীশুভেন্দু সিংহরায় ও শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল'-এর মুদ্রণ কার্য চলিতেছে।

। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ।

আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার একটি বিষয়ানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। বৈষ্ণব পদাবলী ৩, ব্যাকরণ ২, ইতিহাস ৫, ভূগোল ১, প্রাদেশিক সাহিত্য ১, বিবিধ ৩। ইহার মধ্যে তিনটি প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

। চিত্রশালা ।

চিত্রশালার প্রদর্শন-কক্ষটি সংস্কারের পর চিত্রশালার দ্রব্যাদি ও দ্বিতলে চিত্রগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা হইতেছে। চিত্রশালায় রক্ষিত বিখ্যাত সাহিত্যিক ও

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পত্র ও ব্যবহৃত জিনিসপত্রের তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয় এবিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতেছেন।

শ্রীকরুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্তিকানির্মিত একটি প্রাচীন গাড়ু ও ১০খানি দেবদেবীর চিত্র-সংবলিত প্রাচীন তাস চিত্রশালা-সংগ্রহে উপহার দিয়াছেন। শ্রীঅসিতকুমার চক্রবর্তী একটি পিত্তলনির্মিত মনসামূর্তিখচিত সুদৃশ্য ঘট এবং শ্রীকানাই সামন্ত একটি প্রাচীন মূর্তি উপহার দিয়াছেন।

। রমেশ ভবন।

বিগত ২৩ পৌষ ১৩৬১ রেশনিং কর্তৃপক্ষ এই ভবনের দ্বিতলটি ছাড়িয়া দেওয়ায় বহু বৎসর পরে আমরা দ্বিতলের বক্তৃতাপ্রকোষ্ঠটির পুনরায় ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এখন কেবলমাত্র একতলার দক্ষিণের বারান্দা পোস্ট অফিস আমাদের ভাড়াটিয়া হিসাবে অধিকার করিয়া আছেন। ফলে সমস্ত রমেশ ভবনের জন্য আমাদিগকে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানকে পুরা ট্যাক্স দিতে হইতেছে। পৌর প্রতিষ্ঠানের সহিত আমাদের এ বিষয়ে পত্রালাপ ও আলাপ আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের নিয়মানুসারে আমরা ট্যাক্স মকুব পাইতে পারি না। ফলে প্রতি বৎসর এই বাবদে আমাদের ৬১৫৲ টাকা লোকসান হইতেছে। পোস্ট অফিস উঠিয়া গেলে এই ট্যাক্স মকুব হইতে পারে। সেই জন্য আমরা পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া অনুরোধ জানাইয়াছি যে, বাড়ী ছাড়িয়া দিলে অথবা পৌর প্রতিষ্ঠানকে দেয় পুরা ট্যাক্স ভাড়া হিসাবে দিলে আমরা এই লোকসান হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি। রমেশ ভবনের সংস্কার কার্য ও আসবাবপত্রের সংস্কার কার্য বর্তমান বর্ষে শেষ হইয়াছে।

। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার।

আলোচ্য বর্ষে উপরোক্ত ভাণ্ডার হইতে ছয় জনকে সারা বৎসর মাসিক ৬৲ টাকা হিসাবে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে ৫ জন সাহিত্যিকগণের বিধবা পত্নী ও ১ জন মহিলা সাহিত্যিক।

। শাখাপরিষৎ।

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখা স্থাপিত হয় নাই। মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর ও নৈহাটি শাখার অধিবেশনাদির যথাযথ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

। আর্থিক সহায়তা।

(ক) পরিষদের পত্রিকাদি প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ২০০০৲ টাকা ও গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

(খ) কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বিগত (১৯৫০-৫১, ১৯৫১-৫২, ১৯৫২-৫৩) তিন বর্ষের সাহায্য বাবদ ১৫০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া পৌর প্রতিষ্ঠান পরিষদ্‌ভবনের (১৯৫১-৫২, ১৯৫২-৫৩) দুই বৎসরের ট্যাক্স মকুব করিয়াছেন।

। উপসংহার ।

আয়ব্যয় সম্পর্কিত যে তালিকাটি ইতিমধ্যে প্রেরিত হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, গত বৎসর পরিষদ্‌ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদির যে মজুদি মূল্য ধরা হইয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে তাহার মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব পূর্ব বৎসরে পুস্তকগুলির বিক্রয়মূল্য অনুসারে Stock value নিরূপিত হইয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে পুস্তকগুলির উৎপাদন মূল্য (manufacturing cost) হিসাবে এই মূল্য ধার্য করা হইয়াছে।

বিগত বার্ষিক অধিবেশনে কার্যবিবরণীর উপসংহারে আশা প্রকাশ করা হইয়াছিল, পরবৎসর কথঞ্চিৎ সাফল্যের সংবাদ আপনাদের নিকটে জ্ঞাপন করিতে পারিব। তাহার পর এক বৎসরের অধিক অতীত হইয়াছে। এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা নাই যে, সকল বিষয়ে আশানুরূপ সাফল্যলাভ আমরা করিতে পারি নাই। আমাদের অকৃতকার্যতার জন্য আমাদের অক্ষমতা নিশ্চয়ই কিয়দংশে দায়ী, কিন্তু অক্ষমতা ভিন্ন অন্যান্য অন্তরায়ও আমাদের কার্যের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। রমেশভবন রেশনিং বিভাগের অধিকার হইতে মুক্ত হইয়াছে, ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু গত বৎসর বলা হইয়াছিল, সভ্যসংখ্যা দ্বিগুণ করিতে পারিলে আমাদিগকে আর ভাড়ার টাকার উপর নির্ভর করিতে হইবে না। রেশনিং বিভাগ উঠিয়া যাওয়ায় যে আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণের জন্য এখন সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ব্যতীত, গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচী প্রণয়ন কার্যে যে টাকা প্রয়োজন, তাহারও ব্যবস্থা করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। পূর্বে যখনই অর্থের অনটন ঘটিয়াছে, তখনই বাংলার ধনিসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে অকুণ্ঠিত ভাবে অর্থানুকূল্য ইহার উপরে বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এই সূত্রে অর্থাগম প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই কারণে আমরা দেশের রাজশক্তির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছি। সরকার দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে কার্য শুরু করিয়াছেন। রাজশক্তি জনগণায়ত্ত সরকারের উচিত ধর্মই পালন করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দীর্ঘ ষাট বৎসর ধরিয়া বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহু উন্নতি সাধনে পুরোযায়ীর কার্য করিয়া আসিতেছে। এবং আজিও বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেশের অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে সক্রিয় হইয়া রহিয়াছে। দীর্ঘ ষাট বৎসর কাল বহু বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া পরিষৎ তাহার কাজ চালাইয়া আসিতেছে—বিশেষতঃ বিগত যুদ্ধের সময় হইতে সভ্যসংখ্যা হ্রাস হেতু ও দেশের অন্যান্য দুরবস্থা হেতু পরিষৎ অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াও আপন কর্তব্যচ্যুত হয় নাই। বর্তমানে সেই অবস্থা বহুলাংশে কাটাইয়া উঠিলেও বহু নূতন কার্যে হাত দিতে হইলে এখনও বহু অর্থের প্রয়োজন—আমরা সে বিষয়ে সরকারের ও দেশের

ধনিসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—দেশের একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমাদের আবেদন অগ্রাধিকার লাভ করিবে, এরূপ আশা করা অন্যায় হইবে না।

এই বৎসরের শুভ সংবাদ, বহুদিন পরে পরিষদ্‌গৃহের সংস্কার কার্যে হাত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গৃহসংস্কার কার্যে আরও অর্থের প্রয়োজন—সরকারী দশ হাজার টাকা আমাদের সম্পূর্ণ প্রয়োজন মিটাইতে পারে নাই। রমেশ ভবনের সভামণ্ডপ খালি হওয়ায় আগামী বৎসর কয়েকটি বিশেষ বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা যাইবে আশা করিতেছি।

গৃহসংস্কার উপলক্ষে পরিষদের সকল কক্ষে ও সকল বিভাগেই নাড়াচাড়া হইয়াছে—পরিষদের বহু ধূলা পরিষ্কার হইয়াছে—ভরসা করিতেছি, এই আলোড়ন পরিষদের অন্তরেও লাগিয়াছে; যাহার ফলে, আগামী বর্ষে সাময়িক অবসাদ ও জড়তা কাটাইয়া পরিষৎ নূতন উৎসাহে তাহার আদর্শ সফল করিতে অগ্রসর হইতে পারিবে। পরিষৎ পরিচালনা বিষয়ে আপনাদের অধিকতর সক্রিয় সহযোগিতা ও মতামত কামনা করিয়া একষষ্টিতম কার্যবিবরণ সমাপ্ত করিতেছি।

৭ আশ্বিন, ১৩৬২।

শ্রীনির্মলকুমার বসু
সম্পাদক

॥ দ্বিষষ্টিতম বর্ষের কর্মাধ্যক্ষগণের তালিকা ॥

। সভাপতি । শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

। সহকারী সভাপতি ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৪৬।৫বি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯
" তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পি ১৭১ সি.সি.ও.এস. কাশীপুর, কলি-২
" দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১০।১ ঘোষপাড়া লেন, কলিকাতা-৩৬
" নরেন্দ্র দেব, ৭২ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯
" বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, গোলকুঠি, ভাগলপুর, বিহার
" যদুনাথ সরকার, ১০ লেক টেরেস, কলিকাতা-২৯
" সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৬ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯
" সুশীলকুমার দে, ১৯এ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৪

। সম্পাদক । শ্রীনির্মলকুমার বসু, ৩৭ বোসপাড়া লেন, কলিকাতা-৩

। সহকারী সম্পাদক ।

শ্রীকুমারেশ ঘোষ, ৪১এ গড়পার রোড, কলিকাতা-৯
" পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পি ৭০ সি. সি. ও. এস. কাশীপুর, কলিকাতা-২
" প্রবোধকুমার দাস, ৭।১ ঈশ্বর ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৬
" মনোরঞ্জন গুপ্ত, ৯ই যোগোদ্যান লেন, কলিকাতা-১১

। চিত্রশালাধ্যক্ষ । শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০

। গ্রন্থাধ্যক্ষ । শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ২৬ পীতাম্বর ঘটক লেন, আলিপুর, কলিকাতা-২৭

। পত্রিকাধ্যক্ষ । শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৯এ শ্রীনাথ মুখার্জি লেন, দমদম, কলিকাতা-৩০

। পুথিশালাধ্যক্ষ । শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

। কোষাধ্যক্ষ । শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, ২২৭।২ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা-২০

। কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ।

শ্রীঅতুল সেন, ২১।২এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬
„ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৪ পঞ্চাননতলা লেন, বেহালা, কলিকাতা-৩৪
„ কামিনীকুমার কর রায়, ৪ চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৫০।৮।সি গৌরীবাড়ী লেন, (তিনতলা) কলি-৪
„ চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, ২৪।এ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
„ জগদীশ ভট্টাচার্য, ৩৫ স্কটস্ লেন, কলিকাতা-৯
„ জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৩।এ একডালিয়া প্লেস, কলিকাতা-১৯
„ দেবপ্রসাদ ঘোষ, ৫৯বি আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯
„ নরেন্দ্রনাথ বসু, ৪৫ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
„ পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ৩০২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯
„ পুলিনবিহারী সেন, ৫৪বি হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯
„ প্রবোধকুমার ঘোষ, ১বি রসা রোড, কলিকাতা-২৫
„ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ৬৩সি হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯
„ মনোজ বসু, পি ৫৬০ লেক রোড, কলিকাতা-২৯
„ মন্মথনাথ সান্যাল, ৪০বি নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-১১
„ শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৪৩ ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
„ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, ১০বি রাধামাধব গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৩
„ সুরেশচন্দ্র দাস, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
„ সুশীল রায়, ১৩বি কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯
„ সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ৩০২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯

। শাখা পরিষদ প্রতিনিধি ।

শ্রীঅতুল্যচরণ দে, পঞ্চাননতলা, নৈহাটি, ২৪ পরগণা
„ চিত্তরঞ্জন রায়, পি ৮ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০
„ মাণিকলাল সিংহ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া
„ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ১৪৭ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী

। পৌরসভার প্রতিনিধি ।

শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯এ।১ রাজা মণীন্দ্র রোড, পাইকপাড়া, কলিকাতা-৩৭

সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালা

কালিদাসের মেঘদূত ॥ শ্রীরাজশেখর বসু -অনূদিত ১॥০

পদ্যানুবাদ যতই সুরচিত হউক, তাহা মূল রচনা অবলম্বনে লিখিত-স্বতন্ত্র কাব্য। এই গ্রন্থে প্রথমে মূল শ্লোক, তাহার পর যথাসম্ভব মূলানুযায়ী স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। পুনর্বার অন্বয়ের সহিত যথাযথ অনুবাদ ও প্রয়োজন অনুসারে টীকা দেওয়া হইয়াছে।

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ॥ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অনূদিত

প্রথম খণ্ড ১॥০ দ্বিতীয় খণ্ড ১॥০

অশ্বঘোষ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আরম্ভে বর্তমান ছিলেন। কাব্য হিসাবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত য়ুরোপীয় পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে কালিদাসের কাব্যের সমতুল্য মনে করেন। পৃথিবীর নানা ভাষায় ইহার একাধিক অনুবাদ হইয়াছে। বোধ হয় হিন্দী ব্যতীত আর কোনো ভারতীয় ভাষায় এ পর্যন্ত ইহার অনুবাদ হয় নাই।

কবিতাবলী ॥ নারী-কবিগণ-রচিত। শ্রীরমা চৌধুরী-অনূদিত ২৲

বাংলা ভাষায় কোনো অনুবাদ না থাকায় বৈদিক নারী-ঋষি ও উত্তরকালীন নারী-কবিদের রচনা সাধারণের অপরিজ্ঞাত ছিল। এই গ্রন্থে ২৬ জন বৈদিক নারী-ঋষির ২৫৩টি ঋক, ৩২ জন নারী-কবির ১৪২টি সংস্কৃত কবিতা ও ৯ জন নারী-কবির ১৬টি প্রাকৃত কবিতার বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত।

২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত।
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

দ্বিষষ্টিতম বর্ষ । দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বিষষ্টিতম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা

॥ বিষয়-সূচী ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
১৩৬২

কবি শ্রীবল্লভ-রচিত কালুরায়ের গীত

শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বাংলা সাহিত্যে দক্ষিণ রায় দেবতা সুপরিচিত। দক্ষিণ রায়ের পূজা প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য লইয়া মাধবাচার্য্য, কৃষ্ণরাম দাস, রুদ্রদেব, হরিদেব এবং বলরাম 'রায়-মঙ্গল' কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের অনেকেরই পুঁথি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। মাধবাচার্য্যের গ্রন্থকীর্তির কথা কৃষ্ণরাম দাসের রচনার মধ্যে উল্লেখ ব্যতীত আর কোন নিদর্শন মিলে নাই। রায়মঙ্গল কাব্যের অবিসম্বাদিত শ্রেষ্ঠ কবি কৃষ্ণরাম দাস। 'রায়মঙ্গল' কাব্য বলিতে আমরা মুখ্যত দক্ষিণ রায়ের কাব্যকাহিনী বুঝিতাম, কারণ, দক্ষিণ রায় ব্যতীত তাঁহার সমধর্মী অপর দুই রায়ের (কালু রায় এবং রূপ রায়) কাব্যকাহিনীর সাহিত্যিক নিদর্শন কিছুই পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধটিতে কালুরায়-সম্পর্কিত যে কাব্যকাহিনী পাওয়া গেল, তাহাতে 'রায়মঙ্গলে'র সংজ্ঞা ব্যাপকতা লাভ করিল।

'কবি শ্রীবল্লভ' নামধেয় একজন কবির কথা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়। তিনি শীতলামঙ্গলের অন্যতম প্রখ্যাত রচনাকার। কবি শ্রীবল্লভ আত্মপরিচয় সম্পর্কে বলিয়াছেন,—

পিতামহ পুরুষোত্তম শ্রীরঘুবল্লভ নাম
শ্রীলোচন তাহার কুঙার।
তস্য সুত অভিরাম অশেষ গুণের ধাম
চিরকাল চেতোর ভেতর ॥
তস্য সুত শ্রীগোপাল মান্দারণে কতকাল
নিবাস করিল বন্দীপুর।
শ্রীবল্লভ তস্য সুত গোবিন্দচরণে রত
হরি বল পাপ যাক দূর ॥

অর্থাৎ কবি শ্রীবল্লভের পিতার নাম শ্রীগোপাল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে কবি এবং কাব্যের আলোচনা করিতেছি, সেই কবির নামও কবি শ্রীবল্লভ এবং আলোচ্য কাব্যের নাম 'কালু রায়ের গীত।' এই পালা-গীতের পুঁথিটি খুবই সংক্ষিপ্ত; তবে সম্পূর্ণ। এই পুঁথির সহিত আরো কয়েকটি পাতা পাওয়া গিয়াছে। ঐ পাতা কয়টিতে যে অসম্পূর্ণ কাহিনীর পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে মনে হয়, ইহা শীতলামঙ্গলেরই অংশবিশেষ। এই দুইটি কাব্য একই

কবির রচনা বলিয়া আমি মনে করি। কারণ, দুইটি কাব্যের লিপি-সাদৃশ্য এবং কবিধর্ম্মের মূলগত ঐক্যের সূত্রটি অত্যন্ত স্পষ্ট। শীতলামঙ্গলের মধ্যে ভণিতায় কবি এক জায়গায় বলিয়াছেন :—

শ্রীকবিবল্লভ গান শ্রীগোপীনন্দন।
নিরবধি ধ্যান করে গোবিন্দচরণ॥

ইহা হইতে আলোচ্য কবি যে 'শ্রীগোপাল-সুত' নহেন এবং তিনি 'শ্রীগোপী-নন্দন' তাহা জানা গেল। ইহা ব্যতীত আত্ম-পরিচয়জ্ঞাপক কোন শ্লোক কবির রচনার মধ্যে পাওয়া যায় নাই। ভণিতার ক্ষেত্রে কবি স্বনামের উল্লেখ ব্যতীত আর কিছু করেন নাই। যেমন :—

(১) রায়ের চরণ তলে, শ্রীকবি বল্লভে বলে,
সংকটে রেখ দিয়া পদছায়া।
(২) শ্রীকবি বল্লভ গান রায়ের কিঙ্কর।
(৩) রায়ের চরণে নম হউক নিজ চিত।
শ্রীকবি বল্লভ গান কালু রায়ের গীত॥

'কালু রায়' নিম্নবঙ্গের অন্যতম অরণ্যদেবতা। 'কোন কোন স্থলে দক্ষিণ রায় একাকী পূজিত হন না। কালু রায় নামে কুম্ভীরারোহী আর এক বীর দেবতার মূর্তি (মুণ্ডমাত্র) পূজিত হয়। এই কাব্যেও [দক্ষিণ-রায়মঙ্গল কাব্যে] সেই কালু রায়ের কথা আছে। অনেক স্থলে এই কালু রায় ও দক্ষিণ রায় ক্ষেত্রপালরূপে পূজিত হন। অনেকে ইহাদিগকে শিবানুচর ভৈরব বলে (ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রবন্ধ)।' বর্তমান কাব্যে কালু রায়কে আমরা কুম্ভীরারোহী দেবতারূপে দেখিতে পাই না। এখানে তিনিও দক্ষিণ রায়ের মত ব্যাঘ্র-দেবতা। কারণ, কালুরায় যদি কুম্ভীরদেবতা হইতেন, তাহা হইলে নদী পার হইবার জন্য পাটনীকে মিনতি করিয়া বলিতেন না—

ধর্ম্ম কর মনে বলি তুয়া স্থানে
নদী মোরে কর পার।
না ভাবিহ আন কর অবধান
কহে প্রভু সারদ্ধার॥

কালু রায় যে অরণ্যদেবতা, তাহা এই কাব্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। কালু রায় নিজেই বলিতেছেন—

'জঙ্গল ঈশ্বর আমি দেব কালুরায়।
অপমান মহারাজা করিল আমায়॥'

এবং তাঁহার বাহন যে ব্যাঘ্র, তাহাও জানা যায়—

কহ প্রভু রূপ রায় কিবা বুদ্ধি করি।
এতগুলা বাঘ আমি বৃথা লয়্যা ফিরি॥

কালু রায় কোন্ অঞ্চলের অরণ্যদেবতা, তাহা অনুমান করা যায়। কৃষ্ণরাম দাসের 'দক্ষিণ রায় মঙ্গলে' বর্ণিত আছে যে, যখন দক্ষিণ রায় ও বড় খাঁ গাজীর যুদ্ধ হয়, তখন কালু রায় তাঁহাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন।—

বড় খাঁ গাজীর সাথে   মহাযুদ্ধ খনিয়াতে
দোস্তানি হইল তার পর।
কালু রায় বন্ধু বটে   সোয়ার ঘোড়ার পিঠে
একমনে পূজে কত নর ॥

*   *   *   *   *

এখন দক্ষিণ রাঢ়   সব ভাটি অধিকার
হিজলীতে কালু রায় থানা।
সর্বত্রে সাহেব পীর   সবে নোয়াইবে শির
কেহ তাহে না করিবে মানা ॥

হিজলীর অধিপতি হিসাবে এখানে কালু রায় সম্মানিত হইয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় দক্ষিণ রায় এবং বড় খাঁ গাজীকে ঐতিহাসিক পুরুষ বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। এই অনুমানকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়ারও উপায় নাই। কারণ, কালু রায়ের উপরও এই ঐতিহাসিকত্ব আরোপ করা চলে কয়েকটি কারণে। (১) কালু রায়ের অধীনস্থ ব্যাঘ্রদের প্রধান হইলেন রূপী রায়। 'ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত তপ্পে বরদার মধ্যে নন্দ কাপাসিয়া বাঁধের অস্তিত্ব স্থানে স্থানে এখনও দৃষ্ট হয়। মৃগাঙ্কবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ঐ স্থানের সুলতানপুর নামক গ্রামে প্রাচীন 'ধর্ম্মমঙ্গল' গ্রন্থে উল্লিখিত জালন্দার গড় ছিল। ঐ রাস্তাটি সেই গড়ের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া গিয়াছিল। মাণিক গাঙ্গুলী, বলরাম চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কবিগণের রচিত ধর্ম্মমঙ্গলে ময়নার রাজা লাউসেনের "কামদল বাঘবধ" একটি বিশিষ্ট পালা। উহার উপাখ্যানভাগ হইতে জানা যায় যে, জালন্দার গড়ের রাজা জল্লাদ বা জালালশিখর একদা মৃগয়া করিতে যাইয়া তারাদীঘির জঙ্গলে একটি ব্যাঘ্রশাবক পাইয়া তাহাকে পুত্রস্নেহে পালন করিতে থাকেন। কিন্তু কামদল বাঘ নামে পরিচিত সেই ব্যাঘ্রশাবক দিনে দিনে প্রচণ্ড বিক্রমশালী ও অত্যাচারী হওয়ায় রাজা তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখেন। কামদল দেবরাজ ইন্দ্রের নর্ত্তক ছিল; অভিশাপে ব্যাঘ্র-জন্ম গ্রহণ করে। রাজা জালালশিখর শৈব ছিলেন—তাঁহার ভক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত হরপার্ব্বতী একদিন ভিক্ষার্থে আগমন করেন, রাজা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তাঁহাদিগকে "কুকুর" লেলাইয়া দেন। দেবী কুপিত হইয়া কামদলকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলে, কামদল নগর ছারখার করিয়া দেয়। রাজা প্রাণভয়ে গৌড়ে আশ্রয় লয়েন। সেই অবধি কামদল গৌড়ে রাজা হইয়া বসে ও অজেয় হইয়া উঠে। পরে গৌড়েশ্বরের শ্যালিকাপুত্র বীর লাউসেন তাহাকে মারিয়া ফেলেন।...প্রাচীন কালে এই জেলার একাংশে ব্যাঘ্ররাজের অধিকারের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। সেই বংশের কোন সন্তান কর্তৃক জালন্দার গড়ের

রাজার পরাজয়কাহিনী—রূপী বাঘিনীর শাবক কামদল বাঘের জালন্দার অধিকারের রূপ কি না বলা যায় না।'* (মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু)।

মেদিনীপুর জেলা যে এক সময় ব্যাঘ্ররাজ অধ্যুষিত ছিল, তাহার প্রমাণ আজিও রহিয়াছে নাম-পদবীতে। বিশেষত মাহিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের 'বাঘ' (বাগ) পদবীর বহুল প্রচলন আছে। বর্ত্তমান পুথির লিপিকারের গ্রামের নাম 'কামালপুর' এই গ্রাম এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী খাচ্চাপুর, বাগবেড়, কিসমৎ প্রভৃতি গ্রামে বহু লোকের 'বাঘ' পদবী পাওয়া যায়। 'বাঘেদের পুকুর' নামে একটি বড় দীঘি খাজাপুর গ্রামে রহিয়াছে। রূপী বাঘের প্রভু কালু রায় সেই হিসাবে অনৈতিহাসিক নাও হইতে পারেন।

আলোচ্য কাব্য-কাহিনীতে দেখা যায় যে, কালু রায় তাঁহার অধীনস্থ ব্যাঘ্রগুলিকে গাড়রের (মেষশাবকের) ছদ্মবেশে রাজা খগেশ্বরের রাজ্যে লইয়া চলিয়াছেন। পথে নদী পার হইয়া যাইতে হইবে। অবশেষে নদী পার হইলেন। হুগলী জেলা এবং মেদিনীপুর জেলার সীমান্তবর্ত্তী রূপনারায়ণ নদের তীরবর্ত্তী 'গাড়র পারের ঘাট' নামে একটি ঘাট আছে। এই ঘাটের সহিত বর্ত্তমান আখ্যায়িকার একটি সহজ যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু ঐ ঘাটের অপর তীরবর্ত্তী মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার শ্যামসুন্দরপুর গ্রামে কালু রায় নামক অরণ্যদেবতাও অধিষ্ঠিত আছেন। মাঠের শেষে নদীর ধারে বিল্ববৃক্ষের তলায় তাঁহার বেদী। দুইটি ব্যাঘ্র দুই পাশে, মাঝখানে একটি ঘট স্থাপিত রহিয়াছে। পূজা হয় বিল্বপত্রে এবং বনফুলে। পূজা করেন নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা। কালের বিবর্ত্তনের পথ ধরিয়া এখানে কালু রায় আপনার কর্ম্মক্ষমতাকে বিস্তারিত করিয়াছেন। কারণ, অরণ্য এবং ব্যাঘ্র যে সময়ে বিরল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে কেবল অরণ্য-দেবতা হইয়া থাকিলে তাঁহাকে অকালমৃত্যু বরণ করিতে হইত। সেই জন্য নিরক্ষর পল্লীবাসীর অকপট বিশ্বাসের ভিত্তিতে কালু রায় আজ অরণ্য-দেবতার স্তর হইতে গ্রাম-দেবতায় পরিণত হইয়াছেন। কাহারো কিছু হারাইয়া গেলে লোকে কালু রায়ের নিকট মানত করে, নৌকা যদি নদীর চরে আটকাইয়া যায়, তবে নৌকাবাহীরা এই দেবতারই নিকট পূজা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আবেদন জানান,

---

* সমুদ্রগুপ্তের খোদিত লিপিতে দেখা যায় যে, তিনি দক্ষিণাপথ জয় করিতে যাত্রা করিয়া, পথে মগধ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের দুই জন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ঐ দুই জনের মধ্যে প্রথম দক্ষিণ-কোশলরাজ মহেন্দ্র ও দ্বিতীয় মহাকান্তারের অধিপতি ব্যাঘ্ররাজ। * * * প্রাচীন দন্তপুর বা আধুনিক দাঁতন পরগণার উত্তরে অবস্থিত কেশিয়াড়ি, গগনেশ্বর প্রভৃতি পরগণার কাগজপত্রে 'বাগভূম' নামে পরিচিত। জনশ্রুতি—প্রাচীন কালে ঐ প্রদেশ বাগ নামক জনৈক অনার্য্য-জাতীয় রাজার অধিকৃত ছিল। অদ্যাপি ঐ প্রদেশের স্থানে স্থানে কয়েকটি পুরাতন পুষ্করিণী বাগবংশীয় রাজাদের কীর্ত্তিচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই বাগ-ভূমের সহিত ব্যাঘ্ররাজের অধিকৃত ভূভাগের অবস্থানের ঐক্য দেখিয়া মনে হয়, খোদিত লিপিতে উল্লিখিত ব্যাঘ্ররাজ ও বাগভূমের বাগ-রাজা একই ব্যক্তি ছিলেন। বাগভূম প্রদেশের স্থানে স্থানে এখনও নিবিড় জঙ্গল বিদ্যমান। (মেঃ ইঃ—যোগেশচন্দ্র বসু)।

গরুর যে-কোন রকম অসুখ হইলে গ্রামবাসীরা এই দেবতারই শরণ লয়েন। মোট কথা, বিপদ-তারণ দেবতা হিসাবে বর্তমানে কালু রায় পল্লীবাসীর নিকট পূজা পাইয়া আসিতেছেন। যাঁহারা কালু রায়ের নিকট মানত করেন, তাঁহারা মাটির ঘোড়া দিয়া পূজা দেন। কারণ, তাহাতে এই ঠাকুর না কি অতিশয় সন্তুষ্ট হন। পূর্ব্বেই আমরা ধর্ম্মমঙ্গলের উদ্ধৃতি অংশে দেখিয়াছি—

কালু রায় বন্ধু বটে　　　সোয়ার ঘোড়ার পিঠে
একমনে পূজে কত নর।

লোকবিশ্বাস অনুযায়ী জানা যায়, এই দেবতা শিবানুচর। আলোচ্য কাব্যকাহিনীর মধ্যেও ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়,—

যেন মত ভাই　　　আছে ঠাঁই ঠাঁই
কালিকা আমার মাতা।
করিল পালন　　　করিয়া যতন
শুনহ আমার কথা॥

কোন কোন সাহিত্যের ইতিহাসকার কালু রায়কে কালু গাজী বলিয়াছেন। এরূপ বলিবার কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাই না। আলোচ্য পুথিটিতে কালু রায়ের অপর নাম 'ঝাড়েশ্বর' বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ কালু রায় নামক ধর্ম্মশিলার খোঁজ পাইয়াছেন। আমার মনে হয়, মূলত তাঁহারা এই 'অরণ্য-ঈশ্বর'ই ছিলেন, পরবর্ত্তী কালে বিবর্ত্তনের পথ বাহিয়া ধর্ম্মশিলায় পর্য্যবসিত হইয়াছেন। গ্রাম-দেবতার এইরূপ গোত্রান্তর একেবারে বিরল বলিয়া মনে হয় না।

'কালু রায়ের গীত' পুঁথিটি খুবই সংক্ষিপ্ত। ইহা হইতে একজন কবির কাব্য-প্রতিভা নির্ণয় করা দুরূহ। বর্তমান কবি যে আরো কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। যাহাই হউক, এই অতিক্ষুদ্র কাব্যটিতেও কবিত্বের কিরণপ্রভায় যে কয়েকটি শিশিরবিন্দুর ছবি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আমরা মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই। কবি রূপী রায়ের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে অপাংক্তেয় নয়।

আসিয়া ত রূপী রায় দিল দরশন।
পুনরায় দেখি হৈল হরষিত মন॥
নখগুলা দেখি যেন ছুরি খাঁড়া পারা।
লোচন ফিরায় বাঘ আকাশের তারা॥
দন্তগুলা দেখি যেন পাটুয়া কোদাল।
চারি পদ দেখি যেন বড়ই দৃঘাল॥

ইহা ছাড়া, পাটনীর সহিত ছদ্মবেশী কালু রায়ের কথোপকথন অংশও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকাব্যের পুরাতন রীতি এখানেও অনুসৃত হইয়াছে। পূজা প্রচারের

জন্য কিছু ছলনা, কিছু বা অহেতুক ভীতি প্রদর্শন কিংবা সাময়িক প্রাণ-হরণ—এ সবের কোনটিই এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় বাদ যায় নাই। মঙ্গলকাব্যের পরিচয় ইহার মধ্যে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে। বর্তমান পুঁথিটিতে রচনাকারের যেমন বিস্তৃত পরিচয় নাই, তেমনি কালনিরূপণের কোন নির্দেশও নাই। লিপিকর্ত্তার নাম শ্রীকার্ত্তিক শর্ম্মা, সাংকামালপুর। (ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রাম।) পুঁথির লিপিনৈপুণ্য দেখিয়া ইহার লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ শতক বলিয়া অনুমান করা যায়। পুথিখানিতে বর্ণাশুদ্ধি দোষ যথেষ্ট রহিয়াছে। জ-ভেদ, ন-ভেদ, শ-ভেদ, রেফ, র-ফলা, য-ফলা, ব-ফলা প্রভৃতির ব্যবহার যথোপযুক্ত হয় নাই। কবির কাব্যনৈপুণ্য সম্পর্কে বিশেষ পরিচয় বর্তমান প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত কাব্যটির মধ্যেই পাওয়া যাইবে।

॥ শ্রীশ্রীরাম: ॥

॥ ১ ॥

কানন সৃজন করি কনক আসনে।
বসি কালু রায় তবে বিচারিল মনে ॥
কালু রায় রূপ রায় দক্ষিণ রায় আর।
কালু রায় বলে শুন দেব রূপ রায় ॥
শুণ থেকে গৃহে বস্যা গুঁয়াইলাম দিন।
মহী মধ্যে না রহিল মহিমার চিন[১] ॥
সকল জীবেতে আছে আমার অধিকার।
মনুষ্যের গৃহে পূজা না হয় আমার ॥
যুক্তি হেতু ঝাড়েশ্বর ভায়েরে জিজ্ঞাসে।
পৃথিবীতে পূজার প্রচার হয় কিসে ॥
কহ প্রভু রূপ রায় কিবা বুদ্ধি করি।
এতগুলা বাঘ আমি কোথা লয়্যা ফিরি ॥
কেমনে হইব পূজা বুদ্ধি না আইসে।
চাহিয়া রায়ের পানে রূপরায় হাসে ॥
পাত্র বাণেশ্বরে প্রভু ডেকে আন তুমি।
পূজার বৃত্তান্ত পরে বোলে দুব[২] আমি ॥
পাত্র বাণেশ্বর বলে স্মরণ করিল।
আসি বাণেশ্বর পাত্র উপনীত হোল ॥
রায়ের চরণে নম হউক নিজচিত।
শ্রীকবি বল্লভ গান কালু রায়ের গীত ॥

॥ ২ ॥

কানন সৃজন করি কানের অধিকারী
যুক্তি করে সঙ্গে পাত্র লয়্যা।
আমি কাননের রাজা কোন রূপে হবে পূজা
পাত্র কহে কৃতাঞ্জলী হয়্যা ॥
পাত্র বাণেশ্বর বলে রায়ের চরণ তলে
যাও তুমি খাড়ির নগর।
খগেশ্বর রাজা আছে বলি আমি তব কাছে
পূজা মাগি লেহ ঝাড়েশ্বর ॥
রাজারে বুঝায়ে তথা কহিবে সকল কথা
যদি রাজা পূজা নাই করে।
সাবধানে শুন তুমি উপায়ে সৃজিব আমি
ব্রাহ্মণ লয়্যা যাব রাজঘরে ॥
পাত্র বাণেশ্বর কয় শুন রায় মহাশয়
কর তুমি পূজার সংবিধান।
দশ অবতার ধরি অখিল ব্রহ্মাণ্ড হরি
মীনরূপে প্রভু ভগবান ॥
ভারতে নাহিক মোর পূজা কহে কাননের রাজা
নৃপতিরে করহ ছলনা।
দুঃখ না ভাবিয়া পান কহি প্রভু ভগবান
পৃথিবীতে করহ ঘোষণা ॥

---

১ চিহ্ন ২ দিব

পাত্র মুখে শুনি রায়　　হরষিত হইল্য তায়
　　রূপী বাঘে আনে ডাক দিয়া।
রায়ের চরণ তলে　　শ্রীকবি বল্লভে বলে
　　সংকটে রেখ দিয়া পদ ছায়া॥

*　　*　　*

॥ ৩ ॥

পয়ার॥

পাত্রের বচন শুনি হরষিত রায়।
হেনকালে রূপী বাঘে ডাকিল তরায়॥
আসিয়া ত রূপীবাঘ দিল দরশন।
পুনরায় দেখি হৈল হরষিত মন॥
নখগুলা দেখি যেন ছুরি খাঁড়া পারা।
লোচন ফিরায় বাঘ আকাশের তারা॥
দন্তগুলা দেখি যেন পাটুয়া কদাল।[১]
চারি পদ দেখি যেন বড়ই দৃঘাল॥[২]

*　　*　　*

রায়ের সাক্ষাতে রূপী উপস্থিত হয়্যা।
শতেক প্রণাম করে চরণে ধরিয়া॥
রূপী বাঘ বলে শুন দেব ঝাড়েশ্বর।
ক্ষুধার কারণে মোরা এসেছি অন্তর॥
হেনকালে রূপীবাঘে বলে আশ্বাসিয়া।
খাড়ির নগরে যাব পূজার লাগিয়া॥
বাঘের অঙ্গেতে রায় বুলাইল কর।
কনকের জিঞ্জির দিল পিষ্ঠেতে[৩] তাহার॥
বাঘেতে চাপিয়া রায় করিল গমন।
খাড়ির নগরে গিয়া দিল দরশন॥
নিদ্রাগত আছে রাজা পালঙ্ক উপরে।
কালু রায় সপ্নে কয় বসিয়া শিয়রে॥
শুনহ খাড়ির রাজা আমার বচন।
তমার[৪] নগরে আমি পূজার কারণ॥
কালু রায় আমার নাম জঙ্গলের রাজা।
খাড়ির নগরে যদি কর মোর পূজা॥

অন্য দেবতার পূজা সকল সংসারে।
মোর পূজা নাই কেন তমার নগরে॥
রায়ের চরণে নম্র হউক নিজ চিত।
শ্রীকবি বল্লভ গান কালু রায়ের গীত॥

॥ ৪ ॥

নমো নমো মহারায় লইলাম স্মরণ।
কৃপা করি কর দয়া কালুর নন্দন॥
স্বপ্ন কহিল রায় পূজার লাগিয়া।
নিদ্রা তেজি উঠে রাজা চমকিত হয়্যা॥
পালঙ্ক উপরে যদি বসিল রাজন।
শিয়রে বসিয়া আছে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ॥
দু কর জুড়িয়া রাজা করিল প্রণতি।
আশ্বাস করিয়া বলে জঙ্গলভূপতি॥
করহ আমার পূজা রাজা খগেশ্বর।
তবে পূজা হবে মোর পৃথিবী ভিতর॥
বিষ্টু বিষ্টু[৫] বলি দ্বিজ কর্ণে দিল হাত।
তিন বার সঙরে ঠাকুর জগন্নাথ॥
বণ্যিকের[৬] পঞ্চ কোড়ি লয়্যা যাও তুমি।
করিতে তোমার পূজা না পারিব আমি॥
তোমাকে করিলে পূজা কোন ফল হব।
বিষ্টুরে করিলে পূজা সময়ে তরিব॥
এতেক শুনিয়া রায় জঙ্গল ঈশ্বর।
স্বপ্নকথা কয় গিয়া রাণীর গোচর॥
শুন গো রাজার রাণী বলি গো তোমারে।
মোর পূজা নাই কেন তোমার নগরে॥

*　　*　　*

জঙ্গল ঈশ্বর আমি দেব কালু রায়।
অপমান মহারাজা করিল আমায়॥
যদি পূজা কর তুমি রায়ের চরণে।
তবে সে আমার পূজা হয় ত্রিভুবনে॥
স্বপন দেখিয়া রাণী নিদ্রা ভঙ্গ হইল্য।
রাজার নিকটে গিয়া কহিতে লাগিল॥

১ কোদাল　২ দীঘল　৩ পৃষ্ঠেতে　৪ তোমার　৫ বিষ্ণু বিষ্ণু　৬ বণিকের

অবধান মহারাজ করি নিবেদন।
অপরূপ দেখি কেন দারুণ স্বপন ॥
স্বপনের কথা রাজা শুন মন দিয়া।
কালু রায় এসেছিলেন যাহার লাগিয়া ॥
শুনিয়া রাণীর কথা না দিল উত্তর।
কোপানল হইল্য বুঝি জঙ্গল ঈশ্বর ॥
না কৈল খাড়ির রাজা আমার পূজন।
মন দুঃখে মহারায় করিল গমন ॥
জঙ্গলেতে গিয়া রায় হৈইল্য উপনীত।
পাত্র বাণেশ্বর তথা হইল্য উপনীত ॥
শুন পাত্র বাণেশ্বর আমার বচন।
না কৈল্য আমার পূজা খাড়ির রাজন ॥
রায় বলে শুন তবে পাত্র বাণেশ্বর।
আর না হইল পূজা পৃথিবী ভিতর ॥
কয় পাত্র বাণেশ্বর কি না বুদ্ধি করি।
এতগুলা বাঘ আমি বৃথা লয়া ফিরি ॥
মনে না করহ দুঃখ কাননের নাথে।
অখনি লইব পূজা নৃপতির কাছে ॥
হুংকারিয়া আনে রায় যত বাঘগণ।
বল্লভ বলেন কর দেবের স্মরণ।

*   *   *

রায় মধ্যে পাত্র তখন বুদ্ধি সৃজিল।
রায়ের হুজুরে গিয়া কহিতে লাগিল ॥
দু কর জুড়িয়া পাত্র কহে দড়বড়।
যত বাঘগণে আর করহ গাড়র ॥
পদ্মহস্ত বুলাইল মাদলের গায়।
গাড়র হইল বাঘ রায়ের কৃপায় ॥
গাড়র দেখিয়া সুখী জঙ্গল ঈশ্বর।
বেপার করিতে যাব খাড়ির নগর ॥
আপনি হইল রায় বৃদ্ধ দ্বিজবর।
পাত্র বানেশ্বর হইল সঙ্গের কিঙ্কর ॥
গাড়র হইল সঙ্গে বাইশ কাহন।
দুই জন হরষিতে করিল গমন ॥

লইয়া গাড়রগণ করিল পয়ান।
ধুমর্যা গাড়র হইল পালের প্রধান ॥
গাড়রের পাল যত আগে আগে ধায়।
তাহার পশ্চাৎ যান জঙ্গলের রায় ॥
একে একে কত দেশ পশ্চাত করিয়া।
সারেঙ্গ নদীর তটে উত্তরিল গিয়া ॥
জিজ্ঞাসা করিল রায় চাহি পাত্র পানে।
এখানে সারেঙ্গ নদী হয়েছে কেমনে ॥
পাত্র বলে মহারায় শুন সমাচার।
যে কালে হইল প্রভু মীন অবতার ॥
প্রথমে গোবিন্দ নাম সারেঙ্গ সুন্দর।
সে কাল হইতে নদী শুন ঝাড়েশ্বর ॥
কেমনে হইব পার বুদ্ধি না আইসে।
চাহিয়া রায়ের পানে বানেশ্বর হাসে ॥
হীরা পাটনী তবে ঘাটে দেই খিয়া[১]।
ডাকেন দক্ষিণ রায় দ্বিজরূপ হয়্যা ॥
হেন কালে পাটনী দিলেন দরশন।
বল্লভ বলেন রায় দিবে হে স্মরন ॥

*   *   *

সারেঙ্গ নদীর তটে জঙ্গল ঈশ্বর।
হীরা পাটনী আইল্য রায়ের গোচর ॥
কর যুড়ি পাটনী করে নিবেদন।
কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে বসিলা তিন জন ॥
ব্রাহ্মণ কহেন কথা পাটনীর তরে।
কতদিন খিয়া দেও সারেঙ্গের তীরে ॥
কি নাম তোমার বটে কোন দেশে ঘর।
পাটনী বলেন গোঁসাই শুন দ্বিজবর ॥
খাড়ির দেশেতে ঘর শুন দ্বিজমণি।
মোর নাম বটে গোঁসাই হীরা পাটনী ॥
চিরকাল এই ঘাটে দিয়া থাকি খিয়া।
তুমি কোন দেশে যাবে কহ বিবরিয়া ॥

---

১ খেয়া

গাড়র তোমার সঙ্গে কিসের কারণ।
লক্ষণ তোমার দেখি গাড়রে ব্রাহ্মণ ॥
গাড়র বেপার করি সকল সংসারে।
বেচিতে গাড়র যাই খাড়ির নগরে ॥
যদি পার কর মোরে শুনহ পাটনী।
দু কর যুড়িয়া বলে রায় গুণমণি ॥
কোন দেশে নিবাস কহ দ্বিজবর।
শ্রীবল্লভ গান রায়ের কিঙ্কর ॥

॥ ৪ ॥

ত্রিপদী।

কহেন ব্রাহ্মণ　　পাটনী নন্দন
কি কব দুখের কথা।
গহন কাননে　　ফিরি রাত্র দিনে
কপালে লিখিল ধাতা ॥
যেন কত ভাই　　আছে ঠাঁই ঠাঁই
কালিকা আমার মাতা।
করিল পালন　　করিয়া যতন
শুনহ আমার কথা ॥
ধর্ম্ম কর মনে　　বলি তুয়া স্থানে
নদী মোরে কর পার।
না ভাবিহ আন　　কর অবধান
কহে প্রভু সারদ্ধার ॥
গাড়র সহিতে　　লয়া যায় সাথে
খগেশ্বর রাজার স্থানে।
কি বলিব আর　　কর নদী পার
শ্রীকবিবল্লভ ভনে ॥

॥ ৫ ॥

ব্রাহ্মণ বলেন শুন পাটনী নন্দন।
নদী পার কর মোরে দেখিয়া ব্রাহ্মণ ॥
পাটনী বলেন তবে দুই কর যুড়ি।
যদি পার হবে দ্বিজ কিছু দেহ কড়ি ॥
ব্রাহ্মণ বলেন বাছা কড়ি নাই সাথে।
আশীষ[১] করিয়া আমি থাকি যে ভারথে ॥
পাটনী বলেন দ্বিজ এই কথা ছাড়ি।
একেক গাড়রে লব ছয় পন কড়ি ॥

যদি নাঞি কড়ি দিবে শুন দ্বিজবর।
কৃপা করি দিয়া যাও একটি গাড়র ॥
আমার পিতৃশ্রাদ্ধ হবে শুন দ্বিজমণি।
একটি গাড়র মোরে দাও না আপনি ॥
এত শুনি কালু রায় হাসিতে লাগিল।
চাঁদা বাঘে দিয়া প্রভু গমন করিল ॥
নিমন্ত্রিয়া আনে তবে যত বন্ধুগণে।
কুটুম্ব আইল সকল পাটুনী ভবনে ॥
গাড়র মারিব বলে যেই জন যায়।
একে একে বাঁধা বাঘ সভাকারে খায় ॥
এইরূপ কত জন করিল ভক্ষণ।
আসি উপনীত হোল পাটুনী নন্দন ॥
পাটুনী দেখিয়া বাঘ নিজ মূর্ত্তি ধরে।
বাঘ দেখে হীরা তবে বিষায় অন্তরে ॥
রাজার নিকটে গিয়া উপনীত হোল।
একে একে যত কথা বলিতে লাগিল ॥
দিবা গেল সন্ধ্যা হোল যামিনী প্রবেশ।
কালু রায় হইলেন ব্রাহ্মণের বেশ ॥
সভাকার হোল তবে নিদ্রা আকর্ষণ।
শিয়রে বসিয়া কথা কহিছে ব্রাহ্মণ ॥
কালু রায় আমার নাম জঙ্গলের রাজা।
পুত্রের কল্যাণে রাজা কর মোর পূজা ॥
মরেছে যতেক নর বাঁচাইয়া দিব।
মন বাঞ্ছা সিদ্ধ করে তবে পূজা নিব ॥
এত কথা বলে প্রভু গমন করিল।
চাঁদা বাঘের কাছে গিয়া উপনীত হোল ॥
খেয়্যাছিল[২] যত লোক উগারিয়্যা[৩] দিল।
সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাদের প্রাণ সঞ্চারিল ॥
শক্তিশেলে মেরেছিল যেন ঠাকুর লক্ষণ।
ওষধ পরশ মাত্র জীলেন[৪] যেমন ॥
সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাদের প্রাণ সঞ্চারিল।
নিদ্রাভঙ্গ কোরে যেন উঠিয়া বসিল ॥
প্রভাতে আনন্দ দেখে যত প্রজাগণে।
কালু রায়ের পূজা আরম্ভিল নিকেতনে ॥
জয় জয় শব্দ হোল রাজার ভুবনে।
শ্রীকবিবল্লভ রচে রায়ের চরণে ॥

---

১ আশীষ, আশীর্ব্বাদ　২ খেয়েছিল　৩ উগারিয়া　৪ জীবিত হলেন

বাংলা সংবাদপত্রে বাংলা গ্রন্থপরিচয়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম. এ.

সোমপ্রকাশ, ৪ আশ্বিন, ১২৭১, পৃঃ ৭০৫

বিজ্ঞাপন—

ষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। অনেকগুলি পুস্তকের মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

মেঘনাদবধ কাব্য ১ম ভাগ সটীক	১৲	প্রাণি বৃত্তান্ত	৷৹
ঐ ২য় ভাগ	১৲	প্রথম পাঠ	৴৹
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	৷৷৹	দ্বিতীয় পাঠ	৴৹
বীরাঙ্গনা কাব্য	৷৷৹	তৃতীয় পাঠ	৷৴৹
ব্রজাঙ্গনা কাব্য	৷৹	বিক্রমোর্ব্বশী	১৲
কৃষ্ণকুমারী নাটক	১৲	পিশাচোদ্ধার	৷৹
শর্ম্মিষ্ঠা নাটক	১৲	শিক্ষাপ্রণালী	২৲
ঐ ইংরাজী অনুবাদ	১৲	গোলকের উপযোগিতা	৷৹
বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ	৷৵৹	মানসাঙ্ক ১ম ভাগ	৴১০
একেই কি বলে সভ্যতা ?	৷৹	বীরবাহু কাব্য	৷৹
সীতা হরণ	৸৹	কবিরাজ খুড়ো	৵৹
বাসবদত্তা	৷৹	জানকী নাটক	১৲
সাহিত্য মুক্তাবলী	৷৹	কবিতা কৌমুদী	৷৹
সমাসমালা	৵১০	বিধবা বঙ্গাঙ্গনা	৷৷৹
প্রেমাবার হাটইন্দ	৷৵৹	সীতার অন্বেষণ	৷৹
ভূগোল সূত্র	৵১০	বীর বাক্যাবলী	৷৹
আফ্রিকার মানচিত্র	৫৲		

নগদ টাকা দিলে পুস্তক বিক্রেতাদিগকে সকল পুস্তকেই শতকরা ২০৲ টাকা হিসাবে কেবল শিক্ষাপ্রণালী, গোলকের উপযোগীতা ও মানসাঙ্কে ১২৷৷৹ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবেক। আফ্রিকার মানচিত্রে কমিসন নাই। নগদ টাকা দিয়া ৫০০ ভূগোল সূত্র একেবারে লইলে ২৫ টাকা হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবেক ইতি।

তাং ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ সাল

ষ্টানহোপ প্রেস শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং

নং ১৮২ বহুবাজার।

সোমপ্রকাশ—৪ আশ্বিন ১২৭১, ৭০৫ পৃঃ

বিজ্ঞাপন—

পুরাণ সংগ্রহের চতুর্দ্দশ খণ্ড।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত

শান্তি পর্ব্বের প্রথম ভাগ রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম।

প্রচারিত হইয়া বিতরিত হইতেছে, গ্রাহকগণ আসিয়া গ্রহণ করুন।

যোড়াসাঁকো শ্রীরাধানাথ বিদ্যারত্ন

শক ১৭৮৬।২৮এ ভাদ্র।

সোমপ্রকাশ—৪ঠা আশ্বিন ১২৭১, পৃঃ ৭০৫

বিজ্ঞাপন—

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্নের লিখিত গ্রন্থসকল বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও অনুমত্যনুসারে মুদ্রিত হইয়াছে।

নিদর্শন তত্ত্ব অথবা

প্রমাণ বিয়োগ বিধি।

কোম্পানী বাহাদুরের বিচারালয়ের উপযোগী শ্রীযুক্ত জন. ক্রস্ নটন কৌন্সিলি সাহেব কর্ত্তৃক অধ্যাপনা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত— দুই খণ্ডে বিভক্ত।

আকটেভো দুই খণ্ডে ৮৮৬ পাতা মূল্য ১০ ডাকের মাসুল সাহত ১০॥০

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের উপর অনরেবল শ্রীযুক্ত মেন সাহেবের কৃত টীকা।

১৮৬২ সালে মুদ্রিত ইংরাজী গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত মুন্সেফের ও উকিলের পদাকাঙ্ক্ষি মহোদয়গণের উপকারার্থে প্রকাশিত হইল—

আকটে-ভো মূল্য ৮ ডাকের মাসুল সহিত ৮॥০

গ্রাহক মহাশয়েরা ১৫ নং এশ-পেলানেড কো শ্রীযুক্ত জি. পি. হে. কোম্পানির ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

সোমপ্রকাশ—২১শে অগ্রহায়ণ ১২৭১

নূতন পুস্তক—মুরশিদাবাদের ইতিহাস।

এখানি গোয়াসের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

মুরশিদাবাদের যাবতীয় বৃত্তান্ত ইহাতে অনতিবিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম মুকসুদাবাদ ছিল, মুরশিদকুলীখাঁর নামে ইহার "মুরশিদাবাদ" নাম হইয়াছে। মুরশিদকুলী অবধি করিয়া যে যে ব্যক্তি এই স্থানে নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত ও এই নগর ও জেলার স্থান সন্নিবেশ ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিষয় গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া স্পষ্ট বোধ হইল, গ্রন্থকার অনেক পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া বৃত্তান্তগুলি সংকলন করিয়াছেন। গ্রন্থের রচনা সরল হইয়াছে। আমরা গ্রন্থের শেষভাগ হইতে কিয়দংশ ক্রমশঃ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠকগণ মুরশিদাবাদের স্থান

সন্নিবেশাদি বৃত্তান্ত সাহত গ্রন্থকারের পরিশ্রমের পরিচয় পাইবেন। এই গ্রন্থ বহরমপুরে ধনসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহার মূল্য ॥০ আনা। পৃঃ [৩৯]

সোমপ্রকাশ—২৮ অগ্রহায়ণ ১২৭১

বিজ্ঞাপন—

মহাকবি গোবর্দ্ধনাচার্য্য বিরচিত আর্য্যাসপ্তশতী শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা সংস্কৃত কলেজে অথবা ঢাকায় শ্রীনন্দকুমার গুহ কোম্পানীর পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য এক টাকা মাত্র। পৃঃ [৪৯]

সোমপ্রকাশ—২৮ অগ্রহায়ণ ১২৭১, ১২ ডিসেম্বর, ১৮৬৪ ইং

বিজ্ঞাপন—

দায়ভাগোপক্রমণিকা।—ওকালতি পরীক্ষাকাঙ্ক্ষা ও হিন্দু শাস্ত্রসম্মত দায়ঘটিত আইন জিজ্ঞাসুদিগের সাহায্যার্থ উপরোক্ত পুস্তক বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইতেছে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা অবিলম্বে কলিকাতা নং ৮ কৃষ্ণ সিংহের লেনে "বাঙ্গালি প্রেসে" অথবা বহুবাজারস্থ নং ১৮২ ভবনে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং নিকট পত্রদ্বারা স্ব স্ব নাম ধাম প্রেরণ করিবেন। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। পৃঃ [৪৯]

সোমপ্রকাশ—২৮ অগ্রহায়ণ ১২৭১। বিজ্ঞাপন। ঐ

কাদম্বরী নাটক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ষ্ট্যানহোপ প্রেসে এবং কালেজষ্ট্রীটে গুপ্ত ব্রাদর্শ দিগের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র। শ্রীনিমাই চাঁদ শীল। ৭ই ডিসেম্বর। ১৮৬৪ (পৃ. ৪৯)

সোমপ্রকাশ। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৭১। বিজ্ঞাপন। ঐ

শব্দসিন্ধু অভিধান। ৬০০ শত পৃষ্ঠায় পরিপূর্ণ শব্দসিন্ধু নামে একখানি সু।বস্তীর্ণ নবাভিধান মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে তাঁহারা কলিকাতা সভাবাজারের বটতলার উত্তর শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষের ২৪৫ নং দোকানে তত্ত্ব করিলে নগদ মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ২ টাকা মাত্র। বটতলা শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। [পৃঃ ৪৯]

সোমপ্রকাশ ৬ই পৌষ ১২৭১। বিজ্ঞাপন। ১৯ ডিসেম্বর। ১৮৬৪ ইং

আখ্যান মঞ্জুরীর শব্দার্থাবলী মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। বালকদিগের বোধসৌকার্য্যার্থ এক প্রকার অভিনব রীতি অবলম্বন পূর্ব্বক, বিশেষ্য, বিশেষণ, পদ বিভাগ প্রত্যেক পদের অর্থ এবং ভূগোল ও ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয় সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে গ্রহণেচ্ছুগণ পটল ডাঙ্গাস্থ প্রায় সমস্ত পুস্তকালয়ে ও বহুবাজার গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালায় অনুসন্ধান করিলে অথবা উক্ত পাঠশালায় আমার নিকট ডাক মাসুল ও মূল্য সহ পত্র প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীহারাধন শর্ম্মা। পৃ. [৬৫]

সোমপ্রকাশ।—১৩ই পৌষ ১২৭১। ২৬ ডিসেম্বর। ১৮৬৪ ইং

একখানি সাপ্তাহিক চিত্রিত সংবাদ পত্র আগামী ৪ঠা জানুয়ারি অবধি প্রকাশিত হইবে। ইহার মাসিক মূল্য তিন টাকা। এ প্রকার সংবাদপত্র এদেশে নাই। পৃ. [৯০]

সোমপ্রকাশ।—২০এ পৌষ ১২৭১। বিজ্ঞাপন। ২ জানুয়ারী ১৮৬৫

আমি ক্রমে ক্রমে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছি। তন্নিবন্ধন, সোমপ্রকাশে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমি আজি অবধি ইহার সম্পাদকতা ভার অন্য হস্তে সমর্পণ করিলাম। কিন্তু সোমপ্রকাশ আমার প্রতিষ্ঠিত, ইহার প্রতি আমার সবিশেষ স্নেহ আছে, অন্য অন্য অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের অবিরোধে যতদূর সাধ্য সাহায্য দান দ্বারা ইহার উন্নতি সাধন চেষ্টায় কখনও পরাঙ্মুখ হইব না। অতঃপর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য বিল ও পত্রাদি স্বাক্ষর করিবেন। আর যাঁহারা সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ে পত্রাদি পাঠাইবেন তাঁহারা শিরোনাম স্থলে "সোমপ্রকাশ সম্পাদকেষু" এই মাত্র লিখিবেন।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা। পৃ. [৯৭]

সোমপ্রকাশ।—২৭এ পৌষ ১২৭১। ৯ জানুয়ারী ১৮৬৫ ইং

২১এ পৌষ মঙ্গলবার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি ইংলিসমানের প্রকাশিত এক খণ্ড পঞ্জিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ইংরাজী সন ও তারিখের এক তালিকা আছে। বণিকদিগের পক্ষে ইহা সবিশেষ উপকারী। পৃ. ১২১

সোমপ্রকাশ।—২৭এ পৌষ ১২৭১, ৯ জানুয়ারী ১৮৬৫ ইং

নূতন পুস্তক ও পঞ্জিকা।

অনেক দিন আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি এ সপ্তাহে নিম্নলিখিত দুইখানি গ্রন্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। নূতন সম্পূর্ণ পঞ্জিকা। বালী গ্রামের শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি ইহার সংকলন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল ঠাকুরের যত্নে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। পঞ্জিকার উপযোগী যাবতীয় বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ডাক মাসুলের নিয়ম ইষ্টাম্প, ও রেলওয়ে ভাড়ার নিয়ম প্রভৃতি কয়েকটী সাধারণের প্রয়োজনোপযোগী বিষয় ইহার অন্তর্নিবেশিত করা হইয়াছে। পঞ্জিকাখানির কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম।

২। বেকন প্রণীত কতিপয় গ্রন্থের প্রশ্নাবলী। ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সামুয়েল সি, আরাটুন সাহেব ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে মহোপকারক বিষয় সকলের প্রশ্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু যাবৎ ইহার উত্তরগুলি প্রকাশিত না হইতেছে, তাবৎ ইহার সম্যক ফলোপধায়িতা হইতেছে না। প্রশ্নগুলি রীতিমত বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে। ইহা ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৶১০ সাড়ে তিন আনা মাত্র। পৃ. ১১৯।

সোমপ্রকাশ।—৪ঠা মাঘ ১২৭১। ১৬ই জানুয়ারী ১৮৬৫ ইং

নূতন পঞ্জিকা ও পত্রিকা।

এ সপ্তাহে নিম্ন লিখিত নূতন পুস্তক ও পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। দায়ভাগোপক্রমণিকা। শ্রীযুক্ত পীতাম্বর বিদ্যালঙ্কার দায়ভাগাদি নানা গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় এতৎ সঙ্কলন করিয়াছেন। সংস্কৃতানভিজ্ঞ উকীল প্রভৃতির পক্ষে ইহা সবিশেষ উপকারী হইবে। ইহা শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানীর ষ্টান হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৷৹ আনা।

২। মহাকবি গোবর্দ্ধনাচার্য্য বিরচিত আর্য্যাসপ্তশতী। এখানি সংস্কৃত গ্রন্থ। ঢাকা কালেজের বাঙ্গলা ভাষাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ইহা সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। সোমনাথ বাবু স্থানে স্থানে দুরূহ শব্দের অর্থ করিয়া দিয়াছেন। ঢাকা মোগলটুলি সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা।

৩। সত্যান্বেষণ। এখানি মাসিক পত্র। ইহা কলিকাতা বৌবাজার ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণের যত্নে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা পত্রখানি পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। ইহা বিশুদ্ধ ও ললিত ভাষায় বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে দশটী প্রস্তাব সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল। প্রস্তাবগুলি পাঠোপযোগী ও প্রীতিকর। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৹ ডাকমাসুল সমেত ৩ টাকা। ইহা কলিকাতা মৃজাপুর আম হাউসের দক্ষিণ ৩৪৷১ নং গৃহে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে। পত্রপ্রচারকেরা যে উদ্দেশ্যে এতদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা পাঠকগণের গোচরার্থ এই পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

সত্যান্বেষণের উদ্দেশ্য।

ষোড়শ মাস অতীত হইল, ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত কলিকাতার অন্তঃপাতী বৌবাজারে একটি ব্রহ্মোপাসনালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি রবিবার সায়ংকালে সেই স্থানে যথানিয়মে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসকগণ বিবেচনা করিলেন, আমরা ব্রহ্মোপাসন দ্বারা যে অনুপম নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি ভ্রাতৃগণকেও তাহার অংশভাগী করা বিধেয়। পরন্তু যে কোন প্রকারে হউক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করাই সেই গুরুতর অভিপ্রায় সংসাধনের একমাত্র উপায়। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমরা এই সত্যান্বেষণ পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিরবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ বা অনুশীলন থাকিলে ইহা সাধারণের প্রীতিকর হইবে না আশঙ্কায় আমরা এই পত্র ধর্ম্ম প্রস্তাবের সহিত নানাবিধ হিতকর প্রস্তাবে প্রপূরিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। পরন্তু ইহা সাধারণের নিকট কত দূর আদরণীয় হইবে তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে এই পত্র দ্বারা যদি এক ব্যক্তিরও হৃদয়ে সত্যধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ হয় যদি এতৎপাঠে এক ব্যক্তিও সত্যধর্ম্মের আলোকে আনীত হন তাহা হইলেও আমাদের সমুদায় যত্ন সফল বোধ করিব। পৃ. ১৩৬

সোমপ্রকাশ—১১ই মাঘ ১২৭১, ২৩ জানুয়ারী, ১৮৬৫ ইং

বিজ্ঞাপন—

জমীদার ও প্রজা সম্বন্ধীয় আইন।

এই গ্রন্থে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন ও ১৮৬২ সালের ৬ আইন এবং এই দুই আইন সংক্রান্ত সদর ও হাইকোর্টের সমস্ত নজীর ও রেবিনিউ বোর্ডের উক্ত আইন সংক্রান্ত নিয়মাবলি ও অপরাপর বিষয় সংকলিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২ টাকা। গ্রহণেচ্ছুগণ হাইকোর্টে অথবা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে উকীল শ্রীতারকনাথ দত্তের নামে পত্র পাঠাইলে এই গ্রন্থ প্রাপ্ত হইবেন। [পৃ. ১৪৫]

সোমপ্রকাশ—১১ই মাঘ ১২৭১, ২৩এ জানুয়ারী ১৮৬৫ ইং

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা। এ সপ্তাহে নিম্নলিখিত নূতন পুস্তক ও পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।—

১। বিবিধ পাঠ। শ্রীযুক্ত রামসদয় ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ইহাতে কয়েকটী উপকারক বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এগুলি পূর্ব্বে শুভকরীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত; মূল্য ছয় আনা।

২। জ্ঞানরঞ্জন। পাবনাদর্পণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামসুন্দর রায় এতৎ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে কয়েকটী নীতিবিষয়ক উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য দুই আনা।

৩। পরিদর্শন। এখানি মাসিক পত্রিকা। পূর্ব্বে ভারতপরিদর্শন যে স্থান ও যে হস্ত হইতে বাহির হইয়াছিল, ইহাও সেই স্থান ও সেই হস্ত হইতে বাহির হইতেছে। আমরা ক্রমে ক্রমে দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম। দেখিয়া এরূপ আশা জন্মিয়াছে, ক্রমে ইহা উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হইবে।

৪। যীশুর জীবনচরিত। শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু সেন (৩) সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহা রায়ত ফ্রেণ্ড যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য······মুদ্রা। পৃ. [১৫১]

সোমপ্রকাশ—১১ই মাঘ ১২৭১, ২৩এ জানুয়ারী ১৮৬৫ ইং

বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে অনুরাগ কেবল পুরুষের নয়, আজি কালি এদেশের রমণীগণের হৃদয়েও লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। অনেকে বিলক্ষণ রচনাশক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে দুই একটি স্ত্রীলোকের রচনা আমাদিগের নয়নগোচর হইয়া থাকে। কোন কোন স্ত্রীলোকের গ্রন্থরচনা ক্ষমতাও আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। সম্প্রতি একটী স্ত্রীলোক উর্ব্বশী নাটক নামে একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ অবস্থা নয় যে তিনি স্বব্যয়ে তাহা মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করিতে পারেন। এই নিমিত্ত তিনি সাধারণের নিকটে সাহায্যার্থিনী হইয়াছেন। তিনি একজন অপরিজ্ঞাত স্ত্রীলোক, লোকে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবেন কেন, এই বিবেচনা করিয়া তিনি নিজ পরিচিত দুই ভদ্র ব্যক্তির মুখ দ্বারা প্রার্থনা করিয়াছেন। সেই প্রার্থনাপত্রখানি এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। এতদ্দ্বারা এই

আর একটি লাভ হইবে, অনেকের চিত্ত আমাদিগের ন্যায় প্রামাণিক ব্যক্তির স্বাক্ষর দেখিয়া সংশয়গ্রহ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

নিবেদনম্—

কোন ব্রাহ্মণকন্যা এই উর্ব্বশী নাটকখানি স্বয়ং রচনা করিয়া আমাদের নিকট পাঠান, কিন্তু রচনা দৃষ্টে উহা তাঁহার লিখিত কি না সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে আমরা শ্রীযুক্ত বাবু নীলরত্ন মুখোপাধ্যায় ও বাবু প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উক্ত দেবীর নিকট পাঠাই। তাহাতে দেবী উঁহাদের সমক্ষে বসিয়া উঁহাদের প্রস্তাবিত একটী বিষয় রচনা করেন। সেই রচনাপ্রণালী দেখিয়া ঐ নাটকখানি তাঁহারই কৃত বলিয়া আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

এই নাটকখানি যে তাঁহার ও ইহাতে যে আর কাহারও সাহায্য নাই তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এই নিমিত্ত আমরা আনন্দের সহিত সর্ব্বসাধারণের নিকট এই প্রার্থনা করি, যে এই স্ত্রীলোকটীর ও এতদ্দেশীয় অবলাকুলের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে সহৃদয় ও বিদ্যোৎসাহী জনগণ কৃপাগুণে উক্ত পুস্তক প্রচারণ বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হন। এই নাটকখানি ডিমাই আক্‌টেবো ১০০ পেজের অধিক হইবে। স্বাক্ষরকারির প্রতি মূল্য ৸০ বিনা স্বাক্ষরকারি ১৲ শ্রীচন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুর সাহায্যকৃত ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি শ্রীগঙ্গাগোপাল চট্টোপাধ্যায় শিবপুর সাহায্যকৃত ইংরাজী ও বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক। শিবপুর ২৭এ পৌষ ১২৭১ সাল—ইহা অনতিবিলম্বে পি. এম. ডি. রোজারিও কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। [পৃঃ ১৪৬]

সোমপ্রকাশ—১০ ফাল্গুন ১২৭১, ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৫ ইং

বিজ্ঞাপন—

সোমপ্রকাশের কার্য্যপ্রণালীগত কিছু কিছু পরিবর্ত্ত হওয়াতে পত্রাদি পাইবার বিষয়ে গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। অতএব আমি সকলকে জানাইতেছি, অতঃপর তাঁহারা প্রেরিত পত্রাদি আমার নামে এবং নোট হুণ্ডি প্রভৃতি অর্থঘটিত পত্রাদি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইবেন। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য যেরূপ চিঠি ও পত্রাদিতে স্বাক্ষর করিতেছেন, সেইরূপ করিবেন।

শ্রীমোহনলাল বিদ্যাবাগীশ। [পৃ. ২০৯]

সোমপ্রকাশ,—১৫ চৈত্র ১২৭১ বাং, ২৭ মার্চ্চ ১৮৬৫ ইং

বিজ্ঞাপন।

ক্ষেত্রতত্ত্বের অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা সকলের প্রমাণ মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে ও যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোম্পানির পুস্তকালয়ে ঢাকাস্থ নন্দকুমার গুহ কোম্পানির পুস্তকালয়ে এবং কুমিল্লা স্কুলে আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

শ্রীউমাকিশোর রায় [পৃ. ২৮৯]

সোমপ্রকাশ—১৫ই চৈত্র ১২৭১, ২৭এ মার্চ, ১৮৬৫ ইং

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা—

এ সপ্তাহে নিম্নলিখিত নূতন গ্রন্থ ও নূতন পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। আশু সম্বিদ্দায়িনী। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার রচনা করিয়াছেন। ভূমিকা মধ্যে লিখিত হইয়াছে "একটি কল্পিত গল্পচ্ছলে সংস্কৃত সাহিত্য, উপনিষৎ বেদান্ত ভগবদ্গীতা ও হস্তামলক প্রভৃতি বিবিধ জ্ঞানপ্রতিপাদক গ্রন্থসকল হইতে এই গ্রন্থের প্রয়োজন মতে সাধ্যানুসারে বঙ্গভাষায় কেবল তাৎপর্য্য মাত্র সঙ্কলন করণান্তর যথা কাঙ্ক্ষিত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ অধ্যাত্মরামায়ণান্তর্গত রামগীতার আদ্যোপান্ত বিবরণ সকল এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অনেকাংশ ঐরূপ অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ তাৎপর্য্যমাত্র বোধানুসারে সংগ্রহ করিয়া ইহার উদর পূর্ত্তি করা হইয়াছে।"

গ্রন্থকার যে যে গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, এদেশের লোকেরা ভক্তি সহকারে এগুলির সবিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন। এ সকলের তাৎপর্য্য সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রন্থকার যেরূপ দুরূহ সংস্কৃত শব্দদ্বারা স্বগ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চেষ্টা সফল হইবে কি না সন্দেহস্থল।

২। শব্দসিন্ধু। সপ্তক্ষীরার শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ রায় চৌধুরী অমরকোষ ও রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ও বেদান্তবাগীশকৃত টীকাধৃত শব্দ সকল সংগ্রহ করিয়া পয়ারে প্রণয়ন করিয়াছেন। এক্ষণে লোকের যেরূপ রুচি পরিবর্ত্ত ও অকারাদিবর্ণবিন্যাসক্রমে অভিধান লিখিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে এ গ্রন্থ যে অধিকতর আদৃত হইবে আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না।

৩। ঢাকা বিজ্ঞাপনী। এখানি একখানি সমাচার পত্রিকা। যে সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাহার লিখনরীতি দেখিয়া বোধ হইতেছে পরিণামে ইহার উন্নতি হইতে পারে। আমরা ইহার একটী প্রস্তাব স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। [পৃঃ ২৯৬]

সোমপ্রকাশ—সন ১২৭১।২৯ চৈত্র, ইং ১৮৬৫।১০ এপ্রেল

বিজ্ঞাপন—

তৃতীয় ভাগ চারুপাঠের শব্দার্থ মুদ্রিত হইতেছে, অতি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের শব্দার্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম অন্যে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

শ্রীফকীরমোহন সেনাপতি।

বালেশ্বর মিসনরী স্কুল। [পৃঃ ৩২১]

সোমপ্রকাশ—[পৃঃ ৩৩৭] ৬ই বৈশাখ ১২৭২, ইং ১৮৬৫।১৭ এপ্রেল

বিজ্ঞাপন—

১৮৬৫ সালের ইউনিভিসিটী এণ্টান্স কোর্সের ধাতু, কৃৎ, তদ্ধিত ও দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা সম্বলিত একখানি ফী (অর্থপুস্তক) এক মাসের মধ্যেই প্রচারিত হইবেক। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা ইতিমধ্যে কলিকাতা বহুবাজার বিদ্যালয়ে পত্র লিখিলে প্রতি ফর্ম্মার নির্দ্দিষ্ট মূল্যের এক পয়সা ন্যূনে পাইবেন।

সোমপ্রকাশ—১৩ই বৈশাখ ১২৭২, ইং ২৪ এপ্রেল ১৮৬৫।

বিজ্ঞাপন—

কাব্যনির্ণয়। অলঙ্কার গ্রন্থ।

পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে ছন্দ ও রীতি প্রভৃতির লক্ষণ বিস্তারিতরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা। সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও মৃজাপুর বিদ্যারত্ন যন্ত্রে পাওয়া যায়।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা। পৃঃ [৩৫৩]

সোমপ্রকাশ—১৩ই বৈশাখ ১২৭২, ইং ২৪ এপ্রেল ১৮৬৫

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। দুর্গেশনন্দিনী। এখানি ইতিহাসমূলক উপন্যাস। ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ইহার রচনা করিয়াছেন। পাঠকগণ গ্রন্থের নামটী দেখিয়া কৌতুহলাবিষ্ট হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমাদিগের মনেও প্রথমে কৌতুক জন্মিয়াছিল। নামটি শ্রুতিমধুর হয় নাই বটে কিন্তু বিলক্ষণ কৌতুকাবহ হইয়াছে। যদি আমরা বিপরীত অর্থ বুঝিয়া না থাকি, পাঠকগণকে এই অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারি গড়মান্দারণ নামক দুর্গের ঈশ্বর বীরেন্দ্র সিংহ, তাঁহার কন্যা তিলোত্তমা, তিনিই এই গ্রন্থের নায়িকা। যাঁহারা আরবোপন্যাস পড়িয়াছেন, আসিয়ার লোকের অদ্ভুত উপন্যাস রচনাশক্তি কেমন প্রবল, তাঁহারা তাহা জানিতে পারিয়াছেন। দুর্গেশনন্দিনী রচনাকার সেই শক্তিকে প্রতীচ্যদিগের প্রদর্শিত নৈসর্গিক রচনারীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রস্তাবিত উপন্যাসের সবিশেষ মনোহরতা সম্পাদন করিয়াছেন। মনোহর উপন্যাস পাঠ চিত্তকে যেরূপ আকর্ষণ করে, দুর্গেশনন্দিনী আমাদিগের চিত্তকে সেইরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল। আমরা ঔৎসুক্য সহকারে ইহার আদ্যপান্ত পাঠ করিয়াছি। পাঠকালে অনেক স্থলে গ্রন্থকারের নায়ক নায়িকা প্রভৃতির রূপবর্ণনাদি ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়াছে। যে স্থলে যে ব্যক্তি বা যে বস্তুর সদ্ভাব অথবা যেরূপ বর্ণনা আবশ্যক, গ্রন্থকার তত্তৎস্থানে যথোচিতরূপে সে সকলের সন্নিবেশাদি করিয়াছেন। জগৎসিংহের নায়কোচিত সাহসিকতা, উন্নতভাব, বিনয়, আয়েষার সৌজন্য, ও বিমলার বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখিয়া পাঠকগণের মন যেমন বিস্ময় ভক্তি ও কৌতুক প্রভাবে স্তিমিত হইবে, গজপতি দিগ্‌গজের কাপুরুষোচিত ব্যবহার দেখিয়া তেমনি অধৈর্য্য হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ওসমান জগৎসিংহের প্রতি তাঁহাকে অনুরক্ত অনুমান করিয়া ঈর্ষান্বিত হন এবং নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে জগৎসিংহকে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণ বধে উদ্যত হন। জগৎসিংহ পূর্ব্ব উপকার স্মরণ পূর্ব্বক ক্ষমা করিয়া রজঃপুত জাতিসুলভ যে মহামনস্কতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা, চিকিৎসক ঔষধের সঙ্গে বিষপান করাইবেন এই পত্র পাইয়াও আলেগজণ্ডার ঔষধ সেবন করিয়া যে মহামনস্কতা প্রকাশ করেন, তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। বিমলা বুদ্ধিকৌশলে দুরাত্মা কতলু খাঁর প্রাণ বধ করিয়া যেরূপে স্বামীবধের শোধ এবং আপনার ও তিলোত্তমার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে কে না বিস্মিত

হইবেন ? শুক্ল কৃষ্ণ, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম পরস্পর সন্নিহিত না হইলে পরস্পরের মহিমা ও শোভা বৃদ্ধি হয় না। আমরা অতঃপর দুর্গেশনন্দিনীর দোষগুলি পার্শে সন্নিবেশিত করিতে চলিলাম। এদেশের লোকের এক বিষয় লইয়া অধিক বর্ণন করিবার যে একটি রোগ আছে গ্রন্থকার সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কয়েকটী স্থান অতিবর্ণন-দোষে বিরস হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে পতৎপ্রকর্ষতা দোষ ঘটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা দোষেরও বিন্দুপাত হইয়াছে। ভাষাটীও ললিত ও সর্ব্বজনহৃদয়গ্রাহিণী হয় নাই। যাহা হউক, যদি কেহ তুলামানে দুর্গেশনন্দিনীর গুণ দোষের পরিমাণ করেন, গুণভার গুরু হইবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানি মৃজাপুর অপর সরকিউলার রোড নং ৫৮।৫ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য এক টাকা।

২। বাঙ্গালা ব্যাকরণ। শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। ইহা বাঙ্গালার প্রকৃত রীতি-সিদ্ধ বিশুদ্ধ সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপন মধ্যে লিখিয়াছেন "সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণকে প্রধান অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে, কয়েক স্থানে উপক্রমণিকারও কয়েকটি কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন স্থানবিশেষে অপরাপর ব্যাকরণ হইতেও অত্যাবশ্যক কতকগুলি নিয়ম সংগ্রহ করা গিয়াছে। গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্ট প্রকরণে ধাত্বর্থ শব্দের প্রকারভেদ, অন্বয় রীতি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও প্রচলিত কতিপয় অলঙ্কারও সন্নিবেশিত হইয়াছে।" এ গ্রন্থখানি হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

৩। কাব্যনির্ণয়। বাঙ্গলা অলঙ্কার গ্রন্থ ইহা দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইয়াছে। লাল-মোহন ভট্টাচার্য্য এতৎ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পাঠ্য অলঙ্কার গ্রন্থ হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় অলঙ্কার গ্রন্থের অসঙ্গতি ছিল। লালমোহন তাহা পূরণ করিয়াছেন। পূর্ব্ববারে যে যে দোষ ছিল, এবার তাহা সংশোধিত হইয়াছে। ছন্দ ও রীতি প্রভৃতি কয়েকটী নূতন পরিচ্ছেদ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৪। পশুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার নিবারণী সভার দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্ট। আমরা পূর্ব্বে সংক্ষেপে সভার কার্য্যবৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। সভা হইতে যে উপকার হইতেছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভদ্রলোক মাত্রেরই এই সভার সহায়তা করা আবশ্যক।

৫। চুঁচুড়া হিন্দুস্কুলের প্রথম বার্ষিক রিপোর্ট। এক বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইল, বিদ্যালয়টী হইয়াছে ইহার মধ্যে ইহার স্পষ্ট উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। বিদ্যালয়ের একটি অধ্যক্ষ-সভা আছে, ঐ সভার যত্নই উন্নতির মূল। ইহাতে সাত জন ইংরাজী শিক্ষক ও দুই জন পণ্ডিত নিয়োজিত আছেন। প্রথমে ৬১ জন মাত্র ছাত্র লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়, বৎসরের শেষে ২৫৯ ছাত্র হইয়াছিল।

৬। আসেম বা ঈশ্বরের ধর্ম্ম রাজ্য শাসন কৌশল। শ্রীগৌরগোবিন্দ রায় ওলিবরগোল্ড স্মিথের কৃত প্রবন্ধের উপাখ্যান ভাগ হইতে সংকলন করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা পদ্যময়। রঙ্গপুর কাকিনীয়া শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত।

৭। হিন্দু হিতৈষিণী। এখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ঢাকা সুলভ যন্ত্রে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পৃ. [৩৬১-৩৬২]

সোমপ্রকাশ—[পৃঃ ৩৭১] ২০ বৈশাখ ১২৭২, ইং ১লা মে ১৮৬৫।

কাব্যনির্ণয়। অলঙ্কার গ্রন্থ। পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে ছন্দ ও রীতি প্রভৃতির লক্ষণ বিস্তারিতরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ১|০ সিকা সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও মুজাপুর বিদ্যারত্ন যন্ত্রে পাওয়া যায়।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা

সোমপ্রকাশ—১২৭২|২০এ বৈশাখ, ইং ১লা মে ১৮৬৫।

বিজ্ঞাপন—

ভূষণসার। বাঙ্গালা ব্যাকরণ। নূতন প্রণালা অনুসারে। শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। মূল্য ।০ চারি আনা। ফিবর হস্পিটলের দক্ষিণ নিমু খানসামার লেন ১৫ নম্বর পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলে পাইবেন। [পৃঃ ৩৬৯]

সোমপ্রকাশ—২০এ বৈশাখ ১২৭২

বিজ্ঞাপন—

দুর্গেশনন্দিনী। ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য এক টাকা। [পৃঃ ৩৬৯]

সোমপ্রকাশ—১০ই জ্যৈষ্ঠ—[পৃ. ৪০১] ১২৭২, ইং ১৮৬৫ ২২এ মে।

বিজ্ঞাপন,

বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙ্গলা সাহিত্যের অর্থ-পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক কঠিন কঠিন শব্দের ধাতু ও তাহার ইংরেজা অর্থ, কৃদন্ত তদ্ধিত, সমাস, প্রতিশব্দ বিষম স্থানের ব্যাখ্যা এবং স্থানে স্থানে অধিকতর বিষদ করিবার নিমিত্ত ইংরাজী প্রতি শব্দও লিখিত হইয়াছে। মূল্য দশ আনা মাত্র। এক কালে ৫ টাকার অধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শতকরা ২৫ টাকার হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

যাঁহার প্রয়োজন হয়, তিনি কলিকাতা বহুবাজারে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালায় সুপরিণ্টেণ্ডের নিকটে পত্র লিখিলেই পাইতে পারিবেন।

১৩ই মে ১৮৬৫। শ্রীমহিমচন্দ্র দাস

সোমপ্রকাশ—[পৃ. ৪০১] ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭২

বিজ্ঞাপন,

আমি সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি, যে ১৭৯৩ অব্দ অবধি ১৮৬৪ পর্য্যন্ত বদবাদে যে জদারী আইন কনষ্ট্রাকৃশন সরকুলার অর্ডার ও তদানুষঙ্গিক সদরের নাজির প্রভৃতি বঙ্গ ভাষায় সংগ্রহ করিয়া দণ্ডসংহিতা নামে একখানি পুস্তক প্রস্তত করিতেছি। অপর কেহ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন।

জিলা বর্দ্ধমান — শ্রীহিতলাল মিশ্র জমিদার
মানকর — এবং অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট।

সোমপ্রকাশ—[৪০১] ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭২

বিজ্ঞাপন,

আমি বাসেলাসের মানে বই-ও শ্রীযুক্ত প্যারিচরণ বাবুর রচিত ফাষ্ট, সেকেণ্ড বুক প্রভৃতি বাঙ্গলা উৎকল ভাষায় অনুবাদ করিতেছি অন্য কেহ এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন না।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পট্টনায়ক

বালেশ্বর বঙ্গোৎকল স্কুলের জনৈক শিক্ষক।

তান্ত্রিক ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ

পুরাণে তন্ত্র

পুরাণের মধ্যে মহাভারত, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই সকল পুরাণে ও অপরাপর অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন পুরাণসমূহেও তন্ত্রের প্রচুর প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে[১]—সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, পাঞ্চরাত্র (বৈষ্ণব তন্ত্র), বেদ ও পাশুপত শাস্ত্র (শৈব তন্ত্র) নানা মত বিশিষ্ট জ্ঞানের আকর। যজ্ঞ, তপ, বেদ, তন্ত্র, মন্ত্র ও সরস্বতী, ইহারা সকলেই সত্য।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উত্তরখণ্ডে "ত্রিশতীস্তব" নামে ষোড়শী বিদ্যার একটি স্তব আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিষ্ণুর সহস্রনামভাষ্যের ন্যায় ইহারও একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উত্তরখণ্ড মান্দ্রাজ হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। যদিও বঙ্গদেশীয় সংস্করণে এই খণ্ড দেখা যায় না, তথাপি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৪র্থ অধ্যায়ে উক্ত আছে[২]—

প্রক্রিয়া, উপোদ্‌ঘাত, অনুষঙ্গ ও উপসংহার নামে চারিটি পাদ আমি সংক্ষেপের জন্য বলিয়াছি। ইহাতে প্রক্রিয়াদি চারিটি পাদে গ্রন্থসমাপ্তি হইয়াছে বুঝা যায়। কিন্তু বঙ্গীয় সংস্করণে প্রক্রিয়া ও অনুষঙ্গপাদ ভিন্ন অপর দুইটি পাদ দেখা যায় না। অতএব অনুক্ত এই দুইটি পাদের দ্বারাই উত্তরখণ্ডের অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে।

উক্ত ত্রিশতীস্তবে শ্রীবিদ্যার পঞ্চদশাক্ষরী মন্ত্রের উল্লেখ আছে। যথা—যিনি মুক্ত পুরুষ অথবা স্বয়ং মহাদেব, তিনিই পঞ্চদশাক্ষরী মন্ত্র লাভ করিয়াছেন। শ্রীবিদ্যাই একমাত্র মুক্তির হেতুভূত বিদ্যা।[৩]

এই পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র তান্ত্রিক বটে। শ্রীবিদ্যাকে কেন্দ্র করিয়াই তান্ত্রিক কুলাচার বিশেষ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। উক্ত বিদ্যা বা মন্ত্র কিছুতেই বৈদিক হইতে পারে না।

এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অনুষঙ্গপাদে তদীয় বর্ণিতব্য বিষয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন—আখ্যান

১। সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ।
—মোক্ষধর্ম্ম, শান্তিপর্ব্ব, ৩৪৯ অধ্যায়।
সত্যং যজ্ঞস্তপো বেদাস্তন্ত্রা মন্ত্রাঃ সরস্বতী।
—মোক্ষধর্ম্ম, ১৯৯ অধ্যায়।

২। প্রক্রিয়া প্রথমঃ পাদঃ ক্রিয়াবস্তু পরিগ্রহঃ।
উপোদ্‌ঘাতোঽনুষঙ্গশ্চ উপসংহার এব চ।
... ...
এবং হি পাদাশ্চত্বারঃ সমাসাৎ কীর্ত্তিতাময়া।

৩। যস্য নো পশ্চিমং জন্ম যদি বা শঙ্করঃ স্বয়ম্।
তেনৈব লভ্যতে বিদ্যা শ্রীমৎপঞ্চদশাক্ষরী।
মোক্ষৈকহেতুর্বিদ্যা চ শ্রীবিদ্যা নাত্র সংশয়ঃ।

(স্বয়ংদৃষ্ট বিষয়), উপাখ্যান (পরম্পরাশ্রুত বিষয়), গাথা (পিতৃ ও পরলোক-বিষয়ক গীত) ও কুলকর্ম্ম (কুলাচার) বর্ণনা দ্বারা এই পুরাণসংহিতা রচনা করিয়াছেন।[৪] এখানে কুলকর্ম্ম শব্দের তান্ত্রিক কুলাচার অর্থ না করিয়া বংশের আচার, এইরূপ অর্থ করা সঙ্গত হইবে না। যেহেতু কোনও পুরাণেই বংশের আচার বর্ণিত হয় নাই। শাস্ত্ররচনার উদ্দেশ্যও তাহা হইতে পারে না।

এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ভিন্ন অন্যান্য অনেক পুরাণেও তন্ত্রের বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের মুক্তিখণ্ডে সূতগীতায়, সূতসংহিতায় ও যজ্ঞবৈভবখণ্ডে তন্ত্রের বৈদিকত্ব ও অবৈদিকত্ব সম্বন্ধে প্রচুর বিচার আছে। এবং অধ্যাত্মরামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে, অগ্নিপুরাণে ৩৯ অঃ, দেবীপুরাণে ৩৯ অঃ, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে ৪৩ অঃ, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্যখণ্ডে ৬ অঃ, কূর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বভাগে ১২ অঃ, কল্কিপুরাণ ১ অঃ এবং ভাগবতে ৮ অঃ ও ১১ অধ্যায়ে তন্ত্রের প্রচুর আলোচনা আছে। ভবিষ্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, বরাহপুরাণ, দেবীভাগবত প্রভৃতিতেও তন্ত্রের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

মহাভারত ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বৌদ্ধপূর্ব্ববর্ত্তিতা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাভারত ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পুরাণসমূহের মধ্যে অতিশয় প্রাচীন। এই দুই গ্রন্থেই তন্ত্রের প্রসঙ্গ আলোচিত থাকায় তাহার প্রাচীনতা সিদ্ধ হইতেছে। এখন ইহাদের কত দূর প্রাচীনতা স্বীকৃত হইতে পারে, দেখা যাউক।

মনীষী লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তদীয় গীতারহস্যে দেখাইয়াছেন—ভাস কবির গ্রন্থে, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে, বৌধায়ন গৃহ্যসূত্রে ও আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রে মহাভারতের বচন দৃষ্ট হওয়ায় গৃহ্যসূত্র রচনাসময়ে (অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকে) মহাভারতের বিদ্যমানতা ছিল। কিন্তু মহাভারতীয় অনুগীতায় (অশ্ব, ৪৪।২) ও আদিপর্ব্বে (৭১।৩৪ শ্লোকে) শ্রবণাদি নক্ষত্রের গণনা দর্শনে "শ্রবণা নক্ষত্রেই তখন উত্তরায়ণ হইত" এইরূপ তাহার ব্যাখ্যা করিয়া এবং বনপর্ব্বের (১৯০।৬৭) 'এড়ুকচিহ্না পৃথিবী ন দেবগৃহভূষিতা॥' এই শ্লোকে এড়ুক শব্দের "বুদ্ধের কেশ দাঁত প্রভৃতি কোন স্মারক বস্তু মাটিতে পুতিয়া, তাহার উপর যে স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে যাহাকে ডাগোবা বলে" এইরূপ অর্থ স্থির করিয়া মহাভারতকে বুদ্ধের পরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে বিষ্ণুর অবতার বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্যান্য পুরাণের ন্যায় তাহাতে বুদ্ধের নাম না থাকায়, বুদ্ধ আবির্ভূত হইবার পর, কিন্তু তিনি অবতারমধ্যে গণ্য হইবার পূর্ব্বে মহাভারতের রচনাকাল স্থির করিয়াছেন।

আমরা তাঁহার কথা সর্ব্বাংশে স্বীকার করিতে না পারিয়া যথোচিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমতঃ শ্রবণাদি নক্ষত্র সম্বন্ধে যে শ্লোক দেখাইয়াছেন, তাহাতে এই নক্ষত্রে উত্তরায়ণ

৪। আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কুলকর্ম্মভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ।

হইত বুঝায় না।[৫] তাহাতে শুক্লাদি মাস, শ্রবণাদি নক্ষত্র ও শিশিরাদি ঋতু, এইরূপে খণ্ড কালের এক একটি আদি প্রদর্শন করাইয়াছেন মাত্র। তখন সম্ভবতঃ অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র, বৈশাখাদি মাস বা গ্রীষ্মাদি ঋতু বলার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। অন্যথায় শ্রবণাদি নক্ষত্রের ন্যায় শিশিরাদি ঋতুরও একটি তাৎপর্য্য দেখাইতে হয়। বিশেষতঃ অনুশাসন পর্ব্বের ৬৪ ও ৮৯ অধ্যায়ে কৃত্তিকাদি নক্ষত্র গণনা করা হইয়াছে, তাহারও একটি তাৎপর্য্য বলা আবশ্যক।

এবং এড়ুক শব্দের অর্থও ডাগোবা নহে। নীলকণ্ঠ তাহার অর্থ করিয়াছেন—এড়ুকান্ অস্থ্যঙ্কিতানি কুড্যানি। অমরকোষে আছে—ভিত্তিঃ স্ত্রী কুড্যং এড়ুকং যদন্তর্ণ্যস্তকীকসম্। অর্থাৎ অস্থ্যাদি চিহ্নিত সমাধিমন্দিরকেই এড়ুক বলে। ইহা কেবল বুদ্ধেরই অস্থ্যাদি-চিহ্নিত হইবে, এরূপ নহে। যে-কোন জনের অস্থ্যাদি থাকিলেই এড়ুক-শব্দবাচ্য হইবে। এবং এই শ্লোকের সম্পূর্ণ অধ্যায়ই কলিযুগের ভবিষ্যদবস্থা-বর্ণনাবিষয়ক। যদি ইহা তৎকালেরই অবস্থাবর্ণনা ধরিয়া লওয়া হয়, তবে "ন দেবগৃহভূষিতা" এই অংশের সঙ্গতি রক্ষা হয় না। বৌদ্ধেরা দেবতা বা দেবগৃহবিদ্বেষী বলিয়া কোনও প্রমাণ নাই। বরং মহাযানপন্থীরা বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবতার উপাসক ও বহু বৌদ্ধ দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতাই দেখা যায়। বিশেষতঃ এই শ্লোকের পরেই আছে—

মহী ম্লেচ্ছজনাকীর্ণা ভবিষ্যতি ততোঽচিরাৎ।

অর্থাৎ পৃথিবী ম্লেচ্ছজনের দ্বারা ব্যাপ্ত হইবে। ইহার দ্বারা কি ভারতে ম্লেচ্ছ আবির্ভাবের পরে মহাভারত রচিত হইয়াছে বলিতে হইবে? বৌদ্ধেরা ত ম্লেচ্ছ নহে। অতএব মহাভারতে যে বুদ্ধাবতারের উল্লেখ নাই, ইহাই বুদ্ধাবির্ভাবের পূর্ব্বে তদীয় রচনাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করিতেছে।

বিশেষতঃ পাণিনি তদীয় অষ্টাধ্যায়ীতে বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্ (৪।৩।৯৮), গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ (৮।৩।৯৫) সূত্রে মহাভারতের নায়ক বাসুদেব, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পদ ও মহান্ ব্রীহ্যপরাহ্ণগৃষ্টীষ্বাসজাবালভারভারতহৈলিহিলরৌরবপ্রবৃদ্ধেষু (৬।২।৩৮) সূত্রে মহাভারত পদ সিদ্ধ করায় পাণিনির সময়ে মহাভারত প্রচলিত ছিল সন্দেহ নাই। পাণিনির কাল সম্বন্ধে পূর্ব্বে মতভেদ থাকিলেও বর্ত্তমানে বহু যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা ডাক্তার শ্রীপাদকৃষ্ণ বেলভল্-কর, পণ্ডিত কাশীনাথবিশ্বনাথ পাঠক, রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর, লোকমান্য তিলকের শিষ্য বিশ্বনাথকাশীনাথ রাজবাড়ে, সি. ভি. বৈদ্য ও গোল্ড ষ্টুকার প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ ৭ম হইতে ১০ম শতকের মধ্যে পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কাজেই মহাভারত তাহারও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হইবে।

এবং পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকে অতিশয় প্রাচীন বলিয়াছি। এবং এইখানি সম্ভবতঃ

৫। অহঃ পূর্ব্বং ততো রাত্রির্মাসাঃ শুক্লাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
শ্রবণাদীনি ঋক্ষাণি ঋতবঃ শিশিরাদয়ঃ।

ব্যাসদেবের স্বহস্তলিখিত হইতে পারে। নিম্নলিখিত যুক্তিপ্রমাণের দ্বারা তাহা সমর্থিত হইবে। (১) বায়ুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মাণ্ডং চাতিপুণ্যোঽয়ং পুরাণানামনুক্রমঃ॥ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অতি পুণ্যপ্রদ ও পুরাণসমূহের অগ্রবর্ত্তী।

(২) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অধ্যায়শেষে অনেক স্থানেই আদি বা আদ্য মহাপুরাণ লেখা আছে। যথা—ইতি শ্রীআদিমহাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডে প্রক্রিয়াপাদে প্রথমোঽধ্যায়ঃ। (বঙ্গবাসী সংস্করণ দ্রষ্টব্য)।

(৩) প্রায় সমুদায় পুরাণেই অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখ আছে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ আদি বলিয়া তাহাতে অন্য পুরাণের নাম নাই।

(৪) খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বা তাহারও পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যগণ জাভা প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা সেই সময় অতিশয় প্রামাণ্য হিসাবে মহাভারত, রামায়ণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণখানি সঙ্গে নিয়াছিলেন। এই পুরাণ তিনখানি জাভাদ্বীপীয় কবি-ভাষায় অনূদিতও হইয়াছে। অন্যান্য পুরাণ তৎকালে তাদৃশ প্রামাণ্য ছিল না বা রচিত হয় নাই বলিয়াই তাঁহারা তাহা সঙ্গে নেন নাই।

(৫) কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে "অথ পুরাণে শ্লোকাবুদাহরন্তি" বলিয়া—

অষ্টাশীতি সহস্রাণি যে প্রজামীষিরর্ষয়ঃ।
দক্ষিণেনার্য্যম্নঃ পন্থানং তে শ্মশানানি ভেজিরে॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি যে প্রজাং নেষিরর্ষয়ঃ।
উত্তরে নার্য্যম্নঃ পন্থানং তেঽমৃতত্বং হি কল্পতে॥ (২।২৩।৩-৫)

এই দুইটি শ্লোক নিম্ন আকারে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অনুষঙ্গপাদে দেখা যায়—

অষ্টাশীতি সহস্রাণি মুনীনাং গৃহমেধিনাম্।
সবিতুর্দক্ষিণং মার্গং স্থিতা হ্যাচন্দ্রতারকম্॥
ক্রিয়াবতাং প্রসংখ্যেয়া যে শ্মশানানি ভেজিরে॥
... ...
অষ্টাশীতিসহস্রাণি তেষামপ্যূর্দ্ধরেতসাম্।
উদকপন্থানমর্য্যম্নঃ স্থিতা হ্যাভূতসংপ্লবাং॥
ইত্যেতৈঃ কারণৈঃ শুদ্ধৈস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে॥
(৫৫ ও ৬৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

বিশ্বকোষকার প্রভৃতি মনীষিগণের মতে ধর্ম্মসূত্রোক্ত পুরাণের শ্লোক দুইটি এই ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণেরই। তবে কালক্রমে লেখকপ্রমাদে ভাষার সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। যেহেতু অন্য কোন পুরাণেই তাদৃশ শ্লোক পাওয়া যায় না। ইহার দ্বারা আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রের পূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হয়। বহু ধর্ম্মসূত্রের আবিষ্কারক ও অনুবাদক ডাক্তার বুলহার আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রের কাল খৃঃ পূঃ তিন শতকের কম নহে বলিয়াছেন। ডাক্তার কালে প্রভৃতি আরও পূর্ব্বে অর্থাৎ ষষ্ঠ শতকে বলিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা বৌদ্ধযুগেরও বহু

পূর্ব্বে মহাভারতাদির রচনাকাল স্থিরীকৃত হইল। তাহাতে তন্ত্রের প্রসঙ্গ আলোচিত থাকায় পৌরাণিক যুগেরও পূর্ব্বে তন্ত্রের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

পুরাণের প্রক্ষিপ্তবাদ উদ্ধার

এখানে আধুনিক শিক্ষিতবর্গের কাহারও কাহারও একটি আপত্তি শুনা যায় যে, পুরাণের অধিকাংশই অত্যন্ত আধুনিক, বৌদ্ধযুগে বা তাহারও পরে রচিত। রামায়ণ মহাভারতাদি দুই তিনখানা পুরাণ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন হইলেও পরবর্ত্তী কালে তাহাতে বহু প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবিষ্ট হইয়াছে। কাজেই তন্ত্রের প্রসঙ্গ পরবর্ত্তী কালেও তাহাতে সংযোজিত হইতে পারে। তদুত্তরে প্রক্ষিপ্তসংযোজন বা পুরাণ-বিশেষের অপ্রাচীনতা অস্বীকার না করিয়াও বলিব—পুরাণাদির যে যে অংশ প্রক্ষিপ্ত, তাহাও পূর্ব্বাপর সঙ্গতি বিচার দ্বারাই নিরূপণ করিতে হয়। নিজের মতবিরুদ্ধ হইলেই তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না। সাধারণতঃ পূর্ব্বাপর গ্রন্থের অসঙ্গতি অথবা অনাবশ্যক উচ্ছ্বসিতভাবে কোনও বিষয়ের নিন্দা বা প্রশংসা দ্বারা যদি কোন সম্প্রদায়ের সার্থসাধন লক্ষিত হয়, তাহা হইলেই সেখানে প্রক্ষিপ্ত রচনা বলা যাইতে পারে। এখন প্রবন্ধবিস্তৃতি-ভয়ে অন্যান্য পুরাণের বিচার না করিয়া একমাত্র অতিশয় প্রামাণ্য ও প্রাচীন মহাভারতেরই তন্ত্রপ্রসঙ্গ বিচার করিয়া দেখিব, তাহা প্রক্ষিপ্ত কি না?

প্রথমে দেখা যায়, জন্মেজয় প্রশ্ন করিতেছেন—হে ব্রহ্মর্ষি! সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ ও আরণ্যক, এইগুলি জ্ঞানশাস্ত্র বলিয়া জগতে পরিচিত। ইহাদের সকলেরই একটিমাত্র তত্ত্বই অভিপ্রেত, অথবা প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে?*

ইহার উত্তরেই পূর্ব্বোক্ত—

সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ॥
…　　…　　…
সর্ব্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে।
যথাগমং যথাজ্ঞানং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ॥

অর্থাৎ তোমার কথিত সাংখ্যাদি শাস্ত্র ভিন্ন পাশুপত নামেও একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানশাস্ত্র আছে। এই সবগুলিই ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও প্রত্যেকেই স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে বেদার্থানুসরণ করিয়া একমাত্র নারায়ণতত্ত্বেই (অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বে) নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এখন দেখুন, প্রশ্নের বেলায় পাঞ্চরাত্রের (বৈষ্ণব তন্ত্রের) উল্লেখ থাকিলেও পাশুপতের (শক্তিতন্ত্রের) কোন উল্লেখই নাই। কিন্তু উত্তরের বেলায় শক্তিতন্ত্রের দ্বারাও তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া প্রসঙ্গতঃ তাহার নামোচ্চারণ করিয়াছেন। ইহা না করিলে পাশুপত

---

* । সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদারণ্যকমেব চ। জ্ঞানান্যেতানি ব্রহ্মর্ষে লোকেষু প্রচরন্তি হি॥
কিমেতান্যেকনিষ্ঠানি পৃথক্‌নিষ্ঠানি বা মুনে। প্রব্রূহি বৈ ময়া পৃষ্টঃ প্রবৃত্তিঞ্চ যথাক্রমম্।

শাস্ত্রের অভিপ্রেত অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত। ইহাতে তন্ত্রের নিন্দা, প্রশংসা বা তদীয় মত প্রতিষ্ঠিত করা প্রভৃতি কোনও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ লক্ষিত হইতেছে না। এখানে উত্তরদাতার নিরপেক্ষতাই বেশ পরিস্ফুট হইতেছে। কাজেই এই তন্ত্রপ্রসঙ্গকে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে না। এইরূপ মহাভারতের অর্জ্জুনকৃত স্তুতিতে 'আম্নায়াগমবেত্তায় শুদ্ধবুদ্ধায় তে নমঃ॥' এই স্থলে আগম শব্দে যে তন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাও কোন প্রকার অভিসন্ধিমূলক নহে।

তন্ত্রের পুরাণপূর্ব্ববর্ত্তিত্ব সম্বন্ধে আরও একটি যুক্তি এই যে, প্রায় সমস্ত পুরাণেই তন্ত্রের প্রসঙ্গ কিছু কিছু পাওয়া যায়; কিন্তু প্রসিদ্ধ কোন তন্ত্রেই পুরাণের প্রসঙ্গ বিশেষ দেখা যায় না। অবশ্য কতকগুলি তন্ত্র যে আধুনিক, তাহা অস্বীকার করিতেছি না। বিচার্য্য বিষয় গোটা তন্ত্রশাস্ত্রকে নিয়া, তন্ত্রবিশেষকে নহে। এবং তন্ত্রেও যে প্রক্ষিপ্তদোষ ঘটে নাই, তাহাও বলা শক্ত। যে চতুঃষষ্টি তন্ত্র বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে, তাহাই তন্ত্রশাস্ত্রের মূলও নহে। বৈদিক শ্রুতির ব্যাখ্যাস্বরূপ যেমন পুরাণসমূহ রচিত হইয়াছে, তান্ত্রিক শ্রুতিসমূহেরও সেইরূপ ব্যাখ্যাগ্রন্থ চতুঃষষ্টি তন্ত্র। মেদিনীকোষ অভিধানে এই জন্য শ্রুতিকে ব্রহ্মশ্রুতি (বেদ) ও শিবশ্রুতি (তন্ত্র) ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মহর্ষি হারীতও বলিয়াছেন—শ্রুতি দুই প্রকার, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী[৭]। প্রকৃতপক্ষে এই শিবশ্রুতি বা তান্ত্রিক শ্রুতিই তন্ত্রের মূল বলিয়া কথিত হয়। বৈদিক যুগে বেদ ও তন্ত্র অভিন্নরূপে বা সমমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। বেদের শাখাভেদে যেমন উপাসনাদির পার্থক্য আছে, তন্ত্রকেও শাখারূপে গণ্য করা হইত বলিয়াই তদীয় উপাসনাদির পার্থক্য থাকা সত্বেও বৈদিকরা তাহাকে শ্রদ্ধা সহকারেই স্বীকার করিতেন। অথর্ব্ববেদ ও বৈদিক যুগের তান্ত্রিক সাধক প্রসঙ্গ আলোচনার সময় তাহা পরিস্ফুট হইবে। যদি বেদের পরে বেদবিরোধিরূপেই তন্ত্রের প্রবর্ত্তন হইত, তাহা হইলে তন্ত্রশাস্ত্রে বেদের ভীষণ নিন্দাবাদই শ্রুত হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া, তন্ত্রের সর্ব্বত্র বেদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই পরিদৃষ্ট হয়।

এত ক্ষণ পুরাণাদি গ্রন্থেই তন্ত্রের অনুসন্ধান করিয়াছি। এখন দেখিব, তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে তন্ত্রের সন্ধান পাই কি না।

সূত্রগ্রন্থে তন্ত্র

পরশুরামকল্পসূত্রে দেখিতে পাই—আনন্দই ব্রহ্মের রূপ, সেই আনন্দ দেহেই অবস্থিত। পঞ্চ মকার সেই আনন্দের অভিব্যঞ্জক। অতএব এই পঞ্চ মকারের দ্বারা গোপনে অর্চ্চনা করিবে। প্রকাশ্যভাবে করিলে নিরয়গামী হইবে[৮]। এবং এই সূত্রগ্রন্থেই অন্যত্র আবার

৭। অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। শ্রুতিপ্রমাণকো ধর্ম্মঃ। শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ। ইতি হারীতঃ।
মনু ২।১, কুল্লুক ভট্ট টীকা।

৮। আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহে ব্যবস্থিতং। তস্যাভিব্যঞ্জকাঃ পঞ্চ মকারাস্তৈরর্চ্চনং
গুপ্ত্যা প্রাকট্যান্নিরয়ঃ। (১।২২)

বলিয়াছেন—সদাশিব পূর্ব্বাম্নায়, দক্ষিণাম্নায়, পশ্চিমাম্নায়, উত্তরাম্নায় ও উর্দ্ধাম্নায় ভেদে পরমার্থসারভূত পাঁচটি আম্নায় (তন্ত্র) প্রকাশ করিয়াছেন।[৯]

বর্ত্তমান তন্ত্রগুলি এই সকল আম্নায় হইতেই প্রকাশিত। সমগ্র পরশুরামকল্পসূত্রই তান্ত্রিক ধর্ম্মের বিবরণে পরিপূর্ণ। এই কল্পসূত্রকার পরশুরামই যে ত্রেতাযুগের ভগবদবতার জামদগ্ন্য পরশুরাম, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। তদ্ভিন্ন শক্তিসূত্র ও শিবসূত্র গ্রন্থদ্বয়ও তান্ত্রিক সূত্রগ্রন্থ বটে[১০]।

বেদে তন্ত্র

অথর্ব্ববেদান্তর্গত কালিকোপনিষদে দেখা যায়—"পঞ্চ মকারের দ্বারা সকলেই বিদ্যাকে লাভ করিতে পারেন। মুক্তি, জ্ঞান বা ধর্ম্মলাভের আর অন্য কোন পথ নাই। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান দৃশ্যাদৃশ্য, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত বস্তুতত্ত্বই কালিকাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে"।[১১] ত্রিপুরামহোপনিষদে আছে—পরিশ্রুত (মদ্য), ঝষ (মৎস্য), পল (মাংস), ভক্ত (অন্ন অর্থাৎ মুদ্রাশব্দ বাচ্য) ও যোনি (মৈথুনতত্ত্ব), এই পঞ্চ মকার পাকাদি লৌকিক সংস্কার ও মন্ত্রাদি অলৌকিক সংস্কার দ্বারা শোধিত করিয়া ইষ্টদেবতাকে নিবেদনপূর্ব্বক প্রসাদরূপে গ্রহণ করিলে সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।[১২] এবং ভাস্কর রায়-বিরচিত বরিবস্যা-রহস্যধৃত ঋগ্বেদীয় শাংখ্যায়নশ্রুতিতে দেখা যায়—

কামো যোনিঃ কমলা বজ্রপাণির্গুহা হসা মাতরিশ্বাঽভ্রমিন্দ্রঃ।
পুনর্গুহা সকলা মায়য়া চ পুরূচ্যেষা বিশ্বমাতাঽদিবিদ্যা।

ইহার ভাষ্য যথা—কামো মাতরিশ্বা চ ককারঃ। যোনিরেকারঃ। কমলা তুরীয়ঃ স্বরঃ। বজ্রপাণিরিন্দ্রশ্চ লকারঃ। গুহাদ্বয়ং মায়া চ লজ্জাবীজম্। হসেতি সকলেতি চ স্বরূপম্। গুহয়া সহ সমাসাদ্বহুবচনং ন পুনঃ সকারো দীর্ঘঃ। এবং লকারোঽপি। অভ্রং হকারঃ। এতাদৃশৈঃ সাঙ্কেতিকৈঃ শব্দৈর্ব্যবহারাদত্যন্তগোপনীয়ত্বং সমর্থিতং ভবতি॥

এই ভাষ্য তান্ত্রিক অভিধান অনুসারেই করা হইয়াছে। এবং ইহার দ্বারা শ্রীবিদ্যার পঞ্চদশাক্ষর বীজমন্ত্রই উদ্ধৃত হইয়াছে। হংসোপনিষদে আছে—সদাশিবঃ শক্ত্যাত্মা। পরমব্রহ্ম সদাশিবের আত্মা শক্তিই বটে। শ্বেতাশ্বতরীয়ে দেখা যায়—পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। পরব্রহ্মের শক্তি নানাভাবে (কালী-তারাদি ভেদে) শুনা যায়। এবং রামপূর্ব্ব-

---

৯। পঞ্চাম্নায়ান্ পরমার্থসারভূতান্ প্রণিনায়। ১।২।

১০। পরশুরামকল্পসূত্র বরোদা গভর্ণমেণ্ট মুদ্রিত করিয়াছেন। শিবসূত্র, ভাষ্য বৃত্তি ও বার্ত্তিক সহ কাশ্মীর হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। শক্তিসূত্রও মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

১১। অথ পঞ্চমকারেণ সর্ব্বং প্রাপ্নোতি বিদ্যাং নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে মোক্ষায় জ্ঞানায় ধর্ম্মায় তৎ সর্ব্বং ভূতং ভব্যং যৎকিঞ্চিদ্দৃশ্যাদৃশ্যমানং স্থাবরং জঙ্গমং তৎ সর্ব্বং কালিকাতন্ত্রে তু প্রোক্তম্।

১২। পরিশ্রুতং ঝষমাদ্যং পলঞ্চ ভক্তানি যোনীঃ সুপরিষ্কৃতানি।
নিবেদয়ন্ দেবতায়ৈ মহত্যৈ স্বাত্মীকৃত্য সুকৃতী সিদ্ধিমেতি।
—ভাস্কর রায়কৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

তাপিন্যুপনিষদে—শক্তমস্তিত্র এবচ। পরব্রহ্মের শক্তিই ত্রিধা (ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী) বিভক্ত। ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্ত প্রভৃতিতেও পরব্রহ্মকে শক্তিরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে। দেখুন, তন্ত্রের সাধনোপকরণ পঞ্চ মকার, শক্তিদেবতা ও বীজমন্ত্র, এইগুলি বেদ ও উপনিষদে কেমন স্পষ্ট লিখিত আছে।

এতদ্ভিন্ন আমরা ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে তান্ত্রিক আচারের ভূরি প্রয়োগ দেখিয়াও তন্ত্রের তৎকালে স্থিতি উপলব্ধি করিতেছি। তান্ত্রিক ধর্ম্ম বলিতে প্রধানতঃ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুনতত্ত্বের দ্বারা সাধনপদ্ধতিকে বুঝাইয়া থাকে। মুদ্রা শব্দের অর্থ মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ষষ্ঠ উল্লাসে উক্ত হইয়াছে—উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে মুদ্রা তিন প্রকার। শালিতণ্ডুল, যব ও গোধূম দ্বারা প্রস্তুত ঘৃতপক্ক খাদ্যই উত্তম মুদ্রা। চিঁড়া খৈ প্রভৃতি ধান্যাদিজাত ভৃষ্ট বস্তু মধ্যম। তদ্ভিন্ন ভৃষ্ট বীজ মাত্রই অধম। এখন দেখুন, ঋগ্বেদে ৩।৫২ সূক্তে ইন্দ্রকে মুদ্রাযুক্ত মদ্য নিবেদন করা হইতেছে। যথা—

হে ইন্দ্র! ভৃষ্ট যবযুক্ত দধিমিশ্রিত সক্তুযুক্ত পিষ্টকসমন্বিত ও উক্থবিশিষ্ট আমাদের সুরা প্রাতঃসবনে গ্রহণ কর। এবং অষ্টম মণ্ডলের ৩১।৫ ঋকে উক্ত হইয়াছে—হে দেবগণ! যে দম্পতি একমনে সোমাভিষব করে, সোম শোধন করে এবং মিশ্রিত দ্রব্যদ্বারা সোম মিশ্রিত করে। সোম ও সুরা একজাতীয় বস্তুই বটে। মিশ্রিত দ্রব্যও মুদ্রাজাতীয়ই হইবে সন্দেহ নাই। এইরূপ মাংস সম্বন্ধেও ঐ বেদে ১।১৬২ সূক্তে অশ্ব ও ছাগবলি এবং তদীয় মাংস পাক করিয়া দেবগণকে প্রদান করার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার ২৮ কণ্ডিকায় উক্ত হইয়াছে—সুরা সিঞ্চন করা হইয়াছে, পরিসিঞ্চন করা হইয়াছে, উৎসিঞ্চন করা হইয়াছে, পরে পবিত্রও করা হইয়াছে। অধুনা এই পিঙ্গলবর্ণ সুরা পান করিয়া প্রমত্ত অবস্থায় সুরাপায়ী কিস্বং কিস্বং (অর্থাৎ তুমি কি তুমি কি) করুক। অর্থাৎ প্রমত্তবচন বলুক। যজুর্ব্বেদের সৌত্রামণি যাগপ্রকরণে (১৯।২০।২১) সুরাপানের প্রমত্ততায় তান্ত্রিকদিগকেও হার মানিতে হইবে। এই শাখার অশ্বমেধ যাগ-প্রকরণে বহু পশুবলির বিধান ও তদীয় পক্ক মাংস উৎসর্গের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

মৈথুনতত্ত্ব সম্বন্ধে সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—স য এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ মিথুনীভবতি মিথুনান্মিথুনাৎ প্রজায়তে। সর্ব্বমায়ুরেতি। জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি। মহান্ কীর্ত্ত্যা। ন কাঞ্চন পরিহরেদেতদ্ব্রতম্।২।১৩। ইহার শাঙ্কর ভাষ্য যথা—ন কাঞ্চন কাঞ্চিদপি স্ত্রিয়ং স্বাত্মতল্পপ্রাপ্তাং ন পরিহরেৎ সমাগমার্থিনীম্। বামদেব্য-সামোপাসনাঙ্গত্বেন বিধানাৎ। এতস্মাদন্যত্র প্রতিষেধস্মৃতয়ো বচনপ্রামাণ্যাচ্চ ধর্ম্মাবগতের্ন প্রতিষেধশাস্ত্রেণ অস্য বিরোধঃ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বামদেব্য সামোপাসক অধিকারীর পক্ষে পরদার স্বীকার্য্য। তদ্ভিন্ন স্থলেই ইহার অবৈধতা জানিবে। তাদৃশ উপাসনায় আয়ুঃ, কীর্ত্তি ও সন্তান বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই বামদেব্য সামোপাসনা তান্ত্রিক উপাসনাই বটে। এখন ত্রয়ী বেদেও তান্ত্রিক আচারসমূহ দৃষ্ট হওয়ায় তন্ত্রকে অবৈদিক বা অনার্য্যসেবিত বলিয়া আর উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

বোলান গান

শ্রীঅমলেন্দু মিত্র

বীরভূম রতন লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা শিবরতন মিত্র মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহে কয়েকটি বোলান গান পাওয়া গিয়েছে। গানগুলি কুত্রাপি প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। "বোলান" সম্পর্কে আলোচনাও বড় একটা কোথাও হয় না। কবি-গান, পাঁচালি, তর্জার নিকটসম্পর্কীয় জ্ঞাতি বলেই হয় ত পৃথক্ ভাবে "বোলান গান" নিয়ে তেমন গবেষণা করা হয়নি।

ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বোলানের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা উল্লেখ করে একটি বোলান গান নিদর্শনস্বরূপে উপস্থাপিত করেছেন। ডাঃ সেনের মতে— ছড়া কেটে ঢোল কাঁসির সঙ্গতে গান ধর্ম ও শিবের গাজনে গাওয়া হত। এই ছড়া আর্যা বা তর্জা নামে পরিচিত। বাঁধা ছড়ার সাহায্যে আসরে যে উত্তর প্রত্যুত্তর চলত, তাকে বলা হয় "দাঁড়া" কবি। ধর্ম ঠাকুর বা শিবের গাজন উৎসবে মূল সন্ন্যাসী গাঁয়ের পথে পথে ঘুরে ঘুরে যে তর্জা ছড়া বলত, তার বিশিষ্ট নাম "বোলান"। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে আছে যে, পুরদত্ত বারুইএর মানসিক ব্রতগাজনে যখন রামাই পণ্ডিত "বোলান বুলিতে গেল ময়না বসতি," তখনই রঞ্জাবতী ধর্ম ঠাকুরের কথা প্রথমে শুনলেন।

নিম্নলিখিত গানগুলির পরিচয় টীকায় "দলে গীত" বলে উল্লেখ থাকায় স্বতঃই ধারণা জন্মে যে, পাঁচালি গানের পদ্ধতি অবলম্বনে গাওয়া হত। রচনা বা কবির সম্পর্কে বিশদ কোন পরিচয় উল্লেখ নাই। তবে আমার বিশ্বাস, সম্ভবতঃ পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে শিবরতন মিত্র মহাশয় স্বকর্ণে শুনে এগুলি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। গানগুলি যেমন পাওয়া গিয়েছে, তেমনিই পৌঁছে দিলাম।

নিত্যানন্দ

(১)

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
ও ভাই রে—
তোরা গৌর ভজ
হরিনামে সদাই মজ॥

(২)

আমার প্রভু নিত্যানন্দ অক্রোধ পরমানন্দ
চণ্ডাল পতিত জীব ঘরে ঘরে যাইয়া
হরিনাম মহামন্ত্র দিছেন বিলাইয়া॥
প্রতি জীবের ঘরে ঘরে নাম বিলাল দয়া করে
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমায় কিনিয়া লও ভজ গৌরহরি—

(৩)

এত বলি নিত্যানন্দ ভূমি গড়ি যায়।
রজতপর্বত যেন ধূলাতে লুটায়॥
ক্ষণে ক্ষণে ভূমে লুটে।
গৌরহরি বলে উঠে॥
অদোষদরশি মোর প্রভু নিত্যানন্দ
না ভজিনু হেন প্রভুর চরণারবিন্দ,

নিত্যানন্দ নিজগুণে
সর্ব্বজীবে সমান জানে ॥

(৫)

হায় রে আমি নাহি জানি কেমন অসুর
পাইয়া না ভজিলাম আমি দয়ার ঠাকুর
ভাগ্যফলে পেয়ে আমি
হারাইলাম গুণমণি ॥

(৬)

হায় রে অভাগার প্রাণ কি সুখেতে আছ
নিতাই বলিয়া কেন মরিয়া না যাইছ ॥
নিত্যানন্দের নাম লয়ে
প্রাণ যাও বাহির হয়ে ।

(৭)

নিতাইএর করুণা শুনি পাষাণ মিলায় ।
হায় রে কঠিন হিয়া না মিলিনু তায় ॥
যে নামেতে পাষাণ গলে ।
সে নামেতে না মজিলে ॥

(৮)

গোরাপ্রেমে গর গর নিতাই রঙ্গিয়া ।
হরি বলে চলে যায় দু বাহু তুলিয়া ॥
হরি বলে বাহু তুলে ।
নিতাই যায় হেলে দুলে ॥

(৯)

করুণাসাগর মোর প্রভু নিত্যানন্দ ।
ভজ ভজ ভজ ভাইরে পাইবে আনন্দ ॥
নিত্যানন্দের নাম··· ।
সদামন আনন্দে বরে ॥

(১০)

নিতাই মোদের প্রাণধন নিতাই মোদের জাতি
নিতাই বিহনে মোদের আর নাহি গতি ॥
আমাদের সর্ব্বস্ব ধন ।
নিতাইএর শ্রীচরণ ॥

(১১)

যে দেশে নিতাই নাই সেই দেশে না যাব ।
নিতাইবৈমুখী জনার মুখ না হেরিব ॥
যে জন নিতাই না ভজে ।
সংসারে সুখে থাকে মজে ॥

(১২)

সংসারসুখের মুখে তুলে দিই ছাই ।
নগরে মাগিয়া খাব গাইয়া নিতাই ॥
ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে ।
বেড়াব লোকের দ্বারে ॥

(১৩)

এই নিবেদন করি সকলের চরণে
এইখানেতে বোলান সাঙ্গ করি সর্ব্বমনে ।
এইখানেতে সাঙ্গ করি ।
সবে মিলে বলুন হরি ॥

[নির্ম্মলচন্দ্র মাঝি, নাগডিহি কর্ত্তৃক গীত]

গোষ্ঠগীত

গোঠে আয় রে কানু বাজায়ে বেণু ধেনু লয়ে যাই ।
আমরা সবে সেজে এলাম সেজেছে বলাই ॥

(১)

প্রভাতকালে মায়ের কোলে আছে রে নীলমণি ।
নিশামাণ অস্ত গেল উদয় দিনমণি ॥
একবার এস ভাই এস ভাই ধেনুগণ লয়ে যায় ।
ওরে গোঠে গিয়ে করব খেলা এই বাসনা মনে ।
ওরে তাই তোরে নিতে সেই জন্তেতে এলাম সর্ব্বজনে ॥
সদা বাঞ্ছা মনে ।
খেলবো কানাই তোমার সনে ।
গগনে হইল বেলা সেজে আয় রে নানা ॥
ঐ দেখ বলাই করে
শিঙার ধ্বনি আমরা শুনি রে ॥

(২)

যাকে বল সাজাইতে ধড়া চূড়া দিয়ে।
অলকা তিলকা ভালে পদে নূপুর লয়ে॥
একবার নেচে নেচে আয় রে।
দেখ গোষ্ঠের সময় যায় রে॥
ওরে মায়ের কোলে থাকলে কেনে তেমন
সুখ পাই না।
আমরা কাকে করব রাখালরাজা তুমি
বাদ যাবে না।
ও ভাই বল রে কানু।
কে বাজাবে মোহন বেণু॥
তোরে লয়ে গোষ্ঠে গেলে।
বড় সুখে থাকি কেলে॥
বনফুলে সদাই হারে।
গাঁথিয়ে পরাই তোরে॥

(৩)

উর্ধ্বমুখে গাভীগণে ভাই হাম্বা হাম্বা রবে।
অঙ্গনে দাঁড়ায়ে ডাকে কোথায় প্রাণ কেশবে॥
তাদের চক্ষে ধারা বয় রে।
এ দুঃখ কি প্রাণে সয় রে॥
গোপাল তোমা বিনে গোপালগণে কাননে
না চলে।
তাদের মন নাই ঘাসে, তোমার আশে ভাসে
নয়নজলে॥
একবার দেখ রে কানাই।
দাঁড়ায়ে তোর নব লক্ষ গাই॥
তুই বিনে চলে না হরি।
দাঁড়ায়ে সবে সারি সারি॥
বংশীধারী তার উপায় কি করি।
মরি, ভেবে মরি॥

(৪)

আপনি শিঙার ধ্বনি করে হল সারা
কেন আর বিলম্ব কর ও ভাই মাখনচোরা॥
ডাকিছে ডাকিছে দাদা।
শিঙার স্বরে বলাই দাদা॥
ও তুই কেমনে রইলি ঘরে ওরে কেলে সোনা।
ওরে নির্দয় কেন রাখাল প্রতি বল না, বল না॥
কেন নিদয় হলি ভাই
কি দোষ করিলাম সবাই॥
যদি দোষ করে থাকি।
ক্ষমা এখন পাব না কি॥
সৃষ্টিধরের ঐ ভাবনা।
ভেবে সেরে কেলে সোনা॥

(৫)

তোমা বিনা সে বিপিনে মনে শঙ্কা পাই রে।
সাধে কি ভাই আমরা তোমায় সঙ্গে নিতে
চাই রে॥
আমরা একলা যেতে পারি না।
তুই না গেলে কেলেসোনা॥
ওরে ক্ষুধার সময় ও রসময় কে দিবে ভাই খেতে
ওরে তুই যদি ভাই সরে রবি, না যাই গোষ্ঠেতে
আর কে দেবে খেতে।
ক্ষুধার সময় সেই বনেতে॥
তুই গেলে খেতে পাই অন্ন।
তোমা বিনে জীবন শূন্য॥
তুমিই ধন্য অন্য কে তা পারে।
ও ভাই কানাই রে॥

(৬)

জলে কিবা অনলে ভাই তুই রে জীবনদাতা।
তুই জানিস আর আমরা জানি আর কে
জানে তা॥
ও ভাই অন্যে কেউ তা।
জানে না, তোর আমার মরমের কথা॥
ও ভাই বনবিহারী
বনে যেতে কেন রে দেরী॥
তবে আর কেন ভাই, চরাতে গাই, যেতে
করছ দেরী॥

মায়ের কাছে বল বল।
গোষ্ঠসাজে সেজে চল॥
এলো এলো ঐ দেখ বলাই।
হেতা দিস না ব্যথা ভাই॥

(৬)

হাসি হাসি কালশশী আমরা আসি ভাই রে।
তোর আশাতে আশা মোদের অন্য আশা নাই রে॥
একবার এস ভাই এস ভাই
আমরা নেচে নেচে গোষ্ঠে যাই॥
ও ভাই গিরিধরা পরবে ধরা ধৈর্য ধরতে নারি।
ও তুই রাখাল মাঝে এলি সেজে আনন্দে বিহারি॥
দুঃখ দিও না হরি।
আয় রে ভাই তোর পায়ে ধরি॥
যদি ভাই তোর পায়ে বাজে।
কাঁধে করব বনমাঝে॥
এখন মা যে নাচন দেখতে চায় রে
নেচে নেচে আয় রে॥

(৮)

রাখালের বিনয়বাণী নীলমণি শুনিয়ে।
প্রণমিয়ে দাঁড়াইল মায়ের কাছে গিয়ে॥
বলে, সাজাইয়ে দাও মা।
বিলম্বে কাজ নাই জননী॥
তখন নন্দরাণী নীলমণি সাজাইয়ে দিল।
অমনি মায়ের পদে প্রণাম করি রাখালরাজ চলিল॥
মিশোনা রাখালদলে
রাখালসাজে রাখাল রাজ॥
আগে আগে চলে ধেনু।
মাঝে চলে রাম কানু।
শিঙা বেণু বাজায়ে বাজায়ে।
নেচে নেচে গেয়ে গো॥
রাখালগণ আনন্দমনে পাছু পাছু যায় গো।
আনন্দের আর নাইকো সীমা কত শোভা পায় গো॥
সবাই নেচে নেচে চলিল।
গো ধেনু চরাইতে॥
ওগো সৃষ্টিধর কয় সখ্যভাবের যাই বলিহারি।
মনে এই বাসনা উপাসনা ঐরূপ যেন করি।
দিবা বিভাবরী॥
ঐ রূপ শয়নে স্বপনে হেরি।
দশের পদে প্রণাম করি।
পদরজঃ শিরে ধরি॥
বদনেতে বল হরি হরি॥

গোষ্ঠ পালা

(কীর্ণাহার—পঞ্চানন বাগ্দী বোলান দলে গীত)

প্রথমে বন্দিব আমি গণেশের চরণে॥
দক্ষিণে জলদা নদী বন্দি জগন্নাথে।
যার প্রসাদ খেয়ে লোক হাত বুলায় মাথে॥
জগন্নাথের কি মহিমা
বলে কে জানাই সীমা॥

(২)

গণেশ থাকিতে যেবা অন্য লোক পূজে।
নানা বিঘ্ন হয় তার সিদ্ধ না হয় কাজে॥
আমি দেখে এলাম পাতালপুরে।
গণেশ পূজে ঘরে ঘরে॥
বন্দনা করিতে আমার হবে অনেকক্ষণ।
একই বারে বন্দিব সকল দেবগণ॥
মন দিয়া তোমরা শুন।
হরি হরি মুখে আন॥

(৩)

শয়নেতে ছিলেন নন্দ রত্নসিংহাসনে।
শুনিয়া কোকিলধ্বনি উঠিল বিহনে॥

উঠ্‌রে বাপ নীলমণি
শূন্য কোলে আছি আমি ॥

(৪)

উচ্চৈঃস্বরে কোকিল ছাড়িছে দেখ রা।
গা তোল গা তোল বলে ডাকে যশোদা ॥
উঠ্‌রে বাপ নীলমণি
উঠে খাও রে ক্ষীর নবনী ॥

(৫)

কত নিদ্রা যাও রে গোপাল আমি ত না জানি।
জাগিল গোকুলের লোক পোহাল রজনী ॥
একবার উঠে আয় রে কোলে।
চাঁদমুখে ডাক মা মা বলে ॥

(৬)

উঠে নন্দ শ্রীদাম মোর সুদাম বলে ডাকে।
গোচন করিয়া ধেনু লয়ে যায় রে মাঠে ॥
গগনেতে বেলা হলো।
কানাই এবার গোঠে চল ॥

(৭)

রাম নাম বলে তখন শিঙায় দিল সাড়া।
বলরামের শিঙার স্বরে সাজিল গোয়ালা পাড়া ॥
বলরামের শিঙার স্বরে।
গোধন হাম্বা চাম্বা করে ॥

(৮)

তখন বাথানে জড়ো দ্বাদশ রাখাল
সকল রাখাল মিলে ডাকাইছে পাল
গগনেতে বেলা হলো।
গোষ্ঠের সময় বয়ে গেল ॥

(৯)

আয় প্রাণের ভাই বলে শ্রীদামও চলিল।
মায়ের কথায় কানাই ঘরেতে রহিল ॥
গগনেতে বেলা হলো।
ধেনুগুচ্ছ সকল খোল ॥

(১০)

গগন পানে চেয়ে দেখ গোষ্ঠে বেলা হলো।
আসি বলে গেল কানাই এখন না এলো ॥
আসি বলে গেল চলে।
বসে আছে মায়ের কোলে ॥

(১১)

শ্রীদাম সুদাম মোর তিনেক রেখ ধেনু।
ঘরে গিয়ে পাঠাইব শ্রীনন্দের কানু ॥
হরি হরি হরি বলে।
ভেসে যাই নয়নজলে ॥

(১২)

রাখাল প্রবোধ দিয়ে শ্রীদামও চলিল।
মায়েরও নিকটে গিয়া দরশন দিল ॥
কোথায় মা গো নন্দরাণী।
গোঠে পাঠাও তোর নীলমণি ॥

(১৩)

করেছি কঠোর ব্রত সাগরে ঢেলে গা।
অনেক ভাগ্য হয়ে আছি গোপালের মা ॥
শিবের মাথায় ঢেলে মধু।
কোলে পেলাম সোনার যাদু ॥

(১৪)

কানাই ভাইকে রেখে যদি আমরা যাব গোঠে।
ভাই বিনা কে তরাবে বিষম সঙ্কটে ॥
ফলে যদি যাব গোঠে।
কে তরাবে এ সঙ্কটে ॥

(১৫)

একদিন মরেছিলাম বিষজল খেয়ে।
বাঁচিয়ে দিল ভাই কানাই প্রাণদান দিয়ে ॥
মরেছিলাম বিষ খেয়ে।
বাঁচিয়েছিল কানাই ভেয়ে ॥

(১৬)

কে যাবি রে যাবি তোরা কানাইকে আনিতে।
সুবল বলে আমি ভাই রে পারব না যাইতে ॥

শুন শ্রীদাম আমার বাণী।
যাতে এসে নীলমণি॥

(১৭)

সুবল বলে আমি ভাই রে গিয়েছিলাম কাল।
কানাইএর মা নন্দরাণী দিয়েছিল গাল॥
তোর মায়ের কি কঠিন হিয়ে।
দয়া নাই চাঁদমুখ চেয়ে॥

বোলান গীত (ভণিতা)

হরিপদ রক্ষিত

আমরা যত বোলান বললাম প্রকাশ করি।
নব ভক্ত লাগায়ে আরও তো বলতে পারি॥
হরিপদ জাতি ক্ষুদ্র
জানে না শুদ্ধাশুদ্ধ বলে অন্য।
ওগো কল্পনাতে পদ্য করা আর কি সাধ্য॥
তোমরা দোষাদোষ ধরো না।
ওগো মনেতে রোষ কোর না॥
এসব কথা এইখানেতে ক্ষান্ত করে যাই।
সকলেতে বদন ভরে হরি বল ভাই॥

ভণিতা—(১৪)

এই হরিপদের দুঃখের কথা শুন সর্বজন।
রাধা যেমন কৃষ্ণ বিনে নিশিদিনে করিছে রোদন॥
আমি তেমনি কেঁদে বেড়াই গো, কানাই কানাই করে।
জ্বালায় উপর জ্বালা ঘটাইল বিধাতা এই বারে।
আমি সেই জ্বালাতে মরে যাই।
ঘরের জ্বালা পরের জ্বালা—
হরিপদর দুঃখের কথা শুন বলি সর্বজন।
পেটের দায়ে করে বেড়াই দেশ ভ্রমণ॥

(১৫)

এলাম মনের আশে চৈত্রমাসে গাইতে বোলান গান।
পেটের তরে বেড়াই দৌড়ে জল বেগরে মরছে ধান॥
যতগুলি বোলান বললাম গো আরও বলতে পারি।
ওস্তাদের নাম হরিপদ দাস কৈবড়াতে বাড়ী
ও যে সে আনাড়ী।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই সে যে আনাড়ী।
দশের বরণ করবো ধারণ এই মনে বাসনা।
নিশি দিনে মনে মনে এই উপাসানা॥
একবার হরি বলুন দশজনা॥

ভণিতা—(ক)

বোলান খণ্ডিত পালা হয় বাড়ী বাড়ী
পালা সাঙ্গ করি সবে বল হরি হরি॥
ওস্তাদ মোদের অতি ক্ষুদ্র জাতি।
কেবড়ার পশ্চিম পাড়াতে বসতি॥
মোর ওস্তাদ রয়েছে সঙ্গে গাইছে বোলান দলে।
বড় সুখী হই হরিগুণ গাই মালা তাহার গলে॥
মালা দাও গো, ওস্তাদের গলায়, মালা দাও গো।
বদন ভরিয়ে সব হরিনাম বল গো॥

(খ)

বিদায় করি দাও এবে দেয়াসিনী গোঁসাই
আশীর্বাদ করুন এমনি কৃষ্ণগুণ গাই॥
করযোড়ে নিবেদন করি
যুগে যুগে মোরা চরণভিখারী
অনেক গাজন বোলান গাইব নাহি সহে বেশী দেরী।
লুটাই ভূমিতে একবিত্ত হয়ে দয়া কর ত্রিপুরারি।
একবার দয়া কর হে! হায় হে একবার দয়া কর হে।
চরণভিখারী মোরা দয়া কর হে॥

মেদিনীপুর জেলার চিত্রকর

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত মাঘ মাসে লোকশিল্প বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য মেদিনীপুর জেলায় কয়েকটি গ্রামে গিয়েছিলাম। সেই সময় বিভিন্ন জাতি, যারা শিল্পকেই প্রধান উপজীবিকা করে বেঁচে আছে, তাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে হয়। এদের মধ্যে একটি চিত্রকর সম্প্রদায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চিত্রকরদের স্থানীয় লোকেরা 'পটিদার' বা 'পটুয়া' বলে। নন্দীগ্রাম থানার কুমীরমারা-আম্‌দাবাদ গ্রামে মোট ১১ ঘর, জনসংখ্যা ৪৩ জন এবং নান্‌কারচক গ্রামে মোট ২৫ ঘর। এদের মধ্যে ২২ ঘরের জনসংখ্যা ১২৩ জন।

যেটা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটা হচ্ছে এদের 'ধর্ম'। এরা অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান। নামগুলো বেশীর ভাগই হচ্ছে পরেশ, যোগেন, সতীশ, সন্তোষ ইত্যাদি। এর মধ্যে দু-একজন নাসিরুদ্দীন বা হোসেন শাও আছে। যদিও বংশাবলী নিতে তাদের বাপের নাম দেখলাম যথাক্রমে শেখ গোপীনাথ ও শেখ ভূষণ শা। এরা ঈদ উৎসব পালন করে, নমাজ পড়ে, বিয়েতে কাজী ডাকে। আবার শীতলা ও বিশ্বকর্মা পূজাও করে। বলাই বাহুল্য, পূজাটা নিজেদেরই সারতে হয়; কেন না, বামুন ঠাকুর আসেন না। পটুয়ারা গোমাংস খায় না। এদের বিবাহ নিজেদের সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ; মুসলমান ঘরে পটুয়ারা সকলেই স্বীকার করে যে, এদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দু ছিলেন। চিত্রকরদের মতে তাদের উদ্ভব হয়েছে বিশ্বকর্মা এবং অপ্সরা ঘৃতাচী থেকে। হিন্দু রাজাদের আমলে এরা অত্যন্ত নীচু শ্রেণীর বলে গণ্য হ'ত এবং উচ্চবর্ণের নানা অত্যাচারের কারণেই নাকি শেষ পর্যন্ত মুসলমান নবাবদের আমলে মুসলমান হয়ে যায়। কুমীরমারা গ্রামের চিত্রকরদের মতে এরা কিন্তু কখনই নিজেদের ছোট জাত বলে ভাবে না। তাই তারা এখনও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের বাড়ীতে ভাত জল খায় না বা পটও দেখায় না। তারা মুসলমানদের বাড়িতেও খায় না বা পট দেখায় না। কেবল গ্রামের বর্ণহিন্দুদের বাড়ীতেই ভাত জল খায় বা পট দেখিয়ে ভিক্ষা করে।

চিত্রকরদের প্রধান উপজীবিকা হলো গান গেয়ে পট দেখিয়ে ভিক্ষা করা। এই সংগে এরা প্রতিমাও গড়ে। এদের মেয়েরাও বসে থাকে না, তারাও পৌষ বা চৈত্রসংক্রান্তির মেলায় অথবা উৎসব উপলক্ষ্যে হাতে মাটির পুতুল গড়ে; তার পর ছেলেরা, কখনও কখনও মেয়েরাও হাটে সেগুলো বিক্রি করে আসে। মেয়েরা ছাঁচেও পুতুল গড়ে। ছাঁচে গড়া রাধাকৃষ্ণ, মহাদেব, লক্ষ্মী, গণেশ ইত্যাদি পুতুলের দাম পড়ে চার আনা থেকে ছ' আনা। তা ছাড়া হাতে গড়া পুতুলগুলোর মধ্যে কাকাতুয়া, টিয়া, ময়ূর, বাঘ, হাতী, হাতীপিঠে মানুষ, আর 'আহ্লাদী' পুতুল ইত্যাদির দাম দুই থেকে ছ' পয়সার মধ্যে। সব পুতুলেই রং মাখানো হয়। ছেলেরা দুর্গা, কালী থেকে সব রকম প্রতিমাই গড়তে পারে। স্থানীয় পূজোতে

চিত্রকরেরা প্রতিমা গড়ে। এদের মধ্যে কুমীরমারা গ্রামের সন্তোষ চিত্রকর কালীঘাটের কুমোরপাড়ায় প্রতিমা গড়ে, মাসিক মাইনে নিয়ে।

এবার পটুয়াদের আসল শিল্প—যেটার নামে এদের নাম, সেই প্রসংগে আসা যাক। আগেই বলেছি, এরা পট দেখিয়েই জীবিকা নির্বাহ করে, তাই এদের নাম হয়েছে পটিদার। পটগুলি এদের নিজেদের আঁকা। কুমীরমারা গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই পট আঁকতে পারে। কিন্তু নামকারচক গ্রামের এক সতীশ পটিদার ছাড়া আর কেউ এখন আর পট আঁকতে পারে না। অপরে সতীশের কাছ থেকে ৬৲ টাকা থেকে ১০৲ টাকায় পট কিনে তাই দেখিয়ে ব্যবসা চালায়।

প্রথমে গানের পালা অনুসারে মাথায় মাথায় কাগজ জুড়ে ২০ থেকে ৫০ ফুট পর্যন্ত লম্বা করে নেওয়া হয়। কাগজগুলিকে মেয়াদী করার জন্যে ২।৩ পুরু করা হয় আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে, তার পর আলতা দিয়ে সেই কাগজের উপর যে যে ছবি আঁকা হবে, তার নক্সা এঁকে নানা রং দিয়ে সেগুলি ক্রমে ভরাট করা হয়। তার পর ছবির দু মাথায় মাপসই দু টুকরো কাপড় সেলাই করে দেওয়া হয়। এই কাপড় দুটোর দুমাথা আবার দুটো কঞ্চির সংগে মুড়ে দেওয়া হয়। শেষে এই কঞ্চির গায়েই সমস্ত পটটাকে শেষের থেকে প্রথম পর্যন্ত গুটিয়ে রাখা হয়। আগে এরা পট আঁকতে বা পুতুল রং করতে কাঠকয়লা, কাঠখড়ি, পাত আলতা বা পাকা তেলাকুচোর রস ইত্যাদি দেশী রং ব্যবহার করতো। তবে এখন কি পট আঁকতে, কি পুতুল রং করতে, বিলাতী রং ব্যবহার করা হয়। পট তৈরী করতে এদের খরচ পড়ে ছোট পটে ৬৲ টাকা, খুব বড় পটে ১০৲ টাকা।

পটের আখ্যানবস্তু সব ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি থেকে নেওয়া হয়। আমি এদের মধ্যে সীতাহরণ, রাবণবধ, কৃষ্ণলীলা, নরমেধ যজ্ঞ, সাবিত্রী সত্যবান্, দাতাকর্ণ, মনসামঙ্গল (বেহুলা), শ্রীদুর্গা (শ্রীমন্ত মশান) ইত্যাদি পট পেয়েছি।

পটগুলির মধ্যে যে দেব বা দেবীর আখ্যান বর্ণনা করা হবে, তাঁর ছবিটি বেশ বড় করে আঁকা হয়। তার পর যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হবে, তার দৃশ্যগুলি পর পর আঁকা থাকে। সর্বশেষে মিলন, কি 'বর প্রাপ্তি' ইত্যাদি দেখিয়ে পট শেষ হয়। পট ক্রমশঃ নীচের দিক্ থেকে খোলা হয়, উপর দিকে গোটানো হয়, সংগে সংগে যে দৃশ্য বেরোয়, চিত্রকর পাঁচালী পাঠের সুর করে ছড়ায় সেই দৃশ্যগুলো বর্ণনা করে যায়। দুটি পট সংগ্রহ করা গেছে গান শুদ্ধ। সেই গান বা ছড়া দুটো দিয়ে উদাহরণ দিলে ভালো বোঝা যাবে।

১। যেমন চণ্ডীপটে (শ্রীদুর্গা বা শ্রীমন্ত মশান) ছড়া (গান দুটিতে তারা যে ভাষা ব্যবহার করে, অবিকল তাই দেওয়া হচ্ছে):—

দুর্গে দুর্গে তারা মাগো দুঃশে বিলাসিনী
দুর্জয় দক্ষিণ কালী নগের নন্দিনী।
দশবাহু চণ্ডীমাতা দশদিকে সাজে
ত্রিনয়ন জলেছে ভালো কপালেরি মাঝে।

লক্ষ্মী সরস্বতী বামে কার্ত্তিক গণেশে
সিংহ অসুরে জয় বিজয়া চলে মার সনে।
একদিন কালকেতুর হয়েছিল দয়া
ডাল্-লিম্ তলাতে ধন দিল দেখাইয়া।

ডাল্-লিম্ তলাতে ধন কালকেতু পেল
সেই ধন পেয়ে কালকেতু গুজরাট কাটিয়া
বন নগর বসালো।
চৌদ্দ বৎসর ছিল সাধু বন্দী কারাগারে
শ্রীমন্ত জন্মিল গিয়া খুল্লনা উদরে।
লেখাপড়ায় শ্রীমন্ত জ্ঞানমন্ত হোল
সফরে যাইবে বলে বাসনা করিল।
এক পুত্র তুই আমার নয়নেরি তারা
তোরে যদি ছেড়ে দেবো রে বাপু দুর্গায়
ডাক ত্বরা।
স্মরণ করিতে তখন আইল দুর্গা।
দুর্গার হাতে শ্রীমন্তকে দিল উঠাইয়া
'জয় মা ভবানী' বলে ডিঙ্গায় উঠে গিয়া।
মকরায় ঝড়বৃষ্টি কোন গৃহে ফলে
কামিনী গিলেছেন গজ বসে শতদলে।
শতদল পদ্মের মাঝে কমলে কামিনী
নারী-ছলে গিলছেন গজ গণেশজননী।
কমলেরি ডালপালা কমলেরি নতা
বৎসর ষোড়শ নারী গিলে গজ মাতা।
ইহা দেখে শ্রীমন্ত ভাবে মনে মনে
লক্ষ লক্ষ প্রণাম সাধু করিল সেখানে।
সেইখানেতে বাহিয়া চলে ডিঙ্গাল বাঙ্গাল
রত্নমালার ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হোল।
রত্নমালার ঘাটে বাজে ধামসার ধ্বনি
রাজার দিগার মিলি করে কানাকানি।
রাজ্যের ব্যবস্থা রাজা রাজ্য লুটে খায়
ভালোমন্দ রাজার কাছে কিছু না শুনায়।
হেনকালে শ্রীমন্ত গিয়ে হাত জোড়ে দাঁড়াল।
তোমার মুলুকে মহারাজ দেখে এলাম আমি
নারীছলে গিলছেন গজ গণেশজননী।
কমলেরি ডালপালা কমলেরি নতা
বৎসর ষোড়শ নারী গিলে গজ মাতা।
ইহা শুনে সাল্‌বন রাজা বলেন দেখাও না
আমারে
অর্ধেক রাজ্য কন্যাদান দিবহে তোমারে।
বৃদ্ধের মা ভগবতী কিনা বৃদ্ধে কইল
শ্রীমন্তরে কাঁদাবে বলে লুকায়ে রহিল।
শ্রীমন্ত দেখাতে না পেরে অপ্রস্তুত হইল
রাজার কোটাল ডেকে বন্ধন জুড়াল।
বন্ধনে পড়িয়া সাধু কাঁদিতে লাগিল
কান্‌তে কান্‌তে দুর্গামারে স্মরণ করিল।
শ্রীমন্তকে কাটবে বলে মশানে চলিল
বৃদ্ধ এক ব্রাহ্মণীর বেশে পথে দেখা দিল।
পুনর্বার কাটবে বলে মশানে চলিল
শঙ্খচিলের রূপে মাগো গগনে উড়েছিল।
তাহাতেও দুষ্ট সাল্‌বন প্রত্যয় নাহি গেল
১৮ ভুজার বেশে মাগো মশানে দাঁড়ালো।
তুমি দিবে ত্রিসন্ধ্যা মাগো তুমি মা যামিনী
কখনো পুরুষ বেশ কখনো কামিনী।
কার বাড়ী গিয়েছিলে মা কে করিল পূজা
জনমসার হোল মাগো দেখে ১৮ ভুজা।
সুশীলা কন্যাকে সাল্‌বন শ্রীমন্তে বিবাহ দিল
দেশ কুটুম্ব ডাকিয়া সব ভোজন করালো।

এই পটে প্রথমেই আছে দশভুজার মূর্তি লক্ষ্মী সরস্বতী ইত্যাদি সহ। তার পর ছড়ায় যা যা কথা আছে, সেগুলোকেই একে একে পরের পর এঁকে দেখানো হয়েছে। শেষ দৃশ্যে দেখানো হয়েছে শ্রীমন্ত রাজকন্যা সুশীলাকে বিয়ে করে পাল্কী করে নিয়ে যাচ্ছে।

২। **মনসামঙ্গল পট** (বেহুলা)

ছড়া

মনসা জগত গৌরী জয় বিষহরি
অষ্টনাগের মাথা পরম সুন্দরী।
নাগের হোল ঘটপট নাগের সিংহাসন
মঙ্গলা বরার পিঠে দেবীর আসন।
তরঙ্গে গরজে বেই না মোচরায় দাড়ি
কান্ধে করে নাচে বুড়ো হেঁতালের বাড়ি।

যদি বিটি ঢেমণের লাগাল যদি পাই
মারিব হেঁতালের বাড়ি কম্বল জুড়াই।
সেই কালে বিষহরি আপণ শুনিল
কোরোধ করিয়া বেই নার ৬ পুত্র খেল।
৬ পুত্র খাইয়া ৬ বঁধূ কৈল রাড়।
জন্মে নাইকো দিশ বেইনা কড়ার পুষ্পদান।
তিন গাইনে গীত গায় মধুরস পাণি
সবার সগুরে পুজে চ্যাংমুড়ির কানী।
কলির পুত্র আইজ্ঞ দুর্লভ লখিন্দর
তার বিবাহ দিব চল চম্পাই নগর।
চম্পাই নগরে ঘর অমূল্য বেইনানী।
তাহার ঝিয়ার নাম রেখেছে বেহুলা লাচনী।
সম্বন্ধ করিতে গেল দনার্দন বুড়ো
সমন্ধ ঘুচায় মোরে সেই আঁটকুড়ো।
সেঁতালী পর্বত আছে লোহার বাসরঘর
তাতে শুয়ে নিদ্রা যায় কান্ত লখিন্দর।
ছুটে গিয়ে নীলা নফর সদাগরে কয়
তোমার পুত্র মরে গেল শুন মহাশয়।
ভালো হোল আমার পুত্র লখিন্দর মোল
দুহাতে তুলিয়া বুড়ো নাচিতে লাগিল।
একখানা কলার গাছে ৩ খান করিল
বাঁশের গাঁজাল মেরে বেহুলা ভাসিল।
ভাসিতে ভাসিতে ভেলা কতদূরে গেল
গদা ঘাটে গিয়ে বেহুলা উপস্থিত হোল।
এক পায়ে গোদ গদার কাঁধে রাম কুড়ি
আশে পাশে ফেলে গদা বড়শির দাড়ি।
যুবতী দেখিয়ে গদা করে উপহাস
কহ দেখি শ্রীমন্তিনী কোন দিকে বাস।
তোর মুখে ছাইরে গদা তোর মুখে ছাই
মা মনসার দাসী আমি জলে ভেসে যাই।
এই রকব কত ঘাট জলে এড়াইয়া গেল
তমলুকের ঘাটে গিয়া উপস্থিত হোল
তমলুকের ঘাটে মড়া খেলিতে লাগিল।
ধনা মনা দুটি ছেলে শোওয়াইয়া ঘাটে
নেতা ধোবানী কাপড় কাচে তমলুকের পাটে
সেই কাপড় নয়ে বেহুলা দেবপুরে গেল
ব্রহ্মা বিষ্ণু কাছ হতে বর মেগে নিল।
দিলাম বেটী বেহুলারে দিলাম বেটী বর
সাত ডিঙ্গা সাত নৌকার যাওরে বিটি ঘর।
সাত ডিঙ্গা সাজাইল মনের হরষে
মরাপতি বাঁচলে গেল তবে দেশে।

এই পটেও প্রথমেই আছে নাগের মাথায় মনসা দেবীর মূর্তি, তার পর ছড়ায় যা আছে, সেই বিষয়বস্তুগুলোকে পর পর এঁকে দেখানো হয়েছে। শেষ দৃশ্যে এই পটেও বেহুলা ও লক্ষীন্দর, বাকী ৬ পুত্র ৬ বধূ সকলকে দেখানো হয়েছে, মনসার পুজা করা দেখানোর সঙ্গে।

ছড়ায় যেমন গাইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মিল রেখে পটও একটু একটু খুলে দেখাতে থাকে এক হাতে; আর এক হাতে গোটাতে থাকে।

চিত্র করেরা লেখাপড়া জানে না। কেউ কেউ সামান্য একটু আধটু বাংলা লিখতে বা পড়তে পারে। এই পটের ছবিগুলো তারা মন থেকেই আঁকে; আর গানগুলো বংশ-পরম্পরায় শুনে শুনে শেখে। এদের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়। ভিক্ষাই এদের উপজীবিকা। পট দেখিয়ে বাড়ী বাড়ী দুমুঠো করে চাল পায়, তাইতে কায়ক্লেশে জীবন কাটে। সকালে ছেলেরা পট নিয়ে বেরোয়, ৩।৪। মাইলের মধ্যে গ্রামগুলিতে ঘুরে ঘুরে চাল সংগ্রহ করে বেলা ২।৩টে আন্দাজ বাড়ী ফেরে। ক্ষেতের কাজ শেষ হলে লোকের হাতে পয়সা হয়। তখন বাড়ীর বড়োরা পট নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, তারা বীরভূম, বাঁকুড়া বা মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামে, শহরে ঘোরে রোজগারের আশায়। বাড়ীতে থাকে ছেলেপিলে, বৌ-ঝিরা; কিশোর ছেলেদের রোজগারে তখন এদের কোনও ক্রমে চলে। গ্রামের লোকেরা চিত্রকরদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এরা গেলে যে যার সাধ্য মত ভিক্ষা দেয়। কদাচিৎ কেউ কেউ পুরান ধুতি বা শাড়ীও দেয়। চিত্রকর ছেলেদের লেখা-পড়া করতে বড় ইচ্ছা; কিন্তু আর্থিক অনটনে সে সুযোগ এরা পায় না। ধানের জমি তো কারুরই নেই, অধিকাংশের ভিটে বলতেও কিছু নেই; অপরের জমিতে দয়া করে হয় তো থাকতে দিয়েছে, তাই আছে। এদের সংখ্যা খুব কম। নিদারুণ অর্থকষ্টে এদের সম্বল শিল্পপ্রতিভাটুকুও যেতে বসেছে। কিন্তু একটা শিল্পী গোষ্ঠীকে সত্যি সত্যি কি আমরা এই ভাবে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখবো ?

মাধ্যমিক বৌদ্ধদের শূন্যবাদ

অধ্যাপক শ্রীহেরম্ব চট্টোপাধ্যায়

মাধ্যমিকপন্থী বৌদ্ধদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইল 'শূন্যতা'। নাগার্জ্জুনকে সাধারণতঃ শূন্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলিলেও এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাহার পূর্ব্বে মহাযান সূত্রগুলির মধ্যে শূন্যতার কথা পাওয়া যায়। তবে নাগার্জ্জুন ঐ সূত্রগুলিকে তর্কাদির প্রয়োগে সুসংবদ্ধ করিয়া প্রতিপাদিত করিয়াছেন। শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ নিজকে মাধ্যমিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শূন্য পদটীর অর্থ অনেকে ভুল বুঝিয়া থাকেন। সাধারণতঃ অভাবার্থে পদটীর প্রয়োগ দেখা যায় বলিয়া এই ভ্রমের উৎপত্তি। মাধ্যমিকদের শূন্যতার বিশেষ একটি অর্থ আছে। সেই অর্থে শূন্য পদ নাস্তিত্ববোধক নয়। তাঁহাদের মতে শূন্য শব্দের অর্থ অবাচ্য কারণ-বুদ্ধির বহির্ভূত নয় (চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত)। যে তত্ত্ব অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, উভয় বা নোভয়ের উর্দ্ধে, তাহাই শূন্যতা। ইহা কিছু স্বীকারও করে না, অস্বীকার করে না, অথবা স্বীকার ও অস্বীকার অথবা না স্বীকার, না অস্বীকার, কোনটাই করে না। একদিকে ইহার অর্থ নির্ভরশীলতা (প্রতীত্যসমুৎপাদ), অন্য দিকে ইহার অর্থ তত্ত্ব।

জগৎ অবর্ণনীয়। কারণ, ইহার অস্তিত্বও নাই, অনস্তিত্বও নাই। তত্ত্ব অবর্ণনীয়। কারণ, ইহা প্রকৃত জ্ঞান (Pure Reason) বলিয়া সাধারণ জ্ঞানের বর্ণনার অতীত। শূন্যের দুইটি অর্থ আছে—নির্ভরশীলতা ও তত্ত্ব—সংসার ও নির্বাণ। যাহা আমাদের নিকট প্রতিভাত, যাহা অস্তিত্বের জন্য অন্য বস্তুর উপর নির্ভরশীল, তাহাকে পরমার্থের দিক্ দিয়া সত্য বলা চলে না। যেমন ধার করা অর্থকে বাস্তবিক অর্থ বলা চলে না। সকল ধর্ম্মই নির্ভরশীল (প্রতীত্যসমুৎপন্ন) বলিয়া বাস্তব উৎপত্তিহীন (পরমার্থতঃ নোৎপন্নঃ), অতএব পরমার্থ-সত্যহীন (স্বভাবশূন্য নিঃস্বভাব ও অনাত্ম) তত্ত্ব (Real)ই পরমার্থ—ইহার মধ্যে সকল বহুত্বই (Plurality) লুপ্ত হয় (প্রপঞ্চশূন্য, নিষ্প্রপঞ্চ, অদ্বয়তত্ত্ব)। অতএব শূন্য পদ নাস্তিত্ববোধক নয়। ইহার অর্থ দাঁড়াইল পরমার্থ-সত্যহীন ও প্রপঞ্চহীন। Prof. St. Cherbatsky যে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন 'Relativity' বলিয়া, তাহা শূন্যতা শব্দটির দুইটি অর্থের অংশমাত্র-বোধক।

অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায় অভিহিত হইয়াছে যে, সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে কোন বস্তুই বাস্তবিকভাবে টিকিতে পারে না। কারণ, তখন দেখা যাইবে যে, ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত। সসীম জ্ঞানের কাছে বস্তুরূপে প্রতিভাত হইলেও পরিণামে দেখা যাইবে যে, তাহারা অস্তিত্বের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল। এই অর্থে কোন বস্তু নাই, ব্যক্তি নাই, ধর্ম্ম নাই। মহাযান শব্দ পর্য্যন্ত স্ববিরোধী। নির্বাণও মায়োপম। এমন কি, নির্ব্বাণ হইতেও বৃহত্তর

কিছু থাকিলে, তাহা মায়ার ন্যায় বুঝিতে হইবে।[১] লঙ্কাবতার-সূত্রে বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বলাভ সম্ভবপর নয়। বুদ্ধির জন্য আমরা বিকল্প ও দ্বৈতজ্ঞানের অধিকারী হই। জগতের ব্যাবহারিক জ্ঞান চতুষ্কোটির উপর প্রতিষ্ঠিত।[২] আরও বলা হইয়াছে যে, ব্যাবহারিক জ্ঞানের জালে যাহারা জড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহারা পরমসত্যকে জানিতে পারে না। আসল তত্ত্ব জানিতে হইলে ব্যাবহারিক জ্ঞানের অতীত হইতে হইবে। ব্যাবহারিক জ্ঞান হইতেই চতুর্দ্দশ প্রকার সংশয় উপস্থিত হয় এবং বুদ্ধদেব এই সংশয় নিরসনের জন্য কোন উত্তর দান না করিয়া চুপ করিয়াছিলেন। জগৎ অস্তবান্ বা অস্তবান্ নয়, অথবা উভয় অথবা কোনটাই নয়।—এরূপ কোন প্রশ্নের জবাবই আমাদের জানা নাই। ইহার সমাধান জ্ঞানের দ্বারা সম্ভবপর নয়। পরস্পর নির্ভরশীল বলিয়া ইহারা সকলে কল্পনামাত্র। এমন কি, নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত মায়ার ন্যায়। বন্ধন ও মুক্তি পরস্পর নির্ভরশীল বলিয়া অসত্য। নির্ব্বাণকে অস্তিত্ববান্ ও অস্তিত্বহীন কল্পনা করা সম্ভবপর নয়, আবার বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া উভয়যুক্ত বলা চলে না। পুনরায় যদি নির্ব্বাণকে কল্পনা করা হয় এমন একটি বস্তু, যাহা অস্তিত্বযুক্তও নয়, অস্তিত্বহীনও নয়, তাহা হইলে এরূপ নির্ব্বাণকে কল্পনার গোচরীভূত করা যাইবে না। সুতরাং নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন যে, নির্ব্বাণ তত্ত্বতঃ টিকিতেই পারে না।[৩] আর্য্যদেব, চন্দ্রকীর্ত্তি ও শান্তিদেব জগতের সমস্ত বস্তুকে প্রতিভাত বস্তুমাত্র বলিয়া কল্পনা করিয়া মায়া, স্বপ্ন প্রভৃতির সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহা হইল শূন্যবাদের ব্যাখ্যার একটি দিক্। শূন্যবাদে কেবলমাত্র সকল পদার্থের নাস্তিত্বই প্রতিপাদিত হয় নাই। তাই বলা হইয়াছে—

> "Sunyavadin is neither a thoroughgoing sceptic nor a cheap nihilist who doubts and denies the existence of everything for its own sake or who relishes in shouting that he does not exist. His object is simply to show that all world objects when taken to be ultimately real, will be found self-contradictory and relative and hence appearances."[৪]

আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তি তাঁহার মাধ্যমিক মূলসূত্রের টীকায় স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, মাধ্যমিকগণ নাস্তিক নয়।[৫] এস্থলে নাস্তিক পদটী সব কিছুর শূন্যতার বোধক বলিয়া অভিপ্রেত। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, কোন বস্তুর সম্পূর্ণ শূন্যতা সম্ভবপর নয়। শূন্য কথাটাই অন্য পক্ষে অস্তিত্বের প্রতিপাদক। মাধ্যমিকদের শূন্যবাদে কেবলমাত্র অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের অস্বীকার করা হইয়াছে। পরমার্থের দিক্ দিয়া বুদ্ধিকেও তিরস্কৃত করা হইয়াছে। কারণ; বুদ্ধির

১। 'যদি নির্ব্বাণাদপ্যন্যঃ কশ্চিৎ ধর্ম্মো বিশিষ্টতরঃ স্যাৎ তমপ্যহং মায়োপমং স্বপ্নোপমমিতি বদেয়ম্'—পৃ. ৪০।

২। 'চাতুষ্কোটিকং চ মহামতে। লোকব্যবহারঃ'—পৃ. ১৮৮।

৩। মাধ্যমিক বৃত্তি—২৭।৪-১৬।

৪। Dr, Chandradhar Sharmaর Indian Philosophy পৃ. ১১৯ দ্রষ্টব্য।

৫। ন বয়ং নাস্তিকাঃ—পৃঃ ৩২৯।

জন্য আমাদের মনে যে বিরোধ বা বিকল্পের জ্ঞান হয়, তাহার উর্দ্ধে উঠিতে না পারিলে তত্ত্বের অনুভূতি অসম্ভব। তত্ত্বের বোধ হইলে সকল প্রপঞ্চের উপশম হয় এবং তাহাকেই শূন্য আখ্যা অন্য দিক্ হইতে দেওয়া হইয়াছে। শূন্যতা যে নাস্তিত্ববোধকই নয়, তাহা বিশেষভাবে লঙ্কাবতারসূত্রে দর্শিত হইয়াছে। অস্তিত্বের দিক্ দিয়াও কল্পনা করিলে শূন্যতাকে সুমেরুমাত্র অর্থাৎ পরিমাণপূর্ণতার প্রতীক বলা যাইতে পারে।[৬] তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে যে, শূন্যতা যদি অস্তিত্ব নাস্তিত্বের কোনটাই না হয়, তাহা হইলে ইহার স্বরূপ কি ?—ইহার উত্তর সমাধিরাজসূত্রে স্পষ্টভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, ঐ উভয় অন্তের পরিহারেই তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি।[৭] সাধারণ লোকেরা বা থেরবাদী বৌদ্ধগণ নাগার্জ্জুনের মতে শূন্যতার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বুদ্ধদেবের বচনের প্রতিপাদ্য অর্থ সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় নাই। ফলে শূন্যবাদকে নাস্তিত্ববাদে পরিণত করিয়া নাগার্জ্জুনের মতকে নাস্তিত্ববাদী বলিয়া অপপ্রচার করা হইয়াছে। বিশেষভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইব যে, বুদ্ধদেব তাঁহার দেশনাকে দুই ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। যেমন ম্লেচ্ছজনের সহিত বাক্যালাপ করিতে হইলে আলাপরত জনকে ম্লেচ্ছভাষায় কথা বলিতে হইবে, কারণ—আর্য্যভাষায় কথা বলিলে তাহা তাহার বোধগম্য হইবে না, সেইরূপ বুদ্ধদেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, গূঢ় তত্ত্বের উপদেশ দুই ভাবে[৮] করা প্রয়োজনীয়। একটী সাধারণের জন্য, তাহার নাম হইল সবৃতিসত্য। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে সকল পদার্থই অস্তিত্বযুক্ত। অপর সত্যটী হইল পরমার্থসত্য। পরমার্থদৃষ্টির মাধ্যমে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সাধারণভাবে যে বস্তুকে আমরা নিত্য বা অস্তিত্বযুক্ত বলিয়া মনে করি, তাহা মূলতঃ অস্তিত্বের জন্য অন্য বস্তুর উপর নির্ভরশীল। যে বস্তু নিজের সত্তার জন্য পদার্থান্তরের উপর নির্ভলশীল, তাহাকে কখনও তত্ত্বতঃ আছে বলিয়া বলা চলে না। তাই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, নিজের জন্মের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল বস্তু কখনই জাত বলা চলে না—'যঃ প্রত্যয়ৈঃ জায়তে স হ্যজাতঃ'। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, পরমার্থদৃষ্টিতে বিচার কারলে কোন বস্তুরই আপেক্ষিক ভিন্ন সত্তা পাওয়া যায় না এবং এই সত্তাহীনতাকেই শূন্যতা পদের দ্বারা বর্ণিত করা হইয়াছে। নাগার্জ্জুন তাঁহার কারিকায় এই কথা বলিয়াছেন—

'যঃ প্রতীত্য সমুৎপাদঃ শূন্যতাং তাং প্রচক্ষ্মহে।

৬। বরং খলু সুমেরুমাত্রা পুদ্‌গলদৃষ্টির্ণত্বেব নাস্ত্যস্তিত্বাভিমানিকস্য শূন্যতাদৃষ্টিঃ। পৃঃ ১৪৬।

৭। তস্মাদুভোন্ত বিবর্জয়িত্বা মধ্যেঽপি স্থানং ন করোতি পণ্ডিতঃ। পৃঃ ৩০।

৮। দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মদেশনা।

লোকসংবৃত্তিসত্যঞ্চ সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ। মাধ্যমিকাকারিকা। ২৪। ৮।

বাঙ্গলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

(৭)

বিদ্যার গর্ভ ও গোপন প্রেম প্রকাশ

এই প্রসঙ্গটি মোটামুটি পাঁচটি প্রকরণে ভাগ করা যাইতে পারে—(ক) বিদ্যার গর্ভলক্ষণ, (খ) গর্ভলক্ষণদৃষ্টে সখীগণের পরামর্শ ও রাণীকে সংবাদ দান, (গ) রাণীর বিদ্যার মন্দিরে আগমন ও গর্ভলক্ষণদৃষ্টে বিদ্যাকে তিরস্কার, (ঘ) বিদ্যার উক্তি, (ঙ) রাণী কর্ত্তৃক রাজাকে বিদ্যার গর্ভ সংবাদদান, রাজার চিন্তা ও রাজা কর্ত্তৃক কোটাল নিগ্রহ।

(ক) বিদ্যার গর্ভলক্ষণ

আমরা বিভিন্ন কাব্যে এই প্রকরণ কয়টি কি ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার একটি তুলনামূলক সমালোচনা করিব। গোবিন্দদাস এই সকল প্রকরণগুলিই সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যার গর্ভলক্ষণ সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—

*　　*　　*

"এমত প্রকারে নিত্য করে গতাগতি।
দৈবের নির্ব্বন্ধ বিদ্যা হৈল গর্ভবতী॥
এক দুই তিন মাস হয় ভিন্ন ভিন্ন।
দিন কত ব্যাজে হইল গর্ভচিহ্ন॥
রতিরঙ্গ বেহার কিছু না গণিল।
দৈবের নির্ব্বন্ধ হেতু বাড়িতে লাগিল॥
আন দিন যান ছাদ হয় তোর মণি (২)।
উঠে বৈসে অনুক্ষণ ধরিয়া ধরণী॥
কুমারের চাক প্রায় ফিরে তার অন্ত।
উরুযুগ ভর করি মুখে উঠে বাস্ত॥
কুচ কালবর্ণ হৈল মুখে উঠে হাই।
গর্ভের লক্ষণ যত দেখিবারে পাই॥
অনুক্ষণ উঠে বৈসে গমন মন্থর।
ভূমেতে শয়ন বিদ্যা ভার গুরুতর॥"

এই বর্ণনাতে বিশেষ কবিত্ব নাই কেবল সংক্ষেপে ব্যাপারটি বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র। কৃষ্ণরাম এই প্রকরণটির বর্ণনায় কবিত্ব করিয়াছেন—

গর্ভবতী হৈল রামা মাস দুই তিন।
ভাবিয়া সকল সখী চিন্তায় মলিন॥
মুখানি কমলফুল পাণ্ডুর বরণ।
শরীরে উঠিল শির গর্ভের লক্ষণ॥
জিহ্বার বিরতি (?) নাই মুখে উঠে জল।
বসন পাতিয়া নিদ্রা যায় ক্ষিতিতল॥
উদর ডাগর নাভি উলটিতে চাহে।
ক্ষীণ মাজা ঘুচিল যৌবন দূরে যায়ে॥
আটিয়া পরিতে নারে খসিল বসন।
সাদে সাধে করে পোড়া মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
উপরে পড়িল ভেলা উচকুচদ্বন্দ্ব।
শাতকুম্ভ কুম্ভ মুখে নীল অরবিন্দ॥

হইল পঞ্চম মাস গুরু উরুভার। প্রিয় সখীগণ সব একত্র হইল।
অধিক আলসে নাঞি শকতি তাহার ॥ পঞ্চ মাস জানি তারে পঞ্চামৃত দিল ॥"

রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের সকল বিষয়ে অনুকরণ করিলেও এক্ষেত্রে বিদ্যার গর্ভ বর্ণনা করেন নাই। রাণীর সহিত বিদ্যার বাক্‌চাতুরী প্রসঙ্গে গর্ভলক্ষণবর্ণনা করিয়াছেন। আমরা যথাকালে সে বিষয়ে আলোচনা করিব।

বলরামের বিদ্যাসুন্দরের প্রেমের ব্যাপার ঘটিয়াছে সখীগণের সম্পূর্ণ অলক্ষিতে। সুতরাং তাহারা এ সম্বন্ধ বিন্দুবিসর্গও জানিত না। সুন্দর এক বৎসর যাবৎ বিদ্যার গৃহে যাতায়াত করিতেছিলেন। তখন দেবী কালিকার মনে হইল যে, তাঁহার দাস ও দাসী এই ভাবে কৌতুকে কালযাপন করিতেছে, অথচ তাঁহার পূজা প্রচারের কোন চেষ্টা হইতেছে না। তিনি কিঙ্করী বিমলার সহিত পরামর্শ করিলেন। বিমলা বলিল, রাজনন্দিনী যদি গর্ভবতী হয়, তাহা হইলে কোটাল সুন্দরকে ধরিবে এবং সুন্দর বিপদে পড়িয়া দেবীর পূজা করিবে। এইরূপে দেবীর পূজা প্রচারিত হইবে। তাহা শুনিয়া দেবী দৈত্যকে পাতাল হৈতে ডাকিয়া বিদ্যার উদরে জন্ম নিতে বলিলেন। তাহার পর—

* * * কালিমা কুচের আগে অতি যে প্রচণ্ড।
"আচম্বিতে গর্ভ আসি হইল বিদ্যার। অলকা বিলোলে শোভা করে পাণ্ডুগণ্ড ॥
মাস দুই তিন গর্ভ হইল যখন। নাহি বাসে উদন অলস নিরন্তর।
সখীগণ দেখে তার গর্ভের লক্ষণ ॥ ঘন নখরেখ তাহে কুচের উপর ॥"

কালিকার এইরূপ নিজপূজা প্রচারের জন্ম আকুলতা ও অসুরনাশিনী কর্তৃক দৈত্যকে নিজ প্রিয় দাসী বিদ্যার গর্ভে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দেওয়া শুধু কাব্যের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই, লৌকিক ধর্মের মূলনীতিকে বিকৃত করিয়াছে। পরন্তু গর্ভবর্ণনায় কোনরূপ কবিত্ব প্রকাশ পায় নাই। মধুসূদন অতি সংক্ষেপে গর্ভবর্ণনা করিয়াছেন—

"হেন অতি রতি রসে আছয়ে বিধির বশে দিনে দিনে বল টুটে নিরবধি হাই উঠে
অবহেলে গেল পঞ্চ মাস। সুপাণ্ডুর বদনমণ্ডল ॥
দেখি শুভক্ষণ বালা শুভগর্ভে ধরে বালা কিবা দিবা কিবা রাতি বসন অঞ্চল পাতি
দিনে দিনে হইল প্রকাশ ॥ নিরবধি ভূমেতে শয়ন।
সকল লক্ষণ লাগে শ্যামল কুচের আগে গর্ভের লক্ষণ দেখি হইয়া মলিনমুখী
নিরবধি আঁখি ঢল ঢল। কানাকানি করে সখীগণ ॥"

এই বর্ণনায় কবিত্ব আছে। দ্বিজ রাধাকান্ত বিদ্যার গর্ভ বর্ণনা করেন নাই, কেবল উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র।—

এমতি যুবতী সতী ভুঞ্জে সুখে রতি। সিতপক্ষ পৌর্ণমাসী শুভ মধুমাস।
শুভক্ষণ বেলা বালা হৈলা গর্ভবতী ॥ দিবসে দিবসে তার গর্ভের প্রকাশ ॥
এক মাস গেল না হৈল ঋতুমতী। তিন মাসে প্রকাশ হইল অতিশয়।
দুই মাসে ঠারাঠারি করেন যুবতী ॥ চারি মাসে সখী সব সশঙ্ক হৃদয় ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিশিরোমণি ভারতচন্দ্র অপূর্ব কাব্যে বিদ্যার গর্ভ বর্ণনা করিয়াছেন—

"দেখহ কালীর খেলা হইতে প্রকাশ।
গর্ভবতী হৈলা বিদ্যা দুই তিন মাস॥
উদর আকাশে সুতচাঁদের উদয়।
কমল মুদিল মুখ রজঃ দূর হয়॥
ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিনে দিনে উচ।
অভিমানে কালামুখ নম্রমুখ কুচ॥
স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধির।
কাল পেয়ে শির তোলা দিল যত শির॥
হরিদ্রা তড়িতচাঁপা সুবর্ণের শাপে।
বরণ পাণ্ডুর বুঝি সম তার তাপে॥
দোহাই না মানে হাই কথা নাই তায়।
উদরে কি হৈল বলি দেখাইতে চায়॥
বসন পরয়ে যত আঁটিয়া আঁটিয়া।
সহিতে না পারে নাভি ফেলায় ঠেলিয়া॥
অধর বান্ধুলি মুখকমল আশায়।
দুই গণ্ডে গণ্ডগোল অলি মাছি তায়॥
সর্ব্বদা ওয়াক ছর্দ্দি মুখে উঠে জল।
কত সাধ খেতে সাদ সুস্বাদু অম্বল॥
মাটি খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ।
পোড়ামাটি খেতে রুচি সারিতে সে লাজ॥
জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার।
অবিরত নিদ্রা বুঝি শুধিতে সে ধার॥
নিদ্রা না হইত পূর্ব্বে অপূর্ব্ব শয্যায়।
আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায়॥
বসিতে উঠিতে নারে সর্ব্বদা অলস।
শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস॥"

(খ) গর্ভলক্ষণ দৃষ্টে সখীগণের পরামর্শ ও রাণীকে সংবাদ দান

এই প্রকরণে কবিত্ব প্রকাশের বিশেষ অবকাশ নাই। তবে কোন্ কোন্ কবি কি ভাবে বিদ্যার সখীগণের চিত্র অংকিত করিয়াছেন, তাহার একটু পরিচয় দিতেছি।

গোবিন্দদাস বিদ্যার সখীগণের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহাতে তাহারা বিদ্যার গর্ভলক্ষণ দেখিয়া ভীত ও চিন্তিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাতে তাহারা আপনাদের দায়িত্ব অস্বীকার করে নাই এবং যাহাতে বিদ্যার কোন অমঙ্গল না হয়, সে কথাও চিন্তা করিয়াছে।

কৃষ্ণরামের কাব্যে সখীগণ অত্যন্ত ভীত হইয়াছে এবং কেহ কেহ এত অল্পবয়স্কা বিদ্যার গর্ভ দৃষ্টে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু কৃষ্ণরাম বিদ্যার যে রূপবর্ণনা করিয়াছেন ও তাহার প্রগল্‌ভতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে সখীর এ উক্তির কোন অর্থ হয় না। তবে স্নেহবশতঃ ধাত্রীসমা পরিচারিকার মুখ দিয়া এরূপ উক্তি অস্বাভাবিক নহে। তাহার পর প্রধানা সখী সুলোচনা বিদ্যা, সুন্দর ও মালিনার উপর দায়িত্ব দিয়া আপনাদিগের দায়িত্ব এড়াইবার যে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতে তাহার চরিত্রে সখীজনসুলভ মনোভাবের অভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রামপ্রসাদ যথারীতি কৃষ্ণরামের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গটি একটু বিশদ বর্ণনা করিয়া কিছু নূতনত্ব করিয়াছেন। সখীগণ যে বিদ্যাকে কামাতুরা বলিয়া দোষারোপ করিয়া নিজ দায়িত্ব ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে, সে বর্ণনাটি সুন্দর হইয়াছে।

"কেহ বলে বিদ্যা মেনে কামগাতিশয়।
রাজপুরে এ কি কাল তনয়া উদয়॥
কেহ বলে মরুক গলায় দিয়া দড়ী।
রাতে দিনে পড়ে থাকে দুটা জড়াজড়ি॥
বিয়া রাত্রে দেখিলাম বর চান্দপারা।
ছুঁড়ীর হাপানে ছোঁড়া হল তন্ত সারা॥"

এখানে বিদ্যা-সুন্দরের মিলনে সখীদিগের অবচেতন মনে যে ঈর্ষ্যার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিলেন তাহার অভিব্যক্তি হয় নাই কি? তাহার পর তাহারা এ ব্যাপারে বিদ্যার গর্ভধারিণীকেও দায়ী করিতে ছাড়ে নাই—

"কেহ বলে এত কেন চিন্তা কর সই। ভালমন্দ তাঁর ঘাড়ে আরের তা কি।
রাণীর নিকটে গিয়া সবিশেষ কই ॥ উদরে ধরেছে কেন কুলখাকী ঝি ॥"

তাহার পর তাহারা, চাকুরী গেলে আবার চাকুরী মিলিবে, এই ভাবে আপনাদিগকে প্রবোধ দিয়া রাণীকে সংবাদ দিতে গেল। ভারতচন্দ্র সংক্ষেপে সখীগণের পরামর্শ বর্ণনা করিয়াছেন—

"গর্ভ দেখি সখীগণ করে কানাকানি। লোচনী লোচনখাগী প্রমাদ পাড়িল ॥
কি হইবে না জানি শুনিলে রাজারাণী ॥ লুকায়ে এ সব কথা রাখা না কি যায়।
হায় কেন মাটি খেয়ে এখানে রহিনু। লোকে বলে পাপ কাপ কদিন লুকায় ॥
না খাইনু না ছুঁইনু বিপাকে মরিনু ॥ চল গিয়ে রাণীরে কহিব সমাচার।
ইহার হইল সুখ তারো হইল সুখ। যায় যাবে যার খুন গর্দ্দান তাহার ॥
হতভাগী মোসবার ভাগ্যে আছে দুখ ॥ ভারত কহিছে এ দাসীর খাসা গুণ।
পূর্ব্বেতে এ সব কথা হীরা কয়েছিল। আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে করে খুন ॥"

কবি নিজেই সখীগণের গুণ বর্ণনা করিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করিয়াছেন।

মধুসূদনের বর্ণনাও অতি সংক্ষিপ্ত ও তাহাতে বিশেষত্ব কিছু নাই। দ্বিজ রাধাকান্ত এই বিষয়টি একটু বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সখীগণ যখন সশংকহৃদয়ে কি কর্তব্য তাহা আলোচনা করিতেছিল তখন মালিনী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সখীগণ তখন তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া বলিতে লাগিল—

"কান কথা লয়্যা নষ্টা করিলি কন্যারে। খাঞাছ পর্যাছ ঘর পুরিয়াছ ধনে ॥
আপনি খাইলি আর আমা সভাকারে ॥ অনাথিনী বলি যত করি উপরোধ।
আমরা কখনো যাহা না দেখি নয়ানে। মরামাগী বুড়া কালে এমন অবোধ ॥"

মালিনী বলিল, "সব দোষ কি আমার? চোর পলাইলে সকলের বুদ্ধি গজায়। এখন উপায় চিন্তা কর।" তাহাতে সখীগণ গর্ভপাতের যুক্তি দিল এবং মালিনী ঔষধ আনিতে সম্মত হইল। মালিনী গিয়া সুন্দরকে বিদ্যার গর্ভসংবাদ দল ও সুন্দর বলিলেন—"বিধাতার যাহা ইচ্ছা তাহা হইবে, তাহাতে চিন্তা কি? বিমলা গর্ভ নষ্ট করিবার প্রস্তাব করিলে সুন্দর মনে মনে স্থির করিলেন যে, এই গর্ভ তিনি নষ্ট হইতে দিবেন না এবং বিদ্যার মন্দিরে গিয়া নিদ্রিতা বিদ্যার ললাটে অঙ্গুরী রাখিয়া মন্ত্রদ্বারা উদর বন্ধন করিয়া দিয়া আসিলেন। এদিকে

"প্রভাতে বিমলা আসি বিদ্যার ভবনে। আর চিন্তা নাহি সখী কহেন কাহিনী ॥
গর্ভনষ্ট ঔষধ কর‍য়ে সখীগণে ॥ দুই দিন রহি গর্ভ ভস্ম হয়ে যাবে।
পানের শিকরা শ্বেত করবীর মূল। ঔষধি পরীক্ষা করা সন্ধে না করিবে ॥
ধুতুর ফুলের বীজ নিল সমতুল ॥ যে গর্ভের বন্ধন কৈল রাজার তনয়।
প্রকারে এ দ্রব্য সব খাইল কামিনী। কার সাধ্য করে নষ্ট রাধাকান্ত কয় ॥"

ইহার পর সখীগণ গিয়া রাণীকে প্রকারান্তরে বিদ্যার অবস্থা বর্ণনা করিয়া গর্ভসংবাদ জানাইল। এ বিষয়টি সকল কবিই প্রায় একভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। রাণী সখীগণকে আসিতে দেখিয়া 'আইস আইস' বলিয়া আপ্যায়ন করিয়া বিদ্যার কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সখীগণ বিদ্যার অজ্ঞাত রোগ হইয়াছে বলিয়া গর্ভলক্ষণ বর্ণনা করিল। এই বর্ণনা গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ প্রায় অনুরূপভাবেই করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র সখীগণের মুখ দিয়া স্পষ্টই বলাইয়াছেন—

ঠাকুরকন্যার যে দেখি আকার গর্ভের লক্ষণ এ ব্যাধি কেমন
পাণ্ডুবর্ণ পেট ভারি। ঠাহরিতে কিছু নারি ॥"

রামপ্রসাদ রাণীকে দুঃস্বপ্ন দেখাইয়া পূর্ব হইতেই দুঃসংবাদ শুনিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মধুসূদনের কাব্যে সখীগণ যখন কানাকানি করিতেছিল, তখন রাণী অগোচরে শুনিতে পাইয়া সেইখানে আসিয়া—

"চমকিয়া কহে রাণী কি কহিলে কহ শুনি পুনরপি কহে রাণী দৈবেতে করল বাণী
সখীগণ হইল চিন্তিত। কেন মোরে করহ বঞ্চন।
প্রতারণা করি তারে সকল বারণ করে জোড় করে কহে সখী তোমার কন্যার দেখি
তথি রাণী না যায় প্রতীত ॥ যত কিছু গর্ভের লক্ষণ ॥"

দ্বিজ রাধাকান্ত সখীগণ দ্বারা রাণীকে কোন সংবাদ দেন নাই, কুস্বপন দেখাইয়া রাণীকে বিদ্যার গৃহে আনাইয়া সাক্ষাতে সকল গর্ভের লক্ষণ দেখাইয়াছেন। বলরামের সখীগণ বিদ্যাসুন্দরের মিলনের কথা বিন্দুবিসর্গও জানিত না। তাহারা বিদ্যার গর্ভলক্ষণ দেখিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল—

"বিদ্যারে সকল সখী জিজ্ঞাসে কারণ। লাজ পরিহরি বিদ্যা কহিল সভারে।
গর্ভের লক্ষণ তব দেখি কি কারণ ॥ মোর দিব্য এই কথা না কহিবে কারে ॥"

সখীগণ তাহা শুনিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল। সখীগণের মধ্যে বিকটামুখীনাম্নী এক দুষ্টা সখী ভীত হইয়া রাণীর নিকট গিয়া—

কাঁদিয়া রাণীর স্থলে করযোড় হইয়া বলে কহিবারে করি ভয় সত্য কিবা মিথ্যা হয়
অবধান কর পাটরাণি। দেখ গিয়া বিদ্যার উদরে।
হৈল বড় পরমাদ বিধি কৈল বিসম্বাদ আচম্বিতে গর্ভচিহ্ন ধরয়ে কনকবর্ণ
বিপাক হইল ঠাকুরাণি ॥ দেখি ত্রাস জন্মিল অন্তরে ॥
পুরুষ নাহিক দেখি গর্ভ ধরে চন্দ্রমুখী কেমত প্রকারে রাণী মোরা কেহ নাহি জানি
অলসে লোটায় মহীতলে। নিবেদন কৈল পদতলে ॥"

এই কর্তব্যপরায়ণা সখীটিকে কবি বিকটামুখী আখ্যা দিয়া ও দুষ্টা বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছেন।

(গ) রাণীর বিদ্যার মন্দিরে আগমন ও গর্ভলক্ষণ দৃষ্টে বিদ্যাকে তিরস্কার

গোবিন্দদাস এই প্রসঙ্গ অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন ও তাহাতে কিছু কবিত্ব প্রকাশ পায় নাই। চিত্ররেখার মুখে বিদ্যার অবস্থার কথা শুনিয়া রাণী বিদ্যার মন্দিরে আসিয়া প্রত্যক্ষে সকল দেখিলেন। বিদ্যা নিদ্রিতা ছিলেন। রাণী নাসিকায় অঙ্গুলি দিয়া চোখ মুখ ও কুচযুগ নিরীক্ষণ করিয়া স্পষ্টই গর্ভলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। সখীগণ বিদ্যার চোখে মুখে জল দিয়া তাহাকে জাগাইল। মাতাকে দেখিয়া বিদ্যা লজ্জিতা হইলেন। গোবিন্দদাস বিদ্যার প্রতি যে রাণীর তিরস্কার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে স্নেহময়ী মাতার উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে, কটুত্ব কিছু নাই—

"রাণী বলে কি হইল বড়ই প্রমাদ কৈল
প্রতিজ্ঞা করিল কি কারণ।
হইল বড় কেলেঙ্কার প্রাণে নাহি জ ব আর
হইল বড় কলঙ্ক ঘোষণ॥
শুন শুন কলঙ্কিনি প্রতিজ্ঞা করিল কেনি
কোন হেতু হইল কোন কাজ।
তোর চিত্তে নাহি ভয় শুন শুন পাপাশয়
জগত ভরিয়া হইল লাজ॥"

কৃষ্ণরাম এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ও তাহাতে যথেষ্ট কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন—

"মোহ হইয়া পড়ে রাণী করাঘাত শিরে হানি
অসম্ভাব্য সখির কথায়।
চিত্রের পুত্তলি প্রায় একদৃষ্টে ঘন চায়
যেন বজ্র পড়িল মাথায়॥
নন্দিনী দেখিতে যায় রাণী।
কি করি কোথায় যাই হেন তার জ্ঞান নাই
বল কিবা করিলা ভবানী॥
ভূমেতে আঁচল পাতি বিদ্যা বিনোদিনী সতী
করিয়াছে কৌতুকে শয়ন।
সুলোচনা সখী পাছে রাণী উত্তরিল কাছে
দেখে যত গর্ভের লক্ষণ॥
সমুখে জননী দেখি বিদ্যা অরবিন্দমুখী
সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে।
মুখ তুলি নাহি চায় বসনে ঢাকিয়া কায়
প্রণমিল মায়ের চরণে॥
তাম্বুল শীতল পানি সিংহাসন দিল আনি
বইস বইস ঘন ঘন বলে।
তুমি নিদারুণ অতি মমতা নাহিক রতি
আসিয়া না দেখ মোর তরে॥
সহচরিগণ জানে এই দুঃখ অভিমানে
হইয়াছি মৃতের সমান।
সর্ব্ব দুঃখ পরিহরি তিন প'রে স্নান করি
সন্ধ্যার সময় জলপান॥
জিজ্ঞাসা না করে বাপ অন্তরে অধিক তাপ
দয়া কিছু করিতে আপনি।
সেই দূর গেল এবে কে আর তলাস নিবে
কিবা মোরে করিলা ভবানী।
বন্দী যেন কারাগারে এমতি রাখিলা মোরে
সদাই বসিয়া থাকি একা।
কবি কৃষ্ণরাম কয় হাঁপাইয়া প্রাণ যায়
কাহার সহিত নাহি দেখা॥"

রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের পদাংক অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যার রাণীর প্রতি উক্তিতে আভিজাত্যের সম্পূর্ণ অভাব রহিয়া গিয়াছে—

"রাণী বলে কি কহিলে সর্ব্বনেশে কথা।
বুঝি বা খাইল বিদ্যা অভাগীর মাথা॥
* * *
শুনি চমৎকার রাণী উঠে।
পাছে শুনে ভূপ চুপ বুক করে দুপ দুপ
কাঁপে কায় কালঘাম ছুটে॥
ভয়ে মুখে উড়ে ধূলা পাছে রহে সখীগুলা
উপনীত নন্দিনী নিকটে।
যে কহিল রামাচয় এ কথা অন্যথা নয়
গর্ভের লক্ষণ যত বটে।
পূর্ব্বরূপ ছারখার উদরের বড় ভার
ধরাতলে শুয়েছে রূপসী।
শিথিল কটির বাস ঘন বহে মৃদু শ্বাস
আস্য আভা প্রভাতের শশী॥
সম্মুখে প্রসবস্থলী উঠে বিদ্যা কৃতাঞ্জলি
প্রণমিল লাজে নত মুখ।
কান্দে কথা কহে শুদ্ধ দেখিলাম মুখপদ্ম
কব কি জন্মিল যত সুখ॥
অনাথিনী থাকি একা ছ মাস বৎসরে দেখা
দিনেক তোমার সঙ্গে নাই।
জননী জীয়ন্ত যার এতেক খোয়ার তার
গর্ভে কেন দিয়াছিলে ঠাঁই॥
হেদে এক কথা শোন যদি খাওয়াতিস্ লোন
ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র মোরে।
বালাই যাইত তবে এত কথা কেন হবে
অনুযোগ কে করিত তোরে॥
চর্য্যা বুঝিলাম আমি মানব রাক্ষসী তুমি
যমের দোসর সেই বাপ।
আমার কপাল পোড়া বিধাতা নষ্টের গোড়া
পূর্ব্বজন্মে ছিল কত পাপ॥"

এইখানে রামপ্রসাদের কবিত্ব নিতান্ত কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। 'প্রসবস্থলী', 'খাওয়াতিস্ লোন' প্রভৃতি শব্দ অত্যন্ত অকবিসুলভ ও গ্রাম্যদোষে দুষ্ট। তাহার উপর মাতাকে রাক্ষসী, পিতাকে যমের দোসর বলিয়া বিদ্যা তাহার শিক্ষা ও আভিজাত্যের কোন প্রমাণই দেন নাই।

বলরামের কাব্যে আছে—বিকটা সখী যখন রাণীর নিকট বিদ্যার গর্ভসংবাদ দিল, রাণী তখন ভূতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সখীগণ জল ঢালিয়া তাঁহার সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিল। পুরুষবিদ্বেষী কন্যা কি কর্ম করিল, ইহা বলিয়া রাণী দেখিতে চলিলেন—

অঝোর নয়নে কাঁদে কেশ বাস নাহি বান্দে
গেল অন্তঃপুরীর ভিতর।
বিদ্যা ইহা নাহি জানে নিদ্রা যায় অচেতনে
অলসেতে মহীর উপর॥
বিকটা সখীর বাণী বিদ্যমানে দেখে রাণী
গর্ভের লক্ষণ যত আছে।
নিরক্ষয় একে একে গর্ভচিহ্ন যত দেখে
অশ্রুমুখে গিয়া তার কাছে॥
পাইয়া রাণীর সাড়ি উঠে বিদ্যা দড়রড়ি
বসনে মুণ্ডিত কৈল অঙ্গ।"

কৃষ্ণরাম বা রামপ্রসাদের ন্যায় বলরাম বিদ্যাকে দিয়া মাতার উপেক্ষার জন্য কোন অনুযোগ করান নাই। তাঁহার কাব্যের সহিত ভারতচন্দ্রের কাব্যের এ বিষয়ে যথেষ্ট মিল আছে। তবে ভারতচন্দ্রের বিদ্যা শুইয়াছিল, মাতা আসিতেই গায়ে কাপড় জড়াইয়া উঠিয়া বসিল, বলরামের বিদ্যা নিদ্রিতা ছিল, রাণী সেই জন্য তাহার গর্ভলক্ষণগুলি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র এই অংশটি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং বিদ্যার মুখ দিয়া কোন অশোভন বাক্য প্রয়োগ করান নাই।

*　　*　　*

"শুনি চমকিয়া　　বলে শিহরিয়া
মহিষী যেন তড়িত ॥
আকুল কুন্তলে　　বিদ্যার মহলে
উত্তরিলা পাটরাণী।
উদর ডাগর　　দেখি হৈল ডর
রাণীর না সরে বাণী ॥
প্রণমিতে মারে　　বিদ্যা নাহি পারে
লজ্জায় পেটের দায়।
কাপড়ে ঢাকিয়া　　প্রণমে বসিয়া
বৈস বৈস বলে মায় ॥
গালে হাত দিয়া　　মাটিতে বসিয়া
অধোমুখে ভাবে রাণী।
গর্ভের লক্ষণ　　করি নিরীক্ষণ
কহে ভালে কর হানি ॥"

মধুসূদন ও রাধাকান্ত এ অংশটি দুই কথায় সারিয়া দিয়াছেন।

কৃষ্ণরাম বিদ্যার এই উক্তির পর যে ভাবে রাণীর কার্য ও উক্তির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে।

"শুনিয়া কন্যার কথা অতি দুঃখে হাসে।
অমনি বসিল রাণী সখিগণ পাশে ॥
বিদ্যার অঙ্গের বস্ত্র খসাইল টানি।
উদর ডাগর দেখি ডরাইল রাণী ॥
কালিমা কুচের আগে দুগ্ধ দেখে চাপি।
নিশ্চয় জানিল গর্ভে সন্দে নাহি ভাবি ॥
নখের আঁচড় দেখি পয়োধর বেড়ি।
নাসায় অঙ্গুলি দিলে তনু যায় ছাড়ি ॥
মর গিয়া আ গ বিদ্যা আঘাটে উলিয়া।
গলায় বাঁধিয়া ঘট কারো না বলিয়া ॥
নহে বা গরল খাইয়া এই ক্ষণে মর।
এ ছার পাপিষ্ঠ প্রাণ কি কারণে ধর ॥
হইয়া কেন নাহি মৈলি জিয়া কোন সুখ।
কেমনে লোকের আগে দেখাইবে মুখ ॥
করিলে এমন কাম কেমন সাহসে।
এক তিল লাজ ভয় নাহিক মানুষে ॥
অবলা হইয়া হেন নাহিল নিশঙ্ক।
নির্ম্মল রাজার কুলে করিলি কলঙ্ক ॥
বিদ্যার জননী মোরে কেহ যদি বলে।
তখনি মরিব আমি কাতি দিয়া গলে ॥
কতেক পাতক হেতু এমন নন্দিনী।
তোমা হইতে হইলাম আমি কুলকলঙ্কিনী।
বাহির নহিলি কেন যাহা তাহা লয়্যা।
হইলে কুলের কালি পুরমাঝে রয়্যা ॥
হায় হায় কি বলিব নৃপতির ঠাঁই।
পৃথিবী বিদার দেহ তোমাতে সাঁধাই ॥
কত কত রাজকন্যা আছিল যুবতী।
অল্প বয়সে কার নাহি মিলে পতি ॥
বাপের দুলালী তুমি প্রাণ হেন বাসে।
করিলি তাহার কাজ লাজ দেশে দেশে ॥
স্ত্রীবধ না হয় যদি কাটি তবে তোয়।
নহে বা খড়্গ হানি বধ করে মোয় ॥
বর চেষ্টা হেতু ভাট গেল দেশে দেশে।
কেমনে হইবে যদি বর নিয়া আইসে ॥
কোথায় মিলিল পতি কহ দেখি শুনি।
কাহারে করিয়াছিলা ইহার কুটুনী ॥"

রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের সকল ক্ষেত্রেই অনুকরণ করিয়াছেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে নূতনত্ব করিতে গিয়া নিজ কাব্যকে খেলো করিয়া ফেলিয়াছেন। বিদ্যার কথার উত্তরে যে সামান্য অংশটুকু কবি রাণীর তিরস্কারবাণীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে। কিন্তু মাতার সহিত কন্যার বাক্‌চাতুরীটি একেবারে গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট।

বিদ্যা যখন মাতার নিকট নিজ উপেক্ষিত অবস্থার অনুযোগ করিল, তখন—

"রাণী বলে পাপীয়সী প্রাণ ছাড় নীরে পশি নির্ম্মল রাজার কুল তুই কলঙ্কের মূল
কিম্বা বিষ্যা খা লো তুই বিষ। জন্মিলি আমার গর্ভে আ লো।
নহে খড়্গে কর ভর এইক্ষণে মর মর এই রাজ্য ত্যজ্য করে যদ্যপি ভাতার ধরে
কলঙ্কিনী কোন্ সুখে জিস্॥ বেরুতিস সেও ছিল ভালো॥

ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় সুস্পষ্ট কৃষ্ণরামের ছায়া রহিয়াছে—

"ওলো নিশঙ্কিনী কুলকলঙ্কিনী
সাপিনী পাপকারিণী।
শাঁখিনীর প্রায় হরিয়া কাহায়
আনিলি ডাকি ডাকিনী॥
ডরে মোর ঘরে বায়ু না সঞ্চরে
ইহার ঘটক কেবা।
সাপের বাসায় ভেকেরে নাচায়
কেমন কুটিনী সে বা॥
না মিলিল দড়ি না মিলিল কড়ি
কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ কেমনে এ কাজ
করিলি খাইয়া মোরে॥
রাজা মহারাজ তারে দিলি লাজ
কলঙ্ক দেশে বিদেশে।
কি ছাই পাড়িলি কি পণ করিলি
প্রমাদ পাড়িলি শেষে॥
এল কত জন রাজার নন্দন
বিবাহ করিতে তোরে।
জিনিয়া বিচারে না বরিলি কারে
শেষে মিটে গেলি চোরে॥
শুনি তোর পণ রাজপুত্রগণ
অদ্যাপি আইসে যায়।
শুনিলে এমন হইবে কেমন
বল কি তার উপায়॥
সন্ন্যাসীটা আছে ভূপতির কাছে
নিত্য আসে তোর পাকে।
কি কব রাজায় না দিল তাহায়
তবে কি এ পাপ থাকে॥
আমি জানি ধন্যা বিদ্যা মোর কন্যা
ধন্য ধন্য সর্ব্ব ঠাঁই।
রূপগুণ যুত যোগ্য রাজসুত
হইবে মোর জামাই॥
রাজার ঘরণী রাজার জননী
রাজার শাশুড়ী হব।
যত কৈনু সাধ সব হৈল বাদ
অপবাদ কত সব॥
বিদ্যার মা ছলে যদি কেহ বলে
তখনি খাইব বিষ।
প্রবেশিব জলে কাতি দিব গলে
পৃথিবী বিদায় দিস॥
আ লো সখীগণ তোরা বা কেমন
রক্ষক আছিলি ভালে।
সকলে মিলিয়া কুটিনী হইয়া
চুণ কালি দিলি গালে॥
তোরা ত সঙ্গিনী এ রঙ্গে রঙ্গিণী
এই রসে ছিলি সবে।
ভুলালি আমায় দানি ভাঁড়া যায়
সঙ্গী ভাঁড়া যায় কবে॥
থাক থাক থাক কাটাইব নাক
আগে ত রাজারে কহি।
মাথা মুড়াইব শালে চড়াইব
ভারত কহিছে সহি॥"

বলরাম যে রাণীকে দিয়া বিদ্যাকে তিরস্কার করাইয়াছেন, তাহাতে পূর্ববর্তী কবিগণের প্রভাব সুস্পষ্ট—

রাণী বলে কহ বিদ্যা কেমন বিচার।
গর্ভের লক্ষণ যত দেখি যে তোমার॥
পুরুষবিদ্বেষী তুমি জানে সর্বজনে।
লোকধর্ম মজাইলি কিসের কারণে॥
পাণ্ডুগণ্ড দেখি তোর অলকা বিলোলে।
সিঁথায় সিন্দুর তোর নয়নে কাজলে॥
কালিমা কুচের আগে কিসের কারণে।
ঘন নখরেখ তাতে পাণ্ডুর বরণে॥
অলসে লোটায় কেন ধরণীর তলে।
নিরবধি উঠে হাই বদনমণ্ডলে॥
উজ্জ্বল বরণ তোর গর্ভের লক্ষণ।
সত্য করি কহ ঝিয়ে কিসের কারণ॥
শিশুকাল হৈতে তোরে শাস্ত্র পড়াইল।
তোমার কারণে কত বর আনাইল॥
বর না ইচ্ছিলে ঝিয়ে মোর মাথা খায়্যা।
গুপতে কেমন জনে রসিক পাইয়া॥
নির্ম্মল আছিল ঝিয়ে মোর কুলদর্প।
তুহ পাপমতি তাহে জনমিলি সর্প॥
জনমিঞা কেন নাঞি মরিলি পাপিনী।
রহিলি আমার কুলে হইয়া সাপিনী॥
পুরুষবিদ্বেষী হইয়া রাখিলি খাঁখার।
অপযশ সংসারেতে রাখিলি রাজার॥

মধুসূদন চক্রবর্ত্তী রাণীর যে তিরস্কার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তাহাতে মাতার অন্তরের বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"বিদ্যার মন্দিরে রাণী হৈল উপনীত।
সেই সব কালীন যত দেখে বিপরীত॥
প্রবল যৌবন দশা পুরুষ সংহতি।
গর্ভের লক্ষণ দেখি কহে দুঃখমতি॥
শুন লো অভাগী ঝিয়ে ডাকে অভাগিনী।
পুরুষবিদ্বেষী তুমি রাজার নন্দিনী॥
নিরবধি উঠে হাই বিস্মিত বদন।
তেজিয়া পালঙ্ক কেন ভূমেতে শয়ন॥
নিশ্চয় করিয়া মোরে কহ না কারণ।
* * *
এরূপ সংহতি দেখি পুরুষের সাথ।
অধর সুরঙ্গ কেন কুচে নখাঘাত॥
বিপরীত কেন দেখি কুচেতে শ্যামল।
পাণ্ডুর বরণ কেন বদনমণ্ডল॥
কি করিলি ছার ঝিএ লাগি মোর মাথা।
কাহারে ভজিলি তুমি স্বরূপ কহ কথা॥"

দ্বিজ রাধাকান্ত রামপ্রসাদের ন্যায় রাণী সহ বিদ্যার বাক্‌চাতুরী বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রাণীর কিছুক্ষণ ভর্ৎসনার পর বিদ্যা তাহার উত্তর দিতেছেন, এইরূপ দুই বার মাত্র রাণীর উক্তি আছে—

"নিশি অবসানে কুস্বপন দেখে রাণী।
প্রভাতে কন্যার ঘরে আইল আপনি॥
সাক্ষাতে দেখিল সব গর্ভের লক্ষণ।
হাহা বিধি কেন মোরে না করে মরণ॥
কেন না মরিলি কি করিলি কলঙ্কিনী।
অকলঙ্ক কুলে কালি দিলি অভাগিনী॥
পড়িলি শুনিলি যত প্রতিজ্ঞা করিলি।
প্রকাশিলি গুণ যত সতীত্ব রাখিলি॥
এখন উপায় মর গরল ভক্ষিয়া।
কলসী বান্ধিয়া গলে কুঘাটেতে গিয়া॥
* * *
রাণী কহে রক্তহীন পাণ্ডুরবরণ।
অধিক উদরে কেন ধূসর বদন॥
কি লাগি সামর্থ্যহীন শ্রম গুরুতর।
কেনে তোর জৃম্ভণ উঠয়ে নিরন্তর॥
শ্যামল কুচের অগ্র হৈল কি লাগিঞা।
ভূতলে শয়ন কেন পালঙ্ক ছাড়িঞা॥
কেনেলো এতেক পাতখোলার আদর॥"
কনক কটরা দেখি হেথা যে বিস্তর॥"

গোবিন্দদাসের রাণী স্নেহশীলা মাতা; কন্যার বিপদে ভীতা ও তাহার মঙ্গলের জন্য আগ্রহান্বিতা। কৃষ্ণরামের রাণী অভিজাত গৃহিণী, কুলকলংকে ভীতা ও সঙ্গে সঙ্গে কন্যার প্রতি স্নেহশীলা। ভারতচন্দ্রের রাণী রাজগৃহিণী রাজকুলের সম্মানই তাঁহার নিকট মুখ্য, কন্যার প্রতি স্নেহ গৌণ। বলরামের রাণী স্নেহশীলা মাতা দ্বিজ রাধাকান্তের বর্ণনায় চরিত্র ফুটিয়া উঠে নাই। মধুসূদন তাঁহার স্বল্প বর্ণনায় মাতার অন্তরের ব্যথা ফুটাইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ কামোদ রাগ ॥

যৌবন রূপবতী যুবতী রসবতী
অশেষ গুণসিন্ধুবতী।
সাধু ধুসদত্ত সঘন আনন্দিত
নগর উল্লসিত অতি॥
সুনাদ শঙ্খ বেণী মৃদঙ্গ পটহ শানি
সঘন কৃত হুলাহুলি।
অসিত ধবল শতেক ছাগল
রুধিরে সন্তোষিতেশ্বরী॥
সধবা যত নারী মিলনে সুন্দরী
রুক্মিণী পতিপুত্রবতী।
পূজিত পার্ব্বতী তদনুগা সতী
বুহিত্র তোলেন যুবতী॥
সুমুখী সত্যবতী রোহিণী পতিগতি
যুবতী জন পুরন্দরা।
জলদ সুবসন ব্যক্ত প্রতিক্ষণ
সৌদামিনী কলেবরা॥
কজ্জল সমুজ্জল চপল সমীক্ষণ
সকল জন মনোহরা।
সুগন্ধি জলসিত কনক রচিত
পাত্র বিভূষিত করা॥
চন্দন সিন্দুর সফল তাম্বূল
পূর্ণিত হেমপাত্র ভুজা।
নিরাগন্ধ দীপ দূর্ব্বা দধি ধূপ
ঘৃত কৃত দেবপূজা॥
গুড় গুড় মধুরিম দগড় ডিণ্ডিম
কাঁসর ধ্বনি নিরবধি।
সুশব্দ নূপুর চরণ বিনিন্দিত
মরাল নরপতি গতি॥
গলিত যৌবন তরুণ শিশুজন
নিত্য বিমোহিত সখী।
অমর নদকূলে চলিলা কুতূহলে
ইন্দুসুন্দরমুখী॥
চতুরধিক দশ বুহিত্র মূর্চ্ছিত
দেখিয়া সন্তোষ যুবতী।
ত্রিপুরাপদস্থল- কমল মধুকর
মুকুন্দ দ্বিজ সুভারতী॥০॥

॥ ছন্দ ॥

সুমুখী রুক্মিণী সত্যবতী একমনা।
সলিলে নাম্বিয়া করে বুহিত্রে অর্চ্চনা॥
নিছিয়া বসন পর্ণ পেলে দুই দিগে।
দূর্ব্বা তণ্ডুল দিল ডিঙ্গার মস্তকে॥
সিন্দুর তিলক দিল [১১৬] অরুণ সমান।
মধুকর প্রভৃতি ডিঙ্গার করে মান॥
পঠিল মঙ্গল বেদ ব্রাহ্মণতনয়।
হেমপাত্র ফিরায় উজ্জ্বল দীপালয়॥
যতেক যুবতী দেই জয় হুলাহুলি।
বাদ্যশব্দে উল্লসিত সাধবের পুরী॥
ডিঙ্গা নির্ম্মঞ্ছিয়া সাধুযুবতী যুগলে।
জলধারা দিয়া উঠে দেবনদকূলে॥
মধুকর হৈতে সাধু নাম্বে পিতা পুত্রে।
অজয় নদের কূলে যায় পদে পদে॥
হুলাহুলি কোলাকুলি আনন্দে বিহ্বল।
স্বামীর বন্দিল দুহে চরণকমল॥

আপন নন্দনে চুম্ব দিয়া তোলে কোলে।
আশীর্ব্বাদ করি বহু যুবতীর মেলে ॥
দণ্ডবত প্রণতি করিয়া সপ্ত মায়।
পথে চলে ছাতা হাথে করি বাপে পোয় ॥
ব্রাহ্মণ মঙ্গল পড়ে স্তুতি করে ভাট।
কোথা গীত শুনে সাধু কোথা দেখে নাট ॥
যুবতীর মুখে পুন শুনি হুলাহুলি।
ইষ্ট মিত্র বন্ধুজনে করে কোলাকুলি ॥
অবিচ্ছেদ জলধারা নিজ গৃহাবধি।
চলিল রুক্মিণী ধীরে ধীরে সত্যবতী ॥
জলপূর্ণ হেমকুম্ভ মুখে চুতডাল।
পথের দু দিগে বৃক্ষ কদলী বিশাল ॥
সুরূপ কুরূপ যত শিশু বৃদ্ধ যুবা।
আনন্দিত নাচে গায় হরষিত শিবা ॥
কৌতুকে যতেক শিশু চলিল সত্বর।
আনন্দিত ধুসদত্ত সাধবের ঘর ॥
সাধুর আওয়াসে যত যুবতী পুরুষে।
উপনীত হইল গৃহে হাস্য পরিহাসে ॥
ধুসদত্ত গুণদত্ত ধনের ঠাকুর।
অসুখ জনের দুঃখ করিলেক দূর ॥
পুরস্কারে গেল যথা যার যেবা ঘর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥০॥

॥ পাহিড়া ॥

পাটনে থাকিয়া সাধু আইল সদনে।
নানা সজ্জ লৈয়া চলে রাজসম্ভাষণে ॥
মণি মুক্ত হীরা নীলা পরশপাথর।
রজত কাঞ্চন শঙ্খ চন্দন চামর ॥
পঞ্চ রত্ন নানা ধন পশুপক্ষিগণ।
দেউল পর্ব্বতচিত্র অমূল্য বসন ॥
কর্পূর কুঙ্কুম মধু মিষ্ট নারিকল।
মধুযষ্টি এলাচি লবঙ্গ জাতিফল ॥
[১১৭ক]পাট ভোট নেত পত্তি নেহালি কম্বল।
তাড়িপত্র কৃপাণ প্রবাল রম্ভফল ॥
পায়রা বড় কপোত কোকিলী রব করে।
ডাহুক গণ্ডুক শুক সুবর্ণ পঞ্জরে ॥
নকুল হরিণ শশ যুঝারু গাড়র।
কস্তুরি গৌলক খাসী তেলঙ্গা ছাগল ॥
দোলারূঢ় দুই সাধু বাদ্য উল্লসিত।
রাজার সভায় গিয়া হইল উপনীত ॥
পাটনে থাকিয়া আইল রাজদর্শনে।
আপন আসনে বৈসে নৃপনিদেশনে ॥
রাজা বলে শুন সাধুসুত কি কারণে।
এতেক দিবস কেন বিলম্ব পাটনে ॥
পাটনের কথা সাধু নিবেদে সুরথে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে হরবধূপদে ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

শুন হে সুরথ নিবেদিয়ে অকপটে।
আপুনি শঙ্কর মোরে রক্ষিল সঙ্কটে ॥
তোমার ভাণ্ডারে নাহি চামর চন্দন।
আদেশ করিলে মোরে যাইতে পাটন ॥
সাজিয়া বুহিত্র সাত মোক্ষ মধুকর।
উপনীত মায়াদহে নাহি দেখি স্থল ॥
মায়াদহে দেখিল পদ্মিনী গজ গিলে।
মাংস বেচে কিনে কেহ কনকনগরে ॥
পাটন দুর্ব্বার কোটালিয়া দুরাচার।
নৃপতি দুর্মুখ পাত্র দুর্নীত তাহার ॥
কহিল যতেক কথা নৃপতি সন্তোষে।
অসত্য বলিয়া রাজা সাজিলেক রোষে ॥
না দেখিয়া পদ্মিনী নগর মায়াদহে।
তে কারণে বন্ধন বিষম কারাগৃহে ॥
হরের প্রসাদে হৈল পুত্র শুভক্ষণে।
দুর্ব্বার পাটন গেল বাপের কারণে ॥
আইল তোমার স্থানে পুত্রের সংহতি।
আদেশিলে ঘরে যাব হরষিত মতি ॥
পরম হরিষে রাজা করিল সম্মান।
বাপে পোয়ে ঘরে যায় সাধব প্রধান ॥

দোলারূঢ় হৈল সাধু সাধুর নন্দন।
হরষিত নিকটে যতেক পরিজন ॥
নানা বাদ্য বাজে লোক হরষিতে ধায়।
পরম হরিষে সাধু নিজালয় যায় ॥
আপন মস্তক ঢাকে প্রসাদ কাপড়ে।
বাঙ্গালি [১১৭] খেলায় পত্তিগণ ধায় রড়ে ॥
যুবতীগণের মুখ নাহি ঢাকে লাজে।
প্রবেশ করিল আসি নগরের মাঝে ॥
সাধুর নন্দন দেখি যুবতী পুরুষে।
পূর্ণিমার শশী যেন ধনি ধনি ঘোষে ॥
গমনাগমন করে যত সব নারী।
নৃপগুণে কেহ তার নহে মন্দকারী ॥
নির্ভয় দেখে দুই রাজার আওয়ারি।
নানা বস্তু কিনে বেচে বসিছে পসারী ॥
কেহ বুদ্ধিবল খেলে কেহ সাতাচারি।
অবিরত কেহ গজতুরগবেহারী ॥
চতুরে চতুরে খেলে বুঝে নানা ভাঁতি।
কেহ গেণ্ডু খেলে কেহ কেহ খেলে পাঁতি ॥
কেহ বাঘছানি খেলে হাসি খলখল।
কেহ সাতাচারি খেলে কেহ চ্যুতরল ॥
পক্ষ লুকালুকি খেলে কেহ খেলে ছুঁছুঁ।
কেহ কড়ি ভাঁটা খেলে কেহ খেলে লেঁজুঁ ॥
গালাগালি মারামারি কেহ ধিকাধিক।
কর্দ্দম মার্জ্জয়ে কেহ খেলে ভাঁটাটিক ॥
কেহ ভাঁটা খেলে কেহ খেলে চিড়াকুট।
বিবাদে গারড় কেহ বুঝায় কুক্কুট ॥
কেহ অঙ্গ বলি দেই কেহ দেব পূজে।
নর্ত্তকী নাচয়ে কোথা নানা বাদ্য বাজে ॥
সঘন চাতক পক্ষ ডাকে পিউ পিউ।
কামানলে বিরহী জনের পোড়ে জিউ ॥
তন্ত্র মন্ত্র বাজায় গায়নে গায় গীত।
স্তুতি করে ভাট ব্রাহ্মণে চিন্তে হিত ॥
প্রচুর করিয়া দেই ব্রাহ্মণে সম্বল।
রজত কাঞ্চন ঝারি বসিতে কম্বল ॥
কারে তঙ্কা দেই সাধু কারে দেই কড়ি।
লড্ডুক সন্দেশ কারে দেই চিড়া মুড়ি ॥
সেবকেরে পরিতোষ সাধুর শাবকে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল গোপী যায় বিকে ॥
নগর দেখিয়া পিতা পুত্র যায় সুখে।
নগর তেজিয়া সাধু আইল কৌতুকে ॥
পুরীজন সঙ্গে উপনীত হৈল ঘরে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে ॥০॥

গুণদত্ত কথয়তি ॥

শুন গো জনমভূমি প্রতাপে দিবসমণি
[১১৮ক]রূপে জিনি নব পঞ্চশর।
না জানি রজনী দিবা যেমত ইন্দ্রের সভা
দুর্মুখ বসুমতীশ্বর ॥
অগাধ সলিল বহে উপনীত মায়াদহে
নগরে পদ্মিনী গজ গিলে।
কেহ মাংস কুটে বেচে কেহ রান্ধে কেহ ভুঞ্জে
কেহ নাচে কোন জন খেলে ॥
পাটনখানি দুর্ব্বার কটোওয়াল দুরাচার
মহাপাত্র তাহার দুর্নীত।
নৃপতির পুরোহিত নাম তাঁর কুচরিত
সকল দেখিল কুচরিত ॥
গেলাও রাজার ঠাঞি পান প্রসাদ পাই
ভক্ষ্যদ্রব্য পাইল বিস্তর।
কহিল পথের কথা সভাজন বলে মিথ্যা
নব নৌকায় সাজিল সাগর ॥
জীবন করিল পণ রাজদণ্ড সিংহাসন
প্রতিজ্ঞা করিল দুইজনে।
রাজা পাত্র সভে গেল দেখাইতে না পারিল
পরাজয় সাক্ষীর বচনে ॥
কাঁকাল্যে দিলেক ডোর লোকে দেখে যেন চোর
নিঞা গেল দক্ষিণ শ্মশানে।
আপন মরণকালে বসিয়া তরুর মূলে
পার্ব্বতী চিন্তিল একমনে ॥

কোটাল নৃপতি পাত্র দয়া নাঞি লেশমাত্র
ছিণ্ড ছিণ্ড বলে উচ্চবাণী।
কোটাল করিল ছিন্ন কন্ধে মুণ্ডে হৈল ভিন্ন
জিয়াইল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী॥
যোগিনী কোটালে বাদ গালাগালি পরমাদ
বিপরীত শ্মশান ভিতরে।
পরিল অনেক সেনা শোণিতের বহে থানা
কোটালিয়া পলায় সত্বরে॥
নৃপতি সমুখে কহে যোগিনী মনুষ্য নহে
যত সৈন্য পড়িল সকল।
শুনিঞা নৃপতি হাসে সাজিয়া আইল রোষে
পরাজয় হৈল নরেশ্বর॥
পড়িল ধবলছত্র পলায় নৃপতিপুত্র
মন্ত্রণা করিল মন্ত্রিগণ।
গলায় কুঠারি বাঁধ যোগিনীর পাদ বন্দ
যদি রাজা রক্ষিবে জীবন॥
কুঠারি বান্ধিয়া কণ্ঠে আইল রাজা সেই দণ্ডে
যোগিনীরে করিল প্রণাম।
বলে দেবী পরিতোষে নৃপ তুষ্ট নহে দোষে
সাধুকে করহ কন্যা দান॥
মৃত সৈন্য পাইল প্রাণ রাজা কৈল কন্যাদান
যোগিনী [১১৮] করিল ভর রথে।
তোমার সফল ব্রত মর‍্যাছিল পাইল সুত
নববধূ বাশুলীপ্রসাদে॥
দ্বিগুণ বুহিত্র ধন বাপে পোয়ে দরশন
বর্দ্ধমান আইলাঙ নগর।
চণ্ডীপদ সরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল॥০॥

॥ কামোদ রাগ ॥

আনন্দিত মানি সাধুর কামিনী
রুক্মিণী পূজে বাশুলী।
পঞ্চ সখী মেলি দেই হুলাহুলি
শতেক ছাগল দিয়া বলি॥

কৃমিজ সুত্রজ বসন নির্ম্মিত
শুক্লা চন্দ্রাতপতলে।
পুষ্প নিকেতন নিকটে আয়োজন
পঞ্চ দীপে ঘৃত জ্বলে॥
সুগন্ধি চন্দন সুবাসিত বন
পূর্ণিত কাঞ্চন ঘটে।
দিয়া চুতডাল কণ্ঠে ফুলমাল
ঢাকিল ধবল পটে॥
ঘৃত সুবাসিত আতর কণ্ঠিত
ধবল তণ্ডুল তলে।
নানা ফুল ফল কর্পূর তাম্বূল
পাতিল কদলিতলে॥
ঢাক ঢোল ভেরি ডিণ্ডিম মোহরি
কাঁসর বাজে মৃদঙ্গ।
বিপ্র পড়ে মন্ত্র বাজে নানা যন্ত্র
কেহ পুরে জয়শঙ্খ॥
শুন সদাগর বুঝহ সকল
আপন বাঞ্ছিত লভ।
আমার নিকটে বসিয়া ত্রিপুরা-
চরণকমল সেব॥
দেখিল নির্ব্বল বল কতুত্তর
তোরে গুণে অতি সহি।
জান মোর মতি যতেক যুবতী
দেবতা কুর্পর নহি॥
তোমার কিঙ্করী কি বলিতে পারি
নাহি সেব ভগবতী।
যথা যথা জীব তথা শক্তি শিব
নির্ণীত কহে যুবতী॥
একচিত্ত করি সেবিলে শঙ্করী
শঙ্কর দুর্ল্লভ নহে।
নাহি জান তত্ত্বে যাহার প্রসাদে
সকল ভুবন রহে॥
সহজে যুবতী অমৃত ভারতী
তথি রূপগুণবতী।

তোমার বচন নাহি লয় মন
তিক্ত যেন মৌষধি ॥
তুমি প্রাণসমা নাহি কর ক্ষমা
তোমারে বলিব কি।
কহ পুনঃ পুন নিরর্থ বচন
জানি হিমালয়ঝি ॥
পণ্ডিত সুমতি পাগল সংহতি
বসিলে এক সমান।
বলদ ঈশ্বর সেবি নিরন্তর
মতি কেন হব আন ॥
ভগবতী বিনি চন্দ্রশিরোমণি
তিলেক আতমা নিন্দে।
শ্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
ত্রিপুরাপদারবিন্দে ॥০॥

[১১৯ক] ॥ মল্লার ॥ অথ গৌরী ॥

সাধব রে ত্বং ভজ ত্রিপুরা।
কথি সুত রামাপরাধ হরা ॥
ঔষধ তিক্ত মনে কাহতং।
নাথ নিশাময় মল্লপিতং ॥
তব চরণে প্রণিপত্য ময়া।
বিনিবেদিতমাধুনিকপ্রিয়য়া ॥
বিধিবিধুসেবিত পদকজয়া।
কজনিলয়া হিমশৈলজয়া ॥
ত্রিগুণময়ি ত্রিলোচনয়া।
প্রভবন্তি যগন্তি বিনানতয়া ॥
যো মৃগলাঞ্ছনমৌলিরসৌ।
অনভ্রঙ্গ নূনঙ্ক ননেতি পসৌ ॥
শ্রীল মুকুন্দ সুধাবচসা।
ভবরমণী অবধি পদ শিরসা ॥০॥

॥ একাবলী ছন্দ ॥

হৈমবতী হেন কালে।
কৈলাসে প্রভুর কোলে ॥
অচলজা দশভুজা।
লইতে আপন পূজা ॥
পরম সুন্দরী গৌরী।
রুক্মিণী সাধুর নারী ॥
আমার ব্রতের দাসী।
প্রভু তার পরবাসী ॥
ভিঙ্গা লইয়া সাত সাত।
বাপে পোয়ে ধুসদত্ত ॥
আইল আপন ঘরে।
নাথরদ্বীপ নগরে ॥
তেজিয়া জীবনপতি।
ধীরে চলে ভগবতী ॥
জয় জয় করে জয়া।
পাতিল অশেষ মায়া ॥
তেজিল আপন দেশ।
ধরিয়া যোগিনী বেশ ॥
গলিতযৌবনদন্তা।
তিলেক নাহিক চিন্তা ॥
শঙ্খের কুণ্ডল কানে।
ঈষৎ পেখি নয়ানে ॥
দেব জটাভার মাথে।
সোহাগাছি বাম হাথে ॥
বিভূতি ফুটিল ভালে।
সিংহনাদ গলে দোলে ॥
কাঁথায় ঢাকিল তনু।
বারি ধরে যেন ভানু ॥
নামিল পৃথিবীতলে।
পূজা লৈতে ভিক্ষাছলে ॥
নাথরদ্বীপের মাঝে।
সাধু ধুসদত্ত নাচে ॥
যতি সে গোরক্ষ জাগে।
যোগিনী সঘনে ডাকে ॥
সাধুর যুবতী শুনে।
আঁতেক আপন কানে ॥

ধাইল মুক্তকেশী।
ডাকিল কুত্র ভিক্ষাশী ॥
যোগিনী দেখিয়া সতী।
দণ্ডবত করে নতি ॥
মায়াবিনী ত্যেজ মায়া।
দাসীরে করহ দয়া ॥
তুমি শশিচুড়মায়া।
দেহ মোরে পদছায়া ॥
সকল তোমা[১১৯]র বরে।
আইস চল মোর ঘরে ॥
যোগিনী চলিল আগে।
ভূমিতে চরণ না লাগে ॥
আসনে যোগিনী বৈসে।
সাধু অর্চ্চনাভিলাষে ॥
স্তুতি করে গুণদন্ত।
সিদ্ধি হৈল অভিমত ॥
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে।
চণ্ডিকার দোষ সহে ॥০॥

॥ মালসী

রণমুখী রুচি দুর্গা রুধিরাকাঙ্ক্ষিণী।
শরদিন্দুমুখী জয়া চকোরনয়ানী ॥
হরের ডমরু মাঝা মৃগ ত্রিলোকিনী।
আতঙ্করহিতমনা কঙ্কালমালিনী।
সদাই রহুক মতি চরণকমলে।
তোমা না সেবিলে জন্ম বিফল ভূতলে ॥
তব পদকমল রুচির ভব রেণু।
স্থজিলে পৃথিবী বিধি একানেকা তনু ॥
সহস্রেক ফণে তার বহে নারায়ণ।
বপুসি ভস্মের ছলে মাথে ত্রিনয়ন ॥
ত্রিভুবনে যে জনে তোমার নাহি কৃপা।
দুঃখের ভাজন কি করিব মহাতপা ॥
অজ্ঞান তিমির কাল কিরণ মালিনী।
সত্ত্ব রজ তমোময় তৃতীয় রূপিণী ॥
চারিদশ লোকে যত নিবসে যুবতী।
কারণে বুঝিতে পারি যেই জন সতা ॥
মহাদি প্রলয় মরে ব্রহ্মাদি গির্ব্বাণ।
তোমার জীবনপতি না মরে ঈশান ॥
প্রতিদিন খায় সুধা জরা মৃত্যু হরে।
শতমখ দেবতা প্রভৃতে তহিঁ মরে ॥
সতীনাথ শঙ্কর গরল পিয়ে জিয়ে।
কে জানে তোমার মায়া কবিচন্দ্র কহে ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

ত্রিপুরে।
তুমি চারিদশ লোকে গতি।
আমি পতিসুতগতি　তোমার প্রসাদে সতী
তব পদে রহু মোর মতি ॥ধ্রু॥
শশিশিরোমণি ফণী　মালতি বেষ্টিত বেণী
প্রণত প্রকৃতি ক্ষেমঙ্করী।
মানুষমস্তকমাল　কৃত কুচ যুগ হার
অনবদ্য মহিমা বাশুলী ॥
সত্ত্ব রজ তম গুণ　ক্রমে ব্রতী তিন জন
বিধি নারায়ণ শূলপাণি।
ত্রিকাল শঙ্করী নিত্যা　কৃপাণ তিমির বিত্তা
সৃজন পালন সংহারিণী ॥
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে　দেব অষ্ট লোকপালে
পূজে নিত্য চরণকমল।
তোমার মহিমা নর　কি বলিব পামর
বিধি হরি হর অগোচর ॥
তব ব্রত বর দাসী [১২০ক] হৃদয় প্রসন্ন বাসি
নিজ জন্ম করিল সফল।
চণ্ডীপদ সরসিজে　শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস সকল ॥০॥

॥ গৌরী রাগ ॥

রুক্মিণীর বচনে হৃদয় সাধু গুণে।
বিধি হরি হর ত্রিপুরা নাহি জানে ॥

আমার যুবতী কহে বিপরীত কথা।
হয় নয় তুই আমি জানিব বারতা॥
শিবশক্তি বচন হৃদয় মোর নয়।
পূজিলে ত্রিপুরা কিছু নাহি অপচয়॥
সবিনয় বলে সাধু সাধুর নন্দন।
তব পদসরসিজে করোঁ নিবেদন॥
তুমি দেবী ভগবতী না কর জঞ্জাত।
ভিক্ষুক যুবতী বেশ দেখিনু সাক্ষাত॥
রুক্মিণী তোমার দাসী জানিল নিশ্চয়।
নিজ রূপ ধরি মোরে দেহ পরিচয়॥
সাধুর বচনে চণ্ডী হাসে খল খল।
ধীরে ধীরে কহে কটু মধুর উত্তর॥
শিরাতে বেষ্টিত সর্ব্ব শরীর দুর্ব্বল।
দশনবর্জ্জিত দেখ বদনকমল॥
অন্ন বিহনে আমি অধিক দুর্ব্বল।
চলিতে না পারি পথ করি টলটল॥
রুক্ষিত জড়িত জটা মস্তক উপর।
আভরণ দেখ কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল॥
গলে সিংহনাদ বাম হাতে লোহাগাছি।
আপুনি না জানি আমি কোন রূপে আছি॥
তুমি সাধু দারু দূর্ব্বা দূর্ব্বা কর দারু।
তৈলহীন দেখ দেহ ধূসর কর্কারু॥
দরিদ্র যুবতী আমি দরিদ্রের ঝি।
পূর্ব্ব পুণ্য নাহি দুঃখে অভিমান কি॥
রূপে কামদেব তুমি ধনের ঠাকুর।
তোর মান করে রাজা সমাজে প্রচুর॥
পরিচয় দিল সাধু বুঝহ সকল।
দরিদ্রের যুবতী সেবনে কোন ফল॥
সাধুর নন্দন তুমি সকল রসিক।
যত কিছু তোমারে কথিলু উপাধিক॥
ত্রিপুরাবচনে রুক্মিণী কাঁপে ডরে।
দ্বিভুজে ধরিল চণ্ডীর চরণকমলে॥
[১২০] সুমুখী রুক্মিণী কহে সাধুর যুবতী।
কপট চরিত্র মাতা ত্যেজ ভগবতী।
সুমতি পণ্ডিত জপে কুমন্ত্র কুদিনে।
হতবুদ্ধি প্রাণনাথ তোমা নাহি চিনে॥
স্মিত বিকসিত গণ্ড ঈষত পাণ্ডুরা।
মধুর ভারতী কহে সেবকবৎসলা॥
জগতমণ্ডলে যত কহে মূর্খজনে।
বাম হস্তের দোষ গুণ না লয়ে দক্ষিণে॥
প্রয়াস না কর ঝিয়ে তোর দুষ্ট স্বামী।
পুন পদ ধরি কহে প্রণত রুক্মিণী॥
তোমার বচন মিথ্যা নহে কোন কালে।
পতিগতি যুবতী সৃজিলে মহীতলে॥
রুক্মিণী যদ্যপি দাসী নাহি লবে দোষ।
নিজ রূপ ধর দেবী ত্যেজ অভিরোষ॥
প্রকাশিয়া নিজ রূপ লহ পুষ্প জল।
প্রবোধ করিতে চাহ পথের পাগল॥
প্রকাশে আপন রূপ দাসীর বচনে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে॥০॥

॥ ধানসী ॥

হাসিয়া অচলপুত্রী সংহরে যোগিনী মূর্ত্তি
পরিচয় দেন ধূসদন্তে।
চামুণ্ডা নৃমুণ্ডমালা ধৃত রুধিরাম্বরধরা
সরক্ত কর্পর কাতি হাথে॥
শোণিতসিন্ধুর জলে কল্পবৃক্ষের মূলে
নর প্রেতাসনে ভগবতী।
কবরী মালতিমালে মধুলোভে গুঞ্জরে
মধুকর হরে মুনিপতি॥
উজ্জ্বল দশনজ্যোতি মুকুটে পীযূষনিধি
তিমিরারি উরিলা ললাটে।
কর্ণে রত্নকুণ্ডল যুগল নয়ন নীল
সরসিজ যুগ অঞ্জপুটে।
গণনাথ গজমুখ তারকারি কার্ত্তিক
হিমালয়ঝিয়ারনন্দন।
বসিল দেবীর কাছে ময়ূর মূষিক নাচে
হরিলেক দেবতার মন॥

সবীণা নারদ যায় মধুর কিঙ্কিণী গায়
আসনে বসিলা ভগবতী।
একত্র বাসব বিধি হরি হর করে স্তুতি
দুই পাশে কমলা ভারতী ॥
অন্যহংস পরিতোষে হংস গরুড় বৃষে
জগত জিনিঞা যার রথ।
উচ্চৈঃশ্রবা বশ হয় মৃগরাজ নির্ভয়
সমুখেতে রহে ঐরাবত ॥
প্রলয়কালের ভানু ঈষত প্রকাশে তনু
কটিদেশে মুখর কিঙ্কিণী।
সভয় কমঠপতি পিঠে যার বসুমতী
টল টল দশ শত ফণী ॥
দেখি মূর্তি বিপরীত ডরে সাধু মূর্চ্ছিত
সাধুর যুবতী অনুমানে।
পূর্ব্ব লিখিল বিধি কুমতি জীবনপতি
মরণ বাশুলীদরশনে ॥
রাওয়ারাই মহারোল কেহ দেই মুখে জল
অনিমিখ নয়ন কমল।
[১২১ক]শ্রীযুত মুকুন্দ কয় ওরে সাধু নাহি ভয়
যোগিনীরে দেহ পুষ্প জল ॥০॥

॥ তুড়ি পয়ার ॥

ও রাঙ্গা চরণ বিনু আর না চাহি আমি।
কিসের অভাব তার যার মাতা গো তুমি ॥০॥

সচেতনে বলে শুন দেবী ভগবতী।
বিশাললোচনী দেবী ত্রিভুবনে গতি ॥
বণিকের কুলে জন্ম নহি পরতন্ত্র।
আমি সাধু ধুসদত্ত জপিল কুমন্ত্র ॥
আপনার মনে আমি করিল বিচার।
মহাদেব বিনু দেবতা নাহি আর ॥
ত্রিভুবনে জানে আমি মহেশকিঙ্কর।
আপদ তারিতে আমায় ন শক্ত শঙ্কর ॥
বাশুলী জননী মোর মহাদেব তাত।
মাতা পিতা ক্ষেম অবিরত অপরাধ ॥
জনক জননী দুহেঁ নহে গুরু পর।
সর্ব্বকাল ঘুষিয়াছে ঈষত অন্তর ॥
যাহার প্রসাদে বিদ্যাদান পুণ্য যশ।
একরূপে দয়া করে অল্প বয়স ॥
পুত্রের কারণে বাপ সহজে পাগল।
দয়া করে শৈশবে যৌবনে হতাদর ॥
মায়েরে অধিক চাপ নহে কোন কালে।
দশ মাস গর্ভ ধরে কথোদিন কোলে ॥
বার্দ্ধক্যে ভরণে শৈশবে প্রতিপালে।
ভাল মন্দ নাহি জানে মা বাপের কোলে ॥
কামতুল্য পুত্র কিবা খোড় কুব্জ কান।
যত দেখ একরূপ মায়ের পরাণ ॥
বাপাধিক দশগুণ সদয় হৃদয়।
গুণের নিদান মাতা দোষ নাহি লয় ॥
পুত্রের মরণে বাপ অলপে পাসরে।
জননীর হৃদয় যাবত নাহি মরে ॥
জগন্মাতা শিবাশিব জগতের পিতা।
কুপুত্রের মরণে মায়েরে লাগে ব্যথা ॥
বিশাললোচনী বলে সাধুর বচনে।
চল চল ঝাঁট পাছে কেহ দেখে শুনে ॥
বড় নিন্দা যুবতী দেবতা পদার্চ্চনে।
[১২১] শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

জননি ক্ষেম দোষ ত্যেজ পরিহাস।
অকপটে দেহ বর কোপ মোরে দূর কর
আমি সাধু কুমতিবিলাস ॥
বলদবাহনে পদ সেবনে বাঢ়য়ে মদ
মোর মনে অবলা অবলা।
না জানি মঙ্গলালয় বিশাললোচনী জয়
তব চরণকমলে কৈল হেলা ॥
সুরেশ্বরী বেদমাতা ত্রিপুরা পরার্দ্ধদাতা
ত্রিপুরা ত্রীশ্বরসহায়িনী।
সুমতী বিক্রমা সতী মধুমতী ভগবতী
রতিপতিহৃদয়মোহিনী ॥

হরি হর বিধি নিত্য করে স্তুতি
ইন্দ্র যার পদ বন্দে।
শ্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
ত্রিপুরাপদারবিন্দে ॥০॥

॥ মল্লার

তুমি স্থল শূন্য বন সলিল পাতাল।
ত্রিদেবাসন মূর্ত্তি অষ্টলোকপাল ॥
পর্ব্বত ভুজগ তরু সিন্ধু নদ নদী।
স্ত্রী পুরুষাকৃতি তুমি দেবী ভগবতী ॥
মাতা তারিহ ত্রিলোকে ত্রিলোকে।
উত্তম মধ্যমাধম প্রণত সেবকে ॥ধ্রু॥
অলক্ষ্মী অদয়া দয়া আত্মমাদিকৃতি।
তুমি মিথ্যা স্বরূপা কমলা সরস্বতী ॥
একানেকা ধৃতি লজ্জা কোটী কাত্যায়নী।
ক্ষমা শান্তি ভক্তি কান্তি মাতা কুণ্ডলিনী ॥
দণ্ড পল মুহূর্ত্ত করণ যোগ তিথি।
দিবস রজনী সন্ধ্যা কাল কলানিধি ॥
সুমতি কুমতি বিধি বিষ্ণু নিরঞ্জন।
উদয় প্রলয় নিদ্রা তুমি জাগরণ ॥
জন্ম শিশু জরা যুবা হেতু বেদমাতা।
ভারত পুরাণ শাস্ত্র ভাগবত গীতা ॥
মীনাদি দশাবতার অনন্তরূপিণী।
বিপত্যনাশিনী সুরশত্রুবিনাশিনী ॥
স্বাহা স্বধা তুষ্টি পুষ্টি সদা সদ্বিচার।
তুমি রোগ লোহ ভোগ মহা অহঙ্কার ॥
মাস ঋতু বৎসর ধর্ম্ম তপোধর্ম্ম।
তুমি পক্ষ গুণ দোষ সুখ মোক্ষ কর্ম্ম ॥
গ্রহ বার তিথি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র।
সুরতি উৎসব তীর্থ তুমি মহাসত্ত্ব ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

॥ পঠ্যতাং রাগ ॥

[১২২] জয় শঙ্খিনী রণরঙ্গিণী
তৃতীয় লোকজনকারী।
তুমি যার সুগেহিনী দ্বিজ শিরোমণি
তোমার মায়াতে নহে স্থির।
জঠর নাসিকা কর্ণ মলমূত্রে পরিপূর্ণ
আমিৎসার মনুষ্যশরীর ॥
তুমি লক্ষ্মী সদাচারে অলক্ষ্মী পাপীর ঘরে
প্রণত সেবকে কৃপাময়ী।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে চণ্ডীসুপ্রসন্ন জনে
সকল ভুবনে পরাজয়ী ॥০॥

॥ মঙ্গল ॥ ছন্দ ঝারিখণ্ড ॥

আনন্দিত বড় সাধু ধুসদত্ত
অন্তেহন্ত মানসে পূজে।
চণ্ডীপদস্থল শত শতদল
ধরিয়া যুগল ভুজে ॥ধ্রু॥
ক্ষীরের পিষ্টক শর্করা মোদক
দধি দুগ্ধ খণ্ড ফেনি।
কস্তুরি চন্দন সিন্দুর কুঙ্কুম
গন্ধ আনে ফরমানি ॥
সুগন্ধি তণ্ডুল কর্পূর তাম্বূল
ঘৃত মধু ফল ফলে।
রচিল নৈবেদ্য যত অনবদ্য
ধূপ ঘৃতদীপ জলে ॥
ব্রাহ্মণ সকল উচ্চারে মঙ্গল
চারি বেদ অবিরত।
রুক্মিণীর পতি পূজিল পার্ব্বতী
সিদ্ধি হইল অভিমত ॥
আসনে যোগিনী বিপত্যনাশিনী
সাধুসুত কাকুর্ভাষে।
স্বর্গ মুক্তি বর- দায়িনী কিঙ্কর
সেবকবৎসলা হাসে ॥
ঢাক ঢোল বেণী মৃদঙ্গ সুধ্বনি
জয়শঙ্খ বাজে ভেরি।
দেই গন্ধপুষ্প মেঘরস মেষ
[১২২ক]ছাগল মহিষ বলি ॥

অসুর সুর নর প্রণতি পদসর-
সরসিরুহাচলনন্দিনী ॥ধ্রু॥
বসুধা বিপতি সংহৃতি সুদতি
সংপ্রতি যাতব কিরীটিনী।
সুর শঙ্খ হাথ বৈরী বিনির্জ্জিত
রুধির কর্পর মণ্ডলিনী ॥
প্রতিপক্ষ নর কোটীসমর চতুর
তুরগস্তক রূপিণী ॥
রুচির নব মৃগ তিলক মস্তক
রেণু কোটী কঙ্কালিনী ॥
অপরাধী নর মূর্জ্জরতর কিঙ্কর
বরমখিল সুর প্রাতিনী।
মুকুন্দ ইতি ভারতী পদকমল সারথি
রচয়তি পিনাকিনী ॥০॥

॥ ইতি শ্রীমতী বিশাললোচনীর গীত সমাপ্তং ॥

॥ অথ অষ্টমঙ্গলা ॥

॥ রুক্মিণী ঝিয়ে ॥

সুখে থাক সাধুর যুবতী।
পুজিলে আমার পদ তোর অভিমত সিদ্ধ
কৈল যেন সুরথ সমাধি ॥ধ্রু॥
প্রলয়পয়োধি জলে বিষ্ণুর শ্রবণমূলে
হৈল মধুকৈটভ অসুর।
জগদীশনাভিপদ্ম উরে বিধি কৈল সদ্ম
জিনিলেক সুরপতিপুর ॥
অচিন্ত্যরূপিণী ত্রয়ী যোগনিদ্রা কৃপাময়ী
বলে ব্রহ্মা জীবনে কাতর।
ত্যেজিল বিষ্ণুর দেহ দেখে মধুকৈটভ
যুঝে পাঁচ সহস্র বৎসর ॥১॥
দুই বীরে ভুজযুদ্ধ কার নাহি টুটে সত্ব
মধুমুখে বাড়ে রোষ।
ডাকি বলে দৈত্যেশ্বর ওরে তুঞি মাগ বর
তোর যুদ্ধে পাইল পরিতোষ ॥
বলে হরি শুন দৈত্য এই বাক্য সত্য সত্য
দুহেঁ ত্যেজে সমর বিরোধ।
ধরিয়া চুলের মুঠি [১২৩] জঘনে আনিঞা কাঠি
প্রকারে করিল তারে বধ ॥২॥
মহিষ জম্ভের সুত ধর্ম্মে তার বাড়ে চিত্ত
বিরিঞ্চি সেবই তপোবনে।
মরাল নৃপতি পতি সাক্ষাত হইল বিধি
বর দিল নৃপ ত্রিভুবনে ॥
মহিষ ব্রহ্মার বরে জিনিলেক পুরন্দরে
আপুনি হইল শচীনাথ।
অধিকার ত্রিভুবনে হারিয়া পলায় রণে
সঙ্কলিল দেবতা বিবাদ ॥৩॥
দুঃখ নিবেদন পর বেদমুখ সুরেশ্বর
যথা আছে দেব হরিহর।
দুর্জ্জয় মহিষ ডরে ক্ষীরোদ সিন্ধুর কূলে
উপনীত দেবতা সকল ॥
দেবতা মন্ত্রণাকালে দেব দুঃখ কোপানলে
শক্তিরূপিণী সুরারীশ।
চামর বিক্ষুর বীর আর যত মহাসুর
পাছে আমি বধিল মহিষ ॥৪॥
দেবগণ স্তুতিপর তারে আমি দিল বর
বিপত্যতারিণী তেজময়ী।
নিজ দণ্ড বাহুবলে ত্রিভুবন বশ করে
শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভাই ॥
রবি শশী যমালয় কুবের করুণালয়
বিধি বিষ্ণু প্রভৃতে কুর্পর।
নিশুম্ভ শুম্ভের ভয় দেবগণ হিমালয়
স্তুতি মোরে করিল বিস্তর ॥৫॥
সাক্ষাত দক্ষিণা কালী দেবতা প্রবোধকারী
ত্রৈলোক্য মোহিল নিজরূপে।
চণ্ডমুণ্ড দেখি মোরে কথিল শুম্ভের তরে
পাঁচনি সুগ্রীব দূত নৃপে ॥
তিন লোকে রত্নরাজ নিশুম্ভ শুম্ভেরে ভজ
কুভারতী সহিতে না পারি।
ধূম্রলোচন আইল হুঙ্কারেতে ভস্ম কৈল
শুনে শুম্ভ নিশুম্ভাধিকারী ॥৬॥

রক্তবীজ চণ্ডমুণ্ড কৈল তারে খণ্ড খণ্ড
শুম্ভ নিশুম্ভ মহাবল।
অদ্যাপি শশিমুখী আমার প্রসাদে সুখী
নির্ভয় দেবতা সকল ॥
প্রণত পাতক ভয় দুঃখ চিন্তা ছিন্ন হয়
বিশালাক্ষী প্রসন্নহৃদয়া।
শিবজয়া বিষ্ণুজয়া সর্বলোকে জানে জয়া
আমি বাণী কমলানিলয়া ॥৭॥
আমার ব্রতের দাসী ঈষত কুটিলকেশী
তোর জন্ম সফল ভূতলে।
তুঁহু সতী পুণ্যবতী দূরদেশা[১২৩]গত পতি
সুত নববধূ কর কোলে ॥
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল মঙ্গল মাধুরী।
রুক্মিণীরে বর দিয়া নিজ পূজা প্রচারিয়া
কৈলাসে চলিলা মহেশ্বরী ॥৮॥০॥

অই রাজরাজেশ্বরী মণিরচিতাসন মাঝে।
দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি দুন্দুভি বাজে
বর সহচরীগণ নাচে ॥ধ্রু॥
অমলা বিমলা দাণ্ডাইল দুই বালা
আৎসাদন আধ মাথায়।
রুণু ঝুনু ঘনে ঘন করে কাজ কঙ্কণ
ঢুলু ঢুলু চামর ঢুলায় ॥
সেবনে সারদাপদ নামিলা অমর যত
কমলজ আর হরিহর।
কমলা ভারতী রতি ভাগীরথী শচীপতি
লোকপাল সহিত অমর ॥
হংস গরুড় গজ ফণিপতি মৃগরাজ
ভল্লুক মূষিক ময়ূর।
হরিণ মহিষ ঘোট কেহ কারে নহে ছোট
বৃষভ শার্দ্দূল নহে দূর ॥
সুরতরুফুল ফুটে পরিমলে নাহি ছুটে
দেবগণ হরিষ অন্তরে।
দেবীর চরণতলে ভকতি করিয়া বলে
না ছাড়িহ প্রণত দাসেরে ॥
বাশুলীমঙ্গল গীত ত্রিভুবনে সুপূজিত
নরলোকে জয়জয়কারী।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল মঙ্গল মাধুরী ॥০॥

॥ শ্রী রাগ ॥

তুমি নাহি জান মন সতত চঞ্চল।
চণ্ডীনামখানি পরলোকের সম্বল ॥ধ্রু॥
আপন মঙ্গল হেতু সেব ভগবতী।
জনমে জনমে যেন না রহে দুর্গতি ॥
চারি যুগে পশু পক্ষ মৃগাদি মানুষ।
সৃজন পালন আত্মা প্রধান পুরুষ ॥
ব্রাহ্মণ সকল হয় জাতিশিরোমণি।
রক্ষিহ সর্ব্বতোভাবে পর্ব্বতনন্দিনী ॥
আমি সুগায়ন কহি বচন রচনা।
পরিপূর্ণ কর মাতা নায়েক কামনা ॥
বিপত্তিনাশিনী জয়া হরের গৃহিণী।
নায়েকের ধন সুত রক্ষিহ ভবানী ॥
বাশুলীমঙ্গল গীত শুনে যেই জনে।
রাজস্থানে রণে বনে রক্ষিহ আপনে ॥
ব্রহ্মাদি না জানে স্তব কি বলিব লোকে।
রক্ষিহ সর্ব্বতোভাবে প্রণত সেবকে ॥
চামুণ্ডা বাশুলী তুমি সেবকবৎসলা।
বিশাল হৃদয় শোভে নরমুণ্ডমালা ॥
নিগুর্ণ সাধবে আমি থাকি যথা তথা।
[১২৪]সেবক বলিয়া মোরে রক্ষিবে সর্ব্বথা ॥
ত্রিপুরাসুন্দরী নাটেশ্বরী মহামায়া।
গায়নে বায়নে কভু না ছাড়িবে দয়া ॥
ত্রিপুরার নাম যার না নিঃসরে মুখে।
বিফল জনম তার কহে তিন লোকে ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

॥ ইতি শ্রীমুকুন্দ কবিচন্দ্র বিরচিত
শ্রীমদ্‌বিশাললোচনীর গীত সমাপ্তং ॥

নৈবেকীং বর্ণিতে চণ্ডী জ্ঞাতেন স্বয়ম্ভবা।
সদাস্ত মতিরস্মাকং ত্রিপুরাপদপঙ্কজে ॥
নমস্তে সমস্তে সদেবে সবন্দে
নমস্তে কৃপাম্ভোধিবক্ত্রারবিন্দে।
নমস্তে ভবাম্ভোধিপারস্থিতারে
নমস্তে বিশালাক্ষী মাতর্নমস্তে ॥০॥

॥ নমস্তে শ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥
॥ নমস্তে শ্রীত্রিপুরায়ৈ নমঃ ॥
॥ শ্রীশ্রীভবন্যৈ নমঃ ॥

শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৫৭ সৌর কার্ত্তিকস্য ত্রিংশ দিবসে সংক্রান্ত্যাং শনিবাসরে দিবা এক প্রহর সময়ে চতুর্দশ্যান্তিথৌ শ্রীশ্রীমদ্বিশালাক্ষী-দেবীং গীতং সমাপ্ত ॥

স্বাক্ষরমিদং শ্রীকিশোর দাস মিত্রস্য মোকাম সাং আখড়িয়া পরগণে মণ্ডলঘাট আমল শ্রীযুত মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায় মহাশয় সন ১১৪২ সাল তারিখ ৩০ কার্ত্তিক ॥

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোষকং।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥

॥ শ্রীশ্রীশিবায় নমঃ ॥
॥ নমো গণেশায় নমঃ ॥
॥ শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥

দৃষ্টি ভঙ্গো কটী ভঙ্গো নৈব দুঃস্থ অধোমুখং দুঃখেন লিখিতা গ্রন্থং যদ্যেপি ইহ পুস্তক মাতা তস্য ভবেৎ বেশ্যা পিতা ভবেৎ শূকর ॥

শিরোমে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মাহেশ্বরী।
হৃদয়াম্পাতুঃ চামুণ্ডা সর্ব্বতঃ পাতু কালিকা ॥০॥

॥ শ্রীশ্রীজয়দুর্গায়ৈ নমঃ ॥
॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥
॥ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥

॥ সমাপ্ত ॥

৪৭৭। ভক্তি উদ্দীপন।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-৮, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। লিপি অনেক স্থলে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৩×৪ ইঞ্চি। ৮ম পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় পুথি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ২য় পৃষ্ঠায় বৃন্দাবন-রচিত একটি পদ এবং তাহার শেষে লিপিকাল ১০৮১ সাল লিখিত আছে। আরম্ভ—

ওঁ শ্রীরাধারমন জিউ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য [ইত্যাদি]
প্রথমে বন্দিব শ্রীশচীর নন্দন।
জাহার কৃপায় জীব পাইল প্রেমধন॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি বন্দো অবধূত বেশে।
পাষণ্ড দলন জার নাম সর্ব্বদেশে॥

শেষ—

শুন ২ আরে ভক্ত করি নিবেদন।
অপরাধ না লইবে কিছু করিল বর্ণন॥
এই সব সাধনে পাই শ্রীবৃন্দাবন।
যেমন করিলে সখি মধ্যে একজন॥
পূর্ব্বাপর যদি হয়ে সব মন্দ।
তথাপিহ এই গ্রন্থে বৈষ্ণবের আনন্দ॥
শ্রীলোকনাথ প্রভুর পদধূলি করি আশ।
ভক্তি উদ্দীপন কহেন নরোত্তম দাস।
ইতি ভক্তি উদ্দিপন গ্রন্থ সম্পূর্ণ॥

ইহার পর-পৃষ্ঠায় নিম্নোদ্ধৃত পদটি আছে।—

নাগর কেনে এত আদর করে।
বঁধু কেনে এত আদর করে॥
নিকুঞ্জ মণ্ডলে মিলনের কালে
নিতি ২ কত মুখানি হেরে।
রসের লালসে অঙ্গ ঠেসি বসে
খেনে কত বার কর়য়ে কোরে॥
আর অদভুত করয়ে কৌতুক
দুখানি চরণ চাপিয়া ধরে।
আলায়ে কবরি রসিক মুরারি
বনাইঞা বেণী সুবেশ করে॥
রচিঞা কবরি আনন্দ মুরারি
মল্লিকার মালা তার উপরে।
বৃন্দাবনের বাণী শুন বিনোদিনি
প্রেমেতে বান্ধাছ শ্যাম নাগরে॥
সন ১০৮১ সাল মাহ আসাড়॥

৪৭৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-১২, সম্পূর্ণ। জলছাপযুক্ত ইংরাজী কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১১।০×৩ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। আরম্ভ—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য [ইত্যাদি]।
শ্রীগুরুপাদপদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম
বন্দ মুই সাবধান মনে।
জাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া জাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় জাহা হইতে॥

শেষ—

আপন ভজনকথা না কহিয় জথা তথা
ইহাতে হইয় সাবধান।

না করিহ কেহ রোষ　না লইয় মোর দোষ
প্রণমহ ভকতচরণ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ পহুঁ বলাইল জেই বাণী।
তাহা বিহু ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥
শ্রীলোকনাথ লোকের জীবন ইতি :
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

ইতি ॥ শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সোমাপ্ত ॥ ইতি ॥ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং শ্রীদাম দাস ॥ ইতি ॥ আশ্বিন মাসে অষ্টমি দিবসে এই গ্রন্থ পুন্ন হইল ॥ ইতি ॥

৪৭৯। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। লিপি পরিষ্কার ও সুন্দর। পরিমাণ ৯৸০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১২ সাল। আরম্ভ—

শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নম ॥
শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট [ইত্যাদি]।
শ্রীগুরু চরণ পদ্ম　কেবল ভকতি সদ্ম
বন্দো মুই সাবধান মনে।
জাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া জাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় জাহা হনে ॥

শেষ—

শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে বোলায়ল যে বাণী।
তাই বলি ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥
শ্রীলোকনাথ পহু পদদ্বন্দ্ব হৃদয় বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত। লিখিত শ্রীরামমোহন দাস বশো। সন ১২১২ বার সত বার সাল তারিখ ২৮ পৌষয্য শুক্রবার অশীত পক্ষ্য সপ্তমীতি ॥

৪৮০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ২-১২, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ৯।০ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১৮ সাল। শেষ—

শ্রীগৌরাঙ্গচান্দ মোরে যে বোলায় বাণী।
ইহা বহি ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥
শ্রীলোকনাথ পদদ্বন্দ্ব হৃদয়ে বিলাসে।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহেন দীন নরোত্তম দাসে ॥

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গৃন্থ সম্পূর্ণ ॥ ইতি সন ১২১৮ বার শও আঠার সাল তারিখ ১৩ তেরঞী অগ্রহায়ণ ॥ শকাব্দাঃ ১৭৩৩ শতের শও তেত্রিষমিদং ॥

৪৮১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-১০, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ৯৸০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। শেষ—

শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে জে বোলায় বাণী।
তাহা বিনি ভালমন্দ কিছুই না জানি ॥
শ্রীলোকনাথপদদ্বন্দ্ব হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥
ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

৪৮২। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-১০, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। শেষ—

শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে বোলায় যেই বাণী।
তাহা বিনু ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
শ্রীলোকনাথপদদ্বন্দ্ব হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নারাত্তম দাস॥
ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সংপূর্ণং॥

৪৮৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পুথির সর্ব্বত্র র অক্ষরের উপরে বিন্দু দেওয়া হইয়াছে, আর ব লিখিত হইয়াছে আসামী র-রূপে। পরিমাণ ১২ × ৪।॰ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। শেষ—

প্রাণ গৌরাঙ্গ মোরে জে বোলায় বাণী।
তাহা বই ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
শ্রীলোকনাথচরণ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্তং॥ যথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]॥ শাক্ষরমিদং শ্রীআনন্দ-মোহন কবিরাজ শাঃ পঞ্চপুষকর্ন্নি জিলা বিরভূম॥

৪৮৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-৮, সম্পূর্ণ। জলছাপযুক্ত পুরু ইংরেজী কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১১৸॰ × ৪।॰ ইঞ্চি। লিপি-কাল ১২০৮ সাল। শেষ—

গৌরাঙ্গ মোরে জে বোলায় বাণী।
তাহা বলি ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
শ্রীলোকনাথ প্রভুর পদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রীকা গ্রন্থ সংপুর্ন্ন॥ এক বৃক্ষ ত্রিয়ো সাখা [ইত্যাদি]॥ গতং জন্ম গতং জন্ম [ইত্যাদি]॥ সন ১২০৮ সাল তারিখ ২৫ ফাল্গুন॥

৪৮৫। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-১০, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১২ × ৪।॰ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৬১ সাল। শেষ—

শ্রীগৌরাঙ্গ বলান বাণী আমি তাহাই বলি
আমি ভাল মন্দ নাই জানি।
শুন২ ভক্তগণ তোমা সভার শ্রীচরণ
কায় মনে ইহা মাত্র জানি॥
শ্রীলোকনাথ পদদ্বন্দ্ব হৃদয় বিলাস।
প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা কহেন শ্রীনরোত্তমদাস॥

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তি গৃহস্ত সমাপ্ত॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]॥ সন ১২৬১ সাল তারিক ১০ চৈত্রী লিখিতং শ্রীতারাচাঁদ সরকার সাং কালবেড়্যা ওরফে গোবিন্দপুর পরগনে বিষ্টুপুর চৌকী বড়জোড়া থানা সিতল্যা সামীল ইতি এই পুস্তক জাহার পাট ও শ্রবন করা আবিস্ক হইবেক তেহ উক্ত সরকারের বাটী হইতে লইয়া জাইয়া পাট ও শ্রবন করিয়া এই পুস্তকএ আপষ ফিরিয়া দীবেন ইতি।

৪৮৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩ × ৪।॰ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। শেষ,—

শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে জে বোলান বাণী।
তাহা বই ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
শ্রীলোকনাথ পদদ্বন্দ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥
স°পুর্ন্ন॥

৪৮৭। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-৯, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৭×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৬ সাল। শেষ—

শ্রীগৌরাঙ্গ চূড়ামণি জে বোলান বাণী।
তাহা বিনু ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
শ্রীলোকনাথপদধূলি অঙ্গেতে লেপন করি।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে শ্রীনরোত্তম দাস॥

ইাত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত ইতি॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। লিক্ষিতং শ্রীবাবুরাম দাস ও কৃষ্ণলাল বৈরাগ্য সাঃ বালিআ মোঃ গোবিন্দচন্দ্র বৈরাগ্যর বাটি ইতি সন ১২২৬ সাল তারিখ ২২ অগ্র্রান সময় সর্ন্ধা।

৪৮৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১, ৩-৬, অসম্পূর্ণ। দু ভাঁজ করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪॥০×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। শেষ—

শ্রীগৌরাঙ্গ জে বলায় বাণী।
তাহাই বলিএ আমি ভাল মন্দ কিছু না জানি॥
শুন২ ভক্তগণ　　তোমা সভার শ্রীচরণ
কায়মনে এই মাত্র জানি॥
শ্রীলোকনাথ প্রভুর পদদ্বন্দ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহেন নরোত্তম দাস॥

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থ স°পূর্ণ°॥ যথা দৃষ্ট° তথা লি··· ॥

৪৮৯। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ২-৭, অসম্পূর্ণ। দু ভাঁজ করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৮০×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫৪ সাল। শেষ—

শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে জে বলান বাণী।
তাহা বিনু ভাল মন্দ কিছু নাহি জানি॥
শ্রীলোকনাথ প্রভুপদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত লিখিত° শ্রীহারাধন বিট সন ১২৫৪ সাল তারিখ ২৮ ফালগুন শুকুর বার॥

৪৯০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-৮, ১০-১৩, অসম্পূর্ণ। ঈষৎ রক্তাভ বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। ১২-১৩ পত্রের হস্তাক্ষর ও কাগজ পৃথক্। পরিমাণ ১৩॥০×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৫ সাল। শেষ—

শ্রীগৌরচন্দ্র জে বোলায় বুলি।
তাহা বহি ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
শ্রীলোকনাথপাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহেন নরোত্তম দাস॥

ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দীকা সমাপ্ত॥ শ্রীমান পীতাম্বর গোস্বামী সন ১২৪৫ সাল ১৯ চৈত্র

সা° শান্তিপুর শ্রীভুবনমোহন গোস্বামী সত্ত্ব প্রণাম।

৪৯১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। মোট পত্র-সংখ্যা ৫। প্রথম পত্র ছাড়া অন্য চারিখানি পত্রে পত্রাঙ্ক নাই। অসম্পূর্ণ। দু ভাঁজ করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। শেষ—

শ্রীগৌরাঙ্গ জে বোলায় মোরে বাণী।
তাহা বিনু ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
শ্রীলোকনাথ প্রভুর পদদ্বন্দ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থ।... শ্রীকৃষ্ণদেবশর্ম্মণা লিখিত° গ্রন্থ।...শ্রীসদাগর দাসস্থ পুস্তকমিদং। শাকিম...।

৪৯২। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ২-৭, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। শেষ—

শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে জে বোলায়ে বাণী।
তাহা সে বলিএ আমি ভালমন্দ কিছুই না জানি॥
শ্রীলোকনাথ প্রভুর পদদ্বন্দ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহেন শ্রীনরোত্তম দাস॥
ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সংপূর্ন্নং।

সপ্তম পত্রের ২য় পৃষ্ঠায় বাম ও দক্ষিণ ভাগে দুইখানি জন্মপত্রিকা লিখিত আছে। উহাতে যথাক্রমে ১৬৭৬ ও ১৬৮৭ শকাব্দ লিখিত দেখা যায়। ১৬৭৬ শকাব্দে 'শ্রী...... সিংহস্ত প্রথম পুত্রো জাতঃ,' নাম শ্রীদর্পনারায়ণ সিংহ। ১৬৮৭ শকাব্দে শ্রীঅনন্তরাম সরকারের ...পুত্র শ্রীঘনশ্যাম সরকার জন্মগ্রহণ করে। জাতকদ্বয়ের পিতামহ, মাতামহ প্রভৃতির নামও লিখিত আছে।

৪৯৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-৭, অসম্পূর্ণ। ১-৪ পত্রের মধ্যদেশ কাটা এবং দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে ২য় পত্রের ১ম পৃষ্ঠার বামার্দ্ধ নাই। দু ভাঁজ করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪৷৷০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। শেষ—

শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে জে বোলায় বাণী।
তাহা বিনু ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
শ্রীলোকনাথ পদ প্রভু হৃদয় বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে শ্রীনরোত্তম দাস॥

জথা দিষ্ট° [ইত্যাদি]। সয়ক্ষর শ্রীবদনচাঁদ দাষ সা° সান্তিপুর।

৪৯৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্রাঙ্কহীন চারিটি পত্র, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ৭ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১২৷৷০ × ২৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

পত্র চারিটির অধিকাংশ স্থল পড়া যায় না। এতদতিরিক্ত আর একটি পত্রাঙ্কশূন্য পত্র শেষে আছে। তাহারও অধিকাংশ পড়া যায় না। যতটুকু পড়া যায়, তাহাতে একটি বৈষ্ণব পদের অংশবিশেষ মনে হয়। শেষে

"শকাব্দা ১৭৮৬" এবং "সাথরমীদং পুস্তকং ইতি" পড়া গেল।

৪৯৫। প্রার্থনা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-৭, সম্পূর্ণ। শাদা রঙের বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪০ সাল। পুথির মধ্যে প্রার্থনামূলক ৩০টি পদ আছে। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীহরিঃ ॥

অথো প্রার্থনার পদাবলি লিক্ষতে ॥
হরি২ বলিতে নয়ানে ববে নীর।
গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর ॥
আর কবে নিতাইচান্দের করুণা হইবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥

শেষ—

এমন বৈষ্ণবপদ জেই নাহি ভজে।
জপ তপ কৈলে সেহ নরকেতে মজে ॥
এমন বৈষ্ণব সদা কৃপা কর মোরে।
নরোত্তম কহে মোরে তার ভবঘোরে ॥

ইতি ॥ প্রার্থনাদৈন্যুক্তং সংপুর্ন ॥......সন ১২৪০ সাল ১২ ফালগুন ॥

৪৯৬। প্রার্থনা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। ডিমাই আকারের পুস্তকের ন্যায় সেলাই করা, পত্রাঙ্কশূন্য ১১টি পত্র; সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১৫ হইতে ২১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ৭৷৷০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯৮ সাল। পুথিতে ৩২টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। শেষ—

অনুক্ষণ প্রেম ভরে এ দুটি নয়ান ঝুরে
না জানি কি জপে নিরবধি ॥
মোরে নাথ অঙ্গী কুরু বাঞ্ছাকলপতরু
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥৩২॥

ইতি শ্রীনরোত্তম দাষ ঠাকুর মহাসএর প্রার্থনা সম্পূর্ণ॥ সন ১১৯৮ সাল মাহ ৩ পৌষ দস্তখত শ্রীসুকদেব দাষ সাং হুগলি ঘোলঘাট।

৪৯৭। প্রার্থনা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-৯, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২২ সাল। পদসংখ্যা—৩০। শেষ—

তোমা সভার হৃদয়েত গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মোর বৈষ্ণব প্রাণধন।
প্রতি জম্মে করি আশ চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি ॥৩০॥

লিখিতং শ্রীবাবুরাম দাস বৈরাগ্য সাং...ইতি প্রার্থনা সংপূর্ণ॥ সন ১২২২ সাল তাং ২৯ মাঘ।

৪৯৮। প্রার্থনা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১,৩-১৩, অসম্পূর্ণ। দু ভাঁজ করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। পদসংখ্যা—৪৭। শেষ—

বিষয় বিষম বিষ সতত খাইলুঁ।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হইলু ॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া ॥৪৭॥

ইহার পরে একটি ত্রিপদী আছে। বোধ হয়, তাহা লিপিকর কর্ত্তৃক রচিত। তাহার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'মহানন্দ দ্বিজবর' নাম পাওয়া যাইতেছে। যথা—

মহানন্দ দ্বিজবর সদা ভাবে নিরন্তর
মন আশা পূর্ণ কর হরি।
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ সকরুণে করি বন্দন
অধমেরে জ্ঞান দেও হরি॥

এই পদের পরে—ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত॥

৪৯৯। স্মরণমঙ্গল।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-১৮, সম্পূর্ণ। দু ভাঁজ করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপি-কাল নাই। দুই জন লেখকের হস্তাক্ষর এবং পত্রের আকৃতিও দুই রকম।

পুথির মধ্যে 'স্মরণমঙ্গল' এবং 'অষ্টকালীয় আখ্যান' এই দুই প্রকার উক্তি আছে। যথা—

সূত্ররূপে কহি এবে স্মরণমঙ্গল।—৪ পত্র।
সংক্ষেপে কহিল তিন কালের আখ্যান॥
—১০ম পত্র।

শেষ—

যুগলকিশোরলীলা অমৃতের সিন্ধু।
দুর্দ্দৈব কর্ম্মসূত্রে না দিল এক বিন্দু॥
উদ্দেশ কহিতে করি দিগ্‌দরশনে।
লীলাকে করিএ স্তুতি দয়া কর মনে॥
শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সূত্ররূপে কহিল অষ্ট কালের আখ্যান॥
শ্রীরূপচরণপদ্ম সবে মাত্র আশ।
স্মরণমঙ্গল কহেন নরোত্তম দাস॥

ইতি শ্রীগোবিন্দলীলামৃত কথা সমাপ্ত॥…যথা দিষ্টং [ইত্যাদি]॥ লিখি শ্রীকিসোর দাস সাকিম কাইগ্রাম॥ ইত্যাদি গৃন্ত সমাপ্ত॥

৫০০। স্মরণমঙ্গল।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-১৫, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। দুই জন লিপিকরের হস্তাক্ষর দেখা যায়। স্থানে স্থানে অক্ষর অস্পষ্ট। পরিমাণ ১০ × ৫।০ ইঞ্চি। ১২শ পত্রের ১ম পৃষ্ঠার বাম দিকের উর্দ্ধে 'সন ১১৮৩' লিখিত আছে। শেষ—

যুগলকিশোরলীলা অমৃতের সিন্ধু।
দুর্দ্দৈব কর্ম্মসূত্রে না দিল এক বিন্দু॥
উদ্দেশ কহিএ মাত্র…অনুসারে।
লীলাকে করিএ স্তুতি দয়া কর মোরে॥
শ্রীরূপমঞ্জরিপাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিএ অষ্ট কালের আখ্যান॥
.. … …
…রূপচরণ সভে করি আশ।
স্মঙরনমঙ্গল কহেন শ্রীনরোত্তম দাস॥

ইতি শ্রীসঙরনমঙ্গল পদ্ধতি গ্রহন্ত সংপুর্ন্নঃ॥

৫০১। স্মরণমঙ্গল।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-১৬, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রথম পত্র প্রায় গলিত ও ছিন্ন। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১০॥০ × ৪ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। শেষ—

যুগলকিশোরলীলা অমৃতের সিন্ধু।
দুর্দ্দৈব কর্ম্মসূত্রে না দিল এক বিন্দু॥
উদ্দেশ করিএ মাত্র লীলা অনুসারে।
লীলাকে করিএ স্তুতি দয়া কর মোরে॥

শ্রীরূপমঞ্জরীপাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল অষ্ট কালের আখ্যান॥
শ্রীরূপচরণপদ্ম মনে করি আশ।
স্মরণমঙ্গল কহে নরোত্তম দাস॥
ইতি স্মরণমঙ্গল সংপূর্ণমিতি॥

৫০২। স্মরণমঙ্গল।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-১৪, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১১৷০×৫ ইঞ্চি। লিপিসম্বৎসর নাই। শেষ—

যুগলকিশোরলীলা অমৃতের সিন্ধু।
দুর্দ্দৈব কর্ম্মসূত্রে না দেয় এক বিন্দু॥
উদ্দেশে কহিএ মাত্র লীলা অনুসারে।
লীলাকে করিয়ে স্তুতি দয়া কর মোরে॥
শ্রীরূপমঞ্জরীপাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল অষ্ট কালের আখ্যান॥
শ্রীরূপমঞ্জরীপাদপদ্ম করি আশ।
স্মরণমঙ্গল কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি শ্রীস্মরণমঙ্গল সংপূর্ণ॥ ইতি তারিখ ১২ জ্যৈষ্ঠ॥

৫০৩। স্মরণমঙ্গল।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-১১, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি লেখা। শেষ পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। পরিমাণ ১০৸০×৫৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৭৭ সাল। শেষ—

যুগলকিশোরলীলা অমৃতের সিন্ধু।
কর্ম্মসূত্র হেতু বিহি না দিল এক বিন্দু॥
উদ্দিশে কহিয়ে মাত্র এই অনুসারে।
লীলা কে কহিতে পারে দয়া কর মোরে॥
শ্রীরূপমঞ্জরিপাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল অষ্ট কালের আখ্যান॥
শ্রীরূপমঞ্জরীপাদপদ্ম করি আশ।
স্মরণমঙ্গল কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি স্মরণমঙ্গল গ্রন্থ সংপুর্ন॥ গ্রন্থমিদং শ্রীকালিদাস বসু দাস॥ স্বহস্তে লিখিতং॥ সন ১২৭৭ সাল তারিখ ২৫ অগ্রহায়ন। হরয়ে নম॥

৫০৪। স্মরণমঙ্গল।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-৮, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি, দুই এক পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১১×৫ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ৮ম পত্রের শেষ—

তোমরা মণ্ডপে থাক সামগ্রী আগুলি।
আমরা পূজার লাগি আনি পুষ্প তুলি॥
এত কহি সখী সঙ্গে রাধাকুণ্ডে আইলা।
নানাভাবে ভেট ধরি কৃষ্ণকে মিলিলা॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল তিন কালের আখ্যান॥

ভ্রম সংশোধন

৮১ পৃষ্ঠায়	২০ লাইনে	(বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড—ড° সুকুমার সেন)	
৮৪ পৃষ্ঠায়	৬ লাইনে	খাচ্চাপুর স্থলে	খাঞ্জাপুর হইবে।
ঐ	৭ লাইনে	খাজাপুর স্থলে	ঐ " ।
৮৬ পৃষ্ঠায়	২ লাইনে	মঙ্গলকাব্যের পরিচয় স্থলে	উদ্দেশ্যগতভাবে মঙ্গল কাব্যের পরিচয়

সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালা

কালিদাসের মেঘদূত ॥ শ্রীরাজশেখর বসু -অনূদিত ১॥০

পদ্যানুবাদ যতই সুরচিত হউক, তাহা মূল রচনা অবলম্বনে লিখিত-স্বতন্ত্র কাব্য। এই গ্রন্থে প্রথমে মূল শ্লোক, তাহার পর যথাসম্ভব মূলানুযায়ী স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। পুনর্বার অন্বয়ের সহিত যথাযথ অনুবাদ ও প্রয়োজন অনুসারে টীকা দেওয়া হইয়াছে।

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ॥ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অনূদিত

প্রথম খণ্ড ১॥০ দ্বিতীয় খণ্ড ১॥০

অশ্বঘোষ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আরম্ভে বর্তমান ছিলেন। কাব্য হিসাবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত য়ুরোপীয় পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে কালিদাসের কাব্যের সমতুল্য মনে করেন। পৃথিবীর নানা ভাষায় ইহার একাধিক অনুবাদ হইয়াছে। বোধ হয় হিন্দী ব্যতীত আর কোনো ভারতীয় ভাষায় এ পর্যন্ত ইহার অনুবাদ হয় নাই।

কবিতাবলী ॥ নারী-কবিগণ-রচিত। শ্রীরমা চৌধুরী -অনূদিত ২৲

বাংলা ভাষায় কোনো অনুবাদ না থাকায় বৈদিক নারী-ঋষি ও উত্তরকালীন নারী-কবিদের রচনা সাধারণের অপরিজ্ঞাত ছিল। এই গ্রন্থে ২৬ জন বৈদিক নারী-ঋষির ২৫৩টি ঋক, ৩২ জন নারী-কবির ১৪২টি সংস্কৃত কবিতা ও ৯ জন নারী-কবির ১৬টি প্রাকৃত কবিতার বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত।

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত।
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

দ্বিষষ্টিতম বর্ষ । তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বিষষ্টিতম বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

॥ বিষয়-সূচী ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা-৬
ফোন নং বড়বাজার ৩৭৪৩

চন।
হিত

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ২৯শে শ্রাবণ (১৩ই আগস্ট) মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ছয়টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিষষ্টিতম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই অধিবেশনে উপস্থিত হইলে সুখী হইব। ইতি ১৭ই শ্রাবণ ১৩৬৩

নিবেদক
শ্রীনির্মলকুমার বসু
সম্পাদক

নত
কে
ষে,

কার্য্যসূচীঃ—১। আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোকপ্রকাশ ২। সভাপতির ভাষণ ৩। ৬২ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ৪। ১৩৬২ বঙ্গাব্দের পরীক্ষিত আয়-ব্যয় বিবরণ ৫। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ বিবেচনান্তে গ্রহণ ৬। ৬৩ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ৭। ৬৩ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন ৮। আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচন ৯। সহায়ক সদস্য আদি নির্ব্বাচন সংবাদ বিজ্ঞাপন ১০। বিবিধ।

র

সভাশেষে বঙ্গীয়-নাট্য-সংসদ কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গকৌতুক হইতে 'আর্য্য-অনার্য্য' নাটিকা অভিনয়।

ধ

"পদাবলি" প্রকাশ করেন, তাহাতে বয়ঃসন্ধি প্রভৃতি বিষয়ক পদগুলির প্রারম্ভে "শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখীর উক্তি," "সখীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি" প্রভৃতি টিপ্পনি যোগ করিয়া দেন। তিনি পদকল্পতরু প্রভৃতি বৈষ্ণব পদ সঙ্কলন হইতে বিদ্যাপতির ১২৪টি পদ নির্বাচন করেন। তিনি ঐ সময়ে মিথিলার কোন পুঁথি পান নাই, মিথিলার লোকমুখে প্রচলিত বিদ্যাপতির কোন পদও

সংগ্রহ করেন নাই। ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে গ্রিয়ার্সন সাহেব কেবল মাত্র মিথিলায় সংগৃহীত ৮২টি পদ প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে মাত্র ছয়টী পদ বাংলার প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীসংগ্রহে পাওয়া যায়। গ্রিয়ার্সন সাহেব মিথিলার সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল মধুবনী মহকুমায় থাকিয়া পদ সংগ্রহ করিলেও বাংলা দেশের প্রচলিত ধারণার প্রভাবে তিনি পদগুলিকে ভগবদ্বিষয়ক রূপক কবিতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং ভগবৎপ্রাপ্তির আকুতি, ভগবৎপ্রেমের আস্বাদন, ভগবদ্বিরহ প্রভৃতি পর্য্যায়ে সাজাইয়াছিলেন।[১]

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় নানা স্থান হইতে ৯৩৫টি পদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। এইগুলির মধ্যে ৮৩৫টিকে তিনি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক মনে করিয়াছিলেন। ১৫টি পদকে কোনরূপেই কৃষ্ণলীলার পর্য্যায়ে ফেলিতে না পারিয়া তিনি ঐগুলিকে "পরকীয়া নায়িকা" নামক এক স্বতন্ত্র ক্রমের মধ্যে নিবদ্ধ করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, বিদ্যাপতি কেবলমাত্র লীলারসই পরিবেশন করেন নাই, শৃঙ্গাররসের কবিতাও লিখিয়াছেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিদ্যাপতির "কীর্ত্তিলতার" ভূমিকায় ঘোষণা করেন যে বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না এবং তাঁহার রচিত রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদগুলি ভক্তি বা মধুররসের কবিতা নহে, শৃঙ্গাররসের কবিতা মাত্র।

মিথিলার আধুনিক পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের বদ্ধমূল ধারণা যে, বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন না, অতএব তিনি রাধাকৃষ্ণকে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকারূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহারা বিদ্যাপতিকে শৃঙ্গাররসের কবি ছাড়া আর কিছু বলিতে রাজী নহেন। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ উমেশ মিশ্র বলেন যে বিদ্যাপতির সময়ে ভক্তির বিশেষ চর্চ্চা ছিল না এবং তিনি কোথাও রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক প্রেম, যাহাকে আমরা রাধাকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বলি, তাহার সম্বন্ধে কিছু লেখেন নাই—"কবি রাধা ঔর কৃষ্ণকে সচ্চে স্বরূপ সে অপরিচিত নহী থা; কিন্তু সচ্চা প্রেম (জিসে হম রাধাকৃষ্ণ কী ভক্তি কহতে হৈঁ) কবি নে অপনী ইন কবিতাওঁ মেঁ কহী নহী দিখায়া।" তিনি আরও বলেন যে, মিথিলা দার্শনিক বিচার ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার দেশ, "ইসী কারণ বিদ্যাপতি কী শৃঙ্গারিক রচনাওঁ কী অপেক্ষা শিব কী নাচারিয়োঁ কা অধিক আদর মিথিলা মে হুআ হৈ, হোতা হৈ তথা হোগা। বিদ্যাপতি কী শৃঙ্গারিক কবিতাএ কেবল শৃঙ্গারিক জীবন ব্যতীত করনেবালী মৈথিলী স্ত্রিয়োঁ হী

---

(১) "I have grouped the songs into classes, according to the subjects which they treat; one class, for instance, treating of the first yearnings of the soul after God, another of the full possession of the soul by love for God, another for the estrangement of the soul and so on. To understand the allegory, it may be taken as a general rule that Radha represent the soul, the messenger or Duti, the evengelist or else the mediator, and Krishna, of course, the diety."—

An Introduction to the Maithili Language of North Bihar containing a Grammar, Chrestomathy and Vocabulary.

মেঁ বিশেষ আদৃত হোতী হৈঁ।" তাঁহার এই উক্তিতে যেমন স্ত্রীজাতির প্রতি, তেমনি বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রতি অশ্রদ্ধা ও অনাদর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বিদ্যাপতির কবিতার স্বরূপ সম্বন্ধে মিথিলা ও বাংলা দেশের মধ্যে এরূপ পরস্পরবিরোধী ধারণা জন্মিবার একটি কারণ দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সঙ্কলিত 'ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি' ও 'পদামৃতসমুদ্রে' ও শেষার্দ্ধে সংগৃহীত 'পদকল্পতরু' এবং উনবিংশ শতকের 'কীর্ত্তনানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যাপতির ১৯০টি পদ ধৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে ১৮৫টি পদ কেবলমাত্র বাংলা দেশেই পাওয়া যায়, মিথিলা, নেপাল বা অন্য কোন প্রদেশে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের প্রাচীন সঙ্কলনে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পদগুলির মধ্যে মাত্র ৫টী এমন পদ আছে, যাহা মিথিলাতেও পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, মিথিলা ও মোরঙ্গ প্রদেশ বিদ্যাপতির রসঘন কতকগুলি শ্রেষ্ঠ পদের আদর করেন নাই এবং তাঁহাদের কোন সংগ্রহগ্রন্থে এগুলির স্থান দেন নাই। বাংলাদেশই এই পদগুলিকে অন্তরের ধন করিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নিম্নে উল্লিখিত শ্রেষ্ঠ পদগুলির একটিও মিথিলা, মোরঙ্গ ও নেপালের কোন পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই—

জহাঁ জহাঁ পদজুগ ধরঈ
তহিঁ তহিঁ সরোরুহ ভরঈ (মিত্র-মজুমদার সংস্করণ, ৬১৯)
পাসরিতে সরীর হোয়ে অবসান
কহইতে ন লয় অব বুঝহ অবধান। (ঐ ৬৩১)
ঘন ঘন গরজয়ে, ঘন মেহ বরিখয়ে, দশ দিশ নাহি পরকাসা।
পথ বিপথহুঁ চিন্নয়ে ন পারিয়ে, কোন পুরয়ে নিজ আস॥ (ঐ ১০৬)
কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁসি-নিসাস-গরলে তনু ভোর॥
হঠ সঁয় পইসএ স্রবনক মাঝ।
তহি খন বিগলিত তনুমন লাজ॥
বিপুল পুলক পরিপূরএ দেহ।
নয়নে ন৷৷হেরি হেরএ জনু কেহ॥ (ঐ ৬৩৩)
সখি হে হামারি দুখের নাহি ওর
　এ ভর বাদর মাহ ভাদর
　শূন্য মন্দির মোর॥ (৭২০)
অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি লেল॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহএ হিলোল॥ (৭৩৩)

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেলি মধাঈ॥ (৭৫১)
অঙ্গনে আওব জব রসিয়া
পালটি চলব হম ইসত হঁসিয়া (৭৫৩)
সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বখানইতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল॥ (৭৬২)
তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমণি সমাজে। (৭৬৩)
মাধব বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী-তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয়। (৭৬৫)

যে দেশে বিদ্যাপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যে ভাষায় তিনি পদ রচনা করিয়াছেন, সেই দেশে সেই ভাষার কোন প্রাচীন পদসংগ্রহে এই শ্রেষ্ঠ পদগুলি রক্ষিত হয় নাই ইহা এক পরম বিস্ময়ের বিষয়। পৃথিবীর কোন দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে বোধ হয়, অনুরূপ কোন ঘটনা কখনও ঘটে নাই। বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯০টি পদের মধ্যে অন্ততঃ এক শতটি পদকে পদাবলীসাহিত্যের জহুরী সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় শ্রেষ্ঠ পদ বলিয়াছেন। মিথিলার লোক এই পদগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই হয়ত তাঁহাদের পক্ষে বিদ্যাপতিকে কেবল মাত্র শৃঙ্গাররসের কবি বলিয়া মনে করা অস্বাভাবিক নহে। অবশ্য এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, বাংলা দেশে প্রচলিত পদগুলির মধ্যে এমন অনেক কবিতা আছে, যাহা শৃঙ্গার রসেরই কবিতা, মধুর বা উজ্জ্বল রসের নহে।

আমি বিদ্যাপতির পদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, তাঁহার ৭৯০টি অকৃত্রিম পদের মধ্যে ৩৮৪টি অর্থাৎ শতকরা ৪৮টি পদে রাধাকৃষ্ণের কোন প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ না থাকিলেও, ভাবের দিক্ দিয়া ইহার মধ্যে কতকগুলি পদকে মধুররসের পদ বলা যাইতে পারে। আবার রাধা, কৃষ্ণ, গোপ, যমুনা, বৃন্দাবন প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও কতকগুলি পদ প্রাকৃত নায়ক নায়িকাবিষয়ক শৃঙ্গার রসেরই পদ।

কবি অন্ততঃ পঞ্চাশ ষাট বৎসর ধরিয়া বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন। তরুণ বয়সে রচিত পদের সহিত প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্দ্ধক্যে লিখিত পদের ভাব পৃথক্ হওয়াই স্বাভাবিক। বিদ্যাপতির রাজনামাঙ্কিত পদগুলি কালানুযায়ী সাজাইয়া আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, কবি প্রথম বয়সে রাজসভার আবহাওয়ায় শৃঙ্গাররসের কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং পরিণত বয়সে তিনি সুরসিক ভক্তের মতন লীলারস পরিবেশন করেন। আমার এই

সিদ্ধান্ত বাংলা ও মিথিলার অনেক সমালোচকেরই মনঃপূত হয় নাই। বিদ্যাপতির মতন মহাজন আদিরসের কবিতা লিখিয়াছেন বলায় বাংলাদেশের কোন কোন সমালোচক ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, কিন্তু কবি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিতাকে শৃঙ্গার হইতে মধুর ভাবে উন্নীত করিয়াছেন বলাতে মিথিলা ও বিহারের কোন কোন সমালোচক আমার বিচারবিমূঢ়তার নিদর্শন পাইয়াছেন। ডাঃ উমেশ মিশ্র মন্তব্য করিয়াছেন—"It is very surprising that after having written so ably and after having given for the first time so valuable analysis of the non-Vaisnavite features, how he could end on such a wrong conclusion! The subject was answered once and last very ably and in detail by Mm. Haraprasad Sastri "বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না" in the introduction to his edition of *Kirtilata*" (Journal of the Ganganath Jha Research Institute, p. 194, 1954)

গবেষণার ক্ষেত্রে কেহই শেষ কথা বলিবার দাবী করিতে পারেন না। আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে শৃঙ্গার রস ও মধুর রসের প্রভাব কতটা পাওয়া যায় তাহা একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করিতেছি।

শিবসিংহের রাজ্যকালে (১৪১০-১৪১৪) বিদ্যাপতির বয়স ত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ছিল। এই সময়ে রচিত পদগুলির মধ্যে ১২৮টি পদে শিবসিংহের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কবি শিবসিংহকে 'নব পচবাণ' (৩৯), পরতখ পঁচবাণ (১৩৯) 'মেদিনি মদন সমান' (১৪৮ এবং ১৫১ সংখ্যক পদে) বলিয়াও ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহাকে 'একাদশ অবতার' (৮৯ ও ১৭৫ সংখ্যক পদে) বলিয়াছেন এবং কয়েকটি পদে তাঁহাকে কৃষ্ণের স্থানেই বসাইয়াছেন। যথা —৩৫ সংখ্যক পদে দেখা যায়, কোন তরুণী তাহার সখীকে বলিতেছে—

নীল কলেবর পীতবসনধর
চন্দন তিলক ধবলা।
সামর মেঘ সৌদামিনি মণ্ডিত
তথিহি উদিত সসিকলা॥
হরি হরি অনতয় জনু পরচার
সপনে মোএ দেখল নন্দকুমার॥

কবি তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

ভনই বিদ্যাপতি অরে বর জৌবতি
জানল সকল মরমে।
সিবসিংঘ রায় তোরা মন জাগল
কান্হু কান্হু করসি ভরমে॥

৭৭ সংখ্যক পদে দেখা যায় যে, কোন তরুণী বলিতেছে যে, তাহার ঘরে এক শ্যামবর্ণ পুরুষ অতিথি হইয়াছিল, রাত্রি রঙ্গরঙ্গে কাটিল।

কাচা সিরিফল নখ মৃতি লও লহ্নি
কেসু পখুরিয়া ভেলী।
সে পিয়া দএ গেল কেসু পখুরিয়া
ধরএ না পারল মোঞে রে ॥

কবি বলিতেছেন—"কান্হরূপ সিরি সিবসিংহ আএল।" ৯৯ সংখ্যক পদে দেখি, এক অভিসারিকা কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে পথে বাহির হইয়াছে, এমন সময় "আন্তর পান্তর বাট উগি গেল চন্দা করম চণ্ডার" প্রান্তরের মধ্যপথে চণ্ডালের মতন কাজ করিয়া চন্দ্র উদিত হইল। সুন্দরী তখন উভয়সঙ্কটে পড়িল, চাঁদের আলোয় না যায় সঙ্কেতস্থানে যাওয়া, না যায় ঘরে ফেরা—"ন পরে পৌলিহুঁ ন ঘরে গেলিহুঁ, দুহু কুল ভেল হানি।" এ দিকে পঞ্চশর যুবতীকে অর্দ্ধমৃত করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু সে কথা কাহাকেও বলা যায় না—

"যুবতি বধ রে আধ পঞ্চসর, কাহু ন
কহহু জাএ।"

এই সঙ্কটকালে কবি তাহাকে গুণনিধান শিবসিংহের সন্ধান দিতেছেন—

ভনে বিদ্যাপতি সুন তএ যুবতি অছএ গুণনিধান।
রাএ সিবসিংহ রূপনরাএণ লছিমা দেবি রমান ॥

১৬৪ সংখ্যক পদে এই ইঙ্গিত আরও বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পদটী নেপালের পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। বিরহিণী বিলাপ করিয়া বলিতেছে যে, তাহার দয়িত তাহার বক্ষস্পর্শ করিয়া শপথ লইয়া বলিয়া গিয়াছিল যে, বৈশাখ মাসের শুক্লা একাদশীতক্ সে ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু সে তো ফিরিল না; তাহার শরীর কাঁপিতেছে, মন অস্থির হইয়াছে; চন্দন, অগুরু, মৃগমদ, কুঙ্কুম ও চন্দ্র দেহ শীতল না করিয়া যেন অগ্নি বর্ষণ করিতেছে। এহেন বিপত্তির সময়—

ভনই বিদ্যাপতি অরে রে কলামতি
অবধি সমাপিল আজি।
লখি দেবিপতি পূরিহ মনোরথ
আবিহ সিবসিংহ রাজা।

শিবসিংহ রাজা আসিয়া তোমার বিরহজ্বালা দূর করিবেন, তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। এরূপ একটা ভণিতা নগেন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও মূল পদে ছাপিতে সাহস করেন নাই, টিপ্পনীতে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। মিথিলার লোকেও ভণিতার এই কয়টী চরণ পরবর্ত্তী কালে বদলাইয়া দিয়াছিল; তাই গ্রিয়ার্সনের সংগ্রহে (৬৬) দেখিতে পাই যে, বিরহিণী বলিতেছে—

এহন বয়স তেজি পহু পরদেশ গেল
কুসুম পিউল মকরন্দা

নিজের তরুণ বয়সের মন্দভাগ্য এমন যে, কুসুম ফুটিল, কিন্তু তাহার মকরন্দ পান করিতে

কোন ভ্রমর আসিল না। সুতরাং সে নিজেই নিজের মধু পান করিতে বাধ্য হইল। এহেন খেদকারিণীকে সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে যে—

ভণহি বিদ্যাপতি শুন বর যৌবতী
হরিক চরণ করু সেবা।
পরল অনাইত তেঁই ছথি অন্তর
বালমু দোষ ন দেবা॥

তুমি হরিচরণ সেবা কর; নিজের বল্লভের দোষ দিও না; সে কার্য্যবশতঃ নিতান্ত অনায়ত্ত বা বাধ্য হইয়া দূরে রহিয়াছে।

জখনে আওব হরি রহব চরণ ধরি
চাঁদে পূজব অরবিন্দা।

ইত্যাদি ১৭৫ সংখ্যক সুন্দর পদটীতে বিরহিণী বলিতেছে—

দিবস রহওঁ হেরি রঅনি বইরিনি ভেলি
বিসম কুসুম সর ভাবে।
নঅন নীরগল মুরছি ধরণি পল
নিরদএ কন্ত নহি আবে॥
সমঅ মাধব মাস পিআ পরদেস বস
তাহি দেখ বসন্ত ন ভেলা।
ফুলল কদব গাছ হাটবাট সেহো অছ
মোরে পিআএঁ সেও ন দেখলা॥

দিনের বেলায় তো তাহার আসার আশায় পথ চাহিয়া থাকি, রাত্রিকালে পথ দেখা যায় না, তাই রাত্রি আমার শত্রু হইল অথবা রাত্রিকালে কুসুমশরের আঘাত প্রবলতর হয়, তাই রাত্রি আমার বৈরিণী। নয়নে অশ্রু বহে, মূর্চ্ছায় ধরণীতে পড়িয়া যাই, তবুও নির্দ্দয় কান্ত আমার আসে না। এই বৈশাখ মাস, তথাপি প্রিয় পরদেশে রহিল; সে দেশে কি বসন্ত আসে না? আজ হাটে বাটে, সব জায়গায় কদম্বফুল ফুটিল, আমার প্রিয়তমের চোখে কি তাহাও পড়িল না? এমন বিরহিণীকে কবি দেখাইয়া দিতেছেন—

ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
অছ তোকেঁ জীবন অধারে।
রাজা সিবসিংঘ রূপ নরাএণ
একাদস অবতারে॥

অপর এক বিরহিণীর বর্ণনায় (১৭৭ সংখ্যক পদে) কবি বলিতেছেন যে, চাঁদ দেখিয়া সে মুখ নীচু করে, নয়নের কাজল দিয়া রাহুর মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়া তাহার শরণ লয়, যাহাতে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলে। দক্ষিণ-পবন যুবতি আর সহ্য করিতে পারে না, তাই দশ নখ দিয়া ব্যগ্রতাভরে ভুজঙ্গমূর্ত্তি অঙ্কন করে; সর্প বায়ুভুক্, তাই বিরহিণী আশা করে যে, তাহার

আঁকা সাপ মলয়সমীরকে খাইয়া ফেলিয়া তাহাকে বিরহের উদ্দীপন হইতে রক্ষা করিবে; শিব মীনকেতনকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাই সে শিব শিব জপ করিয়া মদনের হাত হইতে বাঁচিতে চায়। আর কোকিল যাহাতে কাছে না আসিতে পারে, সেই জন্ম হাতে পায়স লইয়া বায়সকে ডাকে। এরূপ বিরহিণীর বিরহের উপশম করিবেন—

রাজা সিবসিংঘ রূপ নরায়ন
করথু বিরহ উপচারে।

পদকল্পতরুতে এই পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু ভণিতা বদলাইয়া পাঠ ধরা হইয়াছে—

ভণয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
বিরহক ইহ উপচারি।

উপচারি শব্দের অর্থ উপকরণ, অনুষ্ঠান বা উপভোগের দ্রব্য। কাজল দিয়া রাহু আঁকা বা নখ দিয়া সাপ আঁকা বা পায়স হাতে করিয়া কাককে ডাকাকে বিরহের অনুষ্ঠান অথবা উপকরণ বলায় অর্থগৌরব বৃদ্ধি পায় না এবং শিবসিংহ নরপতি নাম লওয়াও নিরর্থক হয়। সুতরাং নগেনবাবুর তালপত্রের পুঁথির পাঠই অকৃত্রিম মনে হয়।

ভণিতার কথা ছাড়িয়া দিলেও বিদ্যাপতির এমন কয়েকটি পদ আছে, যাহা কিছুতেই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বলিয়া অথবা মধুররসের পোষকরূপে স্বীকার করা যায় না। ১৭৩ সংখ্যক পদে এক বিরহিণী বলিতেছে—

জাবে ন ওঙ্গ তরুণত ভেল।
তাবে সেকন্ত দিগন্তর গেল॥
পরহিত অহিত সদা বিহি বাম।
দুই অভিমত ন রহএ এক ঠাম॥
ধনকুল ধরম মনোভব চোর।
কেও ন বুঝাব মুগুধ পিআ মোর॥

যখন আমার দেহে তারুণ্যের প্রকাশ হয় নাই, তখন কান্ত বিদেশে গেল; এখন আমি পূর্ণ যুবতী, অথচ একাকিনী থাকি। এ সবই বিধাতার কারসাজি; সে পরের হিত করিতে চাহে না। আমার মুগ্ধ প্রিয়কে এ কথা কেহ কি বুঝাইবার নাই যে, মদন ধন, কুল ও ধর্ম্মের অপহারক; অর্থাৎ সে ফিরিয়া না আসিলে আমার কুল ও ধর্ম্ম রক্ষা পাইবে না। ৫৫৪ সংখ্যক পদে প্রহেলিকা করিয়া এক ষোড়শী বলিতেছে—

প্রথম একাদস দই পহু গেল।
সেহো রে বিতিত মোর কত দিন ভেল॥
ঋতু অবতার বয়স মোর ভেল।
তইও ন পহু মোর দরসন দেল॥
অব ন ধরম সখি বাঁচত মোর।
দিন দিন মদন দুগুণ সর জোর॥

চান সুরুজ মোহি সহিও ন হোএ।
চানন লাগ বিখম সব সোএ॥

আমার প্রভু আমাকে প্রথম অক্ষর অর্থাৎ ক এবং একাদশ অক্ষর অর্থাৎ ট, কট বা প্রতিশ্রুতি দিয়া গেল যে, সে নির্দিষ্ট দিনে আসিবে। সেও কত দিন শেষ হইয়া গেল। এখন আমার বয়স হইল, ঋতু অর্থাৎ ৬ এবং অবতার অর্থাৎ দশ, ১৬; তবুও প্রভু দর্শন দিলেন না। সখি! আর আমার ধর্ম্ম বাঁচিবে না। এখন দিন দিন মদনের শরাঘাত দ্বিগুণ হইতেছে। চাঁদ ও সূর্য অর্থাৎ দিন ও রাত্রি উভয়ই আমার অসহ্য মনে হয় এবং চন্দনও ভাল লাগে না।

৫৭৫ সংখ্যক প্রহেলিকা পদে নায়িকা বলিতেছে যে, নায়ক আমাকে ধ (উনিশ অক্ষর), র (সাতাশ অক্ষর), ম (পঁচিশ অক্ষর) রক্ষা করিতে বলিয়া গেল, কিন্তু তাহা যে আজ নষ্ট হইতে বসিয়াছে, সে কি উহা দেখিবে না?

লিখব উনৈস সতাইসক সঙ্গ।
সে পুনি লিখব পচীসক সঙ্গ॥
জনিকাঁ সোপি গেলা মোর আহি।
সে পুনি গেলাহ দেখব নহিঁ তাহি॥

কিন্তু মাধব আমাকে যেন দোষ দিও না, উহার ভরসায় আর কত দিন থাকিব?

মাধব জনু দীঅহ মোর দোষ।
কতদিন রাখব হুনক ভরোস॥

সময়মত কান্ত ফিরিয়া না আসিলে যে নায়িকা ধর্ম নষ্ট হইবার আশঙ্কা করে, সে নায়িকা রাধা নহে।

বিদ্যাপতি প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের কবি। সুতরাং তাঁহার পদাবলীর বিন্যাস উজ্জ্বলনীলমণি বা অন্য কোন বৈষ্ণবীয় অলঙ্কার বা রসশাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে হইতে পারে না। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার পদরচনা দেখিলে মনে হয় যে, তিনি তাঁহার সময়ে প্রচলিত কোন ধাঁচা বা রীতির অনুসরণ করিতেছেন। এই ধাঁচার পরিচয় পাওয়া যায় ১২০৫ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত সেন-রাজগণের মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাস-কৃত সদুক্তিকর্ণামৃতে। শ্রীধরদাস উক্ত গ্রন্থের শৃঙ্গারপ্রবাহ-বীচিতে ৮৭৬টি সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহ করিয়াছেন; প্রায় প্রত্যেক বীচিতে ৫টি করিয়া সুভাষিত দিয়া ১৭৯টি বীচিতে শৃঙ্গারপ্রবাহকে বিভক্ত করিয়াছেন। এইরূপ বিষয় নির্বাচন ও পদসন্নিবেশ বিদ্যাপতির পদাবলীতেও দেখা যায়। শ্রীধরদাস যে যে বিষয়ে শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এমন কতকগুলির উল্লেখ করিতেছি, যে বিষয়ে বিদ্যাপতির একাধিক পদ পাওয়া যায়:—বয়ঃসন্ধি, কিঞ্চিদুপারূঢ়যৌবনা, যুবতি, নায়িকাদ্ভুতম্‌, মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা, নবোঢ়া, বিস্রব্ধ-নবোঢ়া, কুলস্ত্রী, অসতী, কুলটোপদেশ, গুপ্ত অসতী, বিদগ্ধ অসতী, লক্ষিত অসতী, বেশ্যা খণ্ডিতা, অন্যরতিচিহ্নদুঃখিতা, লক্ষিতবিরহিণী, বিরহিণী, বিরহিণী বচন, বিরহিণীরুদিত, দূতীবচন, প্রিয়সম্বোধন, পত্রখণ্ডাভিধান, বিরহিণীচেষ্টা, সন্তাপকথন,

তম্বুতাখ্যান, উদ্বেগকথন, নিশাবস্থাকথন, বাসকসজ্জা, স্বাধীনভর্তৃকা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, মানিনী, উদাত্তমানিনী, অনুরক্তমানিনী, নায়কের প্রতি মানিনীবচন, মানিনীর প্রতি সখীবচন, অনুনয়, মানভঙ্গ, প্রোষিতভর্তৃকা, বর্ত্মাবলোকিনী, অভিসার, অভিসারিকা, দিবাভিসারিকা, তিমিরাভিসারিকা, জ্যোৎস্নাভিসারিকা, দুর্দ্দিনাভিসারিকা, দক্ষিণনায়ক, শঠনায়ক, ধৃষ্টনায়ক, গ্রাম্যনায়ক, মানিনায়ক, পথিক, বর্ষাপথিক, বনবিহার, জলক্রীড়া, আলিঙ্গন, চুম্বন, অধরখণ্ডন, নখক্ষত, নবোঢ়াসম্ভোগ, রত, বিপরীতরত, ঋতুবর্ণন।

বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি, অভিসার, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, মান, বিরহ প্রভৃতির কবিতা সুবিদিত। কেবল মাত্র শৃঙ্গাররস সৃষ্টির জন্যই বিদ্যাপতি যে সব বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, যাহার সহিত রাধাকৃষ্ণলীলার কোন সম্বন্ধ স্থাপন করা কঠিন, শ্রীধরদাসবর্ণিত এমন কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

রাধাকৃষ্ণলীলায় সখীর কাজ হইতেছে উভয়ের মিলন সাধন করা। কিন্তু বিদ্যাপতির অন্ততঃ ৪টি পদে দেখা যায় যে, সখী নায়িকাকে পরপ্রীতি হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সদুক্তিকর্ণামৃতে লক্ষ্মণসেনের যুগের কবি শরণের নিম্নলিখিত পদটি কুলটোপদেশ-প্রকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে—

আরাধ্যঃ পতিরেব তস্য চ পদদ্বন্দ্বানুবৃত্তির্ব্রতং
কেনৈতাঃ সখি শিক্ষিতাসি বিপথপ্রস্থানদুর্বাসনাঃ।
কিংরূপেণ ন যত্র মজ্জতি মনো যূনাং কিমাচার্য্যকৈ-
র্গূঢ়ানঙ্গরহস্যযুক্তিষু ফলং যেষাং ন দীর্ঘং যশঃ॥

রামভদ্রপুরের পুথিতে প্রাপ্ত একটি পদে (সংখ্যা ১৫) বিদ্যাপতি সখীর দ্বারা নায়িকাকে উপদেশ দিতেছেন—

পহু সঞো উতরি বোলব বোল।
অইসন মন ন মানএ মোর॥
সে জদি বচনে ফলে উদাস।
আপনি ছাহরি তেজ ন পাস॥
সখি পচারসি মন্দে সাথ।
হরও আদর আপন নাথ॥
কৈরব সুরজ কমল চন্দ।
পরপুরুষক সিনেহ মন্দ॥
নাগরি ভএ যদি হটেবি মান।
একহি জনমে ইচ্ছব আন॥
সরস ভণ কবি-কণ্ঠহার।
সুন্দরি রাখ কুল বেবহার॥

তুমি যে স্বামীর কথার উপর কথা বলিবে, ইহা আমার মনে ভাল লাগে না। সে যদি কাজে বা কথায় উদাসীনতাও দেখায়, তথাপি তোমার মনে রাখা উচিত যে, ছায়া কায়াকে ত্যাগ করে না। সখি! তুমি মন্দলোকের সাথে মেলামেশা করিতেছ, তাহারা নিজের স্বামীর সহিত ভালবাসা নষ্ট করিয়া দেয়। কুমুদিনীর সহিত যেমন সূর্য্যের অথবা কমলিনীর সহিত চন্দ্রের প্রেম খারাপ, তেমনি পরপুরুষের প্রতি প্রেম গর্হিত। তুমি যদি নাগরী হইয়া মান হারাইতে চাও, তবেই এই জন্মে আবার অন্যকে অভিলাষ কর। সরস কবিকণ্ঠহার বলিতেছেন, হে সুন্দরি, কুলের গৌরব রক্ষা কর।

ঐ রামভদ্রপুরের পুথি হইতেই সংগৃহীত ২৫১ সংখ্যক পদে আরও স্পষ্ট ভাবে পাতিব্রত্যের উপদেশ আছে—

থির পদ পরিহরিএ যে জন অথির মানস লাব।
সব চাহিল দিনে দিনে খেলবত পরতর পাব॥
সাজনি থির মন কএ থাক।
হটেঁ জে জখনে করম করিঅ ভল নহি পরিপাক॥
বুধজন মন বুঝি নিবেদএ সবে সংসারেরি ভাব॥

স্থির বস্তুকে পরিহার করিয়া যে অস্থিরের প্রতি মন দেয়, তাহার তুলনা হইতেছে সেই লোক, যে ঘর ছাড়িয়া সারাদিন খেলায় মত্ত থাকে। সখি! মনস্থির করিয়া থাক; সহসা কোন কাজ করিলে তাহার ফল ভাল হয় না। বিজ্ঞজন সকল কথা মন দিয়া বুঝিয়া বলেন।

৪৬ সংখ্যক পদে দেখি, পরকীয় সম্বন্ধ স্থাপনে উদ্যোগিনী সখীকে নায়িকা তিরস্কার করিয়া বলিতেছে—

পিয়া পরবাস আস তুঅ পাসহি
　　তেঁ কি বোলহ জদি আন।
জে পতিপালক সে ভেল পাবক
　　ইথী কি বোলত আন॥
সাজনি অঘটন ঘটাবহ মোহি
পহিলহি আনি পানি পিয়তমে গহি
　　করে ধরি সোপলিহু তোহি।
কুলটা ভএ জদি পেম বঢ়াইঅ
　　তেঁ জীবনে কী কাজ।

তিলা এক রঙ্গ রভস সুখ পাওব
　　রহত জনম ভরি লাজ॥
কুলকামিনি ভএ নিজ পিয় বিলসএ
　　অপথে কতহু নহি জাই।
কী মালতী মধুকর উপভোগএ
　　কিম্বা লতাহি সুখাই॥
বিদ্যাপতি কহ কুল রখলে রহ
　　দুতি বচনে নহি কাজ॥

প্রিয় প্রবাসে গিয়াছে, তুমি কাছে আছ, তাই কি অন্য রকম কথা বলিতেছ? যে প্রতিপালক, সেই কি পাবক হইল? ইহাতে অন্যে কি বলিবে? সখি! তুমি আমার অঘটন ঘটাইতে চাহ; প্রথমে তো তুমিই আমাকে হাতে ধরিয়া প্রিয়তমের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলে। এখন আমি যদি কুলটা হইয়া প্রেম করি তো জীবনে কি কাজ? এক তিল রঙ্গরস করিব, জীবন ভরিয়া লজ্জা রহিবে। যে কুলকামিনী, সে নিজের প্রিয়ের সহিতই বিলাস করে, বিপথে কখনও যায় না। মালতী হয় তাহার মধুকরের দ্বারা উপভুক্ত হয়, না হয় লতাতেই শুকাইয়া যায়—অন্যের সংসর্গ করে না। বিদ্যাপতি বলেন, তুমি দূতীর কথা শুনিও না, কুলধর্ম বাঁচাইয়া রাখ।

শ্রীধরদাস বিদগ্ধা অসতী পর্য্যায়ে যে ধরণের কবিতা সংগ্রহ করিয়াছেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সেই ধরণের ১৪টি কবিতাকে "পরকীয়া নায়িকা" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক প্রায় সকল কবিতাই তো পরকীয়া লইয়া; সুতরাং পৃথক্ করিয়া পরকীয়া পর্য্যায় বানাইবার কি প্রয়োজন ছিল? গুপ্ত মহাশয় এই ১৪টি কবিতাকে কিছুতেই

কৃষ্ণলীলার পর্য্যায়ে ফেলিতে পারেন নাই বলিয়াই এগুলিকে একটি স্বতন্ত্র স্থান দিয়াছেন। বিদ্যাপতি এই ধরণের কবিতায় গতানুগতিক প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীধরদাসধৃত রুদ্রটের একটি কবিতায় আছে—

একাকিনী পরবশা তরুণী তথাহমস্মিন্ গৃহে গৃহপতিশ্চ গতো বিদূরং।
কিং যাচসে তদিহ বাসমিয়ং বরাকী শ্বশ্রূর্মমান্ধবধিরা নমু মূঢ় পান্থ॥

নেপালের পুঁথিতে প্রাপ্ত ৫৮৩ সংখ্যক পদটির প্রথম চারি চরণ যেন ঠিক ইহার অনুবাদ—

হম জুবতি পতি গেলাহ বিদেস। সাসু দোসরি কিছুও নহিঁ জান।
লগ নহি বসএ পড়োসিয়াক লেস॥ আঁখ রতৌঁধি সুনএ নহি কান॥

পরবর্ত্তী দুই চরণ হইতেছে—

জাগহ পথিক জাহ জনু ভোর। রাতি অধাঁর গাম বড় চোর॥

ইহা 'শৃঙ্গারতিলকে'র নিম্নলিখিত শ্লোকের প্রতিধ্বনি মনে হয়—

…বালাঽহং মনসিজভয়াৎ প্রাপ্তগাঢ়প্রকম্পা।
গ্রামশ্চৌরৈরয়মুপহৃতঃ পান্থ নিদ্রাং জহীহি॥

কিন্তু 'শৃঙ্গারতিলকে' যুবতী মনসিজভয়ে কাঁপিতেছিল বলিয়া যেন বড্ড বেশী নিজেকে খেল করিয়া দিল। বিদ্যাপতির নায়িকা সুকৌশলে বলিতেছে যে, "হাঁ, গ্রামে খুব চোরের উপদ্রব বটে, কিন্তু চৌকিদার ভুলিয়াও পাহারা দেয় না, কেহ কাহারও বিচার করে না। রাজা অপরাধীকে শাস্তিও দেন না। তার পর গ্রামের যত মাতব্বর লোক আমার স্বজাতি। অতএব অনুক্তবক্তব্য তোমার আর চুরি করিতে ভয়টা কি ?

ভরমহুঁ চৌরি ন দেঅ কোতবার। পুরুস মহতে সব হমর সজাতি॥
কাহু ন কেও নহি করয়ে বিচার॥ বিদ্যাপতি কবি এহ রস গাব।
অধিপ ন কর অপরাধহু সাতি। উকুতিহু অবলা ভাব জনাব॥

সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত বলভদ্রের নিম্নে লিখিত কবিতার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় নেপালপুথিতে প্রাপ্ত ৫৮৪ সংখ্যক বিদ্যাপতির পদে—

গ্রামান্তে বসতির্মমাতিবিজনে দূরপ্রবাসী পতিঃ
গেহে দেহবতী জরেব জরতী শ্বশ্রূ দ্বিতীয়া পরম্।
এতৎ পান্থ বৃথা বিড়ম্বয়তি মাং বাল্যাতিরিক্তং বয়ঃ
সুস্পষ্টং বীক্ষিতুমক্ষমেহ জানতা বাসোঽন্যত্র চিন্ত্যতাম্॥

হমে একসরি পিঅতম নহি গাম। জেঁা কেও দোসরি পড়উসিনি পাস॥
তেঁ মোহি তরতম দেইতে ঠাম॥ চল চল পথুক চলহ পথ মাহ।
অনতহু কতহু দেঅইতহু বাস। বাস নগর বোলি অনতহু যাহ॥

এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বজকবির অনুসরণ করিয়া বিদ্যাপতি নূতন রস সৃষ্টি করিতেছেন—অন্যত্রই যাও, কিন্তু তোমাকে নূতন পরদেশী লোক বলিয়া মনে হইতেছে, গ্রামের পরেই তো প্রান্তর, সন্ধ্যা সমাগত, এদিকে ঘোর ঘনঘটা দেখিতেছি ; এ সময়ে যাহাকে বাহিরে থাকিতে হয়, তাহার কি কষ্ট।

আতর পাঁতর সাঁঝক বেরি　　　ঘোর পয়োধর জামিনি ভেদ
পরদেস বসিঅ অনাগত হেরি।　　　জেকর বহ তাকর পরিচ্ছেদ॥

ঘোর পয়োধর শব্দ দ্বারা মেঘ বুঝাইয়া তরুণী কি অন্য কিছুরও ব্যঞ্জনা করিল?

শ্রীকৃষ্ণ রসিকচূড়ামণি; বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুসারে তিনি বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, দেশকাল-অভিজ্ঞ। তাঁহাকে কিছুতেই কামকলাঅনভিজ্ঞ গ্রাম্য নায়ক বলা যায় না। সদুক্তিকর্ণামৃতের একটি বীচিতে গ্রাম্যনায়ক সম্বন্ধে পাঁচটী কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহারই ভাব অনুসরণ করিয়া বিদ্যাপতি গ্রাম্যনায়কের কয়েকটি চিত্র অঙ্কণ করিয়াছেন—

হসি নিহারল, পলটি হেরি লাজে, কি বোলব সাঁঝক বেরি।
হরথেঁ আরতি হরল চীর, সূন পয়োধর, কাঁপ সরীর॥
সখি কি কহব কহইতে লাজ, গোরু চিহ্নএ গোপক কাজ।
নিবি নিরাসলি, ফুজলি আস, ততেও দেখি ন আবএ পাস॥
অও কত কহব মধুর বাণি, কাজর দুধেঁ পখালল আনি।
সখি বুঝাবএ ধরিএ হাথ গোপ বোলবথি গোপী সাথ॥
চৈনহে ন চিহ্নহ রসক ভাব, বড় পুণে পুণমতি পাব।

এই পদটীতে (৮১ সংখ্যক) সন্ধ্যাবেলায় নায়িকা অগ্রসর হইয়া নায়ককে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আর রাত্রিকালে নিদ্রাকাতর নায়কের নিকট তাহার ব্যর্থ প্রয়াসের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে ৩৪৮ সংখ্যক পদে—

গুণ অগুণ সম কয় মানএ　　　জগত ভরল নাগর অছএ
ভেদ ন জানএ পহু।　　　বিহি ছললিহ মোহি॥
নিঅ চতুরিম কত সিখাউবি　　　কাম কলারস কত সিখাউবি
হমহু ভেলিহ লহু॥　　　পুব পছিম ন জান।
সাজনি হৃদয় কহঞো তোহি　　　রভস বেরা নিন্দে বেআকুল
　　　কিছু ন তাহি গেআন॥

এই দুইটী পদের ভাবের এবং বিশেষ করিয়া নায়িকার প্রচেষ্টার সহিত তুলনীয় সদুক্তিকর্ণামৃত-ধৃত অমরুর গ্রাম্য নায়কের চিত্র—

ব্যাবৃত্যা শিথিলীকরোতি বসনং, জাগ্রত্যপি ব্রীড়য়া
স্বপ্নভ্রান্তিপরিপ্লুতেন মনসা গাঢ়ং সমালিঙ্গতি।
দত্বাঙ্কং স্বপিতি প্রিয়স্য রতয়ে, ব্যাজেন নিদ্রাং গতা
তন্বংগ্যা বিফলং বিচেষ্টিতমভূত্তাবানভিজ্ঞে জনে॥

শ্রীকৃষ্ণে যেমন গ্রাম্য নায়কত্ব আরোপ করা চলে না, তেমনি শ্রীরাধিকার সহিত একত্র বাস করিয়াও তিনি তাঁহার প্রতি উদাসীন হইয়াছেন, এরূপ কল্পনাও কোথাও নাই। অথচ বিদ্যাপতি উপেক্ষিতা স্ত্রীর অবস্থা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

সে ভল জে বরু বসএ বিদেসে পিআ নিকটহি বস পুছিও ন পুছই
পুছিও পথুক জন তাক উদেসে। এহন বিরহদুখ কে দহ সহই ॥ (১৫২)

১৫০ সংখ্যক পদে 'মাধব' শব্দ থাকিলেও উহা দয়িত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কেন না, রাধাকৃষ্ণ একই ভবনে বাস করিতেন অথবা কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া চোখ ফিরাইয়া লইয়াছেন, এরূপ কোন কল্পনা কোথাও দেখা যায় না—

মাধব বুঝল তেহর অনুরোধ। একহু ভবন বসি দরসন বাধ।
হেরিতহু কএলহ নয়ন নিরোধ ॥ কিছু ন বুঝিঅ পহু কী অপরাধ ॥

১৫৯ সংখ্যক পদে দেখি, নারী উপেক্ষিতা হইয়া আশঙ্কা করিতেছে, এবার কোন অবিদগ্ধ নায়ক তাহাকে স্পর্শ করিবে—

একহি মন্দিরে বসি পিয়া ন পুছএ হাসি ই দুই জোবনা তরুণা লাখ লহ
মোরে লেখে সমুদ ক পার। সে আবে পরস গমার ॥

৪০১ সংখ্যক পদে এক অভিসারিকা কি নিদারুণরূপে উপেক্ষিতা হইয়াছে, তাহার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। নেপাল-পুথিতে প্রাপ্ত এই পদটীকে নগেন্দ্রবাবু শ্রীরাধার উক্তি বলিলেও, মাধবের নিদারুণ মানেও তাঁহার এরূপ ভাব কোথাও কল্পিত হয় নাই—

বচন অমিঞসম মনে অনুমানি। কুলিস অইসন হিয় ফাট নহী ॥
নিঅর অএলাহু তুঅ সুপুরুষ জানি ॥ কর জুগে পরসি জগাওল ভাব।
তসু পরিণতি কিছু কহহি ন জাএ। তইঅও ন তেজ পহু নীন্দ সভাব ॥
সুতি রহল পহু দীপ মিঝাএ ॥ হাথ ঝপাএ রহল মুহ লাএ।
এ সখি পহু অবলেপ সহী। জগাইত নিন্দ গেল ন হোঅ জগাএ ॥

অমিয়সমান তোমার কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম—তুমি সুপুরুষ; তাই তোমার নিকটে আসিলাম। কিন্তু তাহার পরিণাম যাহা হইল, তাহা বলা যায় না; প্রভু দীপ নিভাইয়া শুইয়া রহিল। এ সখি, প্রভুর এই গর্ব্বিত ব্যবহারেও আমার কুলিশহিয়া ফাটিয়া গেল না। আমি তাহাকে স্পর্শ করিয়া ভাব জাগাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাতেও প্রভুর চোখের ঘুম যেন ভাঙ্গিল না। তিনি মুখে হাত ঢাকা দিয়া রহিলেন। যে জাগিয়া ঘুমায়, তাহাকে জাগান যায় না।

বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি, নায়িকার যৌবনবর্ণনা, সদ্যঃস্নাতার বর্ণন, লক্ষিত অসতীর বর্ণনা, নায়ক নায়িকার কেলিবর্ণনা প্রভৃতি শৃঙ্গাররসেরই পদ। এ সব পদে উজ্জ্বল বা মধুররসের চিত্র যাঁহারা দেখিতে পান, তাঁহারা আমাদের প্রণম্য। কেন না, তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়নিহিত প্রেমভক্তির প্রভাবেই এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিয়াছেন।

ভারতীয় জ্যোতিষে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার

শ্রীরমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিদ্যমান থাকা সম্বন্ধে গবেষণা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিবদ্ বরাহমিহির-(খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) কৃত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' নামক গ্রন্থ অন্যতম। এই গ্রন্থে ৫টি সিদ্ধান্ত (astronomical treatise) সম্বন্ধে তথ্যাদি আলোচিত হইয়াছে। যথা—১। রোমক সিদ্ধান্ত, ২। পৌলীশ সিদ্ধান্ত, ৩। বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, ৪। সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং ৫। পৈতামহ সিদ্ধান্ত। জ্যোতির্বিবদ্ বরাহমিহির উক্ত ৫টি সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁহার 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' করণ গ্রন্থ অর্থাৎ উহাতে বিশেষ কোন মত প্রকাশ করা হয় নাই, কেবল মাত্র কতকগুলি বিধি বা নিয়মাবলি প্রদর্শিত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, উহাতে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষ (Scientific Aatronomy) পরিলক্ষিত হইতেছে, যাহা আদিম প্রাচীন জ্যোতিষগ্রন্থাদিতে অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং এই গ্রন্থ ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দিক্ হইতে অত্যাবশ্যকীয়। সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডাক্তার থিবো (Dr. Thibaut) 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, এই যুগের জ্যোতিষে গ্রীসদেশীয় জ্যোতিষের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কারণ, পঞ্চসিদ্ধান্তিকার লিখিত জ্যোতিষ-গ্রন্থাদির মতবাদে (theory) ভারতীয় আদর্শের মতবাদের পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর (transition) দেখা যাইতেছে। এবং এই যুগের জ্যোতিষে আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। তিনি বলিতেছেন, এই যুগে হিন্দুগণ জ্যোতিষ গণনার নূতন আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, যথা—যুগ গণনা, সৌর বৎসরগণনা, বৃত্তের সিঞ্জনী রেখা বা তাহার অনুপাত (sine value of circles)—[১] গ্রহের গতি, সূর্য্যকেন্দ্রের সমীকরণ (equation of the centre of the sun) ইত্যাদি। সুতরাং কথিত হইয়াছে যে এই সকল বিশুদ্ধ মতবাদ ও গণনা তৎকালীন মিশরদেশীয় জ্যোতির্বিবদ্—(খৃঃ ২য় শতাব্দি) টলেমি (Ptolemy) হইতে গৃহীত, অথবা এলেকজেণ্ড্রীয়ার খ্যাতনামা জ্যোতির্বিবদ্ হাইপারকাস্ (Hypercus)…(খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দি) হইতে গৃহীত। উক্ত ৫টি সিদ্ধান্ত মধ্যে সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, রোমক সিদ্ধান্ত এবং পৌলিশ সিদ্ধান্ত উক্ত পাশ্চাত্য জ্যোতিষীদিগের মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছে। অপর ২টি সিদ্ধান্ত, যথা—বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত এবং পৈতামহ সিদ্ধান্ত আরও

---

১ Sine—A straight line drawn from one extremity of an arc perpendicular to the diameter that passes through the other extremity. The ratio of this line to the radius

আদিম যুগের জ্যোতিষ সংক্রান্ত মতবাদ প্রচার করিয়াছে। যাহার নেতা গর্গ, পরাশর এবং অন্যান্য মনীষিগণ।

ডাক্তার থিবো বলিতেছেন যে, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থ ব্যতীত তদপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া যায় না। এবং যেহেতু টলেমি (Ptolemy) পঞ্চসিদ্ধান্তিকার পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া খ্যাত, সুতরাং পঞ্চসিদ্ধান্তিকাতে পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতবাদ গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাচ্যে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা নামক গ্রন্থের সহিত পাশ্চাত্যে Ptolemyর জ্যোতিষের মতবাদের ঐক্য থাকায় উক্ত মতবাদ সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়াছে। এখন আলোচ্য বিষয় এই যে, এই দুই দেশের মতবাদের কতদূর সামঞ্জস্য বা ঐক্য সাধিত হইয়াছে এবং সিদ্ধান্তের কালনির্ণয় ও তৎকালে যাহা বিদিত ছিল অথবা তৎপূর্ব্বেও যে সকল অন্যান্য সিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল পঞ্চসিদ্ধান্তিকা তৎকালীন সকল সিদ্ধান্তেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছে কি না। ডাক্তার থিবো সাহেব বলিতেছেন যে, তিনটি সিদ্ধান্ত, যথা—রোমক সিদ্ধান্ত, পৌলীশ সিদ্ধান্ত এবং সূর্য্য সিদ্ধান্ত একই পর্য্যায়ভুক্ত যদিও তাহাদের পার্থক্য আছে। কারণ, এই সকল সিদ্ধান্তের গণনা পাশ্চাত্য জ্যোতিষের আদর্শে গঠিত, সেই গননা এক সময়ে আলেকজেণ্ড্রিয়ার বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ টলেমি কর্ত্তৃক প্রচারিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হইতেছে, পৌলীশ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যবনপুর আলেকজেণ্ড্রিয়ার (Alexandria) নামান্তর মাত্র। আরও বলা হইতেছে যে, এই সামঞ্জস্য ঘটনাক্রমে নির্ণয় করা হয় নাই। পরন্তু উহা গবেষণাপ্রসূত। অন্যত্র বলা হইতেছে, উজ্জয়িনী লঙ্কার নিকটবর্ত্তী। কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক। কারণ, এই দুই স্থানের দ্রাঘিমান্তর (longitude) এক নহে। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। পঞ্চসিদ্ধান্তিকাতে লিখিত আছে যে লঙ্কাতে যখন সূর্য্যোদয় হয়, তখন রোমক দেশে মধ্যরাত্রি। অন্যত্র বরাহমিহির বলিতেছেন যে, রোমক দেশ হইতে গণিত দ্রাঘিমা ও যবনপুরের (Alexandria)...দ্রাঘিমার মধ্যে পার্থক্য আছে। ইহা শুদ্ধ গণনা। কিন্তু এই উভয় স্থানের দ্রাঘিমা কত তাহা বুঝা যায় না। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থের লিখিত রোমক দেশ অথবা যবনপুর অভিন্ন, ইহা প্রতিপন্ন করা যায় না। সুতরাং যবনপুরের দ্রাঘিমা বর্ত্তমানে আলেকজেণ্ড্রিয়ার সহিত ঐক্য থাকা সম্পূর্ণ দৈবাৎ প্রতিপন্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই সকল সিদ্ধান্তের কালনির্ণয়। পূর্ব্বেই সূচিত হইয়াছে যে, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আছে। এবং এই প্রকার গবেষণা টলেমির পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও বর্ত্তমান ছিল। ইহাও বলা হইয়াছে যে, যদিও এই প্রকার সিদ্ধান্ত টলেমির পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বলিয়া অনুমিত হয়, তথাপি আলেকজেণ্ড্রিয়ার বিখ্যাত প্রাচীন জ্যোতিষী হাইপারকাস (Hypercus)এর প্রভাব ভারতবর্ষে বিস্তার হওয়া অসম্ভব নহে। হাইপারকাসের কাল খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দি। টলেমির কাল খৃঃ ২য় শতাব্দি।

এখন বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে।

রোমক সিদ্ধান্ত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সৌর বৎসর (Tropical Solar year) প্রয়োগ করিয়াছে।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং পূর্ব্বোক্ত পৌলীস সিদ্ধান্ত সূর্য্য এবং চন্দ্রের নক্ষত্রপ্রসূত গতি বা আবর্ত্তন (Sidereal revolution of the sun and moon) গ্রহণ করিয়াছে। (Sidereal—that is, revolution measured by the apparent motion of the stars) ।—

এই tropical solar yearটি—টলেমী অথবা তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী হাইপারকাস জ্যোতির্ব্বিদ্ হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া কথিত।

যবনপুরের দ্রাঘিমাবৃত্তের (Meredian) প্রয়োগ।—থিবো সাহেব বলিতেছেন যে, এই প্রকার প্রয়োগ ঘটনাধীন নহে। অর্থাৎ উহা গবেষণাপ্রসূত। কিন্তু যবনপুরের উল্লেখ থাকাতে ঐ স্থানে বিজ্ঞানের প্রভাবও বিস্তার হইয়াছে। এই প্রকার সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। যদি জ্যোতির্ব্বিদের নামে পৌলিয়াস (Paulius) ও পৌলীশ এক হওয়া ভিত্তিহীন হয়, তবে আলেকজেণ্ড্রিয়াও যবনপুর প্রতিপন্ন হইবার কোন কারণ দেখা যায় না।[২] হিন্দু জ্যোতিষে উজ্জয়িনী হইতেই Meridian বা দ্রাঘিমা চক্র গণনা করা হইত।[৩]

সূর্য্য এবং চন্দ্রের কেন্দ্রের সমীকরণ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের সাদৃশ্য ও পার্থক্য, উভয়ই (Agreement in equation of the centre of the sun and moon) এখানে নিম্নলিখিত সূচিতে প্রদর্শিত হইতেছে—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কেন্দ্রের সমীকরণ	১৫	৩০	৪৫	৬০	৭৫	৯০
রোমক সিদ্ধান্ত অনুসারে	৩৪′ ৪২″	১° ৮′ ৩৭″	১° ৮′ ৩৭″	২° ২′ ৪৯″	২° ১৭′ ১৫″	২° ২৩′ ২৩″
টলেমি অনুসারে		১° ৯′		২° ১′		২° ২৩′

জ্যোতিষী টলেমির গণনানুসারে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর বৃহত্তম দূরত্ব (apogee)[৪] সূর্য্য-বৃত্তের এক চতুর্থাংশ ভিত্তিতে (quadrant)[৫] গণনা করা হইয়াছে। রোমক সিদ্ধান্ত বৃত্তের

২ উজ্জয়িনী লঙ্কায়াঃ সংনিহিতা যোত্তরেণ সমসূত্রে তন্মধ্যাহ্নো যুগপদ্বিষমো দিবসবিষুবন্তোঽস্তঃ। ১

উদয় যো লঙ্কায়াং সোঽস্তময়ঃ সবিতুরেব সিদ্ধপুরে।

মধ্যাহ্নো যমকোট্যাং রোমক বিষয়ে অর্দ্ধরাত্রঃ সঃ। ২

অস্তদ্রোমকবিষয়াদ্দেশাংতরমস্তদেব যবনপুরাৎ।

লঙ্কার্ধরাত্রসময়াদস্ত সূর্য্যোদয়াচ্চৈব। ৩

। ১৭শ শ্লোক, ৩৩ পৃষ্ঠা পঞ্চসিদ্ধান্তিকা। (Thibaut's Panchasidhantika)

৩ Merldian—An imaginary circle passing through the poles of the heavens and the Zenith of the spectator which the sun crosses at mid-day.

৪ The values of Ptolemy are for the qnadrant of the apogee of the sun. Apogee is the greatest distance of the earth from any of the heavenly bodies (here the sun)

৫ Quadrant is the fourth part of a circle, an are of 90° degrees.

৩

একচতুর্থাংশ ভিত্তিতে গণনার কোন বৈষম্য করে নাই। কিন্তু সর্ব্বস্থানেই একই সমীকরণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। তদ্রূপ চন্দ্রের কেন্দ্রস্থ সমীকরণ ১৫ হইতে ১৫° ডিগ্রী অন্তর ॥ ক ॥ প্রদর্শিত হইয়াছে।

পৌলিশ সিদ্ধান্তের ৪র্থ অধ্যায়ে বৃত্তাংশের সিঞ্জিনী সরল রেখার পরিমাণের যে স্থচি (Table of Sine values) দেওয়া হইয়াছে, তাহা নাকি গ্রীক আদর্শের ন্যায়। উক্ত স্থচি অনুযায়ী বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধকে ১২০ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং ঐ ১২০ ভাগের প্রত্যেক ভাগকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ভারতীয় আদর্শ অনুসারে ব্যাসার্দ্ধকে ৩৪৩৮' ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পার্থক্য এই যে টলেমি বৃত্তের ব্যাসের ১২০ ভাগকে মিনিট এবং সেকেণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে পৌলিশ সিদ্ধান্ত উহাকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক ব্যক্তি বৃত্তের ব্যাসকে এবং অপর ব্যক্তি বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধকে বিভক্ত করিয়াছেন।

রোমক সিদ্ধান্ত সূর্য্য ও চন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য গ্রহের গতি সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করে নাই। ইহাকে Luni solar astronomy (সৌরচন্দ্র) জ্যোতিষ বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে পূর্ব্বোক্ত বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত এবং পৌলীশ সিদ্ধান্ত অন্যান্য গ্রহগণের সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছে। বলা হইয়াছে যে, বশিষ্ঠ সিদ্ধান্তকে কতকাংশ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষ বলা যায় না। উক্ত সিদ্ধান্তের গণনাদি আরও প্রাচীন যুগের এবং টলেমির যুগ অপেক্ষাও অধিকতর প্রাচীন যুগের গণনা বলিয়া অনুমিত হয়। বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গোলকমণ্ডলকে (Spheres) সিঞ্জিনী, ডিগ্রী এবং মিনিটে ; এবং লগ্ন সম্বন্ধে এবং সূর্য্যের অয়নমণ্ডল (Ecliptic) সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করিয়াছেন।

Ecliptic—The name given to the great circle of the heavens round which the suns seems to travel from west to east in the course of a year.

পাশ্চাত্য পণ্ডিত Whitney সাহেব বলিতেছেন যে—"Absence from the Hindu system of any improvement introduced into Greek Astronomy by Ptolemy seems to favour the conclusion that the original transmission of astronomical knowledge into India took place before Ptolemy" অর্থাৎ গ্রীস দেশে টলেমি কর্ত্তৃক যে সকল জ্যোতিষতত্ত্বের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, হিন্দু জ্যোতিষে ঐ সকল তত্ত্বের অভাব দৃষ্ট হওয়ায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতীয় জ্যোতিষে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রবর্ত্তন Ptolemyর আবির্ভাব হওয়ার পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ টলেমির পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীস দেশীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অসম্পূর্ণ বা অঙ্গহীন বলিয়া পরিগণিত। বিখ্যাত Whitney সাহেব আর্য্যভট্ট প্রণীত সূর্য্যসিদ্ধান্তের সর্ব্বপ্রথম অনুবাদ করিয়াছেন। Bentley সাহেব তাঁহার Hindu Arstronomy গ্রন্থে তদ্বিপরীত মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত ভারতীয় জ্যোতিবিগণকে খৃষ্টীয় ৬০০ শতাব্দীতে নির্ণয় করিয়াছেন।

	বর্ষগণনা—দিন	ঘণ্টা	মিঃ	সেঃ
১। রোমক সিদ্ধান্ত অনুসারে—	৩৬৫	৫	৫৫	১৯
২। পৌলীশ সিদ্ধান্ত অনুসারে	৩৬৫	৬	১১	০

পৌলীশ সিদ্ধান্ত অনুসারে চন্দ্রের স্থান নির্ণয়ের সূত্র অন্যান্য সিদ্ধান্ত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সম্ভবতঃ উহা তেলেগু জ্যোতিষ হইতে গৃহীত। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে সূর্য্যের স্থান নির্ণয় রোমক সিদ্ধান্তের অনুরূপ। যদিও তাহাতে কতক পার্থক্য থাকা দৃষ্ট হয়। পৌলীশ সিদ্ধান্ত অনুসারে সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের গণনা স্বতন্ত্র। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার ৯ম, ১০ম, ও ১১শ অধ্যায়ে সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ এবং গ্রহগণের প্রক্ষেপণ (Projection) সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করা হইয়াছে।

বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গোলক মণ্ডলকে সিঞ্জিনী (Sines), ডিগ্রী ও মিনিটে বিভক্ত করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পৈতামহ সিদ্ধান্ত গোলক মণ্ডলকে ২৭ অথবা ২৮টি নক্ষত্রে বিভাগ করিয়াছে। যথা—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা ইত্যাদি। হিন্দু জ্যোতিষ অথবা টলেমির জ্যোতিষ অনুযায়ী সংখ্যা চক্রের বা কালচক্রের (Epicycle)[৬] যে সকল পরিমাণ (dimension) দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

যুগগণনা—যুগ গণনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তসমূহে পরস্পরের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে পুরুষ-পরম্পরাগত ১৮০০০ বৎসরে এক যুগ গণনা করা হইয়াছে। এবং যুগের ১০০০ গুণকে এক কল্প গণনা করা হইয়াছে। রোমক সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগতভাবে পৃথক্ যুগ গণনা করিয়াছে। তদনুযায়ী Metonic Period[৭]-এর ১৯ বৎসরকে ১৫০ দ্বারা গুণ করিয়া যুগ গণনা করা হইয়াছে। রোমক সিদ্ধান্তগ্রীষ্মমণ্ডলীয় সৌর বৎসরমূলক (tropical solar year), এবং সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও পৌলীশ সিদ্ধান্ত Sidereal revolution of the sun and moon—(অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্রের নক্ষত্রপ্রসূত গতিমূলক আবর্ত্তন) গ্রহণ করিয়াছে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে tropical solar yearটি টলেমী এবং হাইপার্কাসের (Hypercus) অনুযায়ী গৃহীত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত।

ডাক্তার Thibaut তাঁহার লিখিত অনুবাদগ্রন্থে একটি আবশ্যকীয় তথ্যের আলোচনা করেন নাই অর্থাৎ ভারতীয় জ্যোতিষ গ্রীসদেশীয় জ্যোতিষের উপর নির্ভরশীল কি না। এই দুই দেশেই রাশিচক্র (Signs of the Zodiac) বিদিত ছিল কি না এবং বিদিত থাকিলে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, তাহা তিনি তর্কের বিষয় বলিয়া বাদ দিয়াছেন। উভয় দেশেই দ্বাদশ রাশির শব্দগত অর্থ একই। তবে খ্যাতনামা পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্ Hyparcus সাহেব বলিতেছেন যে, ভারতীয় জ্যোতিষ গ্রীসদেশীয় জ্যোতিষের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা যদি

---

৬ Epicycle—A circle having its centre on another bigger circle on which it turns,

৭ Metonic Period—Is the period pertaining to the Lunar Cycle of 19 years after which the new and full moon happen again on the same day of the year as at its begining.

প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে রাশিচক্রের তথ্যাদি গ্রীসদেশীয় জ্যোতিষের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এ স্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আলেকজেণ্ড্রিয়ার খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্ Hyperous (খৃঃ পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দী) দ্বাদশ রাশি সম্বন্ধে কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, যাহা রাশিচক্রের প্রতিরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। এবং টলেমি সাহেব তৎপরে ঐ সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলিকে নামকরণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন।

এখন রোমক সিদ্ধান্ত এবং পৌলীশ সিদ্ধান্তের গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। বলা হইতেছে যে, এই দুই সিদ্ধান্তই পাশ্চাত্ত্য নামে অভিহিত। রোমক সিদ্ধান্ত কিছুদিন পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে কোন পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের নাম পাওয়া যায় না। পৌলিশ সিদ্ধান্তকে ডাক্তার থিবো সাহেব Paulius of Alexandriaর মত বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু তৎকালে Paulius বলিয়া কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষীর নাম পাওয়া যায় না। যথা, অগস্ত্যকে Augustus বলিয়া সন্দেহ করা হয়। কিন্তু ভারতীয় অগস্ত্যকে Augustus বলিয়া কেহ স্বীকার করেন নাই। সুতরাং পঞ্চসিদ্ধান্তিকা হইতে শুধু নামের ভিত্তিতে এক দেশ হইতে অপর দেশে জ্যোতিষবিজ্ঞান প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।

রোমক সিদ্ধান্তের গ্রন্থকার সম্বন্ধে জানা যায় যে, ব্রহ্মগুপ্ত এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত বলিতেছেন—শ্রীসেন এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। থিবো সাহেব তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, শ্রীসেনকৃত সিদ্ধান্ত ব্রহ্মগুপ্তের অন্যতম সংস্করণ মাত্র। কিন্তু প্রকৃত বিষয় যাহাই হউক না কেন, ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীসেন জ্যোতির্ব্বিদ্‌লতাদেব হইতে এবং আর্য্যভট্ট হইতে অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়াছেন।

পৌলিশ তিথি স্ফুটোসৌ।
তস্যাসন্নস্তত রোমক প্রোক্ত ॥
স্ফুটতরঃ সাবিত্রঃ।
পরিশেষৌ দূরবিভ্রষ্টৌ ॥

অস্যার্থ—পৌলিশকৃত সিদ্ধান্ত শুদ্ধ। তাহার নিকটবর্ত্তী রোমক। আরও শুদ্ধ সাবিত্র অর্থাৎ সূর্য্যসিদ্ধান্ত। অপর দুই সিদ্ধান্ত শুদ্ধ নহে।

শ্রীসেন রোমকসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিদিত থাকা সম্ভবপর এবং যদি শ্রীসেন আর্য্যভট্ট হইতে তাঁহার অনেক সূত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রোমক সিদ্ধান্ত গ্রীক আদর্শ গ্রহণ করার উক্তি ভ্রমাত্মক।

আর্য্যভট্ট বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন নহেন। কারণ, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রোমক এবং পৌলিশ সিদ্ধান্ত উহা অপেক্ষা প্রাচীনতর। বরাহমিহির তাঁহার পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে সিদ্ধান্তগুলি পূর্ব্বাপর ভাবে সন্নিবেশিত করেন নাই।

তিনি গ্রন্থের গুণানুসারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং সূর্য্যসিদ্ধান্তকে শীর্ষস্থান দিয়াছেন। আর্য্যভট্টকৃত সূর্য্যসিদ্ধান্ত রোমক এবং পৌলিশকৃত সিদ্ধান্তের পরবর্ত্তী হইবার বিশুদ্ধ প্রমাণ নাই। থিবো সাহেব বলিতেছেন যে, আর্য্যভট্ট যদি বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হইতেন, তাহা হইলে তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্তের সূত্রাদি আরও বিশদ ভাবে প্রকাশ করিতেন। থিবো সাহেব আর্য্যভট্টের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম জ্যোতিষবিজ্ঞানে গণিত প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম বলিয়াছেন, পৃথিবী অক্ষরেখার (axis) উপর পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহাকে আহ্নিক গতি বলা যায়। আর্য্যভট্টের কাল খৃঃ ৪র্থ শতাব্দী বলিয়া অনুমিত।

শুধু তাহাই নহে। আর্য্যভট্টের অন্যতম গ্রন্থ মহাসিদ্ধান্ত হইতে প্রতীয়মান হয়, তিনি Calculas বা সূক্ষ্মরাশি গণিতের নিয়মগুলি জানিতেন। লঘুমানস-প্রণেতা মুঞ্জাল, আর্য্যভট্ট এবং ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষিগণ Calculus জানিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত নিউটন (Newton) কর্ত্তৃক Calculus আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা শ্লাঘা প্রকাশ করেন, তাঁহারা আর্য্যভট্ট এবং মুঞ্জালের গ্রন্থাদি অথবা ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের নিকট Calculus-এর নিয়মগুলি অবিদিত ছিল না। টলেমির Calculus সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল বলিয়া জানা যায় না।

শ্রীসেন রোমক সিদ্ধান্তের টীকাকার এবং বিজয়নন্দিন বশিষ্ঠসিদ্ধান্তের গ্রন্থকার বলিয়া অভিহিত। এই সকল সিদ্ধান্তে এই প্রকার কোন মন্তব্য নাই যে, কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে কোন মতবাদ গৃহীত হইয়াছে। পৌলিশ সিদ্ধান্তের টীকাকার ভট্টপাল এবং পৃথূদক। তাঁহারা বলিতেছেন, পৌলিশ সিদ্ধান্ত আর্য্যভট্টের অনুসৃত। বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই। কিন্তু বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত যদিও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নহে, তথাপি উক্ত সিদ্ধান্তে প্রাচীন জ্যোতিষ হইতে নব্য জ্যোতিষের পরিবর্ত্তন সূচনা করিয়াছে। বশিষ্ঠসিদ্ধান্তে গ্রহাদির আবর্ত্তন সম্বন্ধে বিশুদ্ধ তথ্য বর্ণিত হইয়াছে এবং পৌলিশ সিদ্ধান্তের গ্রহ বর্ণনা এবং সূত্রাদি টলেমি হইতে প্রাচীনতর। ব্রহ্মগুপ্তের সংহিতা হইতে জানা যায়, বশিষ্ঠসিদ্ধান্তের গ্রন্থকার বিষ্ণুচন্দ্র। বশিষ্ঠসিদ্ধান্তে দিবামান গণনা করিবার সূত্রাদি পৈতামহ সিদ্ধান্তের অনুরূপ। বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত সৌরমণ্ডলের আবর্ত্তনের (Sidereal revolution of the sun) স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অদ্ভুত কারণ প্রদর্শন করিয়াছে। উহা হিন্দু জ্যোতিষের সহিত ঐক্য হয় না। উক্ত সিদ্ধান্ত হইতে একটি তথ্য অনুমিত হয় যে, হিন্দু জ্যোতিষে বৈজ্ঞানিক তথ্য ঐ সময় হইতে ক্রমবিকাশ হইতেছিল। ব্রহ্মগুপ্ত এক স্থানে ইহাও বলিয়াছেন যে, বশিষ্ঠসিদ্ধান্তের প্রণেতা বিষ্ণুচন্দ্র।

বরাহমিহির বিশেষ সাহিত্যক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। সে জন্য তিনি সেই অভ্যুদয়যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রবর্ত্তক এবং অন্যতম রত্নবিশেষ।[৮]

As Thibaut says "at any rate Varahamihira is said to be the first representative of that literary development which Professor Maxmuller has called the renaissance of Sanskrit literature of which Varahamihira was one of the ornaments."

৮ ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

বাংলা সংবাদপত্রে বাংলা গ্রন্থপরিচয়

১৮১৮—১৮৬৭খ্রীঃ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম. এ.

(পূর্বানুবৃত্তি)

সোমপ্রকাশ—১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭২, ইং ২৯এ মে, ১৮৬৫।

নূতন গ্রন্থ।

নিম্নলিখিত দুইখানি পুস্তক আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙ্গালা অর্থপুস্তক (কী) ইহাতে প্রায় কঠিন কঠিন শব্দের ধাতু ও তাহার ইংরাজী অর্থ, কৃদন্ত, তদ্ধিত, সমাস প্রতিশব্দ বিষম স্থলের ব্যাখ্যা ও স্থানে স্থানে অধিকতর বিশদ করিবার নিমিত্ত ইংরাজী প্রতিশব্দও লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি যে প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে তাহাতে কেবল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগের উপকার হইবে এরূপ নহে, বিদ্যার্থি ছাত্র মাত্রেরই বিলক্ষণ উপকার হইতে পারিবে। এখানি শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস প্রণীত, ইহার মূল্য দশ আনা। দ্বিতীয়, জয়দ্রথবধ বৃত্তান্ত। শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র নাটকাকারে ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য দশ আনা। এখানিও মন্দ হয় নাই। পৃঃ [৪৪০]।

সোমপ্রকাশ—২০শে আষাঢ় ১২৭২, ইং ১৮৬৫, ৩ জুলাই [পৃঃ ৫১৩]

বিজ্ঞাপন।

লীলাবতী, শ্রেঢ়ী ব্যবহার পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ পাটীগণীত।

শ্রীমদ্ভাস্করাচার্য্য প্রণীত সংস্কৃত হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত মূল্য ৷৹ আনা।

গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ বা সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ডাক মাসুল সমেত মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে

সোমপ্রকাশ—৩রা শ্রাবণ ১২৭২, ১৭ জুলাই ১৮৬৫ ইং।

নূতন পুস্তক।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। উপদেশমালা। বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী শ্রীকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মিত্র প্রণীত। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপন মধ্যে লিখিয়াছেন "বোধোদয়ের পর পাঠ্য তাদৃশ সরল ভাষার সাহিত্য গ্রন্থ না থাকায় সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের অধ্যয়নের বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। এই অভাব পরিপূরণ করিবার মানসে উপদেশমালা গ্রথিত হইল। প্রথমতঃ যেরূপ সহজ ভাষায় কয়েকটি প্রকরণ লেখা গিয়াছে, উত্তরোত্তর তদপেক্ষাকৃত ভাষার কঠিনতা ও ভাবের প্রগাঢ়তা লক্ষিত হইবে। কিন্তু কোন অংশ এমত নাই যাহার অর্থবোধে শিশু-

দিগের মস্তিষ্কে বেদনা উপস্থিত হয়। বিষয়গুলি অল্পবয়স্ক পাঠকদিগের জ্ঞানান্বেষণ পক্ষে সম্যক্ উপযোগী বুঝিয়া নির্ব্বাচন করা হইয়াছে, রচনাও তদীয় রুচিকর হইবে বলিয়া বিশেষ যত্ন পাইয়াছি।" আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অতিশয় তুষ্ট হইলাম, এতৎপাঠে বালকদিগের বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের স্ব স্ব বিদ্যালয়ে এখানি প্রবর্ত্তিত করা উচিত।

২। চরিতমালা প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইন, এতৎ প্রণয়ন করিয়াছেন। এ খণ্ডে ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল ও এলিজাবেথ ফ্রাই এই দুটি গুণবতী রমণীর জীবন-বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এখানিও উত্তম হইয়াছে। আমাদিগের দেশের স্ত্রীগণের পক্ষে এবংবিধ গ্রন্থ পাঠ সবিশেষ আবশ্যক। এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের সদ্‌গুণের উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা আছে।

৩। লীলাবতী। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে ভাস্করাচার্য্য প্রণীত সংস্কৃত লীলাবতীর শ্রেঢ়ী ব্যবহার পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। যাঁহাদিগের সংস্কৃত লীলাবতী পাঠের অভিলাষ থাকে, অথচ সংস্কৃত জানা নাই, এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের উপকার সাধিত হইবে। পৃঃ (৫৫৩)

সোমপ্রকাশ—৩রা শ্রাবণ ১২৭২।

বিজ্ঞাপন।

আগামী শ্রাবণ মাস অবধি কলিকাতা যোড়াসাঁকস্থ প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ হইতে "সত্যজ্ঞান-প্রদায়িনী" নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। তাহার পত্রসংখ্যা ন্যূনাধিক ৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য প্রতিসংখ্যা ।৵ আনা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ আনা, ডাক মাসুল সমেত ১৷৷০ আনা। অগ্রিম মূল্য প্রদানেচ্ছু মহাশয়েরা নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকটে মূল্য পাঠাইবেন।

শ্রীলালমাধব মুখোপাধ্যায়।
প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।
কলিকাতা যোড়াসাঁকো রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীট
৪৭ সংখ্যক ভবন। পৃঃ [৫৪৬]

সোমপ্রকাশ—৩রা শ্রাবণ ১২৭২।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পুস্তক লাণ্ড মার্কস অব হিষ্টরি নামক ইতিবৃত্তসারের নির্দ্ধারিত অংশের ভূগোল, ইতিহাস, বাইবল ও পৌরাণিক উপাখ্যান সংক্রান্ত কাব্যের টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য আট আনা।

কলিকাতা ফ্রি চর্চ্চ, ইনষ্টিটিউশন

সোমপ্রকাশ—৩রা শ্রাবণ ১২৭২, ১৭ জুলাই ১৮৬৫।

বিজ্ঞাপন।

অতি সুন্দর মানচিত্রের সহিত একখানি ভারতবর্ষের বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষের ভূগোল সংক্রান্ত তাবৎ বিষয় বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। এবং দুই একটা নূতন বিষয়ও সন্নিবেশিত হইয়াছে গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এণ্ড কোং যন্ত্রে পাইতে পারিবেন। মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা। পৃ. [৫৪৬]

সোমপ্রকাশ—৩রা শ্রাবণ ১২৭২, ইং ১৭ জুলাই ১৮৬৫।

বিজ্ঞাপন।

জমীদার ও প্রজা সম্বন্ধীয় আইন।

অর্থাৎ ১৮৫৯ সালের ১০ আইন ও ১৮৬২ সালের ৬ আইন ও তৎসংক্রান্ত ইং ১৮৫৯ সাল অবধি বর্ত্তমান সালের ৩০এ জুন পর্য্যন্ত হাইকোর্টের সমস্ত নজীর ও পত্তনী বিষয়ক ১৮১৯ সালের ৮ আইন ও অপরাপর আইন সংগ্রহ। এই গ্রন্থ দ্বিতীয় বার বহুবাহুল্য সহিত মুদ্রিত হইল। মূল্য ২।০ গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা হাইকোর্টে নিম্নলিখিত নামে পত্র পাঠাইবেন।

শ্রীতারকনাথ দত্ত। পৃঃ [৫৪৫]

সোমপ্রকাশ—৩রা শ্রাবণ ১২৭২।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের কৃত জমীদারী দর্পণ পুস্তক দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইয়াছে। ৮নং কলেজ ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীবিপিনমোহন সেনগুপ্ত। পৃঃ [৫৪৫]

সোমপ্রকাশ—১০ই শ্রাবণ ১২৭২, ইং ২৪ জুলাই ১৮৬৫।

বিজ্ঞাপন।

মহামান্যবর হাইকোর্টের চতুর্দ্দশ জজ একত্রে বৈঠক করিয়া খাজনা বৃদ্ধি সম্পর্কীয় ঘোরতর মকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন কলিকাতা ভারতবর্ষীয় সভার অনুবাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সাহায্যে মুদ্রিত হইতেছে। মূল্য ২ টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা হিন্দু পেট্রিয়ট আফিসে অথবা নিমু খানশামার লেন ১৫ নং বাটী সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে মূল্য সহ স্বীয় স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে পাইতে পারিবেন। ইতি ২৪ আষাঢ় ১২৭২। পৃঃ [৫৬১]

সোমপ্রকাশ—১০ই শ্রাবণ ১২৭২।

বিজ্ঞাপন।

জমিদার ও প্রজা সম্বন্ধীয় আইন।

অর্থাৎ ১৮৫৯ সালের ১০ আইন ও ১৮৬২ সালের ৬ আইন ও এই দুই আইনের সমস্ত

নজীর এবং পত্তনী সম্বন্ধীয় ১৮১৯ সনের ৮ আইন ও জোত নিলাম বিষয়ক ১৮৬৫ সালের ৮ আইন এবং রেবিনিউ বোর্ডের দশ আইন সংক্রান্ত নিয়ম দ্বিতীয় বার মুদ্রিত। মূল্য ২।০ ডাক মাশুল ৵০ আনা।

হাইকোর্ট ; ১৪ নং উকিলের ঘর। শ্রীতারকনাথ দত্ত। পৃ. [৫৬১]

সোমপ্রকাশ—১০ই শ্রাবণ ১২৭২।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের কৃত জমীদারী দর্পণ পুস্তক দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইয়াছে ৮ নং কলেজ ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীবিপিনমোহন সেনগুপ্ত। পৃ: [৫৬১]

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয়। বোধ হয় বর্ত্তমান ৭৩ সালের শিক্ষা-দর্পণ দেখিতেছেন। ৭৩ সালের কয়েক খণ্ড শিক্ষাদর্পণে যে সকল দেশহিতকর অপূর্ব্ব প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদায় পাঠ করিলে লেখক মহাশয়ের অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞতা, স্বদেশহিতৈষিতা ও তৎসংক্রান্ত প্রগাঢ় পরিশ্রম এবং যত্নের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিক্ষাদর্পণের বয়স অতি অল্প। অনেকে এ জন্য তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হন নাই।

শিক্ষাদর্পণ অপর একটি অসামান্য রত্নে বিভূষিত। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালিরা যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই অনুবাদমাত্র, অথবা অনুবাদ না হইলে খুচরা কাব্যমাত্র। কেবল তীক্ষ্ণধী মৃত রামকমলবাবু নূতন ক্ষেত্রতত্ত্ব রচনা করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষাদর্পণে অনুবাদ নহে এবং খুচরা কাব্য নহে, এমত একখানি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে ; যে গ্রন্থ রচনা করা হিন্দু জাতির অভ্যাসের বিপরীত। সেই গ্রন্থ লার্ড বেণ্টিঙ্কের অধিকারের পর অবধি বাঙ্গলার ইতিহাস। সচরাচর যে প্রণালীতে ইতিহাস লিখিত হয়, যে প্রণালীর দোষে এ দেশীয়েরা ইতিহাস পাঠের উপকারিতা বুঝিতে না পারিয়া বিরক্ত হন, ইহা সে প্রণালীতে লিখিত হইতেছে না। ইহাতে শুদ্ধ খৃষ্টাব্দ, গবর্ণর, ঘটনারই বিষয় লিখিত হয় না। বাঙ্গলার প্রচলিত ইতিহাস দুইখানিতে যেমন ইংরাজদিগের কথা মাত্র লিখিত হইয়াছে, ইহাতে সেরূপ হইতেছে না, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অন্তরিন্দ্রিয় সুপ্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গলা দেশের পূর্ব্বকালীন অবস্থা এবং তৎসহ বর্ত্তমান ও ভাবি অবস্থার সম্বন্ধ বাঙ্গালিদিগের প্রধান শিক্ষণীয় ; তৎসমুদায় শিক্ষাদর্পণের ইতিহাসখণ্ডে বিশেষরূপে লিখিত হয়। এই ইতিহাস খণ্ডই শিক্ষাদর্পণের দেশদীপক নিরপায় ভূষণ।

ফলতঃ বাঙ্গালি মাত্রেরই বিশেষ মনোযোগের সহিত শিক্ষাদর্পণ পাঠ করা উচিত। শিক্ষাদর্পণ অল্পমূল্য হইয়া সকলের সুলভও আছে।

অনেকে শিক্ষাদর্পণের বিশেষ পরিচয়ও জ্ঞাত নহেন। শিক্ষাদর্পণ কাহারও

অর্থোপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ নহে, উহার আয় সমুদায় উহারই উন্নতি সাধনে ও নিয়মিত ব্যয়েই পর্য্যবসিত হয়। উহাতে কেবল বঙ্গ হিতৈষীরই স্বত্ব আছে এবং একজন কৃতবিদ্য সুবিচক্ষণ বাঙ্গালি অবৈতনিক কর্ম্মচারিরূপে শিক্ষাদর্পণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

এ স্থলে শিক্ষাদর্পণের লেখক মহোদয়কেও কিছু নিবেদন করিতে হইল।

শিক্ষাদর্পণ নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হয় না বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন।

মেদিনীপুর
২১শে অগ্রহায়ণ
১২৭৩ } কশ্চিৎ বাঙ্গালী

৩রা পৌষ ১২৭৩, ১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৬। পৃঃ ১

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সংপ্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও শাঁখারিটোলা মাখনওয়ালার গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে। মূল্য ৫ পাঁচ টাকা মাত্র।

৫। ১২৭৪ সালের নূতন পঞ্জিকা বালীর শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল ঠাকুরের যত্নে কলিকাতা লালবাজার ২৩ নং বাটীতে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কোন্স কোম্পানির যন্ত্রের মুদ্রিত এ পঞ্জিকা বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার প্রশংসার্থ আমাদিগের অধিক বক্তব্য নাই। ইহাতে যে যে বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, পাঠকগণের গোচরার্থ তাহা পঞ্জিকাকার দিগের বাক্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"ইংরাজী প্রচলিত দিনের সহিত বঙ্গ দিনের ঐক্য করিয়া প্রতি দিবসীয় তিথ্যাদি প্রাত্যহিক লগ্ন মুহূর্ত্ত ভুক্তি ও স্মার্ত্তসম্মত শুভক্ষণ শ্রাদ্ধদিনাদি ও খোনার নানাপ্রকার বচন এবং হরিভক্তি বিলাসের মত ও একাদশীর ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঠাকুরের বহু যত্নে ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সাহায্যে এই পঞ্জিকা প্রস্তুত" ইত্যাদি।

৭। বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক পত্রিকা। প্রতি রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময়ে সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়া পুরাণ পাঠাদি যে যে বিষয় হইয়া থাকে, এবং যে যে নিয়মে সভা চলিয়া থাকে, তাহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

৮। পল্লীবিজ্ঞান। এখানি মাসিক পত্রিকা। ঢাকার মোগলটুলি সুলভ যন্ত্রে জৈনসার বিদ্যালয় হইতে ইহা প্রচারিত হইতেছে। ইহাতে নিম্নলিখিত কয়টী বিষয় সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল। প্রথম, ভূমিকা। দ্বিতীয়, পল্লীবিজ্ঞান। তৃতীয়, ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা। চতুর্থ, সময়। পঞ্চম, গ্রাম্য বিদ্যালয়। ষষ্ঠ, দেশের প্রচলিত অব্দ। সপ্তম, ইতিহাস এবং পুরাবৃত্ত। অষ্টম, গতবর্ষীয় মহামারী এবং জৈনসার ডিস্‌পেনসরি। নবম, সেনেটরি কমিশন।

"গ্রাম্য বিদ্যালয়। এইক্ষণে পল্লীগ্রামে বিদ্যালয়ের আর অভাব নাই। স্থানে স্থানে সাহায্যকৃত স্কুলসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা যে কেবল ভদ্রসন্তানগণই উপকৃত হইতেছে, এমন নয়, ইতর কৃষক প্রভৃতি যাহাদের মধ্যে কখনও বিদ্যা শিক্ষার চর্চ্চা ছিল না, তাহারাও এইক্ষণে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভূগোল খগোলাদি নানা শাস্ত্রে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা কি সামান্য আহ্লাদের বিষয়! বস্তুতঃ এটী কিসে? কেবল ইংলণ্ডীয় মহাত্মাদের যত্নে নয়? তাহাদের ন্যায় আমরা যদি আমাদের শিক্ষার জন্য সমুচিত ব্যগ্র হইতাম, তবে না জানি এত দিনে এ দেশ সভ্যতা সোপানে কত দূর অগ্রসর হইত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গ্রাম ও পল্লীসমূহের উন্নতিতে দেশের প্রকৃত উন্নতি, অতএব গ্রাম্য স্কুলগুলির উন্নতি পক্ষে কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বিশেষ যত্নবান হইতে হয়। শিক্ষকদিগকে যথোপযুক্ত বেতন দিউন, ছাত্রদিগের উৎসাহ বৃদ্ধির উপায় করুন, তত্ত্বাবধানের নিয়মগুলির সংশোধন করুন এবং সাধারণতঃ মঙ্গলের পক্ষে আর যে কোন উপায় হইতে পারে, অবলম্বন করুন। নিকটস্থ বিদ্যালয়সমূহের কোন্ বিদ্যালয় কবে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার ছাত্রসংখ্যা কত এবং সাধারণতঃ শিক্ষার উন্নতি পক্ষে কি কর্ত্তব্য, শিক্ষক এবং বিদ্যানুরাগী মহাশয়গণ লিখিয়া পাঠাইলে, তাহা প্রকাশ করায় আমরা যত্নবান হইব।"

২১শে ফাল্গুন ১২৭৩, ৪ঠা মার্চ্চ ১৮৬৭, পৃঃ ২৪১।

পুরাণ সংগ্রহের শেষ খণ্ড।

মধ্যে পুরাণ সংগ্রহের বিতরণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে নিয়মিত মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে ডাক মাসুল দিয়া পাঠান হইতেছে এবং কলিকাতার বক্রী গ্রাহকদিগকে দেওয়া যাইতেছে এবং বিতরণ বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্নবান হওয়া গিয়াছে, যাঁহারা পান নাই এবং যাঁহাদের সম্পূর্ণ সেটের বিচ্ছেদ জন্মিয়াছে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ত্বরায় যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করুন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

বালকদিগের ব্যবহারার্থে "গণিত বিজ্ঞান" নামে একখানি অঙ্কপুস্তক শান্তিপুরস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রণীত ও শ্রী আই সি, বসু কোং দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ষ্ট্যান হোপ প্রেসে ও কালেজ ষ্ট্রীটে সংস্কৃত প্রেসের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। মূল্য ১৷৹ পাঁচ সিকা মাত্র।

২৮এ ফাল্গুন ১২৭৩, ১১ই মার্চ্চ ১৮৬৭ পৃঃ ২০৭

পাটীগণিত প্রথম ভাগ।

শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই ব্যবহারোপযোগী হয় এরূপ প্রণালী অনুসারে আমি একখানি পাটীগণিত প্রস্তুত করিতেছি। আপাততঃ উহার প্রথম ভাগ মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। গ্রন্থমধ্যে বহুল পরিমাণে সহজ অথচ সুকৌশলরচিত প্রশ্ন সকল সংগৃহীত হইয়াছে। মূল্য দশ আনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়

৩। গণিত বিজ্ঞান। শান্তিপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "যদিও ইহা কোন পুস্তক-বিশেষের অনুবাদ নহে, তথাপি ইহার অধিকাংশই প্রসিদ্ধ বারনাড স্মিথের অঙ্কপুস্তক হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে এবং চেম্বর্স ও কলিঞ্জকৃত পাটীগণিত হইতেও কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে যে সকল প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রায় কপোলকল্পিত, ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে বারলাড স্মিথ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আমি তাঁহাকেই আদর্শ করিয়াছি।" শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারির ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক শব্দ সকলও ইহাতে গৃহীত হইয়াছে।

৪। পাটীগণিত, প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা। ইহাতে অনেকগুলি সহজ ও কৌশলরচিত প্রশ্ন আছে। দিন দিন বাঙ্গলা ভাষায় সমুদায় বিষয়েরই গ্রন্থসংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে। এবার পাঠকগণ দুইখানি নূতন পাটীগণিত দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করুন।

৫। দেহরক্ষক। শ্রীযুক্ত পীতাম্বর সেন কবিরত্ন ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। কবিরত্ন চরকাদি নানা গ্রন্থ হইতে ঋতুচর্য্যা প্রভৃতি কয়েকটী দেহ রক্ষার উপযোগী বিষয় সঙ্কলন করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মূল হইতে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কবিরত্ন তাহার বাঙ্গলা করিয়াছেন। মৈথুনাদি দুই একটী বিষয় পরিত্যাগ করিলে ভাল হইত।

৬। মুকুন্দবিলাপ। গ্রন্থকারের নাম নাই। কৃষ্ণনগর বঙ্গপুস্তকালয় ইহার প্রকাশ করিয়াছেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (ইঁহার উপাধি কবিকঙ্কণ) বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা দুরাত্মা মামুদ সরিফের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্র-কলত্র সহ নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। সেই সময়ে তিনি যে বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাগুলি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

৭। ছাত্রবোধ পদ্যাঙ্কুর। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সেনগুপ্ত ইহার প্রণয়নকর্ত্তা। এখানি পদ্যময়। পদ্যগুলি মধ্যম প্রকার হইয়াছে।

৮। ১৮৬৮ অব্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার অর্থপুস্তক। শ্রীযুক্ত রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য ইহার প্রণয়ন করিতেছেন। ইহা ফরমা ফরমা প্রকাশ হইতেছে। পুস্তকখানি কিছু বৃহৎ হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে কবিতার অন্বয় তাৎপর্য্য ব্যুৎপত্তিকারক সমাস ও প্রত্যয়াদি বিশদ করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা যেরূপে প্রণীত হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা যায়, ছাত্রগণ এতৎপাঠে বিশিষ্ট উপকার লাভ করিবেন।

১২ই চৈত্র ১২৭৩, ২৫এ মার্চ্চ ১৮৬৭। পৃঃ ২৮৭।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল, শ্রীধর গোস্বামীর টীকা এবং বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত রীত্যনুসারে মুদ্রিত হইয়া ২৸৹ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি সংস্কৃত যন্ত্রের

পুস্তকালয়ে পুস্তকাধ্যক্ষের নিকট অথবা প্রাকৃত যন্ত্রালয়ে মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীমথুরানাথ শর্ম্মা।

নূতন পুস্তক। ১৯এ চৈত্র ১২৭৩, ১লা এপ্রিল ১৮৬৭। পৃ. ৩১১।

১। বাদিবিবাদভঞ্জন। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুমতি অনুসারে ইহার সংকলন করিয়াছেন। মন্বাদি শাস্ত্রে ব্যবহার দর্শনের (মকদ্দমা করিবার) যে বিধি আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া ইহা সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে মূল সংস্কৃত বচন ও তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য এই অনুবাদ করিয়া দেন।

২। কাশীখণ্ডের বাঙ্গলা অনুবাদ। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুবাদ করিয়াছেন।

প্রাচীন বাংলা দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১। বাংলা গদ্যের আদি রূপ

১৬শ হইতে ১৮শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ পর্য্যন্ত বাংলা গদ্য চলিয়াছে কুণ্ঠিত চরণে, প্রয়োজনের খিড়কী পথে। বৈষ্ণব সহজিয়াদের 'কড়চা', আইন-আদালত, ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিনামা প্রভৃতির মধ্যে এই দুই শত বৎসর ধরিয়া বাংলা গদ্য যেন নির্ব্বাসন যাপন করিয়াছে। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন ১৪৭৭ শকাব্দে (১৫৫৫ খ্রীঃ অঃ) কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ কর্ত্তৃক অহোমরাজ চুকাম্‌কা স্বর্গদেবের নিকট লিখিত পত্রখানিকে[১] বাংলা গদ্যের আদিম নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পত্রখানির শুধু ভাষাই নহে, ইহার মধ্যে এই অঞ্চলের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনও আভাসে প্রতিফলিত হইয়াছে। ভাষাদৃষ্টে মনে হয়, ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই বাংলা গদ্যের অনুশীলন চলিতেছিল। 'শূন্যপুরাণে'র রচনাকাল লইয়া প্রচুর সংশয় রহিয়াছে; উপরন্তু ইহাতে যে তথাকথিত গদ্যের নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা বাস্তবিক আত্মসচেতন গদ্যপংক্তি, অথবা কৌলীন্যহীন পয়ার-পংক্তি—তাহা লইয়া প্রচুর সন্দেহ রহিয়াছে। কাজেই কুচবিহাররাজের পত্রখানিকে বাংলা গদ্যের আদিম লৈখিক নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিলেও ইহার পূর্ব্বেও অন্ততঃ দুই শত বৎসর ধরিয়া দৈনিক কাজকর্ম্মে বাংলা গদ্যের প্রচুর ব্যবহার চলিতেছিল। তাহা না হইলে তাহার পরেও কুচবিহার, আসাম, ভোটান প্রভৃতি দেশের মধ্যে বাংলা গদ্যে পত্রালাপ চলিতে পারিত না। সে যাহা হউক, ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত এই পত্রটি বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে স্মারকস্তম্ভরূপে বিরাজ করিতেছে। নিতান্ত তথ্যকেন্দ্রিক প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে উঠিয়া ভাষা ও পদান্বয় যে বক্রোক্তির চারুত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা অবশ্যই উপলব্ধিগোচর হইবে মহারাজ নরনারায়ণের পত্রের উল্লিখিত অংশ হইতে: "তোমার আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে।" শুধু এই উক্তিটুকুতে যে অলঙ্কারের মৃদু স্পর্শ রহিয়াছে, তাহাতেই বুঝা যাইবে যে, ১৬শ শতাব্দীর অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বাংলা গদ্য বাঙ্‌ময় রূপ ছাড়াইয়া লৈখিক রূপ লাভ করিয়াছিল; তাহা না হইলে বক্তব্যের মধ্যে কখনই চারুত্ব সঞ্চারিত হইতে পারিত না। ১৬শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাঙালীর প্রায়-নিস্তরঙ্গ সমাজ-জীবনে মোগল-সাম্রাজ্যলোভী সংঘর্ষ যে নূতন অভিজ্ঞতা ও কেন্দ্রায়িত রাজশক্তির সর্ব্বশোষী নৈরাশ্য সৃষ্টি করিয়াছিল, বাংলা গদ্যে রচিত তৎসমসাময়িক কোন পত্র প্রাপ্ত হইলে বাঙালীর সমসাময়িক সমাজ-জীবনের নূতন স্বরূপ আবিষ্কার করা যাইত।

১। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (ক. বি.)।

১৭শ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া ১৮শ শতাব্দীর সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত বাংলা গদ্যের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার সীমাবদ্ধ পরিমণ্ডলে ভাষার মসৃণতা ও যুক্তিকেন্দ্রিক মননধর্ম্মিতার বিশেষ কোন দীপ্তি প্রকাশিত হয় নাই। এই দুই শত বৎসর বাঙালীর সমাজজীবনে অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক তথ্যবহ তাৎপর্য্য আনয়ন করিয়াছে; কিন্তু সাংস্কৃতিক জীবনে সেই পরিমাণে চলিষ্ণু জীবনের গতিবেগমুখর উদ্দামতা লাভ করিতে পারে নাই। বাংলা গদ্য তখনও প্রয়োজনের সীমার মধ্যে রুদ্ধ হইয়া ছিল। পর্ত্তুগীজ মিশনারী, আদালতের আরবী-ফারসীবহুল আবেদন-নিবেদন, ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিনামা, কুচবিহার-আসাম-ভোটান-অধিপতির রাজনীতিসম্পৃক্ত পত্রাবলী, সহজিয়া সাহিত্য প্রভৃতি বাস্তব প্রয়োজনের দাসত্ব করিতেই বাংলা গদ্যের ডাক পড়িয়াছিল। ১৭শ শতাব্দীতে বিস্তারিত আকারে বাংলা গদ্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; ভাব ভাষা, ব্যাকরণ, পদান্বয় ও প্রকাশভঙ্গিমা তখনও সাহিত্যিক রূপ হইতে শত যোজন দূরে ছিল। ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর বাংলা গদ্যকে দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতি আদালতী প্রয়োজন, চিঠিপত্রাদি, বৈষ্ণব সহজিয়া ও তীর্থ-পরিক্রমা, পর্ত্তুগীজ খ্রীষ্টানী প্রচার-পুস্তিকা প্রভৃতি কয়েকটি পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায় এবং ঈষৎ বিশ্লেষণ করিলে তৎকালীন বাঙালীর মনোজীবন সম্বন্ধেও কিছু কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যাইবে।

২। আইন-আদালত ও দলিল-দস্তাবেজ

১৭শ শতাব্দীতে আদালতের আরজি সম্বন্ধীয় যে দুইটি রচনা দীনেশচন্দ্রের 'প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যপরিচয়ে' (খৃঃ ১৬৭০) উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের আকার আয়তন এত স্বল্প এবং ভাষাও অভিযোগমূলক যে, তাহার মধ্যে বিশেষ কোন রচনারীতি বা পদান্বয়ের সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায় না। ইসলামী আদালতের প্রভাবে সাধারণ অভিযোগপত্রেও, "আসামী মজুকরকে হুজুর তলপ করিয়া হক ইনসাব করিতে আজ্ঞা হয়"—প্রভৃতি ইসলামী বাগ্‌ভঙ্গিমা যথেচ্ছ প্রবেশ করিয়াছে শাসকসম্প্রদায়ের ভাষাদর্শে ও বাধ্যতামূলক ইসলামী শব্দ ব্যবহারের পরবর্ত্তী কালে ১৮শ শতাব্দীর আদালতী আরজিতে ইসলামী শব্দ এত অধিক প্রবেশ করে যে, অদ্যাপি আদালতী ভাষা হইতে তাহা অপসারিত হয় নাই। আদালতী ভাষা আইন ও আদালতের চতুঃসীমায় বদ্ধ থাকিলেও বাঙালীর অন্যান্য গদ্য রচনায় ইসলামী শব্দ দুর্ব্বার বন্যার মত প্রবেশ করিয়াছে। সে যুগের আইন-বিলাসী সাধারণ বাঙালীর নিকট এই আদালতী বাগ্‌ভঙ্গিমা নিশ্চয়ই দুরূহ ছিল না, অথবা শাসকসম্প্রদায়ের বিধিনিষেধের প্রতি চাহিয়া বাঙালী হিন্দুকেও বাধ্য হইয়া আদালতী চোগা-চাপকানের মত আইনবিষয়ক ইসলামী বাক্যাংশ আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল। পরবর্ত্তী বাংলা সাহিত্যে আদালতী গদ্য ও মিশনারীদের গদ্যচর্চ্চা সর্ব্বজনীন উপহাসের বিষয় হইয়াছিল; এই বিড়ম্বিত উপহাসের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে এই যুগের আদালতী গদ্য বিশ্লেষণ করিতে হইবে। অবশ্য মুসলমান বিচারক ও ইসলামী বিচার-পদ্ধতির নিকট সুবিচার পাইতে হইলে এইরূপ মিশ্র ও বিচিত্র

ভাষার "যাবনী মিশাল" সাহায্য গ্রহণ না করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইত না। আদালতী ভাষার 'বাঁধা গত' এখনও বজায় আছে—যদিও আইন-আদালতের রূপরেখা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত 'মনুষ্য-বিক্রয়পত্র' নামক একখানি বিচিত্র চুক্তিপত্র শিবরতন মিত্র মহাশয়ের Types of Early Bengali Prose নামক প্রাচীন বাংলা গদ্য-সংগ্রহে উল্লিখিত আছে :

> আমি আপনা খুসরজ ও রসবাত পুরাকত আকাম বিনা ওজর ইতবারে তোমার পান হনে রেআজি তিন রূপায়া লৈয়া আমার বেটী যার উমর এগার বরিস তুমার স্থানে আকির খাস করিয়া দিলাম।২

ভাষার মধ্যে মুসলমানী শব্দের বাহুল্য তো আছেই; কিন্তু ১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকেও যে দাসদাসী ও সাধারণ মানুষ নিতান্ত অল্প মূল্যে বিকাইত, তাহা এই দলিল হইতে প্রতীয়মান হইতেছে। ১৮শ শতকের প্রথম দুই-তিন দশকে সাধারণ বাঙালীর যে কি শোচনীয় অর্থনৈতিক অধঃপতন হইয়াছিল। তাহা জানা যাইবে কয়েকখানি 'আত্মবিক্রয়' দলিল হইতে। নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি উল্লেখযোগ্য :

> এগার রূপাইয়া পাইয়া স্বইচ্ছাপূর্ব্বক আপুবিক্রয় হইলাম / তোমার পুত্র-পৌত্র আদি ক্রেমে আমার পুত্র-পৌত্র আদি ক্রেমে গোলামি করিব /৩

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের দারুণ অন্নাভাবের সময় যে বহু 'আপ্ত-বিক্রয়' হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মন্বন্তরের পরের বৎসর বাংলা ১১৭৭ সালে এক গোপ এই মর্ম্মে আত্ম-বিক্রয় করিতেছে :

> অকালে অন্নাভাবে মরি / মহাশয়ের নিকট আত্মবিক্রয় হইলাম / ভরণ পোষণ করিয়া দাস্যে দাখিল করিবেন / একবার বিকাইলাম ইহাতে / পলাইয়া যাই ধরিয়া আনিয়া শাস্তি করিবেন /৪

এমন কি, ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দেও মাত্র "১৬ শুল্লটাকা সীক্যা নিয়া" আত্মবিক্রয় করিয়া ক্রেতার "খানি খাইয়া ও পুসাগ পৈরিয়া হামেসা নিকট হাজির"৫ থাকিবার বৃত্তান্তও পাওয়া গিয়াছে। আদালতের জমিজমাসংক্রান্ত দলিল-আরজি অপেক্ষা দাস-দাসী ও আত্মবিক্রয়-পত্রগুলির ভাষায় আদালতী বাগ্‌ভঙ্গিমার নিতান্ত অপ্রতুলতা না থাকিলেও ভাষার মধ্যে স্বচ্ছন্দ সরসতা দৃষ্টিগোচর হইবে।

৩। বৈষ্ণব দলিল

বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে আদালতী দলিল ও চুক্তিপত্রের সহিত ১৭১৯ খ্রীঃ অব্দে লিখিত বৈষ্ণব পরকীয়াবাদ সম্পর্কিত দলিলটির বৈয়াকরণ

২। শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত Types of Early Bengali Prose, pp. 86-87.

৩। শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত Types of Early Bengali Prose, পৃঃ ৮৮ (১১৩৪ সালে লিখিত)।

৪। শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত Types of Early Bengali Prose, পৃঃ ৯০।

৫। শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত Types of EarlyBengali Prose, পৃঃ ১১১।

ও ভাষাভিত্তিক মূল্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সেইরূপ দলিল-সম্পাদক মনোভাবের পশ্চাতে যে সমাজ-দর্শন রহিয়াছে, তাহাও বিবেচ্য। ১৭১৯ খ্রীঃ অব্দে জয়পুর মহারাজের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য স্বকীয় মত (অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা) সংস্থাপনের জন্য গৌড়মণ্ডলে প্রেরিত হন। তাঁহার সহিত গৌড়ীয় পরকীয়াবাদের সমর্থক ও বৈষ্ণব সমাজের আচার্য্য শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের প্রায় ছয় মাস বিচার চলে; সেই বিচারে স্বকীয় মতের সমর্থক কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য সশিষ্য পরাজিত হইয়া রাধামোহন ঠাকুরকে 'অজয়পত্র' লিখিয়া দেন এবং রাধামোহনের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। এই স্বীকারপত্র বা দলিলের ভাষা বাস্তবিক স্বচ্ছন্দবাহী; উপযুক্ত বিরামচিহ্ন প্রয়োগ করিলে ইহাকে অক্লেশে ১৯শ শতকের প্রথমার্দ্ধের ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য 'অজয়পত্র' লিখিয়া দিয়া বলিতেছেন :

> শ্রীযুক্ত সেওার জয়সিংহ মহারাজার সেখান হইতে স্বকীয় ধর্ম্মের পরওানা লইয়া গৌড়মণ্ডলে স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে আসিয়াছিলাম এবং শ্রীযুক্ত পাতশাহার হুকুম মত তৈলাতী লোক সঙ্গে করিয়া গৌড়-মণ্ডলে সর্ব্বশুদ্ধা স্বকীয়সিদ্ধান্তের জয়পত্র লইয়া আসিয়াছিলাম। মালিহাটী মোকামে তোমার নিকট[৬] স্বকীয় পরকীয় ধর্ম্মবিচার অনেক মত করিলাম এবং শ্রীমৎভাগবত এবং পুরাণ এবং শ্রীশ্রী॰গোস্বামীদিগের ভক্তিশাস্ত্র লইয়া সিদ্ধান্তমতে স্বকীয় ধর্ম্মের স্থাপন হইল না। ইহাতে পরাভূত হইয়া অজয়পত্র লিখিয়া দিলাম এবং শিষ্য হইলাম।[৭]

শুধু ভাষার সাবলীল সারল্যই নহে, ইহার অন্তর্নিহিত কয়েকটা মূল্যবান্ সামাজিক তাৎপর্য্যও দৃষ্টিগোচর হইবে। দেখা যাইতেছে যে, ১৮শ শতকের প্রথম দিকেও বাংলার বাহিরে স্বকীয়া-পরকীয়া মতের পরস্পর বিরোধিতা তো ছিলই,—এমন কি, গৌড়মণ্ডলের বহু পণ্ডিত পরকীয়া মতের বিরোধী ছিলেন। কারণ, এই বিচার-বিতর্কে কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যকে সাহায্য করিয়াছিলেন—দিনাজপুরের শ্রীধর বিদ্যাবাগীশ ও প্রাণনাথ রায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্বকীয়া মতের পরাজয় হইল। এই বিচার-সংক্রান্ত ব্যাপার নিশ্চয় সর্ব্বজনীন কৌতূহলের বস্তু হইয়াছিল। 'ইশাদী'র তালিকায় কুড়ারিয়া গ্রামের শেখ কাজী সদরুদ্দীন ও চোঘরিয়া গ্রামের সৈএদ করম উল্লারও স্বাক্ষর রহিয়াছে। এই বিচার বৈষ্ণবীয় সমাজ-সীমা ছাড়াইয়া হিন্দু-মুসলমান, সাধারণ গৃহস্থ, সরকারী কানুনগো প্রভৃতির কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এমন কি, 'পাতসাই শুভা' শ্রীযুত নবাব জাফর খাঁ সাহেবের নিকট সুবিচারের জন্য আবেদন করিলে তিনিও বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনা তজবিজ হয় না।" স্বকীয়া-পরকীয়া মতের কলহ ছাড়িয়া দিলেও, এই দলিল হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বৈষ্ণবসমাজে গদ্য ভাষা প্রায় আধুনিক সাধুভাষার রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। আদালতী ভাষার বাহিরেও সামাজিক দলিল-চুক্তিপত্রের ভাষা দৃষ্টে মনে হয় যে, প্রাগাধুনিক যুগে বাংলা গদ্য রসসাহিত্যে ব্যবহৃত না হইলেও হিন্দুসমাজের নানা স্তরে ইহার বহুল ব্যবহার ছিল। তাহা না হইলে

৬। অর্থাৎ রাধামোহন ঠাকুরের নিকট।

৭। পূর্ণচ্ছেদ চিহ্নগুলি লেখক কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

উক্ত দলিলের ভাষা এত স্বচ্ছন্দচারী হইতে পারিত না। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলিবে তথাকথিত সহজিয়া গন্থ-নিবন্ধ ও বৈষ্ণব পরিব্রাজকদের তীর্থ-পরিক্রমাবিষয়ক ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে। মুসলমান-প্রভাবান্বিত সমাজ-জীবনের বাহিরে বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে বাংলা গদ্যের যে কলেবর গড়িয়া উঠিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালের সাধুভাষা হইতে তাহা বহু দূরবর্ত্তী ছিল না।

৪। চিঠিপত্র

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী যে সমস্ত চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার কিছু কিছু দীনেশচন্দ্র সেন-সঙ্কলিত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, শিবরতন মিত্রের Types of Early Bengali Prose এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন-সঙ্কলিত প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলনে মুদ্রিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত পত্রের সংখ্যা অতি অল্প। ইহার অধিকাংশই মামলা-মোকদ্দমা, আইন-আদালত ও রাজনৈতিক ঘটনার ঘনঘটাপূর্ণ বলিয়া এই পত্র-সাহিত্য হইতে যেমন বাংলা গদ্যের একটা ক্রমবিকাশের ভাষাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য আবিষ্কার করা যায় না, তেমনি মধ্যবিত্ত ও অভিজাত বাঙালীর নিতান্ত প্রয়োজনতাড়িত পত্রগুলির মধ্যে কয়েকটা স্থূল ঘটনাবৃত্তান্ত ব্যতীত বাঙালীর আধিমানসিক জীবনের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত যে পত্র পাওয়া গিয়াছে,[৮] তাহার ভাষা দুরূহ নহে, ইসলামী শব্দের সংখ্যাও অল্প। এক আসামী নৃপতি গৌহাটীর তদানীন্তন ফৌজদার নবাব আলেয়ার খাঁকে ১৬৩১ খ্রীঃ অব্দে এই পত্র লিখিয়াছিলেন :

> এখন তোমার উকিল পত্রসহিত আসিয়া আমার স্থানে পহুঁছিল। আমিও প্রীতি-প্রণয় পূর্ব্বক জ্ঞাত হইলাম।

এই ভাষায় সাধু ভাষার মূল কাঠামো বজায় আছে এবং বঙ্গের বাহিরেও "ভূটান, কুচবিহার, আসাম, মণিপুর ও কাছাড়ের নরপতিগণ এই ভাষায়ই পরস্পরের সহিত এবং ইংরাজ সরকারের সহিত পত্রালাপ করিতেন। বাঙ্গালাই যে তখন পূর্ব্বোত্তর ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল," [৯] তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

১৮শ শতাব্দীতে লিখিত বহু পত্র পাওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ইহার প্রায় অধিকাংশই রাজনৈতিক। কোন সামন্ত নৃপতি বা বৃহদ্ ভূস্বামীর সহিত মুসলমান ফৌজদার বা অন্য কোন রাজকর্মচারীর রাজনৈতিক প্রসঙ্গই এই পত্রগুলির মূল বক্তব্য ; ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের পত্রগুলিতে ইংরাজ-প্রসঙ্গ আসিয়া গিয়াছে। ১৭২৮ খ্রীঃ অব্দে শ্রীহট্টের ফৌজদার-লিখিত, "অল্প দিবস হয় আমি এথা আসিয়াছি, থানার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই দিগের থানা দৃঢ় করিয়া সেই দিগের থানাতে ফৌজ পাঠাইতেছি।" আসামের বড় ফুকন

৮। 'আসাম-বন্তি' (ঐতিহাসিক চিঠি)—.৯০১, ১লা আগষ্ট। (শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১২)।

৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন সঙ্কলিত প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন, পৃঃ ৮৪।

লিখিত, "তোমার পত্র সমাচার পহুঁছিল। তাহার শুনিয়া পরম প্রসন্ন হৈলাম।"[১০] এই পত্রগুলি বাংলার বাহিরে রচিত; ইহার উদ্দেশ্যও নিছক রাজনৈতিক। কিন্তু ভাষার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য আসিয়াছে, প্রয়োজনের চাপে ভাষার কাঠামো আদৌ বিকৃত হয় নাই, ইসলামী শব্দের প্রাচুর্য্যও সংযত হইয়াছে। কিন্তু এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে যে পত্রগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য যেন মুদ্রাদোষে পরিণত হইয়াছে। এই পত্রগুলির মধ্যে মহারাজ নন্দকুমারের কয়েকখানি চিঠির ভাষা ও বিষয়বস্তু কৌতূহলোদ্দীপক। নন্দকুমার শেষ জীবনে যে শোচনীয় রাজনৈতিক আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াছিলেন, এই দ্রুত লিখিত পত্রগুলির মধ্যেও তাহার উত্তাপ স্পর্শ করিয়াছে।

> অদ্য চারি রোজ এথা পৌছিয়াছি। ইহার মধ্যে একটি অন্ন যদি দেখিয়া থাকি সে অভক্ষ্য। মুখ প্রক্ষালনাদি কিছুই করিতে পারি নাই। নাসাগ্রে প্রাণ হইল। ফসীহৎ যত যত পাইলাম তাহা কত লিখিব।......এ সময় তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার তবেই যে হউক। নচেৎ আমার নাম লোপ হইল।[১১]

এই পত্রের মধ্যে ব্যক্তিগত আপৎপাতের বিষণ্ণ সম্ভাবনা ও তাহা হইতে মুক্তির জন্য ব্যাকুল আর্ত্তি ধ্বনিত হইয়াছে। ভাষার মধ্যেও তাই নিরাভরণ রিক্ততা রহিয়াছে। তৎকালীন রাজনৈতিক সংঘর্ষের ফলে নন্দকুমারকে বহুদিন হইতেই নানাবিধ আপদ্-বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, ইহাতে সেইরূপ কোন আসন্ন বিপদের উল্লেখ রহিয়াছে। ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে পুত্র গুরুদাসকে তিনি লিখিতেছেন:

> তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করণক অত্র কুশল। পরন্তু শ্রীযুত মিস্তর মেদনটিন সাহেব ৯ই পৌষ সোমবার দুই প্রহর দিবসকালে এথান হইতে রাহি হইয়াছেন। তাঁহার সহিত সকল কথোপকথন হইয়াছে তাহা কার্য্যদ্বারা বুঝিবে। তুমি কোন বিষয় অসন্তোষ করিবে না।[১২]

ইহার বক্তব্য রাজনৈতিক ভ্রূকুটিকুটিল ইঙ্গিতপূর্ণ; দুই চারিটি ইসলামী শব্দ আছে, ভাষার মধ্যে বিশেষ কোন পরিপাট্য বা নূতন বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। পত্রটি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বলিয়া ইহার মধ্যে আন্তরিকতার সুর বাজিয়াছে—যাহা সমকালীন অন্য কোন পত্রে প্রায় অনুপস্থিত।

রাজ্যশাসন, বিচার, অভিযোগ প্রভৃতি শাসন প্রয়োজন সম্পর্কীয় যে সমস্ত পত্র ভারত-সরকারের 'মহাফেজখানা'র ধূসর অন্ধকার ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে ইসলামী শব্দ ও আইন আদালতের এমন সমস্ত জটিল পারিভাষিক শব্দ রহিয়াছে যে, তাহার মধ্যে বাংলা গদ্যের বিকাশোন্মুখ রূপটি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। অধিকাংশ পত্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীকে লিখিত। এই পত্রগুলির সম্বোধন-পাঠ অতি জটিল এবং লিখনপদ্ধতি বাঁধা বুলিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। একটু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে:

১০। Types of Early Bengali Prose, Pp 113-114.

১১। Ibid, Pp 115-116.

১২। Ibid, P 117.

স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভুজবলে প্রতাপতাপিত সক্রসমূহ পূজিতাখিল রাযে,শ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীর খাস হুজুর শুলতানন ও ইঙ্গলিস্থান জব্দয়েন বুনিয়ান আজিমঃসান শীফাহছালার আফু আজ বাদশাহি ও কম্পানী কেসওরে হিন্দোস্থান গৌরনর জনরল চারলছ করণওলেছ বাহাদোর বিসম সমরাট বৈরীজন করীকুম্ভ বিদারণ কেশরীবর মহোগ্র প্রতাপেষু……।

প্রায় তাবৎ পত্রেই এই একই বাগ্‌ভঙ্গিমা অনুসৃত হইত। কুচবিহার হইতে ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ কর্নওয়ালিসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাষার বিকাশ যেন মধ্যপথে শুরু হইয়াছে। শুধু এক বিষয়ে বাঙালী অগ্রসর হইয়াছিল; এ সময়ে লিখিত সকল পত্রেই "৺কুম্পানীর ছায়া লইয়াছি," "কুম্পানী বাহাদুরের সরণাগত দস্তবস্তা হাজির আছি"[১৩] এই জাতীয় বিনয়োক্তি প্রায় প্রত্যেক পত্রেই পাওয়া যাইবে। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি বাঙালী ভূস্বামিগণের বিশ্বাস ও নির্ভরতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। কুচবিহারের কলহবিবাদে কর্ণওয়লিশকে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য কুচবিহারের রাজা এবং রাজমাতা কমতেশ্বরী দেবীর আর্তনাদপূর্ণ বহু পত্র কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছিল।[১৪] এমন কি, ক্যাপ্টেন ওয়ালেস সসৈন্যে আসাম পরিত্যাগ করিয়া আসার প্রাক্কালে আসামের বুড়া গোহাঞি, বড় গোহাঞি, বড় বড়ুয়া প্রভৃতি মন্ত্রীরা বড়লাট স্যার জন সোর্কে সকাতরে অনুনয় বিনয় করিয়া লিখিয়াছিলেন:

আমাদের সকলকে অনুগ্রহ করিয়া কাপ্তেন ওবালিচ সাহেবকে ফৌজ সমেত থাকিয়া শত্রুদমন করি দেশটা প্রতুল করিবার নিমিত্তে হুকুম দিবেন।[১৫]

ইত্যাকার পত্র দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বাংলা ও বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের সামন্তশাসিত প্রদেশে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাব কি ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছিল। কিন্তু সাধারণ বৃত্তিজীবী বাঙালী বণিকের সহিত ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিত্তলোলুপ কর্ম্মচারীদের যে প্রায়ই দ্বন্দ্ব কলহ হইত, তাহারও কয়েকটা প্রমাণ আছে। ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে শ্রীহরিমোহন ও জয়কৃষ্ণ শর্ম্মা লিখিতেছেন যে, তাঁহাদের ধোপা যখন তসরের কোরা কাপড় কাচিতেছিল, তখন—

মেঃ গোল সাহেবের তরফ পেয়াদা আসিয়া খামখা জবরদস্তী ও মারপিট করিয়া ঘাট হইতে ধোবা-লোককে ধরিয়া লইয়া গেল। আমার তরফ গোমস্তা ও পেয়াদা যাইয়া সাহেব মজকুরকে হাজির করিল। তাহা সাহেব গৌর না করিয়া আমার লোককে হাকাইয়া দিলেক এবং কহিলেক, 'পুনরায় তোমরা আইয়াছ। সাজাই দিব'।[১৬]

অত্যাচারের আরও বর্ণনা আছে:

মেঃ ওয়াল সাহেব জবরদস্তী করিয়া তাতিলোককে কাপড় বুনিতে দেয় না। মুচলেকা লইয়াছেন। সেওয়ায় ইঙ্গরেজ কোম্পানী আর কোন মহাজনের কাপড় বুনিতে পারিবে না। ইহাতে তাতিলোক

১৩। প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলন, পৃঃ ১০-১২।

১৪। এইরূপ বহু পত্র প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলনে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৫। এইরূপ বহু পত্র প্রাচীন বাঙ্গালা পত্রসঙ্কলনে মুদ্রিত হইয়াছে। পৃঃ ৮০-৮১।

১৬। বিরামচিহ্ন লেখক কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

আমারদিগের কাপড় বুনিতে নারাজ। যদি ছাপীয়া আমারদিগের কাপড় কেহ বোনে, তাহা ছেনাইয়া লন এবং মারপিট করেন। ইহাতে আমারদিগের কর্ম্ম বন্ধ হইয়াছে। জাহাতে কাজ চলে এমন তদারক করিতে হুকুম হয়।[১৭]

শ্রীহরিমোহন ওলন্দাজ কোম্পানীর নিকট দাদন লইয়া তসরের কাপড় সরবরাহ করিতেন; ঈর্ষাতুর ইষ্ট্‌ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বণিকের উপর কিরূপ অত্যাচার করিত, তাহার সামান্য পরিচয় এই পত্রগুলির মধ্যে লুকাইয়া আছে।

এই পত্রগুচ্ছের ভাষা-বিকাশ যে একটা ক্রমপরিণতির পথ ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা মনে হয় না, এবং ১৬শ শতকের কুচবিহাররাজের আসামরাজকে লিখিত পত্র বা ১৭শ শতকে গৌহাটীর ফৌজদারকে লিখিত কোন এক আসামরাজের পত্রের ভাষা যে ইহা অপেক্ষা অপরিণতগঠন ছিল, তাহা মনে করিবার হেতু নাই। বাস্তবিক ১৬শ হইতে ১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ পর্য্যন্ত যে সমস্ত পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ক্রমবিকাশের কোন স্তর-পরম্পরা লক্ষ্য করা যায় না, দুই চারিখানি পত্র ব্যতীত অন্য কোন পত্রে সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রা বিশেষ পরিস্ফুট হয় নাই। ১৮শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাঙালীর নিস্তরঙ্গ জীবনের শান্তিভঙ্গ হইয়াছিল; তাই এই শতকের সমাপ্তির মুখে যে সমস্ত চিঠি পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভাষাও যেমন পরিচ্ছন্ন, বক্তব্য বিষয়েও সেইরূপ নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হইয়াছে। ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে খিদিরপুরের কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ও জয়নারায়ণ ঘোষাল "মহামহিমমহিমাসমূহ শ্রীযুত রাইট হানবিল গয়রনর জানেরেল বাহাদুর সাহেবকে" যে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা অভিনব বলিতে হইবে। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন:

জাহারা কানাখোড়া আতুর অচল ও পুঙ্গ ব্যাধিগ্রস্থ অনাথা পিতামাতাহিন ও পতিপুত্রবিহিন শাক্ত রহিত। শ্রম করিয়া আত্মভরণপোষণ করিতে অযোগ্য। সর্ব্বদা সহরের রাস্থাতে ও গলিতে ও বৃক্ষতলাতে বাস করিয়া থাকে। যাহাদিগের মৃত্যু গাড়ি ও ঘোড়ার চাপটে ও অন্যান্য অসদ্গতিতে। তাহাদিগের মৃত্যু হইলে পরে সহরের মুরদাফরাস আসিয়া স্থানান্তর করিয়া ফেলিয়া দেয়।

ইহা দূর করিবার জন্য খিদিরপুরের স্বনামধন্য ঘোষালদ্বয় গভর্ণর জেনারেলের নিকট কয়েকটি গঠনমূলক প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পরিশেষে বলিয়াছিলেন, "ইহার ইঙ্গরেজিতে তরজমা কারণ উপযুক্ত আমরা নহি, এজন্য বাঙ্গালা লিখিয়া দিলাম।"[১৮] এই সামান্য এক-খানি পত্র হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৮শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া নবজাগৃতির যে প্রবল প্রাণবন্যা বাঙালীর রুদ্ধদ্বার কক্ষে আঘাত হানিয়াছিল, সমসাময়িক চিঠিপত্রে তাহার যৎসামান্য উল্লেখ দেখা যায়।

আলোচ্য চিঠিপত্রের গদ্য যে কোন মতেই সাহিত্যিক গদ্য নহে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু ইসলামী শব্দবাহুল্য ও সংস্কৃত বাঁধা বুলির বিকট পাঠ সত্ত্বেও বাংলা গদ্য ক্রমশঃ লঘুভার

১৭। প্রা, বা. পত্রসঙ্কলন, পৃঃ ৩।

১৮। প্রা, বা, পত্রসঙ্কলন, পৃঃ ২০১-২০৫।

হইয়া উঠিতেছিল। মুসলমানী শব্দ শুধু রাজকার্য্যসংক্রান্ত পত্রেই নহে, মহারাজ নন্দকুমারের ব্যক্তিগত পত্রেও তাহার অবাধ অধিকার ছিল। সে যুগে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীকেও "গোব্রাহ্মণপ্রতিপালক" বলিয়া সম্বোধন করা হইত, সমস্ত নৃপতিবর্গ পরস্পরের মধ্যে কলহ করিয়া ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সালিসী করিবার জন্য ডাকিয়া আনিত,[১৯] ইংরাজ কর্ম্মচারীরাও দেশীয় লোকের সহিত পত্রব্যবহারে বাংলা ভাষার সাহায্য লইতেন এবং পত্রের শিরোভাগে 'শ্রীকৃষ্ণ' লিখিয়া পত্র আরম্ভ করিতেন,[২০] ইত্যাদি নানা কৌতূহলোদ্দীপক ও তথ্যবহ ঘটনা আলোচ্য পত্রগুলির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। বৈয়াকরণ ও সাহিত্যিক মূল্য বাদ দিলেও এই দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রের মধ্যে বাঙালীর এক যুগের জীবনায়নের আভাস রহিয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

১৯। প্রা, বা, পত্রসঙ্কলন, পৃঃ ৮১।

২০। প্রা, বা, পত্রসঙ্কলন, পৃঃ ৮৫-৮৬।

তান্ত্রিক ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ

(পূর্বানুবৃত্তি)

প্রাগ্‌বৈদিক যুগে তন্ত্র

বৈদিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস পৃথিবীর অজ্ঞাত। সেই সময়ের কোন আলোচনা করিতে গেলেই কুমারিল ভট্টের একটি শ্লোক মনে পড়ে।

মহতাপি প্রযত্নেন তমিস্রায়াং পরামৃশন্।
কৃষ্ণশুক্ল বিবেকং হি ন কশ্চিদধিগচ্ছতি।

মহৎ প্রযত্নেও অন্ধকারের মধ্যে হস্তস্পর্শ দ্বারা কৃষ্ণ শুক্ল প্রভৃতি বর্ণের উপলব্ধি করা যায় না। তথাপি পুরাতত্ত্ব আলোচনায় কিছুটা না বলিয়া উপায় নাই। এখনকার সমস্ত আলোচনাই অনেকটা অনুমানমূলক হইবে। সুধীগণ প্রকৃত সত্য নিরূপণে সচেষ্ট হইবেন।

(১) তন্ত্রমতে শিবই পরমেশ্বর। এবং তদায় শক্তিই মহাবিদ্যারূপে পূজিতা হইতেছেন। এই শক্তি সহযোগেই সদাশিব জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন॥ আনন্দ লহরীতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বলিয়াছেন—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।

এই শিবকে সকলেই লিঙ্গরূপে পূজা করেন। শিবলিঙ্গের নিম্নভাগ যোনির আকার ও উপরিভাগ লিঙ্গাকার। কাজেই ইহা পিতা মাতার প্রতীক। মানবের অর্দ্ধসভ্যতা যুগে পিতামাতাকেই ভগবান্‌রূপে পূজা করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মনীষী বার্থ তদীয় রিলিজিওন অব ইণ্ডিয়া গ্রন্থের ১৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—"পিতৃপূজা মানবীয় সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ।" চীনদেশীয় ঋষি কনফিউসিয়াস খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীন দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার "সূ" ও "সিংকিং" নামক গ্রন্থদ্বয় পাঠে জানা যায়—৭৭৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে যে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, তাহারও সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশে পিতৃপূজা প্রচলিত ছিল। চীন ও জাপানের "সিন্তো" ধর্ম্ম পিতৃপূজারই নামান্তরবিশেষ। বৈদিক শ্রাদ্ধকাণ্ডও সমস্তই পিতৃপূজাবিশেষ। অথর্ব্ববেদে (১৮।২।৪৮) লিখিত আছে, "পিতৃগণ ত্রিস্বর্গের সর্ব্বোচ্চ স্থানে বাস করিতেছেন।" যদিও এখানে পিতৃগণ শব্দে অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণই অভিপ্রেত; তথাপি প্রাগ্‌বৈদিক যুগের মৃত পিতামাতাই বৈদিক যুগে অগ্নিষ্বাত্তাদি নাম গ্রহণ করিয়াছেন মনে হয়। পারসিক, গ্রীক ও রোমানদের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রেও পিতৃপূজার উল্লেখ আছে।

এই পিতৃপূজায় হাতে খড়ি প্রাপ্ত হইয়া আদিম মনুষ্যসমাজ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পক্ষে

অপরিহার্য্য অমিতশক্তিসম্পন্ন অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু ও জল প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জড় প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃদেবগণকে পূজা করিতে অভ্যস্ত হয়। এবং ক্রমশঃ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বে নিষ্ঠা লাভ করে। অদ্বৈততত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব। ইহা স্থূল দ্বৈততত্ত্ব (তন্ত্রাদিবাদ) উপলব্ধির পরে প্রবর্ত্তিত হওয়াই সম্ভব, পূর্ব্বে নহে।

(২) তন্ত্রের সর্ব্বত্রই ভূতশুদ্ধ্যাদি সমস্ত কার্য্যে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে। পরশুরামকল্পসূত্রে এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের পূর্ব্বে আরও ১ শিব, ২ শক্তি, ৩ সদাশিব, ৪ ঈশ্বর, ৫ বিদ্যা, ৬ মায়া, ৭ অবিদ্যা, ৮ কলা, ৯ রাগ, ১০ কাল ও ১১ নিয়তি, এই এগারটি তত্ত্ব অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। চতুঃষষ্টি তন্ত্র প্রভৃতি পরবর্ত্তী তান্ত্রিক ব্যাখ্যা, গ্রন্থে এই অতিরিক্ত এগারটি তত্ত্বের উল্লেখ না থাকায় অনুমান হয়—প্রথমে ৩৬টি তত্ত্বই উদ্ভাবিত হইয়াছিল, পরে সাংখ্যশাস্ত্রকার কপিলের মত প্রচারিত হইলে অতিরিক্ত এগার তত্ত্বের পঞ্চবিংশতিশতত্ত্বেই অন্তর্ভাব হইতেছে দেখিয়া তান্ত্রিকরা তাহা পরিত্যাগ করেন।

যোগদর্শনও সাংখ্যেরই তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ত্রয়ী বেদে কোথাও অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ব ভিন্ন এই সকল তত্ত্বের নাম নাই। এই জন্যই কুমারিল ভট্ট তন্ত্রবার্ত্তিকে তন্ত্র, সাংখ্যযোগ প্রভৃতি শাস্ত্রকে অবৈদিক বলিয়াছেন।[১]

তন্ত্রমতে উপাসনার বেলায় নির্গুণ নিরাকার অদ্বৈতবাদের স্থান নাই। উপাস্য উপাসকের অভেদবুদ্ধি জাত হইলে কে কাহার উপাসনা করিবে? নিজেই ত তখন ঈশ্বর-রূপে প্রতিভাত। নির্গুণের নিকট প্রার্থনাবাক্য বলারও কোন সার্থকতা নাই। যাঁহার প্রার্থনা পূরণের ক্ষমতা আছে, তিনি আর নির্গুণ হইবেন কিরূপে? তদ্রূপ নিরাকারেরও উপাসনা চলিতে পারে না। উপাসনা মানসিক ব্যাপারবিশেষ। উপাস্যকে মনের গোচরীভূত না করিলে উপাসনা অসম্ভব। কাজেই নিরাকার উপাস্যের অন্ততঃ মনে মনেও ও একটি রূপ দিতে হইবে।

আণবিক বোমা আমরা কেহই দেখি নাই, তাহার আকৃতি সম্বন্ধেও কোন জ্ঞান নাই। তথাপি তাহার বিষয় কিছু বলিলেই তদীয় একটা আকৃতি (ডিম্বাকার বা মুষলাকার, যেরূপই

১। যান্যেতানি ত্রয়ীবিদ্ভির্ন পরিগৃহীতানি, কিঞ্চিৎ তন্মিশ্রধর্ম্মকঞ্চুকচ্ছায়াপতিতানি, লোকোপসংগ্রহলাভ-পূজাখ্যাতিপ্রয়োজনপরাণি, ত্রয়ীবিপরীতাসম্বদ্ধদৃষ্টলোভাদিপ্রত্যক্ষানুমানোপমার্থাপত্তিপ্রায়যুক্তিমূলোপনিবদ্ধানি, সাংখ্য-যোগ-পাঞ্চরাত্র-পাশুপতশাক্য-নিগ্রন্থপরিগৃহীতধর্ম্মাধর্ম্মনিবন্ধনানি, বিষচিকিৎসা-বশীকরণোচ্চাটনোন্মাদনাদিসমর্থ-কতিপয়মন্ত্রৌষধি কাদাচিৎক-সিদ্ধিনিদর্শনবলেন অহিংসাসত্যবচন-দম-দান-দয়াদিশ্রুতি-স্মৃতিসংবাদিস্তোকার্থগন্ধবাসিত জীবিকার্থান্তরোপদেশীনি, যানি চ বাহ্যতরাণি ম্লেচ্ছাচারমিশ্রকভোজনাচরণনিবন্ধনানিতেষামেবৈতৎ শ্রুতিবিরোধ-হেতুদর্শনাভ্যামনপেক্ষণীয়ত্বং প্রতিপাদ্যতে।—তন্ত্রবার্ত্তিক, ১১৪ পৃষ্ঠা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা অপ্রমাণ। সাংখ্য যোগ পাঞ্চরাত্র পাশুপত বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি শাস্ত্র লোকগণের চিত্তাকর্ষক, লাভ পূজা ও খ্যাতিমূলক। এবং ভ্রমোৎপাদনের জন্য আংশিক বৈদিক মিশ্র ধর্ম্মের আবরণে আচ্ছাদিত হইলেও ইহারা বেদবিরুদ্ধ বলিয়া অপ্রমাণ।

হউক) মনের মধ্যে উদিত হইবে। মনের অগোচর কোনও বস্তুরই ব্যবহার চলিতে পারে না। মনও এমনই জিনিষ, তাহার অগোচর কোনও বস্তুই ব্রহ্মাণ্ডে নাই। সে তাহার খেয়ালমতে প্রত্যেক অজ্ঞাত বস্তুরও এক একটি স্বরূপ কল্পনা করিয়া লয়। হিন্দুর দেবতা-বাদও ঈশ্বরের আকৃতিবিষয়ক এই মানসিক ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য এই ঐশ্বরিক আকারের ব্যবহারিক সত্তামাত্রই স্বীকার্য্য, পারমার্থিক সত্তা নহে। পারমার্থিক সত্তায়ই ব্রহ্মের "অবাঙ্‌মনসগোচরঃ" শ্রুতি সার্থক হয়। এই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

অর্থাৎ চিন্ময় অদ্বিতীয় নিরংশ নিরাকার ব্রহ্মের রূপকল্পনা উপাসনার জন্যই হইয়া থাকে।

এই জন্যই পৌত্তলিকতাবিরোধী মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরানেও ঈশ্বরের সাকারত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে দেখা যায়। যথা—মূসা ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে ঈশ্বর তাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময় তেজ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন।—সুরা বকরা ৫৫ ও সুরা এরাফ ১৪২। এবং অন্যত্র ঈশ্বরকে সিংহাসনোপবিষ্টরূপেও বর্ণনা করিয়াছেন।—সুরা ইয়ুনস ৪ দ্রষ্টব্য।

এই প্রবন্ধ উক্ত বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য নহে। মোট কথা, উপাসনা মাত্রই সগুণ ও সাকার ব্রহ্মেরই হইয়া থাকে। যাঁহারা নিরাকারের উপাসক বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও কার্য্যতঃ সাকারেরই উপাসনা করিতেছেন। এই জন্য বেদান্তসার বলিয়াছেন—

উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপাররূপাণি॥

ইহাতে আমি কাহারও ধর্ম্মমতে অশ্রদ্ধা বা কটাক্ষ করিতেছি, এইরূপ ভুল ধারণা যেন কেহই না করেন।

বাস্তবিক নির্গুণ নিরাকার অদ্বৈততত্ত্বের উপলব্ধির দ্বারা মুক্তিলাভই উপাসনার চরম লক্ষ্য। অতিবড় মনীষীর পক্ষেও এক ধাপে তাদৃশ অদ্বৈততত্ত্বের সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় না। লক্ষ্য একটি বস্তুতে চিত্ত স্থির করিয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের শক্তি সঞ্চয় করিতে হয়। এই কারণেই উৎকট অদ্বৈতবাদী স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যও তাদৃশ শক্তিলাভের জন্য উপাসনার বেলায় দ্বৈতবাদী ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। তদীয় ব্রহ্মসূত্রভাষ্য (১।১।১১ ও ২।১।১৪) এবং প্রপঞ্চসার তন্ত্র ও আনন্দলহরী প্রভৃতি গ্রন্থই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। শঙ্করবিলাস গ্রন্থেও দেখা যায়, তিনি তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে তারার পূজা করিয়া নিরাকারবাদ প্রচারের জন্য সাকারবাদ শ্রুতিকে উপেক্ষা করায় দেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।

সাকারশ্রুতিমুল্লঙ্ঘ্য নিরাকারপ্রবাদতঃ।
যদঘং মে কৃতং দেবি তদ্দোষং ক্ষন্তুমর্হতি॥

শুনিয়াছি, শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত মঠগুলিতে এখন পর্য্যন্ত তান্ত্রিক পদ্ধতিতেই উপাসনা ও তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইয়া থাকে।

বেদে যে নির্গুণ নিরাকার অদ্বৈতবাদ ঘোষিত হইয়াছে, তাহাও এই দ্বৈতবাদ প্রচারের

পরেই হওয়া স্বাভাবিক। মানবসভ্যতার প্রথম স্তরে মানব যখন অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি জড় বস্তুর অপরিমিত শক্তিদর্শনে তত্তদধিষ্ঠাতৃ কোনও শক্তিমানের কল্পনা করিয়া, তাঁহাদিগকে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন মানবের পক্ষে তাঁহাদিগকে নির্গুণ অদ্বৈত ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করা যুক্তিসিদ্ধও হয় না। এই জন্যই সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত দ্বৈতবাদপ্রচারক কপিল মুনিকে বেদে ও গীতায় আদিবিদ্বান্ সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।[২] ইহার দ্বারাও অনুমান করিতে চাই, প্রাগ্‌বৈদিক যুগেই কপিলমতকে অবলম্বন করিয়া তন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয় ও বৈদিক যুগে অথর্ব্ববেদের দ্বারা তাহার সুরম্য সুদৃঢ় প্রাচীর গঠিত হইয়াছিল।

(৩) বেদ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিতে যাহাদিগকে অনার্য্য, অসুর, রাক্ষস, দানব প্রভৃতি ঘৃণ্য সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহাদিগের অনেকের মধ্যেই উগ্র তপস্যা ও মায়াবিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়। হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দানবগণ ও রাবণাদি রাক্ষসগণ উগ্র তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মা প্রভৃতির নিকট হইতে অভীষ্ট বর লাভ করিয়া ত্রিভুবনে অপরাজেয় হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদিগেরও একটি ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল দেখা যায়। এই ধর্ম্ম নিশ্চয়ই বৈদিক নহে। তাহা হইলে তাঁহারা বেদবিরোধী বলিয়া কুখ্যাত হইতেন না। এবং মায়াবিদ্যাও তাঁহাদের অধিগত ছিল। ঋগ্বেদে আছে—হে ইন্দ্র! তুমি নমী ঋষির সাহায্যে দূরদেশে নমুচি নামক মায়াবীকে বধ করিয়াছিলে। ১।৫৩।৭। হে বীর লোকপতি অগ্নি! আমার নূতন স্তোত্র শ্রবণ করিয়া মায়াবী রাক্ষসগণকে তাপপ্রদ তেজ দ্বারা দগ্ধ কর। ৮।২৩।২৪।

এইরূপ পুরাণে ও রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থেও রাবণ ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি রাক্ষসগণের মায়াবলে অদৃশ্য হওয়া, বিভিন্ন রূপ ধারণ করা প্রভৃতি অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ এই মায়াবিদ্যা বৈদিক বলিয়া প্রমাণ নাই। তাহা হইলে অনার্য্য রাক্ষসাদির ইহা একচেটিয়া হইত না। বৈদিক ঋষিগণের ইহা জানা থাকিলে আর্য্যসমাজে তাহা নিশ্চয়ই প্রকাশ করিতেন। যদিও বৈদিক ঋষিগণ যোগবিদ্যাপ্রভাবে সময় সময় অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন; শুনা যায়, তথাপি মায়াবিদ্যা এই যোগবিদ্যা হইতে পৃথক্ ছিল সন্দেহ নাই। নতুবা অতি হীন স্তরের অশিক্ষিত অনার্য্যদের মধ্যে তাহার প্রভাব দেখা যাইত না। লুপ্তপ্রায় এই বিদ্যার সামান্য অংশও এখন পর্য্যন্ত তথাকথিত পার্ব্বত্য অনার্য্য জাতির মধ্যেই সংরক্ষিত আছে। জনপ্রবাদে জানা যায়, ইংরেজরা এই দেশে আসিয়া আসামে অনেক মায়াবীর সন্ধান পান। তখন তাঁহারা প্রমাদ আশঙ্কায় মায়াবিগণকে পুরস্কারের প্রলোভনে জড় করিয়া অতর্কিত আক্রমণে তাহাদিগকে হত্যা করেন। এখনও আসামে এই বিদ্যার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের রোষদৃষ্টি হেতু মায়াবিগণ অতি গোপনে তাঁহাদের বিদ্যাকে রক্ষা করিতেছেন। কাজেই এই বিদ্যা মানবীয় অর্দ্ধসভ্যতার যুগেই প্রকাশিত হইয়া তথাকথিত অনার্য্যদিগের মধ্যেই অনেকাংশে সীমাবদ্ধ ছিল।

২। ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।—ঋগ্বেদ।
সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।—গীতা।

মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন, বশীকরণ প্রভৃতির সহিত এই মায়াবিদ্যাকে ত্রয়ী ঋষিগণ সমাজের অনিষ্টকারক ও মুক্তির পরিপন্থী বলিয়া শ্রদ্ধা সহকারে দেখিতেন না। তন্ত্র-বার্ত্তিকে কুমারিল ভট্ট এই কথা পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কিন্তু অথর্ব্ব-বেদীয়গণ সমাজরক্ষার পক্ষে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে তাহাদের ও প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া এইগুলির প্রয়োগ কিছু কিছু বৈদিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করিয়াছেন।

দেখা যায়, শান্তি স্বস্ত্যয়ন মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি লৌকিক প্রতিপত্তিজনক যাবতীয় কার্য্যই প্রায় অথর্ব্ববেদীয় ও তান্ত্রিকের মৌরসী স্বত্ব। পুরাণে দেখিতে পাই, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবেই দৈত্যগণ অপরাজেয়তা লাভ করিয়াছে উপলব্ধি করিয়া, সেই বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য দেবগুরু বৃহস্পতি স্বীয় পুত্র কচকে শুক্রের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে প্রেরণ করেন। এবং মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মে (২৮৯ অঃ) দেখা যায়, তিনি অতিশয় মায়াবিৎ ছিলেন। এই শুক্রাচার্য্য যে তান্ত্রিক ছিলেন, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

রামায়ণের বালকাণ্ডে দেখিতে পাই, মহারাজ দশরথের পুত্রেষ্টি যাগ অথর্ব্ববেদের বিধান মতে সম্পন্ন হইয়াছিল। এবং মহারাজ দিলীপ সন্তানহীনতার প্রতীকারের জন্য অথর্ব্ববেদীয় বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু ত্রয়ী বেদে মায়াবিৎ ও মারণাদি ষট্‌কর্ম্মবিৎ এই শুক্রাচার্য্য বা বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের দৃষ্ট মন্ত্রে তাদৃশ অভিচারাদি বিদ্যার পরিচয় না পাওয়ায় এই সকল বিদ্যা তাঁহাদের পূর্ব্বাচার্য্য পরম্পরা প্রাপ্ত বলিতে হইবে।

(৪) তান্ত্রিক বীজমন্ত্র সবগুলিই অনুস্বার চন্দ্রবিন্দুসংযুক্ত। কোন কোন মন্ত্রে বা "হিলি হিলি কিলি কিলি" ইত্যাদি অবোধ্য শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। কোনও ভাষায়ই তাহার এখন কোন অর্থবোধ হয় না। অথচ অর্থ ছাড়া মন্ত্রের শক্তিই হইতে পারে না। অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির ভাষায় প্রায় শব্দেই অনুস্বার চন্দ্রবিন্দুর ছড়াছড়ি। হিলি হিলি ইত্যাদি শব্দও পার্ব্বত্য ভাষার মতই মনে হয়। এখন পর্য্যন্তও চীনা ভাষায় অনুস্বার চন্দ্রবিন্দুর অত্যধিক প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। এই চীনদেশই পূর্ব্বে তান্ত্রিক সাধনার লীলা-ভূমি বলিয়া বহু তন্ত্রেই উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মযামলে ১—২ পটলে দেখা যায়, বশিষ্ঠ চীনাচার অবলম্বন করিয়া তারা দেবীর উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারাও অনুমিত হয়, প্রাগ্‌বৈদিক যুগে মানবীয় ভাষা বিকাশের প্রথম অবস্থায় তন্ত্রের লীলাক্ষেত্র চীনদেশে বীজমন্ত্রের ন্যায় অনুস্বার চন্দ্রবিন্দুসংযুক্ত শব্দও ব্যবহৃত হইত। এবং তৎকালোচিত তাদৃশ ভাষায়ই বীজমন্ত্রাদি রচিত হইয়াছিল।

(৫) তান্ত্রিক যন্ত্রগুলি দেবতার প্রতীক। যন্ত্র অঙ্কিত করিলে পূজায় আর মূর্ত্তির আবশ্যক হয় না।[৩] এই হিসাবে যন্ত্রগুলিকে চিত্রলিপি বলা যাইতে পারে। বর্ণলিপি

৩। মহাযন্ত্রন্তু দেবেশি যদি কুর্য্যাচ্চ সাধকঃ।
তত্র মূর্ত্তিং ন কুর্ব্বীত কদাচিদপি মোহিতঃ।
যদি মূর্ত্তিং প্রকুর্য্যাত্তু তত্র যন্ত্রং ন কারয়েৎ।—মাতৃকাভেদতন্ত্রে ১২ পটল।

আবিষ্কারের পূর্ব্বে যে চিত্রের দ্বারা ভাব প্রকাশ করা হইত, তাহাকেই চিত্রলিপি বলা হয়। আধুনিক চীনা লিপিও চিত্রলিপির উন্নত সংস্করণ বটে। এই চিত্রলিপির যুগেই যন্ত্রের দ্বারা দেবতা অভিহিত হইতে আরব্ধ হইয়াছিলেন বলা যাইতে পারে।

(৬) ভারতে বৈদিক সভ্যতা প্রসারের পূর্ব্বে সিন্ধু প্রদেশের মোহেন-জো-দাড়োতে একটি উন্নত সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন। সম্প্রতি সেই স্থানে আবিষ্কৃত পোড়া মাটির মাতৃকামূর্ত্তি ও যোগাসনে উপবিষ্ট পুরুষমূর্ত্তির নিদর্শন হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, সেই যুগে জগন্মাতা দুর্গা (?) ও জগৎপিতা শিব (?) উভয়েরই পূজা হইত। (ডাঃ কালিদাস নাগের "স্বদেশ ও সভ্যতা" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। ইহার দ্বারাও বৈদিক সভ্যতার পূর্ব্বে তন্ত্রের অভ্যুদয় অনুমান করিতে পারি।

তান্ত্রিক সাধক সম্প্রদায়

বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন তান্ত্রিক সাধকগণের পরিচয় পরিলক্ষিত হওয়ায় এই ধর্ম্মের একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই প্রবাহের উৎস হিসাবে প্রাগ্‌বৈদিক যুগকেই স্বীকার করিতে হয়। বৈদিক যুগের বশিষ্ঠ শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি, পৌরাণিক যুগে পরশুরাম, রামচন্দ্র, রাবণ, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি, ঐতিহাসিক যুগে শঙ্করাচার্য্য, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, সর্ব্বানন্দ, ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রভৃতি ও বর্ত্তমান যুগে উক্ত সাধকগণের বংশধর ও তদীয় শিষ্যসম্প্রদায় প্রভৃতিকে তান্ত্রিক সাধকসম্প্রদায়রূপে অভিহিত করা যাইতে পারে। যথা—

(১) বশিষ্ঠ—ঋগ্বেদে দেখিতে পাই, গুরুদেব বশিষ্ঠের কৃপায় তদীয় শিষ্য সুদাস রাজা, বিশ্বামিত্রশিষ্য ভারতবংশীয় দশ জন রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই কার্য্যকেই লক্ষ্য করিয়া ৭।১৮।১৭ মন্ত্রে বলিয়াছেন—ইন্দ্র তখন ক্ষুদ্র সুদাসের দ্বারা এক মহৎ কার্য্য করাইয়াছিলেন। প্রবল সিংহকে ছাগ দ্বারা নিহত করাইয়াছিলেন। এই বৈদিক যুগের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতাসম্পন্ন বশিষ্ঠ ও বিশ্বমিত্রকেই আমরা তন্ত্র পুরাণাদিতে তান্ত্রিক সাধনায় অলৌকিক শক্তি সঞ্চয় করিতে দেখিতেছি।

রুদ্রযামলের ১৭ পটলে ও ব্রহ্মযামলের ১-২ পটলে দেখা যায়—ব্রহ্মার মানস পুত্র বশিষ্ঠ চীনাচার অবলম্বনে তারা দেবীর উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এই বশিষ্ঠকে মহাকবি কালিদাস অথর্ব্ববেদীয়রূপে অভিহিত করিয়া আমাদের উক্তিরই সমর্থন করিতেছেন।[৪]

(২) শুক্রাচার্য্য—বৃহন্নীলতন্ত্রে দেখা যায়—শুক্রাচার্য্য পঞ্চমকারের দ্বারা উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পুরাণেও বলিয়াছেন, তিনি দৈত্যগুরু ও মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যাবিদ্‌।

৪। অথাথর্ব্বনিধেস্তস্য বিজিতারিপুরঃ পুরঃ।
অর্ঘ্যামর্ঘপতির্বাচমাদদে বদতাং বরঃ।—রঘু, ১ম সর্গ।

অসুরগণ তদীয় শিষ্য কচকে ভস্মচূর্ণ করিয়া সুরার সঙ্গে মিশাইয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়াছিল। পরে শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন।—মহাভারত, আদি পর্ব্ব, ১৭৬। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ও তদীয় তান্ত্রিকতা প্রকাশ পায়। ইনিই বৈদিক ঋষি উশনাঃ। উশনাঃ, ভার্গবঃ, কবিঃ, ইত্যাদি শুক্রেরই নামান্তর। যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও তাঁহাকে অসুরপক্ষীয় লোক বলিয়াছেন। যথা—"অগ্নির্দেবানাং দূত আসীৎ উশনা কাব্যোঽসুরাণাম্।"

(৩) পরশুরাম—কল্পসূত্র গ্রন্থই পরশুরামের তান্ত্রিকতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই সূত্রকারইযে বিষ্ণুর অবতার জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, তাহা কল্পসূত্রের সমাপ্তিসূচক বাক্যেও প্রকাশ পাইতেছে। যথা—"ইতি শ্রীদুষ্টক্ষত্রিয়কুলকালান্তক রেণুকাগর্ভসম্ভূত মহাদেবপ্রধনশিষ্য জামদগ্ন্য পরশুরাম ভার্গব মহোপাধ্যায় মহাকুলাচার্য্যনিম্মিতং কল্পসূত্রং সম্পূর্ণম্।" এই জন্যই পূর্ণানন্দ প্রভৃতি সিদ্ধ তান্ত্রিক নিবন্ধকারগণ "তথাচ কুলমূলাবতারকল্পসূত্রে" এইরূপ নামোল্লেখ করিয়া অনেক স্থানে পরশুরামকল্পসূত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কুল-শাস্ত্রই মূল যাহার এবং অবতারবিরচিত, এই অর্থেই কল্পসূত্রের কুলমূলাবতার বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

(৪) রামচন্দ্র—আচার চিন্তামণি তন্ত্রে দেখা যায়—রাবণ রামচন্দ্রকে ভৈরবী চক্রে আহ্বান করিয়াছিলেন। তন্ত্রের বিধান অনুসারে পরম শত্রুরও এই নিমন্ত্রণ রামচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভৈরবীচক্র একটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান। ইহাতে তান্ত্রিক সাধকগণই কেবল যোগদান করিতে পারেন। এই চক্রে উপবিষ্ট হইতে হইলে তখন সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন ও শত্রু মিত্র জ্ঞানরহিত হইতে হয়। পুরাণাদি হইতেও রাবণাদি রাক্ষসগণের বেদবিরোধী একটি ধর্ম্মাচরণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তন্ত্রের এই সকল প্রমাণ দ্বারা রাবণ ও রামচন্দ্রকে তান্ত্রিক সাধক বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত প্রমাণানুসারে বশিষ্ঠকে তান্ত্রিক স্বীকার করিলে তদীয় কুলশিষ্য রামচন্দ্রাদিকেও তান্ত্রিকই বলিতে হইবে।

(৫) দত্তাত্রেয়—মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখা যায়, মহর্ষি দত্তাত্রেয়কে স্ত্রীর সহিত সুরাপানে আসক্ত ও গীত-বাদ্যাদি স্ত্রীসংসর্গদূষিত দেখিয়া দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।[৫] স্ত্রীলোকের সহিত একত্রে সুরাপানরত সাধককে অবশ্যই তান্ত্রিক বলিতে হইবে। বিশেষতঃ দত্তাত্রেয়সংহিতা নামে একখানা তন্ত্র ও একখানা তান্ত্রিক যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থও তদীয় তান্ত্রিকতা প্রমাণ করিতেছে।

(৬) শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই প্রমাণ দিয়াছি। পূর্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সর্ব্বানন্দ প্রভৃতির

৫। ইত্যুক্তাস্তে তদা জগ্মুর্দত্তাত্রেয়াশ্রমং সুরাঃ।
দদৃশুশ্চ মহাত্মানং তং তে লক্ষ্ম্যা সমন্বিতম্।
... ...
সুরাপানরতং তেন সভার্য্যং তত্যজুস্ততঃ।
গীতবাদ্যাদিবনিতাভোগসংসর্গ দূষিতম্।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

সুপ্রসিদ্ধ শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, সর্ব্বোল্লাস তন্ত্র প্রভৃতি তান্ত্রিক নিবন্ধগ্রন্থ এবং তদীয় বংশপরম্পরায় তান্ত্রিক সাধকধারা দ্বারাই তাঁহাদের তান্ত্রিকতা সর্ব্বজনসম্মত।

অথর্ব্ববেদ

পূর্ব্বে আমি তন্ত্রশাস্ত্রকে অথর্ব্ববেদমূলক বলিয়া প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছি। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বেবর প্রভৃতি মনীষিগণ অথর্ব্ববেদের আধুনিকতা প্রতিপাদনের জন্য বলিয়া থাকেন—ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তের "তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে ঋক্, যজুঃ, সামেরই উল্লেখ আছে অথর্ব্ববেদের নাম নাই। এবং বৃহদারণ্যকে (১।৫।৫), ছান্দোগ্যে (৩।১ ও ৭।১), ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৫।৩২), শতপথ ব্রাহ্মণে (৪।৬।৭। ১৩), বশিষ্ঠসূত্রে (১৩।৩) ও বৌধায়ন সূত্রে (৪।৫।২৯), এইরূপ অসংখ্য স্থানে ত্রয়ীশব্দের অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ ও সামবেদেরই উল্লেখ থাকায় নিশ্চয়ই তৎকালে অথর্ব্ববেদ ছিল না বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ইহা পৌরাণিক যুগেই রচিত হইয়াছে। ইত্যাদি। এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে তন্ত্রের মূল ভিত্তিরই আধুনিকতা হেতু তাহার সুপ্রাচীনতা চিরতরেই বিধ্বস্ত হয়। অতএব সংক্ষেপে ইহা নিরস্ত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

পাণিনি তদীয় অষ্টাধ্যায়ীতে (৪।৩) অথর্ব্ববেদীয় শৌনক শাখা ও কৌশিক সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যাস্ক (খৃষ্টপূর্ব্ব ৯০০) তদীয় নিরুক্ত গ্রন্থে নৈঘণ্টুক কাণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে আঙ্গিরস ও আথর্ব্বণিক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। দেবরাজ যজ্বা তদীয় টীকায় অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা ঋষিকে অথর্ব্ববেদের দ্রষ্টা বলিয়াছেন। কাজেই ইঁহাদেরও পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদ ছিল। এবং গোপথব্রাহ্মণে (৩।২) দেখা যায়—প্রজাপতি যজ্ঞ বিস্তার করেন। তিনি ঋগ্বেদের দ্বারা হৌত্র, যজুর্ব্বেদের দ্বারা আধ্বর্য্যব, সামবেদের দ্বারা ঔদ্গাত্র ও অথর্ব্ববেদের দ্বারা ব্রহ্মত্ব নিষ্পন্ন করেন। শতপথব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ডে (১৪।৫) আছে—পরমাত্মা আকাশ হইতেও বৃহৎ। তাঁহা হইতেই ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদ নিঃশ্বাসের ন্যায় নিঃসৃত হইয়াছে। এই সমূহ শ্রুতিবাক্য দ্বারা বৈদিক যুগেও অথর্ব্ববেদ পাওয়া যাইতেছে। অধিক কি, এই অথর্ব্ববেদ প্রাগ্‌বৈদিক যুগেই দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

প্রাগ্‌বৈদিক অথর্ব্ববেদ

প্রাগ্‌বৈদিক যুগে প্রাচীন আর্য্যাবাস হইতে আর্য্যগণের বিভিন্ন স্থানে গমনসময়ে ইরাণীয় আর্য্যগণ এই অথর্ব্ববেদ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ডাঃ মার্টিন হৌগ তদীয় Essays on the Parsis গ্রন্থে এই বিষয় যথেষ্ট প্রমাণ দেখাইয়াছেন। এবং পারসিক ধর্ম্মগ্রন্থ আভেস্তায় যস্ত গ্রন্থে (৪৩।১৫) আথ ব শব্দের উল্লেখ আছে। আথ্‌বই অথর্ব্ববেদ। উক্ত আভেস্তায় ঋষি জরথুস্ত্রকে অথর্ব্ববেদীয় বলিয়াছেন। যথা—

উস্তানো জাতো স্পিথামো জরথুস্ত্র যো অথর্ব্বা।
ফ্রবর দিন যস্ত ৯১।১২

আভেস্তায় বহু বৈদিক দেবতাদির নাম এইরূপ সামান্য বিকৃত আকারে পরিদৃষ্ট হয়। যথা—বেদে অথর্ব্বন্ অর্য্যমন্ বায়ু সোম যম॥ আভেস্তায়—আথ্ৰবন্ ঐর্য্যমন্ বায়ু হোম যিম॥ ইহার দ্বারা বেদের সহিত আভেস্তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝা যাইতেছে। অথচ প্রাগ্ বৈদিক যুগে বৈদিকদিগের সহিত তাহারা বিচ্ছিন্ন হইলে অন্য বেদের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক থাকিতে পারে না। কিন্তু অথর্ব্বা প্রভৃতি শব্দ দ্বারা এবং আভেস্তা ও বেদের ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য দর্শনে তাহাকে অথর্ব্ববেদেরই অনুজ বা তনুজ বলা যাইতে পারে। ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া খ্যাত গ্রীক পণ্ডিত জানথোস ৪৭০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাহা হইতেও জানা যায় এই আভেস্তায় উক্ত জরথুস্ত্র ঋষি ২৪০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। এখন দেখুন অথর্ব্ববেদ কত প্রাচীন। তবে যে পূর্ব্বোক্ত স্থলগুলিতে কেবল ত্রয়ীরই উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার কারণ মনে হয়—অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে বেদত্রয়কে অবলম্বন করিয়াই বৈদিক সভ্যতা গঠিত হয়। তখন প্রাচীন দ্বৈতবাদমূলক অনার্য্য সভ্যতাকে হেয় প্রতিপাদন করার জন্যই তৎপ্রকাশক অথর্ব্ববেদকে কেহ কেহ উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছেন। ইহার ফলে অথর্ব্ববেদের বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ একটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হইয়া তন্ত্র নামে খ্যাত হইয়াছে। এই জন্যই এখন অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

অথবা প্রাগ্ বৈদিকযুগে অর্দ্ধসভ্যতাবস্থায় মানবগণ স্বভাবতঃ হিংস্রভাবাপন্ন বলিয়া মারণোচ্চাটনাদি হিংসাজনক কর্ম্মোপযোগী মন্ত্রাদি রচনা করতঃ দ্বৈতবাদে যে অথর্ব্ববেদের ভিত্তি স্থাপন করেন, পরবর্ত্তীযুগে তদীয় বংশধরগণই ত্রয়ী বেদের উন্নত অদ্বৈততত্ত্ব অবগত হইয়া উন্নত রুচিসম্পন্ন হওয়ায় তন্মধ্যে অনেক ঋষি পূর্ব্বলব্ধ দ্বৈতজ্ঞান ও মারণোচ্চাটনাদি কর্ম্মোপদেশক অথর্ব্ববেদকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন। এই জন্যই আমরা অথর্ব্ব বেদকে কোন কোন স্থানে, নব্য শিক্ষিত বাবুবিশেষের বন্ধু মহলে মর্য্যাদাহানি ভয়ে অশিক্ষিত ভদ্রবেশবিবর্জ্জিত পিতামাতাকে 'ওল্ড্ সারভেণ্ট্' নামে উপেক্ষিত করার ন্যায় উপেক্ষিত দেখিতে পাই।

আর যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্ট বলিয়া এই বিদ্যাকে সগৌরবে গ্রহণ করতঃ নানাবিধ উন্নত জ্ঞানালঙ্কারের দ্বারা তাহাকে বিভূষিত করিয়াছেন, সেই প্রাচীন স্মৃতিসংরক্ষক শ্রদ্ধেয় ঋষি-গণকেই আমরা অথর্ব্ববেদীয় বা তান্ত্রিক ঋষি বলিয়া মনে করি।

বাঙ্গলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

(৭)

(ঘ) বিদ্যার উক্তি

রাণী সখীমুখে বিদ্যার গর্ভসংবাদ শুনিয়া বিদ্যার গৃহে আসিয়া যখন স্বচক্ষে গর্ভ লক্ষণগুলি দেখিতে পাইয়া বিদ্যাকে তিরস্কার করিলেন, তখন বিদ্যা আত্মদোষ স্খালনের একটি ব্যর্থ প্রয়াস করিলেন। বিভিন্ন কবি বিদ্যার সেই মাতার প্রতি উক্তির একটা বর্ণনা দিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য কাব্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম কবি গোবিন্দদাস যে ভাবে রাণী ও বিদ্যার মধ্যে কথোপকথনটি চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মাতার মনে কন্যার এই বিপদে যেরূপ উৎকণ্ঠা ও আশংকা সাধারণতঃ জাগিয়া উঠা সম্ভব, তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, রাণী বিদ্যাকে তিরস্কার করিবার পর যখন সখীগণের নিকট প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন, তখন—

"ঠারাঠারি চিত্ররেখা কহে করাঙ্গুলি।
বাক্যরসে মহারাণী জানিলা সকলি॥"

এখানে সখীগণ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছে না, কারণ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। তাই তাহারা সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে, এই ভাবে মুখে কিছু না বলিয়া ঠারে কথাচ্ছলে ব্যাপারটি প্রকাশ করিল। তখন রাণী বিদ্যাকে সস্নেহে প্রশ্ন করলেন—

"মুখ্যরাণী বলে মা গো তোমারে সে বলি।
কেমনে নাগর আসি করে নাগরালি॥"

বিদ্যা তখন আর কি করিবেন। ব্যাপারটা স্বীকার করিবার মত সাহস তাঁহার নাই। তিনি তাঁহার গর্ভাবস্থাকে একটা অসুস্থতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন।

"বিদ্যাবতী বলে আমি কিছুই না জানি।
আচম্বিতে শরীরে কি হইল আপনি॥
প্রাণ ছট্‌ফট্ করে মুখে উঠে বাস্ত।
না জানি শরীর মোর পুড়ে উঠে অস্ত॥"

রাণী ব্যাপারটা বুঝিলেন। কি আর করিবেন। লোকলজ্জা ঢাকিবার জন্য কি করিয়া বিদ্যার গর্ভপাত করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণরামের বিদ্যা অপেক্ষাকৃত প্রগল্‌ভা এবং নিজ দোষ ঢাকিবার জন্য যথেষ্ট বাক্‌চাতুরী

অবলম্বন করিয়াছেন। বিদ্যা মাতার তিরস্কারের উত্তরে উল্টাইয়া তাঁহার প্রতি অনাদরের জন্য মাতার উপরেই দোষারোপ করিতেছেন—

না জানি বিশেষ কথা　কেন কটু বল মাতা
　ধিক্ ধিক্ আমার কপালে।
হইব আপন বধি　গরল না খাই যদি
　রসাল কাটারি দিব গলে॥
দুঃখের নাহিক ওর　উদরি হইয়াছে মোর
　নিশ্বাস ছাড়িতে নাহি পারি।
অস্থি চর্ম্ম অবশেষ　দূর গেল রূপ বেশ
　নড়িতে চড়িতে নাহি পারি॥
　　*　*　*
　কি কহিব দুঃখের অবধি।
অকারণ কর রোষ　কি দিব তোমার দোষ
　এত করে নিদারুণ বিধি॥
প্রহরি কোটালচয়ে　প্রতাপে যমের ভয়ে
　নারী নারে পুরে প্রবেশিতে।
সহিত সকল সখি　সদনে বসিয়া থাকি
　সাদ যায় মানুষ দেখিতে॥
যৌবনে বালক কেবা　বৃদ্ধ আদি করি যুবা
　দেখি নাহি পুরুষ অনেক।
জিয়া আর নাহি সাদ　মা দেয় কন্যার বাদ
　লোকেও হইব পরতেক॥
আমার যতেক কর্ম্ম　সকল জানেন ধর্ম্ম
　তিলেক নাহিক করি দোষ।
না বুঝিয়া যত বল　আপুনি কলঙ্ক তোল
　অপরাধ বিনে কর রোষ॥
উষা অতি কুতূহলে　অনিরুদ্ধ আনি ঘরে
　বরিল, না জানে বাপ মায়।
হইলে তেমন লাজ　যে দেখি তোমায় কাজ
　তখনি বধিতে মোরে চায়॥"

তাহার পর বিদ্যা তাহার গর্ভলক্ষণ ও পুরুষসঙ্গলক্ষণ ঢাকিবার একটা হাস্যাস্পদ যুক্তি দেখাইতেছেন—

"সদাই শয়নকালে　মার্জারী আসিয়া কোলে
　আঁচড়িল পয়োধর যুগে।
উদরে বেদনা বড়　অধোমুখে শুই দড়
　কালিমা হয়েছে কুচমুখে॥
ভিন্ন পুরুষ নিয়া　যদি থাকি সুখী হইয়া
　তবে সদাশিবের দোহাই।
বুঝ যদি মনে অন্য　দিব্যি করি এই জন্য
　নিশ্চয় তোমার মাথা খাই॥"

এখানে কৃষ্ণরাম "ভিন্ন পুরুষ নিয়া" কেন বলিলেন বুঝিলাম না। অনূঢ়া কন্যার পক্ষে এ উক্তি শোভা পায় না; সধবা নারী এ কথা বলিলে শোভা পাইত। ইহার পর মিথ্যা অপবাদের জন্য যে সকল সংস্কার আছে, তাহার উল্লেখ করিতেছেন—

"ভাদ্রচতুর্থীর শশী　দেখিয়াছি হেন বাসি
　নহে কেন মিছা পরিবাদ।
যত সুখ করি তাহা　শত্রুতে ভুঞ্জুক উহা
　মোর আর জিতে নাহি সাদ॥
না শুনি সখীর মানা　জল লইয়া আলিপনা
　বসিয়া দিয়াছি ধরাতলে।
এতেক কলঙ্ক বটে　হাথ দিয়া পূর্ণ ঘটে
　জানিয়া করিনু এ সকলে॥

বিদ্যার এই চাতুরীপূর্ণ বচন শুনিয়া অতি দুঃখেও রাণীর হাসি পাইল। তিনি তার পর সখীগণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন।

"ঘুচাইল লাজ ভয় এই যুক্তি দিলা।
যাহারে রক্ষক দিনু তাহাই ভক্ষিলা॥
এমনি লোকের কাজ কি কহিব আর।
রাজারে কহিয়া দিব সাজাই ইহার॥"

কৃষ্ণরামের সখীগণ বিদ্যার ন্যায়ই প্রগল্‌ভা। তাহারা রাজা রাণীকে এতকাল কন্যার বিবাহ না দিবার জন্য দোষ দিল।

"সখিগণ বলে মোরা কিছু নাহি জানি।
কি করিব কটু বল তুমি রাজরাণী ॥
যতদিন আছি মোরা বিদ্যার রক্ষক।
না দেখি পুরুষমুখ বল নিরর্থক ॥
গোপনে আইসে যদি অন্তরীক্ষগতি।
দেববিনা নহে ইহা কাহার শকতি ॥
হইল বৎসর ষোল যৌবন প্রবল।
সদাই পোড়য়ে মন বিরহ অনল ॥
বিদ্যার বয়েসে দেখ যত নারী আর।
হাটিয়া বেড়ায় শিশু তাহা সভাকার ॥
নিশ্চিন্তে আছেন বাপ কন্যা নাহি মনে।
তুমিও না কহ কিছু বিভার কারণে ॥
কোটালে শিখাও লইয়া মোরা কি করিব।
অবিচারে মার যদি দৈবেতে মরিব ॥"

সখীগণের উত্তর শুনিয়া রাণী আর কিছু বলিতে পারিলেন না, রাজাকে সংবাদ দিতে চলিলেন।

রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের Plotটি লইয়া তাহার উপর কারিগরী করিয়াছেন। তিনি মাতা ও কন্যার উক্তি কথোপকথনের ন্যায় সাজাইয়াছেন। তাহাতে একটা কোন্দলের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা মোটেই, রাজজনোচিত তো দূরের কথা, ভদ্রজনোচিত হয় নাই।—

'আলো হেদে লো পাপিনি ঝি'।
বিদ্যা বলে, 'দোষ বা দেখিলা কি' ॥
'আলো কেমনে মিলিল স্বামী'।
বিদ্যাবলে, 'পুরুষ না দেখি আমি'।
'আলো কারে কর প্রতারণা'।
বিদ্যা বলে, 'চক্ষু নাই বুঝি কাণা' ॥
'আলো গর্ভের লক্ষণ সর্ব'।
বিদ্যা বলে 'বাতাসে কি জন্মে গর্ভ' ॥
'আলো উদর ডাগর তোর'।
বিদ্যা বলে 'উদরী হয়েছে মোর' ॥
'আলো স্তনে ক্ষরে কেন পয়'।
বিদ্যা বলে, 'এ রোগে বাঁচা সংশয়' ॥
'আলো কুচাগ্রভাগেতে কালি'।
বিদ্যা বলে 'প্রলেপ দিয়াছে আলি' ॥
'আলো শয়ন কেন ভূতলে'।
বিদ্যা বলে, 'নিরন্তর দেহ জ্বলে' ॥
'আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম'।
বিদ্যা বলে, 'নিদাঘকালের ধর্ম্ম' ॥
'আলো পূর্বরূপ গেল দূর'।
বিদ্যা বলে, 'দেখ লক্ষণ পাণ্ডুর' ॥
'আলো ঘন ঘন উঠে হাই।
বিদ্যা বলে, 'বলাধান মাত্র নাই' ॥
'আলো ভক্ষণ যে পোড়া মাটি'।
বিদ্যা বলে, 'ছি মাগি, তোরে না আঁটি' ॥
তারা মায় ঝীয়ে যত ভাষে।
আড়ে থাকি বসি আলি হাসে ॥

মাতা ও কন্যার মধ্যে এই বাক্‌যুদ্ধটিকে মনে হইতেছে যেন দুই সতীনের ঝগড়া বা দুই সখীর রহস্যালাপ। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া মাতা ও পুত্রীর মধ্যে এইরূপ আলাপ কখন সম্ভব নহে। যাহা হউক, এ পর্যন্ত তবু ভদ্রতা রক্ষা হইয়াছে। ইহার পর আর এক দফা বাক্‌-ছল গাহিয়াছেন রামপ্রসাদ।

রাণী বলিতেছেন—

"এতক্ষণ জীয়া আছ তাই আমি চাই।
বাসনা এমনি হয় আমি বিষ খাই॥
প্রাণ সম বাসি পিতা পড়াইল তোকে।
গালে দিলি কালি চুণ হাসিবেক লোকে॥
সমুচিত শাস্তি বিদ্যা তুই পাবি কালি।
উল্‌টা চোরে গৃহী বান্ধে মোরে দিস গালি॥
বিদ্যা বলে পুনঃ পুনঃ কত কটু কও।
চারা নাই মা গো তুমি গুরুলোক হও॥
গলায় অঙ্গুলি দিয়া কেন তোল কাশ।
আপনিই আপনার কর সর্ব্বনাশ॥
কাল বড় কুৎসিত আমাকে কর মাপ॥
খুঁড়িতে কেঁচুয়া পাছে উঠে কাল সাপ॥
কিবা ডাক ছাড় তুমি কিবা হাত নাড়।
ভাল বট জীয়ন্ত মাছেতে পোকা পাড়॥
বারে বারে যত কহি কথা নাহি মান।
যেমন আমার রীত সুন্দর তা জান॥
অনাথিনী প্রায় পড়ে থাকি এক ঠাঁই।
পুরুষ কেমন কভু চক্ষে দেখি নাই॥
সবে মাত্র স্নেহভাবে দেখেছেন বাপ।
গর্ভ গর্ভ বলে কেন দেহ মনস্তাপ॥
দুঃখের উপরে দুঃখ এ বড় উৎপাত।
কোথা বান্ধিবেক তাগা শিরে সর্পাঘাত॥
রাণী বলে মর মেনে এ কি আর পাপ।
তবে বুঝি এ কর্ম্ম করেছে তোর বাপ॥
তোর এ কথায় গায় কাটে যেন বিছা।
পেটে ছেলে লড়ে চড়ে তবু বলে মিছা॥"

এখানে বিদ্যার 'গলায় অঙ্গুলি দিয়া কেন তোল কাশ,' 'খুঁড়িতে কেঁচুয়া পাছে উঠে কাল সাপ' এ সকল উক্তির দ্বারা কিছু যেন কুৎসিত ইঙ্গিত করিতেছেন মনে হয় এবং বিদ্যার পিতা ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে চোখে দেখি নাই; এ উক্তির উত্তরে রাণীর 'তবে বুঝি এ কর্ম্ম করেছে তোর বাপ,' এইরূপ অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ মোটেই সৎসাহিত্যের পরিচয় হয় নাই। ইহার পর রাণী যখন সখীগণকে শাসাইতেছেন, তাহার উত্তরে রামপ্রসাদ তাহাদিগকে দিয়াও যে জবাব দিতেছেন, তাহা কোন দাসী শ্রেণীর লোকে রাণীর প্রতি প্রয়োগ করিতে পারে বলিয়াও আমরা জানি না।

"করযোড়ে কহে তারা কেন কর রোষ।
বিবেচনা করিলে কাহারে নাহি দোষ॥
জন্মাবধি দেখি নাই পুরুষ কেমন।
রাজরাণী বট কেন কহ গো এমন॥
বাহিরে প্রহরী থাকে দুরন্ত কোটাল।
মনুষ্য সঞ্চার নাই এ কি ঠাকুরাল॥
উচিত কহিতে কিন্তু মর্ম্মে পাবে পীড়া।
রমণী রমণী সঙ্গে নাহি করে ক্রীড়া॥
ভগীরথজন্ম কথা শুনিয়াছি কাণে।
সে কালের মেয়ে তারা এ কালে না জানে॥
তবে কে করিল গর্ভ এ ত বড় রঙ্গ।
ছাড় মেনে ঠাকুরাণি এ পাপ প্রসঙ্গ॥
আপনার মান গো আপনি যত্নে রাখি।
লোকে বলে কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকি॥
আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গায়ে পড়ে।
বাড়া কিবা কহিব কথায় কথা বাড়ে॥
অবিচারে কর নষ্ট তার চারা কিবা।
যার রীত যেমন জানেন মাত্র শিবা॥"

রামপ্রসাদ বিদ্যাকে দিয়া মিথ্যা অপবাদের জন্য কোন অনুশোচনা করান নাই। বিদ্যা রীতিমত ইতর শ্রেণীর যুবতীর মত মায়ের সহিত কোন্দল করিয়াছে। বিদ্যার সখীগণের উক্তি বিদ্যারই অনুরূপ হইয়াছে। রামপ্রসাদ রাজরাণীকে একেবারে পথে দাঁড় করাইয়াছেন।

বলরাম বিদ্যার মুখ দিয়া যে উত্তর দেওয়াইয়াছেন, তাহা সুন্দর ও শোভন হইয়াছে। কোথাও বিন্দুমাত্র গ্রাম্যতা নাই। মাতার তিরস্কারের উত্তরে বিদ্যা বলিতেছেন—

"শুন গ জননী মিথ্যা বল বাণী
বিপরীত পরিবাদ।
তুমি যে কহিলে লোকে যে শুনিলে
হইবে বড় পরমাদ ॥
গায়ে কণ্ডু দেখ কুচে নখরেখ
বিষম কণ্ডুর জালে।
যেবা পাণ্ডু গণ্ড দেখিলে প্রচণ্ড
লেপিত চন্দন কালে ॥
জর হৈল পূর্ব্বে তেঞি দেখ গর্ব্বে
না জানি কেমন ব্যাধি।
তাহার কারণে পাণ্ডুর লোচনে
রাত্রে নাহি যাই নিন্দি ॥
অঙ্গেতে সর্জ্জর হয় নিরন্তর
পোড়য়ে আমার অঙ্গ।
কেন গ জননি মিথ্যা বল বাণী
মোরে পুরুষের সঙ্গ ॥
বয়েস কারণ বিকচ যৌবন
কৌতুকে লোটাই মহী।
হইয়া জননী মিথ্যা বল বাণী
তে কারণে আমি সহি ॥
কেমত প্রকারে সিঁথার উপরে
সিঁদুর লাগ্যাছে মোর।
যৌবনের কালে অলকা বিলোলে
কালিমা কুচের ডোর ॥
গরিমা গরিসে লোটাই অলসে
পাইয়া শীতল স্থল।
মুখে দেখ হাই নিন্দ নাই যাই
নাহি রুচে অন্ন জল ॥
কহ মিথ্যাবাদ বড় পরমাদ
দেখিল কি নষ্ট চাঁদ।
দেখিয়া যৌবন করিতে দমন
তেঞি কিবা দেহ ফাঁদ ॥
সম্পূর্ণ কলসে কিবা অভিলাষে
হাথা দিমু মাথা খাইয়া।
সেই কি প্রমাদ বল মিথ্যাবাদ
আমার জননী হৈয়্যা ॥"

বলরাম কিন্তু কৃষ্ণরামের ন্যায় মিথ্যা অপবাদের কাল্পনিক কারণগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। বলরাম রাণীকে দিয়া সখীগণকে তিরস্কার করান নাই। বিদ্যার সখীগণ সুন্দরের গমনাগমন সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। বিদ্যা সখীদিগের নিকট যে স্বপ্নে সুন্দরের সহিত মিলনের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন, বলরাম তাহা খুব সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের বিদ্যার সাফাই হইতে সংকলন করিয়াছিলেন। আমরা পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

মধুসূদন চক্রবর্ত্তী একবার বিদ্যার মুখ দিয়া মাতার তিরস্কারের জবাব দিয়াছেন, পুনরায় বিদ্যার ছল কান্না বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যা মাতার তিরস্কারের উত্তরে যাহা বলিতেছেন, তাহাতে পূর্ববর্ত্তী কবিগণের প্রভাব সুস্পষ্ট রহিয়াছে—

"শুনিয়া মাএর কথা রাজার নন্দিনী।
গদগদ ভাষে কহে বিস্মিতবদনী ॥
না বুঝিয়া এত মোর করহ লাঞ্ছিত।
কোন মতে কিবা মোরে দেখ বিপরীত ॥
নিজ নখাঘাত কুচে কুৎসিত শয়নে।
পাণ্ডুর বরণে গন্ধ কুমকুম লেপনে ॥
রাউতে নাহিক নিদ্রা মুখে উঠে হাই।
শীতল ভূমিতে শুয়্যা সুখে নিদ্রা যাই ॥
শ্যামল কুচের আগে বিধির গঠন।
থাকি আমি এইরূপে প্রমাণ সখীগণ ॥
শিবের চরণ বিনে মুখ নাহি জানি।
মিথ্যা অনুযোগ মোরে কর গো জননি ॥"

ইহার পর কবি প্রসঙ্গান্তরে 'বিদ্যার ছল কান্না' বর্ণনা করিয়াছেন—

প্রতারণা করি নানা ছান্দে।
রাজার নন্দিনী ঘন কান্দে॥
হায় হায় কি করিল বিধি।
একাকিনী জনম অবধি॥
কার সনে নাই কোন কালে।
মা হইয়া হেন বোল বলে॥
কপালে আছিল বিধি সঙ্গ।
তেঞি মোর মিথ্যা কলঙ্ক॥
নষ্টচন্দ্র দেখিলাম আকাশে।
হস্ত দিনু পূর্ণ কলসে॥
দধি অন্ন খাইলাম নিশি।
বিউনি পাতিয়া তথি বসি॥
আলিপনা লিখিলাম জলে।
তেঞি মিথ্যা কলঙ্ক কপালে॥
মাথায় ধরিলাম রাত্রিবাস।
হেন বোলা সঘনে নিশ্বাস॥
নখেতে লিখিলাম ভূমিতলে।
পদে পদ দিনু কুতূহলে॥
মিথ্যা এ কলঙ্ক কার সয়॥
মোরে বলে মরিতে যুয়ায়॥"

মধুসূদন কৃষ্ণরামের কাব্য হইতে মিথ্যা কলংকের কারণগুলি লইয়া কিছু অদলবদল করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। মধুসূদনের বিদ্যা ভীতা ও নিজ দোষ গোপন করিবার জন্য ছলনার আশ্রয় লইয়াছেন, কোন্দল করেন নাই। মধুসূদনের রাণীও সখীগণকে তিরস্কার করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে দ্বিজ রাধাকান্ত কিছু বৈশিষ্ট্য দেখান নাই। রাণী যখন গর্ভলক্ষণ দেখিয়া বিদ্যাকে প্রশ্ন করিলেন, বিদ্যা তাঁহার প্রত্যেকটি প্রশ্নের এই ভাবে জবাব দিয়াছেন—

হাসিয়া রূপসী তবে কহেন তাঁহারে।
মা হয়া কহিলে মন্দ কি কব কাহারে॥
কালিমা কুচের অগ্র বিধির নির্ব্বন্ধ।
ইহাতে জননী কিছু না করিহ সন্ধ॥
অগুরু চন্দন রসে পাণ্ডুর বরণ।
রক্তহীন দেখ মাতা তথির কারণ॥
নিদ্রা নাহি হয় মোর রবির উত্তাপে।
পালঙ্ক তেজিয়া তেঞি শয়ন ভূমিতে॥
এই হেতু উঠে হাই ধূসর বদন।
হয়াছি সামর্থ্যহীন নিদ্রার কারণ॥
উদরে দারুণ বিধি করিলে উদরী।
অধিক জঠর শ্রমে নড়িতে না পারি॥
বালিকা অবধি পাত খোলাতে আবেশ॥
ইহাতে জননী হইয়া কর এত দ্বেষ॥"

রাধাকান্ত রাণীকে দিয়া সখীগণকে ভর্ৎসনা করেন নাই, কিম্বা বিদ্যার মুখ দিয়া মিথ্যা কলংকের কারণগুলির উল্লেখ করেন নাই। বিদ্যার উক্তির পরেই রাণী রাজার নিকট গমন করিলেন।

এইবার আমরা ভারতচন্দ্র এ সম্বন্ধে যাহা লিখিতেছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

রাণী যত কহে বিদ্যা মৌনে রহে
লাজে ভয়ে জড়সড়।
ভাবিয়া কান্দিয়া কহে বিনাইয়া
ধূর্ত্তের চাতুরী বড়॥
নিবেদয়ে ধনী শুন গো জননি
কত কহ করে ছল।
কিছু জানি নাই জানেন গোঁসাই
ভাল মন্দ ফলাফল॥
চৌদিকে প্রহরী সঙ্গে সহচরী
রহিঞা বন্দীর মত।
নাহি করি ভোগ মিথ্যা অনুযোগ
মা হইয়া কও কত॥

রাজার নন্দিনী চিরবিরহিণী
মোর সমা কেবা আছে।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
দাঁড়াইব কার কাছে॥
কি করি বাঁচিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া
গুল্ম হইল বুঝি পেটে।
মুখে উঠে জল অঙ্গে নাহি বল
চাহিতে না পারি হেটে॥
সবে এক জানি শুন ঠাকুরাণি
প্রত্যহ দেখি স্বপন।
একই সুন্দর দেব কি কিন্নর
বলে করে আলিঙ্গন॥

চোর বলি তারে চাহি ধরিবারে
তপাসি ঘুমের ঘোরে।
নিদ্রা ভঙ্গে চাই দেখিতে না পাই
নিত্য এই জ্বালা মোরে।
পুরুষে স্বপনে নারীর ঘটনে
মিথ্যায় সত্যের ভান।
দেখে নিদ্রা ভঙ্গে মিথ্যা রতিরঙ্গে
বসনে রেত নিপান॥
তেমনি আমারে স্বপন বিহারে
পুরুষ সহিত ভেট।
পিতা পতি সঙ্গ মিথ্যা রতি রঙ্গ
সত্য বুঝি হবে পেট॥

বিভিন্ন কবির কাব্য হইতে একই প্রসঙ্গের যে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতে দেখিতে পাইতেছি, গোবিন্দদাসের বিন্তা কোনরূপ যুক্তি দেখান নাই। শরীরের এই বিকার কেন হইল, তাহা তিনি জানেন না, মাত্র তাহাই বলিয়াছেন। কৃষ্ণরামের বিন্তাই উদরি হইয়াছে বলিয়া কারণ দর্শাইয়াছেন এবং মিথ্যা পরিবাদের জন্য ছল করিয়া অনুশোচনা করিয়াছেন। ভাদ্রচতুর্থীর নষ্টচন্দ্র দর্শন, জলে আলিপনা, পূর্ণ কলসে হাত ইত্যাদি মিথ্যা কলংকের যে সকল কারণ আছে, কৃষ্ণরামই প্রথমে বিন্তার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন এবং তিনিই প্রথমে বিন্তার প্রহরীবেষ্টিত পুরীতে বন্দিনীর মত নিঃসঙ্গ জীবনের উল্লেখ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ সকল ক্ষেত্রে কৃষ্ণরামের পদাংক অনুসরণ করিলেও এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আপন বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন এবং রাজবাড়ীর মধ্যে বস্তির কোন্দল আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। মধুসূদন একবার বিন্তাকে দিয়া রাণীর প্রশ্নগুলির জবাব দেওয়াইছেন এবং তাহার পর বিন্তার ছল কান্না বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় কৃষ্ণরামের প্রভাব সুস্পষ্ট। নষ্টচন্দ্র দর্শন, পূর্ণ কলসে হাত, জলের আলিপনা সহিত আরও দুইটি মিথ্যা কলংকের কারণ দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণরামের বিন্তা কুচে নখাঘাতের কারণ দেখাইয়াছেন মার্জারীর আঁচড়, মধুসূদনের বিন্তা কুৎসিত শয়নে নিজনখাঘাতে তাহার যুক্তি দেখাইয়াছেন। বলরাম এই প্রসঙ্গে বিন্তার বৈদগ্ধ্য সর্বাপেক্ষা বেশী ফুটাইয়াছেন। গায়ে চুলকণা হইয়াছে। সেইজন্য চুলকাইতে কুচে নখ-রেখা হইয়াছে। জ্বরের জন্য পেটে প্লীহা বা যকৃৎ হওয়া সম্ভব এবং সেইজন্য বর্ণ পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে; ভূমিশয্যার কারণ দেখাইয়াছেন বিকচ যৌবন; বলরামও মিথ্যা কলংকের দুইটি কারণ দেখাইয়াছেন।

ভারতচন্দ্র স্বপ্নে পুরুষের সহিত বিহারের একটা অলীক কাহিনী সৃষ্টি করিয়া বিন্তার কথায় একটা হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। বলরামও বিন্তাকে দিয়া সখীদিগের নিকট এই স্বপ্নবিহারের কাহিনী বলাইয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই ভারতচন্দ্রের প্রভাব। শুক পক্ষীর ন্যায় এই প্রসঙ্গটিও তিনি ভারতচন্দ্রের নিকট হইতে ধার লইয়াছিলেন।

(ঙ) রাণীকর্তৃক রাজাকে বিদ্যার গর্ভসংবাদ প্রদান ও কোটাল নিগ্রহ

বিদ্যাকে ভৎর্সনা করিয়া রাণী রাজার নিকটে এই দুঃসংবাদ জানাইতে গেলেন, অধিকাংশ কবি ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দদাস যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছে। অনূঢ়া কন্যার গর্ভসংবাদে মাতার স্নেহময় চিত্তে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, তাহা ক্রোধ নহে—বিষাদ। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—

বিষাদ ভরিয়া রাণী শিরে দিল হাত। না জানি কি করিব কি হবে পরিণাম।
কেমন প্রকারে ইহার গর্ভ করি পাত ॥ এমন প্রমাদে বিধি কৈলা কোন কাম ॥"

রাণী নৃপতিকে কিছু না বলিয়া নিজ অন্তঃপুরে গিয়া বিষণ্ণহৃদয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাজা দরবার সারিয়া দিবসান্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাণীর অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সখীগণ জল দিয়া রাণীর চৈতন্য সম্পাদন করিলে রাজাই তাঁহাকে এই প্রমাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রাণী বলিলেন—

"রাণী বলে কি কহিব কুশলের কাজ। আচম্বিতে গর্ভ ভার শুন নৃপমণি।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বিদ্যা থুল্যা বড় লাজ ॥ সেই ক্ষণে মহারাজা বসিলা ধরণী ॥"

তাহার পর রাজা বাহির হইয়া গেলেন। সদরে রাজা আসিতেই সভাসদ্‌গণ আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহই রাজাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না। তাহার পর রজনী প্রভাতে রাজা রাণী স্নানাদি সমাপন করিলেন। দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। রাজা কোটালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

কৃষ্ণরাম ঘটা করিয়া রাজার নিকট রাণীর গমন প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদ ঐ প্রসঙ্গকে আরও অলংকার সংযোগে জমকাল করিয়াছেন।

কৃষ্ণরাম—

"কিছু না কহিলা তবে রাজার মহিলা। খুধায় আদর নাই খুধা গেল তল।
জিনিয়া কুঞ্জরপতি সত্বরে চলিলা ॥ খাইতে কেবল মনে হয় হলাহল ॥
কোপে কাঁপাইয়া কায় না যায় ধরণ। সুতায় শতেক ধিক্ আপনার সাথে।
ঘামেতে তিতিল সতীর সোনার বরণ ॥ আনিয়া প্রমাদ বাণি বিবসন মাথে ॥
যেমন মহিস বিস রিসিক ফুটিয়া (?) । মুকুতা চিকুর ভার শুসল সঝরে (?) ।
কান্ধের অঞ্চল যায় ধূলায় লুটিয়া ॥ আঘাতে রোহিত পাত কপালেতে করে ॥
গোয় জুগ পঙ্কজে পুষ্করে বহে ধার। পূজা করি বসিয়াছে ধরণীভূষণ।
উগরে খঞ্জন যেন মুকুতার হার ॥ রাণী উত্তরিল তথা বিরস বদন ॥"

রামপ্রসাদ—

"নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে। বিগলিত কুন্তল জলদপুঞ্জ ছটা।
অসম্বর অম্বর, অম্বর পড়ে শিরে ॥ নিরানন্দ গতি মন্দ জিনিয়া বরটা ॥
জ্ঞানহারা তারাকারা ধারা শত শত। ভূপ উপে উপনীত মলিন বদন।
গোযুগে গলিত ধারা তৃষ্ণা নিষ্ঠাগত ॥ সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে শীঘ্র ধরণীভূষণ ॥"

কৃষ্ণরামের প্রভাব রামপ্রসাদে সুস্পষ্ট বিদ্যমান।

বলরাম মাত্র এক কথায় রাণীর গমনপ্রসঙ্গ সারিয়াছেন—

"আউদড় চুলে ধায় সভাতলে
যথা আছে নৃপমণি ॥"

মধুসূদনও কোনরূপ বর্ণনা করেন নাই, কেবল লিখিয়াছেন—

"বিদ্যার নয়নে বহে ধারা। রাজার গোচরে উপনীত।
মহিষী ছুটিল যেন তারা ॥ ভ্রমজনে (?) হইয়া মূর্চ্ছিত ॥"

রাধাকান্ত এই সামান্য বর্ণনাটুকুও করেন নাই। ভারতচন্দ্র ক্রুদ্ধা রাজরাণীর নৃপতিসমীপে গমন সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন—

"ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে আঁচল ধরায় পড়ে শয়নমন্দিরে রায় বৈকালিক নিদ্রা যায়
আলুথালু কবরীবন্ধন। সহচরী চামর ঢুলায়।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক হাতনাড়া ঘন ডাক রাণী আইল ক্রোধমনে নূপুরের ঝনঝনে
চমকে সকল পুরজন ॥ উঠি বৈসে বীরসিংহ রায় ॥"

ইহার পর রাণী নৃপতির নিকট বিদ্যার গর্ভবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। গোবিন্দদাস যে ভাবে এই দুঃসংবাদ রাজার গোচর করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। কৃষ্ণরামের রাণী গৃহে আইবুড়া কন্যা রাখার জন্য রাজার উপর দোষারোপ করিতেছেন। রাজা রাণীর মলিন মুখ ও আলুলায়িত কেশ দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—

বলে রাণী কহিতে কিবা ভয় লাজ মোর। আইবড় ঘরে আছে এমন নন্দিনী।
বিদ্যার হইয়াছে গর্ভ শুন নৃপবর ॥ কেমনে উদরে তুমি দেহ অন্নপানি ॥

এই বলিয়া রাণী বিলাপ করিতে লাগিলেন।

বিপরীত কথা শুনি বীরসিংহ রায়। অকস্মাৎ কেহ যেন হানিলেক খাঁড়া।
আকাশ ভাঙ্গিল যেন পড়িল মাথায় ॥ চলিয়া যাইতে যেন বাঘে দিল তাড়া ॥
অনিমিক নয়ান হইল জ্ঞানহারা। উচ্চতরু হইতে যেন পিছলিল পা।
সাগরে ডুবিল যেন রতনের ভরা ॥ অস্ফুট কদম্বকলি শিহরিল গা ॥"

রাজা পুনরায় ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—সংবাদ সত্য কি না। রাণী বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং গর্ভের লক্ষণ দেখিয়া আসিয়াছেন। তাহার পর

"পুনরপি প্রিয়া যদি এতেক কহিল। কোকনদ প্রায় কাঁপে যুগল নয়ন।
মৌন হইয়া ক্ষিতিপতি ক্ষণেক রহিল ॥ না করিল জলপান শয়ন ভোজন ॥
হৃদয় বিকল বড় নষ্ট হইল ধর্ম্ম। পুনরপি বাহির মহলে বার দিল।
নিশ্চয় জানিল মনে কোটালের কর্ম্ম ॥ সোয়ারে বাঘাই কোটাল ধরিয়া আনিল ॥"

কৃষ্ণরাম কোটালকে ধরিয়া আনার ব্যাপারে কোন আড়ম্বর করেন নাই।

রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের অনুকরণে লিখিতেছেন, রাণীকে দেখিয়া রাজা প্রশ্ন করিলেন—

"বিমল কমলমুখ ম্লান কেন কবে। শিরে হানি পাণি রাণী বলে কব কি।
অন্য কান্তে কৃতান্তে নিশান্তে কারে লবে ॥ শোন পর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব গর্ভবতী ঝি ॥

কি বল কাঁপিয়া উঠে মুখে উড়ে ফাক্‌কা।
ভাবনায় ভাতি ভিন্ন ভূপ যায় ভাক্‌কা॥
সমূলে রুষিল যেন মাতাল মাতঙ্গ।
সুষুপ্তি সময়ে যেন দংশিল ভুজঙ্গ॥
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত নিকটে যেমন।
সেইরূপ শুনি ভূপ মহিলাবচন॥
আপাদ পর্য্যন্ত অগ্নিশিখা যেন দহে।
কোটালের কর্ম্ম এই আর কারু নহে॥
আরবার দরবার মধ্যে গিয়া ভূপ।
কাঁপে গুরু উরু ওষ্ঠ লোচন বিরূপ॥
ক্রোধে কয় তোমরা সোয়ার দশ যাও।
এহি ওক্ত মেরে পাশ বাঘাই মাঙ্গাও॥"

রামপ্রসাদ অনুপ্রাসের অট্টহাস করিয়াছেন এই বর্ণনায়, কিন্তু অতিরিক্ত অলংকারভারে কাব্য জড়সড় হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর 'আপাদ পর্য্যন্ত' প্রভৃতি ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগে 'ফাক্‌কা, ভাক্‌কা' প্রভৃতি শব্দের গুরুচণ্ডালী দোষে বর্ণনাটি জর্জরিত। কৃষ্ণরামের বর্ণনার বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও মিষ্টত্ব আছে।

বলরাম রাণীকে দিয়া অপেক্ষাকৃত মিষ্টবাক্যে রাজার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে উদাসীনতার অভিযোগ করাইয়াছেন—

"রাণী বলে বৃথা রাজা শুনিলে পুরাণ।
অষ্টমে নবমে নাহি কৈলে কন্যা দান॥
অষ্টম বরিষে গৌরী নবমে রোহিণী।
দশমেতে কন্যাকাল শুন নৃপমণি॥
একাদশে রজস্বলা সর্ব্বলোকে জানে।*
পঞ্চদশ হৈল কন্যা না করিলে মনে॥
বিপরীত হৈল রাজা কহিল তোমারে।
পাপমতি বিদ্যা গর্ভ ধরিল উদরে॥
কোথা হইতে আইল চোর মোর অন্তঃপুরে।
কোন সখী তার মধ্যে লখিতে না পারে॥

রাণী এই কথা বলিলে রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে 'কোটাল কোটাল' বলিয়া ডাক দিতে কোটালকে আনিতে লোক ছুটিল এবং কোটাল রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

মধুসূদন লিখিয়াছেন, রাণী রাজার নিকটে গিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাজা মূর্চ্ছাভঙ্গে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে—

কান্দিতে কান্দিতে কহে রাণী।
শুন শুন মহারাজ পাপিনী বিদ্যার কাজ
কি কহব আমি অভাগিনী॥
শুন শুন প্রাণনাথ।
থাক তুমি কুতূহলে কলঙ্ক রাখিলে কুলে
সঙ্গ দেখি পুরুষের সাথ॥
নিবেদন করি তুয়া পায়।
জনমিয়্যা না মরিল কুল শীল মজাইল
গর্ভের লক্ষণ দেখি তায়॥
শুনিয়া চমকে মহাবল।
কি করিব হায় হায় পাপিনী বিদ্যার দায়
কুল শীল মজিল সকল॥
আমারে করিল বিধি রঙ্গ।
পুরুষবিদ্বেষী যে হেন কর্ম্ম করে সে
নিষ্কলঙ্কে রাখিল কলঙ্ক॥
হেন দুঃখ পাসরিব কিসে।
আমার নন্দিনী হয়্যা কুল শীল মজাইয়া
ভজিলেক কেমনে পুরুষে॥

* অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥

ছার ঝিএ কি করিলি কাজ। কোপে কহে নৃপতিনন্দন।
করিয়া অনল কুণ্ড শুধিব বিধির দণ্ড কোটালিঞা গেল কোথা আনহ তাহারে হেথা
তবে সে ঘুচিব মোর লাজ ॥ আজি তার বধিব জীবন ॥
হায় হায় কি কৈল অভাগিনী। যতেক অকার্য্য সেই করে।
আসিয়া কেমন চোর কলঙ্ক রাখিল মোর যদি দেয় চোরে ধরি তবে পরিত্রাণ করি
মরুক পাপিনী কলঙ্কিনী ॥ নহে যম তাহার উপরে ॥
রাণী বলে শুন নৃপরায়। ক্রোধ করি কোটালেরে ডাকে।
তোমার বালাই লয়্যা পাপিনী মরুক গিয়া আসিয়া রজনীপতি মায়া করি করে স্তুতি
কলঙ্ক না রহে ঝির দায় ॥ ঘোরতর দেখিয়া বিপাকে ॥"

মধুসূদনের ন্যায় আর কোন কবি রাজাকে দিয়া বিলাপ করান নাই। দ্বিজ রাধাকান্ত রাণীকে দিয়া রাজাকে একচোট তিরস্কার করাইয়াছেন।

রাণী বহে ওহে রাজা কি কব তোমারে। যৌবনে তাহার কর্ত্তা ভর্ত্তা সে রক্ষিতা ॥
আপনা খাইয়া কন্যা রাখিয়াছে ঘরে ॥ না জানি কেমন চোরে ভজিল কামিনী।
যখন বালিকা সুতা রক্ষে মাতা পিতা। গর্ভের লক্ষণ তার দেখিলাম আপনি ॥"

রাজা তখন—

হঠাৎ বিকট কথা শুনিয়া শ্রবণে। অন্যমনা জনা যেন তাতায় শকুলে (?) ॥
কুলিশ পতন শিরে জানিলেন মনে ॥ অচলে চড়িতে যেন বিচলিত পা।
চিত্রের পুত্তলী সম রহেন রাজন। আত্রিক ত্রিদোষে যেন ভ্রমিলেক গা ॥
ভাবেন সর্ব্বস্ব দাহ দিল অরিজন ॥ কৃতান্ত সমান যেন হইল রাজন।
খরতর অসি আসি কেহ দিল গলে। মেঘান্তর দিবাকর হৈল দরশন ॥

তাহার পর নৃপতি বাহির-বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কুপিত নৃপতির মুখে এই কথা শুনিয়া দেওয়ান প্রমাদ গণিল। রাজা ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে কোটালের প্রতি চাহিলেন।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, রাজসভায় কোটাল উপস্থিত ছিল, তাহাকে আনিতে লোক পাঠাইতে হয় নাই।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে রাণী শ্লেষের সহিত রাজা ও কোটালকে বিদ্রূপ করিয়াছেন এবং বিদ্যা অপেক্ষা রাজারই যে বেশী অপরাধ, তাহাই বলিয়াছেন।

ঘরে আইবড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে যৌবনে কামের জালা কদিন সহিবে বালা
বিবাহের না ভাব উপায়। কথায় রাখিব কত টেলে ॥
অনায়াসে পাবে সুখ দেখিবে নাতির মুখ সদা মত্ত থাক রাগে কোন ভার নাহি লাগে
এড়াইলে ঝির বিয়া দায় ॥ উপযুক্ত প্রহরী কোটাল।
* * * এক ভস্ম আর ছার দোষ গুণ কব কার
বিদ্যার কে দিব দোষ তারে বৃথা করি রোষ আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল ॥
বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।

যে জনে আপনা বুঝে পরদুঃখ তারে শুঝে
সকলে আপন ভাবে জানে।
রাণী গেলা এত বলে বীরসিংহ ক্রোধে জলে
বার দিল বাহির দেয়ানে॥"

কোটালকে ধরিয়া আনা প্রসঙ্গ কৃষ্ণরাম বিশেষ কিছু বর্ণনা করেন নাই। কেবল লিখিয়াছেন, সোয়ার গিয়া কোটালকে ধরিয়া আনিল। সে কারণ কিছু না বুঝিয়া হাত জোড় করিয়া রহিল। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

কালান্তকালের কাল ক্রোধে কহে মহীপাল
কে আছ রে আন ত কোটালে।
উকীল আছিল যারা কীলে সারা হৈল তারা
কোটালের যে থাকে কপালে॥
হুঙ্কারে হুকুম পায় শত শত খোজা ধায়
খানেজাদ চেলা চোপদার।
কীল লাথি লাঠি হুড়া চর্ম্ম উঠে হাড়গুঁড়া
এনে ফেলে মৃতের আকার॥
ক্ষণেকে সম্বিত পেয়ে জোড়হাতে রয়ে চেয়ে
ভারত কহিছে কহে রায়।
যেমন নিমক খালি হালাল করিলি ভালি
মাথা কাটি তবে দুঃখ যায়॥"

রামপ্রসাদ সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের এই সামান্য ইঙ্গিতটি লইয়া বিস্তারিতভাবে কোটালকে ধরিয়া আনার প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদ কোটালকে ধরিয়া আনার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সমসাময়িক কালে বাঙ্গলার নবাবদের স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রের একটা চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"যো হুকুম বলিয়া সওয়ার দশ লড়ে।
কেহ তাজি তুরকী টাঙ্গন পৃষ্ঠে চড়ে॥
দড়বড় গড় পাড়ে উঠাইয়া ঘোড়া।
রজপুত যমদূত গোঁপে দেয় যোড়া॥
ঘেরে কোটালের বাড়ী, কহে বেহেসাব।
কাঁহা কোতোয়ালগিরি নেকাল সেতাব॥
বৈঠকখানায় কোতোয়াল শুয়ে খাটে।
সোয়ারের ঘটা দেখি ভয়ে মার্গ ফাটে॥
ধুতি পরি লেঙ্গা শির, হইল হাজির।
অমনি ঢেকায় করে বেড়ার বাহির॥
পাছে থেকে মারে কেহ বন্দুকের হুড়া।
আকটে পাপোস মারে হাড় করে গুঁড়া॥
কোটাল-মহিলা কান্দে, করে হায় হায়।
এক দণ্ডে নিয়া গেল রাজার সভায়॥"

কোটালকে তো রাজসভায় লইয়া যাওয়া হইল। তখন রাজা কোটালকে যে ভাবে ভর্ৎসনা করিয়াছেন, তাহাতে বিভিন্ন কবির কাব্য বিভিন্ন ধারা অবলম্বন করিয়াছে। সুতরাং এই রাজার উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গোবিন্দদাস লিখিতেছেন—

"ডাক দিয়া রাজা তবে আনে নিশীশ্বর।
ক্রোধ হইয়া কহে তথা তর্জ্জিত উত্তর॥
আরে বেটা রিপু সঙ্গে করিয়াছ মেলা॥
তথির কারণে মোর কার্য্য কর হেলা॥
আনন্দে পুরীর মাঝে আছ যে বিভোর।
আনন্দে আনহ তুমি অন্তঃপুরে চোর॥
শিশুকাল হৈতে তোরে দিলাম অধিকার।
তথির কারণে কার্য্য করিলি আমার॥
তোরে আনি কোটাল করিলা কি কারণ।
আজি প্রাণ লই তোর হেন লয় মন॥
রাজার বচন শুনি কোটাল পালে ভয়।
করজোড় করিয়া কোটালে কথা কয়॥
এতেক প্রমাদ রাজা নাহি পাই সন্ধি।
আজ্ঞা করহ চোর করি দিব বন্দী॥
জলে স্থলে থাকে যথা মহী এ মণ্ডলে।
চোর ধরি আনি দিব বান্ধি হাতে গলে॥
রাজা বলে কোটাল আমি যে এই চাই।
নহে তোমার সবংশ গাড়িব এক ঠাঁই॥"

এখানে দেখিতেছি, রাজা কোটালকে কেবল ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, অন্তঃপুরে চোর প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহা সম্ভব হইয়াছে কোটালের অসাবধানতার জন্য। চুরিটি কি প্রকারের, তাহার কোন ইঙ্গিত ইহাতে নাই। কোটাল সম্ভবতঃ তাহা অন্যান্য কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিয়া লইয়াছে। রাজা কোটালকে চোর ধরিবার নির্দ্দিষ্ট কোন মেয়াদ দেন নাই।

কৃষ্ণরাম লিখিতেছেন, কোটালকে যখন ধরিয়া আনা হইল, সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া এবং কারণ না জানিয়া অভিবাদন করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজা তখন তাহাকে এই ভাবে তিরস্কার করিলেন—

ঘুর্ণিতলোচনে চায় বলে বীর সিংহ রায়
অন্তরে কম্পিত মহাক্রোধ।
অরে কোটালিয়া শুন খাইয়া আমার লুন
লাভে মূলে দিলা তার শোধ॥
* * *
এমনি কলির ব্যবহার।
পালিলাম পুত্র মত প্রশ্রয় দিলাম যত
তার কার্য্য করিলি আমার॥

তিলেক নাহিক ভয় সুখে থাক নিজ ঘর
রমণী লইয়া দিবা নিশি।
না রাখ আমার পুরী প্রতিদিন হয় চুরি
সে কাজে তোমার হেন বাসি॥
অনিবার ক্রোধ মনে শূলে দিব জনে জনে
যেন কর্ম্ম সাজাই তেমন।
চণ্ডালের ব্যবহার নিমকহারাম আর
কেহ যেন না করে এমন॥"

কোটাল সকাতরে করজোড়ে স্তুতি করিয়া বলিল—

"তোমার ক্রোধের কালে অখিল ধরণীতলে
কোন জন স্থির হয় আগে॥
বিষ যদি দেয় মায় কি করিতে পারি তায়
বাপে বেচে কে রাখিতে পারে।
রাজায় সর্ব্বস্ব হরে অবিচারে দণ্ড করে
কেহ নাহি পারে রাখিবারে॥
সসৈন্য প্রহরী সঙ্গে যামিনী জাগিয়া রঙ্গে
তবু চুরি পুরীর ভিতর।
কারে কি বলিব আর মুখল যমের দ্বার
হৈল মোরে বিমুখ ঈশ্বর॥

এক নিবেদন করি চোর আনি দিব ধরি
ব্যাজ কর দিন পাঁচ ছয়।
নাগাল না পাই যদি রাখিতে নারিব নিধি
দৈবেতে মারিবে মহাশয়॥
শুনি গণি ক্ষিতিপতি কহিল কোটাল প্রতি
ছয় দিন রাখিলাম প্রাণ।
যদি দুষ্ট চোর মিলে খালাস পাইবে দিলে
পাবে গ্রাম দুই চারিখান॥"

রাজা কিন্তু কোটাল পাছে পলাইয়া যায়, সেই জন্য একশত সোয়ার সহ একজন সরদারকে তাহার সঙ্গে দিলেন ও সপ্তম দিবসে তাহাকে হাজির করিতে বলিলেন।

এখানে রাজা প্রথমতঃ কোটালকে অপরাধী করিতেছেন—"সে কাজ তোমার হেন বাসি" অর্থাৎ কাজটি তোমার বলিয়া মনে হইতেছে। রাজা সম্ভবতঃ বলিতে চাহিয়াছেন যে, তুমিই ইহার জন্য দায়ী। কিন্তু কবি উক্তিতে এই ভাবে বলাইয়াছেন যে, তাহা কোটালের কানে অন্যরূপ শুনাইয়াছে। রাজা চুরিটি কি প্রকারের, তাহা গোপনেই রাখিলেন। সেই জন্য পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে কৃষ্ণরাম প্রকৃত সংবাদ জানিবার জন্য কোটালের স্ত্রীকে রাজঅন্তঃপুরে

পাঠাইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ রাজা কোটালকে বলিতেছেন, "সুখে থাক নিজ ঘরে রমণী লইয়া দিবানিশি" অর্থাৎ কোটালকে নারীতে আসক্ত বলিতেছেন।

রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের হুবহু অনুকরণে কোটাল রাজসভায় নীত হইলে নকীবকে দিয়া রাজার সম্মুখে হাজির করাইয়াছেন। তাহার পর—

"মৌনরূপে ভূপ আছে কোতোয়াল খাড়া কাছে
কোপে কহে ঘন বাহু লাড়া।
কুকুরে প্রশ্রয় দিলে কান্ধে চড়ে এক তিলে
বিশেষ কহিব কিবা বাড়া॥
ক্রোধে কাঁপে মহীপাল কহে ওরে কোতোয়াল
বুঝিলাম তোর নাহি দোষ।
যেমন যুগের ধর্ম্ম তেমন উচিত কর্ম্ম
মিছামিছি আমি করি রোষ॥
কারে কব কাব্য কহ যে যাহারে সঁপে দেহ
সে নাকি তাহার কাটে শির।
করিয়া হারামখুরি পশিয়া আমার পুরী
রাজ্যে চুরী নাকে দিব তির॥
মনেতে আগুন জলে পুনঃ পুনঃ কটু বলে
শান্তি নহে আরো ক্রোধ বাড়ে।
বিষয় বিষয়ে মত্ত নালও বিদ্যার তত্ত্ব
সবংশে গাড়িব এক গাড়ে॥
সুরাপানে রাগ রঙ্গে থাক বারবধূ সঙ্গে
অধর্ম্মে একান্ত পূর্ণ দৃষ্টি।
বিশ্বাসঘাতকী বেটা হেন কায করে কেটা
এই পাপে যাবে তোর সৃষ্টি॥
কোতোয়াল বিদ্যমান থরথর কাঁপে প্রাণ
ধীরে কহে কি করেছি আমি।
ক্রোধ সম্বরণ কর সকলি করিতে পার
মহারাজ আপনি ভূস্বামী॥
বিষ খেতে দেন মাতা ধনলোভে বেচে পিতা
জাতি বাদ যদি দেয় দারা।
অবিচারে রাজদণ্ড গৃহ দহে বহ্নি চণ্ড
কি আছে ইহার আর চারা॥
কিন্তু শুন মহাশয় বিচার করিতে হয়
দোষ দেখে এক গাড়ে গাড়।
যদ্যপি না ঘাটি থাকে প্রাণ লও মিছা পাকে
এ নহে বিহিত ক্রোধ ছাড়॥
আর শুন গুণধাম লইয়া বিদ্যার নাম
তারে রক্ষা করি আমি সদা।
অন্তরে বিষম ভয় রাত্রে নাহি নিদ্রা হয়
সাক্ষী মাত্র কেবল শারদা॥
সতত সতর্ক থাকি দণ্ডে দশবার ডাকি
সখী কহে প্রবোধ বচন।
হুসিয়ারে আছি ভাই আমরা কি নিদ্রা যাই
সবে বিদ্যা ঘুমে অচেতন।
পিপীড়ার নাহি সন্ধি নজরেতে হয় বন্দী
ইহাতে মনুষ্য কোন ছার।
তবে যদি যায় চোরে বিধাতা বিমুখ মোরে
নিতান্ত এ কর্ম্ম দেবতার॥
রাজা বলে সে যা হোক সাত দিন প্রাণ রোক
ইতিমধ্যে চোর দিবে ধরে।
ধরিয়া আনিলে চোর সম্মান করিব তোর
জায়গির দিব বহু করে॥"

তাহার পর রাজা কোটালের পিছনে 'মহসিল' দিলেন, যাহাতে সে একতিল সরিতে না পারে। রামপ্রসাদ সকল বিষয়ে কৃষ্ণরামের অনুকরণ করিয়াছেন। কেবল একটি বিষয়ে তিনি কৃষ্ণরামের অনুসরণ করেন নাই। কৃষ্ণরামের কোটাল রাজার নিকট পাঁচ ছয় দিন সময় চাহিয়াছিল; রাজা তাহাতে তাহাকে ছয় দিন সময় দিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের রাজাই স্বয়ং কোটালকে সাত দিন সময় দিয়াছেন, কোটাল সে বিষয়ে কিছু বলে নাই।

বলরামের কাব্যে রাজা বিদ্যার গর্ভসংবাদ শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে কোটালকে ডাকিতে লাগিলেন। কোটাল উপস্থিত হইলে তাহাকে খড়্গ লইয়া কাটিতে গেলেন এবং ভর্ৎসনা করিলেন।

বলরামের কাব্যে কোটালই নিজে চোর ধরিয়া দিবার জন্য দশ দিন সময় লইয়াছে এবং অন্তঃপুরে অনুসন্ধান করিবার অনুমতি লইয়াছে। এই অন্তঃপুরে অনুসন্ধান করিবার অনুমতি লওয়াতে ভারতচন্দ্রের প্রভাব নাই কি ?

ভারতচন্দ্র রাজাকর্ত্তৃক কোটালকে শাসন করার প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

রাজা কহে শুন রে কোটাল।
নিমকহারাম বেটা আজি বাঁচাইবে কেটা
দেখিবি করিব যেই হাল ॥
রাজ্য কৈলি ছারখার তল্লাস কে করে তার
পাত্র মিত্র গোবর গণেশ।
আপনি ডাকাতি করি প্রজার সর্ব্বস্ব হরি
হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ ॥
লুঠিলি সকল দেশ মোর পুরী ছিল শেষ
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।
জান বাচ্চা এক খাদে গাড়িব হারামজাদে
তবে সে জানিবি মোর দম্ভ ॥
তোর জিম্মা মোর পুরী বিদ্যার মন্দিরে চুরি
কি কহিব কহিতে সরম।
মাতালে কোটালি দিয়া পাইনু আপন কিয়া
দূর গেল ধরম ভরম ॥
প্রাণ রাখিবার হেতু নিবেদয়ে ধূমকেতু
অবধান কর মহারাজ।
সাত দিন ক্ষম মোরে ধরি আনি দিব চোরে
প্রাণ রাখ গরীবনেবাজ ॥
পাত্র মিত্র দিল সায় ভাল ভাল বলি রায়
নাজীরের হাবালে করিল।
কোটাল বিনয়ে কয় মহল হাবালে হয়
ভাল বলি রাজা সায় দিল ॥”

এখানে দেখিতেছি, ভারতচন্দ্র রাজাকে দিয়া কোটালকে চুরির অপবাদ দিয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই কৃষ্ণরামের প্রভাব। কৃষ্ণরামের কাব্যে রাজা কোটালকে নারীতে আশক্ত বলিয়াছেন এবং কবি নগর বর্ণণ প্রসঙ্গে তাহাকে “বারবধূ বার সাথে ভ্রমিয়া বেড়ায়” বলিয়াছেন। রামপ্রসাদ তাহাকে মাতাল ও লম্পট বলিয়াছেন এবং ভারতচন্দ্রের রাজা তাহাকে কেবল মাতাল বলিলেও হীরামালিনী তাহাকে “লোকের ঝি বহুলয়ে সদা থাক মত্ত হয়ে” এই বলিয়া গালাগালি দিয়াছে। ইহাতে মোগলযুগের শহর কোতোয়ালদিগের নৈতিক চরিত্রের একটি চিত্র আমরা দেখিতে পাইতেছি। আরক্ষা বিভাগের কর্মচারিগণের সহিত নগরের গণিকাগণের যে বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহা আমরা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও দেখিতে পাই। ভারতচন্দ্রের রাজা কোটালকে সাত দিন সময় দিয়াছেন এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যদৃষ্টে রামপ্রসাদ এখানে কৃষ্ণরামকে অনুসরণ না করিয়া ভারতচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়াছেন। কোটালের লম্পট অপবাদ মধুসূদনের কাব্যে কত দূর গিয়াছে, তাহা দেখাইতেছি। রাজা কোটালকে তিরস্কার করিতেছেন—

তুঞি মূঢ়হীন জাতি করিনু রজনী পতি
তেঞি মোর এমনি ব্যবহার।
মধু পানে মত্ত হয়্যা সুখে নিদ্রা যায় শুয়্যা
রাজ্যের না লয় সমাচার ॥

কলঙ্ক রাখিলি তুঞি মোর।
কোথা হেন নাহি জানি　অকস্মাৎ কেন শুনি
বিদ্যার মন্দিরে কেন চোর॥
দুই রাণ্ডী কোলে পিঠে আর রাণ্ডী ভাঙ্গ ঘোটে
আর বান্দী চামর ঢুলায়।
এইরূপে দিবা নিশি　নিজ গৃহে থাক বসি
রাজকর্ম্মে নাহি লাগে দায়॥
হেন দুঃখ উঠে আজি　জীবনে জীবন তেজি
নহে তোর বধিব জীবন।
নহে ধরি দেহ চোর　পরাণ রাখিব তোর
আর যত আছে বন্ধুজন॥
তর্জ্জন গর্জ্জন শুনি　অন্তকাল ভয় মানি
কোটালিয়া বলে করপুটে।
মনে মানে সর্ব্বনাশ　মুখে গদগদ ভাষ
আপন বিক্রম নাহি টুটে॥
না কর না কর রোষ　ক্ষেম সেবকের দোষ
শুন হে রাজার চূড়ামণি।
দয়া কর লোকনাথ　নিয়ম রজনী সাত
চোরেরে ধরিয়া দিব আমি॥"

মধুসূদন যে ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতেই এই সাত দিন সময় দিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহ।

দ্বিজ রাধাকান্তের কাব্যে রাজার তিরস্কার অতি সংক্ষিপ্ত এবং কোটালের কোন উক্তি তাহাতে নাই।

"রাজা বলে দুষ্ট বেটা দাগাবাজ অতি।
সারাদিন রহে ঘরে লইয়া যুবতী॥
মাস মাস ময়ুর মাহিনা মাত্র পাএ।
রাজ্যমধ্যে হিতাহিত তত্ত্ব নাহি চাএ॥
সবংশে বধিলে তোরে তবে দুঃখ জায়।
আরে ভ্রান্ত গতি চিন্ত রাধাকান্ত গায়॥"

এখানে রাজা তাহাকে স্ত্রৈণ বলিয়াছেন, লম্পট বলেন নাই।

(ক্রমশঃ)

৫০৫। আশ্রয়নির্ণয়।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ৫-৭, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ এবং শেষ পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তি লিখিত। পরিমাণ ৯॥০ × ৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। শেষ—

এই হেতু কৃষ্ণচন্দ্র প্রেমানুগা নাম।
তেঞি কহে রাধা প্রেম জীবন ধন প্রাণ॥
আশ্রয়নির্ন্নয় এই কিঞ্চিত কহিল।
গুরুকৃষ্ণকৃপাবলে জে কিছু লিখিল॥
শ্রীলোকনাথপাদপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
আশ্রয়নির্ন্নয় কহে শ্রীনরোত্তম দাস॥

—

৫০৬। গুরুশিষ্যসম্বাদ।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১৪ হইতে ১৫ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ৯৶০ × ৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৩ সাল। আরম্ভ—

শ্রীগুরুবে নম। শ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তাং॥
এহি মতে গুরুশিষ্য বসি এক ঠাই।
প্রত্যুত্তর করে দোঁহ আনন্দিত হই॥
শিষ্যে নিবেদন করে শ্রীগুরু গোসাঞি।
শুনিলাম কহিলা জত শ্রীদাম গোসাঞি॥
তাহা শুনিয়া মোর হরিষ অন্তরে।
সাধন নির্ন্নয় সেই কহিবে আমারে॥
শিষ্যের বচন শুনি শ্রীগুরু মহাশয়।
কহিতে লাগিল সাধ্য সাধন নির্ণয়॥

শেষ—

এহি সব বাক্যে জাহার লোভ হএ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ সে জন জানএ॥
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি কে কহিতে পারে।
ঐশ্বর্য্য প্রকাশ তাথে মাধুর্য্য বিহরে॥
শ্রীলোকনাথচরণ স্মরণ অভিলাষে।
শ্রীগুরুশিষ্যসম্বাদ কহে শ্রীনরোত্তম দাসে॥

শ্রীগুরুশিষ্যসম্বাদ শ্রীবৃন্দাবন নিরূপন নাম দষ পটলং॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। সঅক্ষর শ্রীরামানন্দ দাষ সাং সাফলিপড়া পুস্তক সমাপ্ত সন ১২০৩ মাহে ৭ আশ্বিন।

—

৫০৭। গুরুক্রমকথা বা নারদসংবাদ।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-৫, সম্পূর্ণ। দুভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। ৩য় হইতে ৫ম পত্রের বাম দিকের কিছু অংশ নাই। পরিমাণ ১৩৶০ × ৪৶০ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই।

প্রথম পত্রে পুথির নাম 'গুরুক্রমকথা' এবং শেষ পত্রে 'নারদসংবাদ'। কিন্তু নারদের উপদেশে শুকদেবের জনকসমীপে গমন ব্যতীত পুথির মধ্যে নারদ মুনির অন্য কোন প্রসঙ্গ নাই। বৈষ্ণবের পক্ষে বৈষ্ণব গুরুই করণীয়, নানা বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে প্রমাণ তুলিয়া পুথিতে ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আরম্ভ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নম॥
জয় জয় জয় গুরুদেবের চরণ।
মুঞি অধমেরে কর পবিত্রকরণ।

শুন২ অয়ে ভাই শুন দিয়া মন।
গুরুক্রমকথা কহি শাস্ত্রনিরূপণ॥
শেষ—
শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ মহাধীর।
তাঁহার সঙ্গে সংবাদ হইল সুস্থির॥
গুরুর সহায় করে…মার্থে দেয় দুঃখ।
ইহ অপরাধ বড় সাক্ষাতে হয় সুখ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবচরণে করি আশ।
নারদসংবাদ কহে নরোত্তম দাস॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণাভ্যাং নম॥ ইতি সমাপ্তমিতি।

৫০৮। বৈষ্ণবামৃত।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-৪, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পত্র জীর্ণ, অনেক স্থলে অক্ষর অস্পষ্ট। পরিমাণ ১৩×৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৭৩ সাল। আরম্ভ—

৺৭শ্রীশ্রীবৈষ্ণবেভ্যো নমো নম॥
করুণাশ্রীরাগ॥

আনন্দে বল কৃষ্ণ ভজ বৃন্দাবন।
ঠাকুর বৈষ্ণবের পদে মজাইয়া মন॥
…ঠাকুর বড় করুণার সিন্ধু।
ইহলোক পরলোক দুই লোকের বন্ধু॥
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।
কেমনে জানিব মুঞি শিশু অল্পমতি॥
শেষ—
বৈষ্ণব ভজ রে ভাই দেখ বৈষ্ণবমহিমা।
আপনে প্রভু জার দিতে নারে সীমা॥
শ্রীযুত আচার্য্য প্রভুর…করি আশ।
বৈষ্ণবামৃত কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি বৈষ্ণবামৃত সম্পূর্ণ॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। ইতি সন ১০৭৩ সন তাং ২ আসিন॥ তিথি কৃষ্ণপক্ষ॥ বারে মঙ্গলবার…এ পুস্তক॥ শ্রীসুরত মালের ইতি॥ নিবাস গড়ভিলা মাধ[ব]পুর॥ লিখীত° শ্রীকন্দর্প মল্ল খাওাস॥

৫০৯। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-৬, ৮-১১, অসম্পূর্ণ। দু ভাঁজ করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৮ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। প্রতি পত্রের চারি দিকে লাল ও সবুজ কালির সুদৃশ্য বেষ্টনি আছে। পরিমাণ ৯॥০×৩॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৭৬ সাল। এই নামীয় পুথির বিবরণ পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। শেষ—

শ্রীগৌরচন্দ্র মরে জে বলিল বাণী।
তাহা বিনু ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
শ্রীলোকনাথ প্রভুর পাদপদ্ম করি আশ।
শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহেন নরোত্তম দাস॥

ইতি গৃন্থ সমাপ্ত॥ সন ১১৭৬ সাল তাঃ মাহ আসার ১৬ রোজ…সোমবার দক্ষীন দুয়ারি…।

৫১০। স্মরণমঙ্গল।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-১১, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১০॥০×৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৫৭ সাল। পুথির পত্রসংখ্যা সম্পূর্ণ হইলেও

লিপিকরের অনবধানতায় প্রথম পত্রের শেষে কিছু অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। শেষ—

যুগলকিশোরলীলা অমৃতের সিন্ধু।
দুর্দ্দৈব কর্ম্মসূত্রে মোরে না দিলেক বিন্দু॥
উদ্দেশ কহিয়ে মাত্র যেই অনুসারে।
লীলাকে করিএ স্তুতি দয়া কর মোরে॥
শ্রীরূপমঞ্জরির পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সূত্ররূপে কহিল অষ্ট কালের আখ্যান॥
শ্রীরূপচরণপদ্ম হৃদয় বিলাস।
স্মরণমঙ্গল কহে নরোত্তম দাস॥

যথা দৃষ্ট [ইত্যাদি]। লিখিত° শ্রীকরুণাময় দাস মোঃ মহাজটুনি সাং গোহাষ সন ১১৫৭ সাল তারিখ ৪ আসাড় রোজ সোমবার পোনে দুই প্রহর বেলার সময় লিখা সমাপ্ত হইল ইতি।

৫১১। স্মরণমঙ্গল।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ২-১০, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১২×৫৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮২ সাল। শেষ—

যুগলকিশোরলীলা অমৃতের সিন্ধু।
দুর্দ্দৈব কর্ম্মসূত্রে মোর না দিলে এক বিন্দু॥
উদ্দেশ করিএ মাত্র লীলা অনুসারে।
লীলাকে করিএ স্তুতি দয়া কর মোরে॥
... ...
শ্রীরূপচরণপাদপদ্ম করি আশ।
স্মরণমঙ্গল কহে শ্রীনরোত্তম দাস॥

ইতি॥ শ্রীস্মরণমঙ্গল গ্রন্থ সম্পূর্ণং॥...ইতি পুস্তক নকল লিখিত শ্রীবৈষ্ণবদাস ইতি সন ১১৮২ সাল ২ শ্রাবন।

৫১২। গুরুশিষ্যসংবাদ।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-১২, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৮ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা; পরিমাণ ১৩।০×৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৬৮০ শকাব্দ। আরম্ভ—

শ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।
এই মতে গুরু শিষ্য দোহে এক ঠাঞি।
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী করে আনন্দিত হই॥
শিষ্য নিবেদন করে শ্রীগুরু গোসাঞি।
স্বনিয়ম যে করিল শ্রীদাস গোসাঞি॥
তাহায়ে শুনিতে মোর হরিষ অন্তরে।
সাধননির্ণয় সেই কহিবা আম্বারে॥

শেষ—

এই বাক্য সত্য করি জার লোভ হয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ সেই সে জানয়॥
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি কে জানিতে পারে।
ঐশ্বর্য্য প্রকাশি তাহে মাধুর্য্য বিহরে।
শ্রীলোকনাথচরণ স্মরণ অভিলাষ।
গুরুশিষ্যসম্বাদ কহেন নরোত্তম দাস॥

ইতি দশম পটল সমাপ্ত°॥ শকাব্দা ১৬৮০॥ বি তেরিখ ২১ আষাঢ়॥ রোজ রবি বার॥

৫১৩। সাধনচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-১৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৮ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা।

পরিমাণ ১৪॥০×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৬২৭ শকাব্দ। পত্র জীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে, অক্ষরের কালি উঠিয়া যাইতেছে; শেষ পৃষ্ঠা একরূপ পড়া যায় না। আরম্ভ—

শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥

জয়২ শ্রীগুরুচরণারবিন্দ।
যার কৃপাঞ্জনে ঘুচে ভবকূপ অন্ধ ॥
সংস্কার দীক্ষা দিয়া মন্ত্র দেয় সে।
ভবসিন্ধু পারাইতে করে উপদেশে ॥
এমন শ্রীগুরুপদে অনন্ত প্রণাম।
যাহার কৃপায় প্রাপ্তি হয় কৃষ্ণধাম ॥

শেষ—

শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপাদপদ্ম করি আশ।
. . ..নরোত্তম দাস ॥

ইতি শ্রীসাধনচন্দ্রিকা সমাপ্ত ॥ ইতি শকাব্দা ১৬২৭...মাহে দিবস কুজবাসরে বেলা চতুর্ব্বিংশতি দণ্ড উর্দ্ধে গ্রহস্থ লিখন সমাপ্ত ॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]।

—

৫১৪। নিগম।

রচয়িতা—গোবিন্দদাস অথবা নরোত্তম দাস। পত্র ১-৮, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৪॥০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০২৬ সাল।

৮ম পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় গোবিন্দদাসের ৩টি এবং ২য় পৃষ্ঠায় পুথির শেষে নরোত্তমের ১টি ভণিতা আছে। পুথির বিষয়—নারদ মুনির নিকট শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবার বিষয় বর্ণনা। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতার।
আপনার গুণে সব জীব কৈল পার ॥
সর্ব্ব ভক্তগণ যার সর্ব্ব অবতারে।
আনন্দে নাচিয়া বুলে সকল সংসারে ॥

ভণিতা—

১। কহেন গোবিন্দদাস হৃদয় আনন্দ।
২। কহেন গোবিন্দদাস ধূলির প্রত্যাশা।
৩। কহেন গোবিন্দদাস বৈষ্ণব চরণে ॥

শেষ—

ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মনোহর কুঞ্জের ভিতর।
চৈতন্যদাসের দাস তুয়া পদে অভিলাষ
নরোত্তমের মনোরথ পুর ॥

ইতি নিগম গ্রন্থ সংপূর্ণ॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। সন ১০২৬ সাল তিথি কৃষ্ট পক্ষে দ্বাদসি বার বৃহস্পতিবার তারিখ ২২ আশ্বিন ॥

—

৫১৫। রাধারসকারিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস। পত্র ১-৪, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৸০×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৭৭ সাল। পুথির মধ্যে চ অক্ষরের আকার প্রাচীন অর্থাৎ আধুনিক ঠ অক্ষরের ন্যায়। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য [ইত্যাদি]
প্রথমে বন্দিব গুরুদেবের চরণ।
জাহার প্রসাদে হয় বাঞ্ছিত পুরণ ॥

অন্ধতা ঘুচয়ে জার করুণা অঞ্জনে।
অজ্ঞানতিমির নাশ করে জার গুণে ॥
তবে বন্দো বৈষ্ণব রসিক জার হিআ।
বিকাইনু কিন মোরে পদরেণু দিয়া ॥
শ্রীরূপসনাতন গোসাঞিির চরণ করি আশ।
রাধারসকারিকা ইবে করিয়ে প্রকাশ ॥

শেষ—

অতএব জেই সেবে সকল ছাড়িয়া।
মানসেতে কৃষ্ণচন্দ্র সেবা জে করিয়া ॥
উপাসনাতত্ত্ব জার অন্তরে জাগয়।
সেই সে বুঝিব ইহা অন্যে নাহি হয় ॥
শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর পাদপদ্ম করি আশ।
রাধারসকারিকা কহেন শ্রীনরোত্তম দাস ॥

ইতি শ্রীরাধারসকারিকায়াং সংপূর্ণ ॥ যথা দিষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস। সাং কাসিনাথগঞ্জ ॥ তাং ৯ অগ্রায়ন ॥ রোজ স্বক্রুবার ॥ ইতি সন ১০৭৭ সাল ॥

—

৬১৬। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।

১ম-১০ম স্কন্ধ।

রচয়িতা—পণ্ডিত রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য। পত্র ১-৩১৭, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১৫৷০ × ৫৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৮ সাল।

পুথিখানি শ্রীমদ্‌ভাগবতের পয়ার অনুবাদ। রঘুনাথ পণ্ডিতের পরিচয়াদি ২৬৯ সংখ্যক পুথির বিবরণে দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান পুথিতে শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১ম হইতে ১০ম স্কন্ধ পর্য্যন্তের পয়ার অনুবাদ আছে। আরম্ভ—

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য [ইত্যাদি]।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপীনাথ দৈবকীনন্দন।
বৃন্দাবনচন্দ্র ব্রজরমণীজীবন ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সার এ দুই অক্ষর।
কৃষ্ণনাম হইতে নিস্পাপ হয় নর ॥
মুখে বাণী থাকিতে না লয় কৃষ্ণনাম।
তেঞি সে সংসারে লোক ভ্রমে অবিশ্রাম ॥

গ্রন্থকারের গুরুপরিচয়—

পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীল গদাধর নামে।
জাহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভুবনে ॥
ক্ষিতিতলে কৃপায় করিলা অবতার।
অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার ॥
বৃন্দাবননাথ কৃষ্ণ চৈতন্যমুরতি।
তাহার অভিন্নদেহ সহজে শকতি ॥
মোর ইষ্ট গুরুদেব সেই দুই চরণ।
দেহ মন বাক্য মোর তাহে সমর্পণ ॥

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য—

শ্লোক অর্থ বুঝিতে না পারে বিজ্ঞ বিনে।
কথারূপে কহি জেন বুঝে সর্ব্বজনে ॥

… … …

সুখে সভে ভাগবত শ্রবণ কারণে।
গীতবন্ধে ভাগবত কৈল প্রচারণে ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতের যে যে অংশে কৃষ্ণগুণ বর্ণিত আছে, গ্রন্থকার সেই সেই অংশেরই পয়ার অনুবাদ করিয়াছেন।

কেবল বৈষ্ণবধর্ম্ম কৃষ্ণগুণগাথা।
মহাভাগবতে না কহিব অন্য কথা।

ভণিতা—

ভাগবত আচার্য্যের মধুরসবাণী।
ভাগবতভাষা এই প্রেমতরঙ্গিণী ॥

শেষ—

রাজ্যপদ পরিহরি ক্ষিতিপতিগণ।
বনে প্রবেশিয়া করে কৃষ্ণ আরাধন ॥
ভজিল পাদারবিন্দ হৃদয়ে ধরিয়া।
নিরাপদে গেল তারা সংসার তরিয়া ॥
এমন প্রভুর গুণ বিচিত্র বাখান।
জে জনা সাধয়ে সেই বড় ভাগ্যবান্ ॥
জানিয়া শুনিয়া জার ভক্তি না জন্মিল।
নিশ্চয় জানিল তারে বিধি বিড়ম্বিল ॥
পৃথিবী আসিয়া জে মনুষ্যজন্ম ধরে।
সুকর্ম্ম করিয়া সেই তরিবারে পারে ॥
হেলায় তরিয়া জাবে শুন সর্ব্বজন।
শুকদেবমুখামৃত এ সব বচন ॥
পণ্ডিতমুকুটমণি গদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে নবতিরধ্যায় ॥ ইতি সমাপ্ত সন ১২৩৮ সাল তারিখ ২৭ সাতাইযে অগ্রহায়ন রবিবার ॥

৫১৭। কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

রচয়িতা—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। পত্র ১-২০৫, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ২১ × ৫৷৷৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫৯ সাল। 'শ্রীদুর্গা' লিখিয়া পুথির আরম্ভ। তৎপরে রঘুনাথ, শুকদেব, মহামায়া, গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবী বন্দনার পর গ্রন্থারম্ভ এইরূপ—

শুন ভাই সভাজন　　কবিত্বের বিবরণ
　　এহি গীত হইল যেই মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে　　কবির শিয়রদেশে
　　চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে ॥
ধন্য রাজা মানসিংহ　　হরিপদে হয়ে ভৃঙ্গ
　　গৌড়দেশে নৃপ যে মহীপ।
রাজা মানসিংহ কালে　　প্রজার পাপের ফলে
　　রাজা হলো মামুদ শরিপ ॥
উজির হলো রায়জাদা　　বেপারি খেত্রিয় খেদা
　　ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হলো অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া　　পনের কাঠায় কুড়া
　　নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥
সরকার হইল কাল　　খিল ভূমি লিখে লাল
　　বিনা উপকারে খায় খতি।
পোদ্দার হইল যম　　টাকায় আড়াই আনা কম
　　পায় লভ্য অতি সে দুর্ম্মতি ॥
ডিহিদার মামুদ খোজ　　টাকা দিলে লয় রোজ
　　ধান্য গরু কেহ নাহি কিনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী　　বিপাকে পড়িল বন্দী
　　এ হেতু নাহিক পরিত্রাণে ॥
জামিনদার বান্ধে গাছে　　প্রজা পালায় পাছে
　　দ্বার জাঁতিয়া কৈল থানা।
প্রজা হলো বিকল　　বিকায় বিত্ত সকল
　　টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা।
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ　　চণ্ডীঘাটা জার গাঁ
　　যুক্তি কৈল গরিব খাঁর সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া জাই　　সঙ্গে রমানাথ ভাই
　　চণ্ডী পথে দিল দরশনে ॥
ভেট লয়ে উপনীত　　রূপ রায় হৃষ্টচিত
　　যদু কুণ্ড তেহোঁ কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর　　নিবারণ কৈল ডর
　　তিন দিবসের দিল ভিক্ষা ॥
বাহিয়া ঘড়াই নদী　　সদাই স্মরিয়া বিধি
　　ভেটনায় হৈলাম উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি　　পাইল মাওলী পুরি
　　চণ্ডীদাস বড় কৈল হিত ॥
নারায়ণ পরাশর　　পার হৈল দামোদর
　　উপনীত কাটোয়া নগরে।

তৈল বিনা কৈল স্নান করিল উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে ॥
আশ্রম পুখুর আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া
পূজা কৈল কুমুদ কুসুমে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা জাইতে সেহি ঠামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
মাতা করিলেন দয়া চরণে দিলেন ছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
হাতে লয়ে পত্র মসি আপনে কলমে বসি
নানা ছন্দ লিখান কবিত্ব ॥
পড়ি নাহি কোন তন্ত্র নাহি জানি কোন মন্ত্র
আজ্ঞা দিলে রচিতে পুস্তক।
তোমার স্বপনাদেশে রচিতে মনে মানসে
আড়রায় হৈল উপনীত।
আড়রা ব্রাহ্মণভূমি ব্রাহ্মণ জাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ববাণী সম্ভাষিলাম নৃপমণি
রাজা দিল পাচ আড়া ধান্য।
সুধন্য বাকুড়া রায় ·· সকল দায়
শিশুপাঠে কৈল নিয়োজন।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
গুরু বন্দি করিল পূজিত।
সঙ্গে জানকী নন্দী জে জানে সপনসন্ধি
অন্ন দিল করিত যতন।
লিখ দিল অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়নেক দিলেন ভূষণ।
বিরমাদেবীর সুত রূপে গুণে অদভুত
বীর বাকুড়া ভাগ্যবান।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

পুথির সর্ব্বত্র কবিকঙ্কণের নানারকম ভণিতা বর্ত্তমান। মাত্র ৩য় পত্রের ২য় পৃষ্ঠায় দৈবকীনন্দনের একটি ভণিতা দেখা যায়। যথা—

মহামুনি ব্যাস গায়ে তুয়া যশ
নিবেদি তুয়া চরণে।
চণ্ডিকা চরিত্র মধুর সঙ্গীত
দৈবকীনন্দনে ভনে ॥

কবিকঙ্কণের নিম্নোদ্ধৃত ভণিতায় কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ত্তমান।—

১। শ্রীকবিকঙ্কণে গায় সুখে বসি আড়রায়
পাচালী করিল পরকাশ ॥
২। মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥
৩। জগদবতংসে পালধি বংশে
নৃপতি রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পুর তার কাম ॥

পুথির শেষ—

শুন গো অভয়া দাসে কর দয়া
গচ্ছ২ নিজধাম।
শুন মাতা শ্যামা দোষ কর ক্ষমা
পূর্ণ হৈল মোর কাম ॥
দিন সাত আট করি নৃত্য নাট
শুনহ তোমার ভাষ।
মন্দ হৈল জে বা দাসে কর ক্ষমা
পদতলে রাখ নিজ দাস ॥
কৃপা করি মোরে পুথি করিবারে
আপনে দিলে আরতি।
তব পদবলে মোরে সদয় হৈলে
আপনি রচিলে পুথি ॥
ত্রিপদী করিয়া ছন্দ পাচালী করিয়া বন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

ইতি শ্রীকবিকঙ্কন ভট্টাচার্য্য বিরচিত পুস্তক সমাপ্ত ॥···সকাব্দা ১১৭৩ শোতর সও

তিয়াত্তরে আরম্ভিয়া। সতর সও চোয়াত্তরে লিখি সমাপিয়া॥ উত্রানের (উত্তরায়ণের) পঞ্চ দিন থাকিতে সমাপোন। ভৃগুবারে ত্রিয়োদশী কৃষ্ণায় লিখন। সাক্ষর পঙ্কজলোচন সঞ্জামনি ক্ষ্যাতি। গাঙ্গলির অন্তপাতি ধুবলি বসতি॥ জে পড়িবে এই পুথি তারে নিবেদন। দোসেতে বঞ্চতি হয়ে লইবেন গুন॥ সন ১২৫৯ শাল তারিখ ২৫ পৌষ স্থক্রবার দিবা এক প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল এ পুস্তক শ্রীপদ্মলোচন সান্যালের সাক্ষরমিদং॥

—

৫১৮। চণ্ডীকাব্য।

রচয়িতা—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। পত্র ২-১১৫, ১১৭-১৪৬, ১৪৮-২৮২, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৬ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৬৷৷০×৫ ইঞ্চি। আদি, মধ্য ও শেষ অংশ খণ্ডিত। স্থতরাং পুথির শেষে লিপিকাল ও লিপিকরের নাম ধাম প্রভৃতি নাই। তবে ৮ ও ৫৩ সংখ্যক পত্রের বাম কোণে যথাক্রমে ১২২৩ ও ১২২৭ সাল লিখিত আছে।

পুথির অবস্থা ভাল নহে। মোটামুটি ভাবে প্রত্যেক পত্র কীটদষ্ট। প্রথম ও শেষ অংশের কতক পত্র গলিত। মধ্যবর্ত্তী অনেক পত্রেরও ঐ অবস্থা। হস্তাক্ষর একাধিক লিপিকরের। ১৫৯ পত্রের পার্শ্বে 'এই পুস্তক শ্রীহরিনাথ শর্ম্মণ' লেখা আছে। দ্বিতীয় পত্রটি গলিত। প্রায় তদবস্থাপন্ন ৩য় পত্র হইতে বাণীবন্দনার কতক অংশ উদ্ধৃত হইল।

বসন্ত রাগ॥

বিধিমুখে বেদবাণী বন্দো মাতা বীণাপাণি
ইন্দু···তুষারসঙ্কাশা।
ত্রৈলোক্যতারিণী ত্রয়ী বিষ্ণুরূপা বর্ণময়ী
কবিমুখে অষ্টাদশ ভাষা॥
শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠান ···ধুতি পরিধান
কণ্ঠে শোভে মণিময় হার।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কপালে বিজলি খেলে
তনুরুচি·········॥
শিরে শোভে ইন্দুকলা করে করজপমালা
সোকসিযু (?) শোভে বাম করে।
নিরন্তর আছে··· ···পুথি খুংগি
সোঙরণে জড়িমা জায় দূরে॥

ভণিতা—

রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে স্থজন।
তার সভাসদ রচি চারু পদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

২৮১ সংখ্যক পত্রের শেষ—

আনিল আপন বাসে ধরি আমি নিজ বেশে
খণ্ডাইলাম বীরের বিপদে॥
মোর বাক্যে দিয়া মন কাটে গুজরাট বন
বসাইলাম নগর বাটে।
নগর চত্বর বাট গীত নাট গুজুরাট
চৌরাশী বাজার গোলাহাটে॥
দূর হইল শাপকাল বন্দী কৈল মহীপাল
স্বপনে কহিনু নৃপবরে।
বসায়্যা আপন খাটে রাজা কৈল গুজরাটে
আমা পুজি গেলা সুরপুরে॥ ইত্যাদি।

—

৫১৯। চণ্ডীকাব্য।

রচয়িতা—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। পত্র ১-৫, ৭-৩১, ৬৩-৮২, ৮৪-১০৫, ১০৭-১৫৯, ১৭০-২৩১, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৪॥০ × ৫ ইঞ্চি। লিপি-কাল ১১৮৫ সাল।

কিছু কিছু কীটদষ্ট হইলেও পুথির অবস্থা মোটের উপর ভাল। ৫১৭ সংখ্যক পুথিতে দেবদেবী বন্দনার পরে গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখা যায়। কিন্তু অলোচ্য পুথিতে প্রথমে গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ এবং তাহার পরে দেবদেবীগণের বন্দনা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে যেন কিছু অস্পষ্টতা ও অসম্পূর্ণতা বর্ত্তমান। আলোচ্য পুথির বিবরণ তদপেক্ষা অনেকাংশে সম্পূর্ণ। প্রথম হইতে ২২৮ সংখ্যক পত্রের ১ম পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কবিকঙ্কণ নামের ভণিতা আছে। কিন্তু ২২৮ পত্রের ২য় পৃষ্ঠা হইতে গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত 'দ্বিজ রামদাস' নামক অন্য এক ব্যক্তির ভণিতা দেখা যায়। এইরূপ ভণিতার মোট সংখ্যা ৯টি।

ভণিতা—

সেবিয়া সারদাপদ আনন্দজনক গীত
বিরচিল মুকুন্দ পণ্ডিত ॥

পুথির শেষ অংশ—

চণ্ডীরে বিদায় করি দেব সুরপতি।
সভাজন সঙ্গে করি দিল অনুমতি ॥
আসিঞা বসিলা ইন্দ্র হেমসিংহাসনে।
রত্নমালা মালাধরে দিল ফুল পানে ॥
নৃত্য করিবারে ইন্দ্র দিল অনুমতি।
সম্ভ্রমে আসিঞা পান নিল শীঘ্রগতি ॥
সাধু সাধুবাদ কৈল সব দেবগণে।
মহামায়া পদ্মাবতী আইলা নিকেতনে ॥
কহিলা সকল দুর্গা শিবের চরণে।
সাঙ্গ হইল ব্রতকথা শুন সাবধানে ॥
শিবকে কহিলা দুর্গা জত বিবরণে।
সাবহিত হঞা সব শুনে ত্রিলোচনে ॥
হেলায় শ্রদ্ধায় জেবা করএ শ্রবণ।
জন্ম জরা ব্যাধিভয় না হবে কখন ॥
সভাসদে বর দেও হর ভগবতী।
প্রণতি করিএ মাতা ভুজে ধরি ক্ষিতি ॥
আনন্দে রহিলা সভে নিজ নিকেতনে।
ব্রতকথা সর্ব্বলোক শুন সাবধানে ॥
আনন্দে রহিলা ঘরে মহেশ পার্ব্বতী।
দ্বিজ রামদাসে কৃপা কর ভগবতী ॥

ইতি দেবীমঙ্গল কথা সমাপ্ত॥ লিখীতং শ্রীখোসল দেবশর্ম্মনঃ স্বাক্ষরঞ্চ। সাকিম পরগণে গনকর দক্ষীনপাড়া॥ শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৬৯৯ আরম্ভঃ সমাপ্তঃ শকাব্দাঃ ১৭০০ মাহ বৈশাখ তারিখ ২১ বৈশাখ শুক্রবার পঞ্চমী ইতি॥ শ্রীহরেকৃষ্ণ শর্ম্মনাস্তেতু প্রশীদতু জগন্ময়ী॥ সন ১১৮৫ সাল॥··· শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মণঃ পুস্তকমিদং॥

৫২০। চণ্ডীকাব্য।

রচয়িতা—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। পত্র ১-৩৭, ৩৮-১৬৪, ১৬৮-১৮৩, ১৮৬-২১১, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৪ × ৪॥০ ইঞ্চি। শেষ অংশ

খণ্ডিত বলিয়া, শেষে লিপিকাল না থাকিলেও ১৮, ৭৬, ১২৬ এবং ১৬৩ সংখ্যক পত্রের নিম্নে ও কোণে ১২২৬ সাল লিখিত আছে। প্রথম ও শেষ দিকের কয়েকটি পত্র ছাড়া পুথির অবস্থা মন্দ নহে।

আলোচ্য পুথিতেও গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ অগ্রে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার পরে দেবদেবীগণের বন্দনা। এখানে লক্ষ্মীর বন্দনাটি উদ্ধৃত হইল।—

অজিতবল্লভা লক্ষ্মি ব্রহ্মার জননি।
তোমার চরণ বন্দো জোড় করি পাণি॥
যখন প্রলয়ে হরি অনন্তশয়নে।
তাঁহার উদরে ছিল এ তিন ভুবনে॥
জন্ম জরা মৃত্যুহরা নাহি কোন কালে।
সেই কালে ছিলা লক্ষ্মি হরিপদতলে॥
আনল গরল আদি কুম্ভীর মকর।
কত শত ছিল সেই সমুদ্র ভিতর॥
ধন জন যৌবন নগর নিকেতন।
পদাতি বারণ বাজি রত্নসিংহাসন॥
সেই অহঙ্কারে গো তাবত শোভা করে।
সেই জন ভগবান্ সংসার ভিতরে॥
তুমি গো বল্লভা লক্ষ্মি কৃপা কর জারে।
তোমার মহিমা আর কে কহিতে পারে॥
তোমারে চঞ্চলা লক্ষ্মি বলে জেই জনে।
তোমার মহিমা মাতা কিছুই না জানে॥
তাহারে ছাড়হ মাতা সেই দোষ দেখি।
অদোষী পুরুষে লক্ষ্মী চিরকাল সুখী॥
সেই জন পণ্ডিত গো সেই জন গুণধাম।
জাহার মন্দিরে মাতা করহ বিশ্রাম॥
লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ কুটুম্ববাড়ী জায়।
ওথা থাকু জল পিড়ি সম্ভাষ না পায়॥
লক্ষ্মীর মহিমা কবিকঙ্কণেতে গায়।
ভকত নাএকে দেবি হবে বরদায়॥

কয়েকটি ভণিতা—

১। উর গো কবির কামে কৃপা কর শিবরামে
চিত্ররেখা যশোদা মহেশে॥
২। গুণিরাজ মিশ্রসুত সঙ্গীতকলায় রত
বিচারিয়া আগম পুরাণ।
নৃপতির অভিলাষে নৌতুন মঙ্গল ভাষে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥
৩। মুকুন্দ রচিল গীত গৌরীমঙ্গল গাথা॥
৪। অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান॥
৫। চণ্ডিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণে॥
৫। রাত্র দিন তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দ কবি
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

২১১ পত্রের শেষ অংশ—

পূর্ব্বাপর আছে মোর কুলের আচার।
বিভা করি এক মাস নহে নদী পার॥
উদ্ধাবনিগমনে সাধু যদি কর ত্বরা।
বৎসরেক বই পার হইবে মগরা॥
পিতা পুত্রে দুই জনে কহিলাম সত্বরে।
অপেক্ষণ তুয়া বিনে কেহ নাহি ঘরে॥
জননীর মোহে মন করে উচাটন।
নিষেধ না কর জাব নিজ নিকেতন॥

ইহার পর আর কোনও অংশ লিখিত হয় নাই। পুথির শেষে লিপিকর প্রভৃতির নাম ধাম না থাকিলেও নিম্নলিখিত পত্রগুলিতে তাহা পাওয়া যায়।—

১। ইতি শুক্রবারে[র] পালা সমাপ্ত॥ এ পুস্তক শ্রীকালিকীঙ্কর মুখোপাধ্যাএর সন ১২২৬ সাল তাং ১৯ বৈশাখ।—১৮ পত্রের শেষ।
২। সয়ক্ষর কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় সাং ফুটীগোদা।—৬০ পত্রের শেষ।
৩। পালা গিত অতর্পর হৈল সমাধান।
হরি২ বল সভে নিসি জাগরন॥

২৮ অগ্রহায়ণ রবিবার বেলা আন্দাজি ছয় দণ্ডের মর্দ্ধে পাঁচ দণ্ডের পর ॥ এগার পালা সাঙ্গ হইল জখন এগার পালা গিত হইল তখন শ্রীযুত পিতাঠাকুর মহাশয় তমাক খান শ্রীযুত নিত্যানন্দ ঘোষ গোলায় কষ দেয় শ্রীমতি ঠাকুরাণ দিদি কুটনা কুটেন সয়ঙ্কর শ্রীযুত কালিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় সাং ফুটীগোদা পং হাজিপার।—১৭১ পত্রের শেষ।

৫২১। চণ্ডীকাব্য।

রচয়িতা—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। পত্র ২-৬৫, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪৸৹ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২২ সাল।

পুথির অবস্থা ভাল নহে। শেষ পত্রটি ছিন্ন ও গলিত। অপর কতকগুলি পত্রের ধার কাটা এবং গলিত। এ জন্য তাহাদের পত্রাঙ্ক নাই। পুথিও সম্পূর্ণ নহে। শ্রীমন্তের সিংহল-যাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া, পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত পুথিতে আছে। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ—

খুল্লনা বলেন বাছা শুন মোর বাণী।
বিপদে রাখিবে তোমা নগেন্দ্রনন্দিনী॥
সভা সনে সম্ভাষ করিল লঘুগতি।
দেবী বলেন ভয় না করহ শ্রীয়পতি॥
খুল্লনা বলেন মাতা করিহ প্রতিকার।
থাকহ নৌকার আগে হইয়া কর্ণধার॥
ছৈঘর চাপিয়া বসিলা সদাগর।
হাথে দণ্ড কেরোয়ালে বসিল গাবর॥
দাণ্ডাইয়া রহিল সভে ভ্রমরার তটে।
দুর্গার বরে কর্ণধার সাধুর নিকটে॥
কারো[হাতে]কেরয়াল কারো হাতে বাঁশ।
কারো হাতে দণ্ড কারো জগঝাঁপ॥
বাহ২ বলিয়া ডাকেন শ্রীয়পতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

৬৫ পত্রের শেষ পৃষ্ঠার যতটুকু পড়া যায়, তাহা এই—

পরিজন সভে মেলি পূজা করে মোর বারি
… … … …
তোমার সেবক জনা কৈল মোর অর্চ্চনা
………পদ্মাবতি।
সমাপ্ত হইল গীত জগজনে পায় প্রীত
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধমতি॥
… … …
এই বর মাগি আমি তোমার সন্নিধান।
জর্ম্মে২ পাই জেন……॥

ইতি সমাপ্ত হইল পুস্তক। তারিখ ৪ আশ্বিণ রোজ রবিবার দেড় প্রহরের মধ্যে কৃষ্ণে পক্ষে অষ্টমী তিথৌ। সন ১২২২ সাল।

৫২২। চণ্ডীকাব্য।

রচয়িতা—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। পত্র ৭-১৪, ১৬-২৩, ২৫-৫০, ৫২-৭৭, অসম্পূর্ণ। পত্রাঙ্কশূন্য একখানি পত্র প্রথমে আছে। তাহাতে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর বন্দনা লিখিত। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৪ × ৪৷৹ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল না থাকিলেও ৩১ সংখ্যক পত্রের কোণে '৭শ্রীশ্রীহরিঃ সন ১২৪০ সাল' লেখা আছে। সপ্তম পত্রের আরম্ভ এইরূপ—

রামরম্ভা জিনি উরু ...নিতম্ব গুরু
কেশরী জিনিঞা মধ্যদেশ।
পরিধান পাট সাজে চরণে নূপুর বাজে
মদনগোচর নহে বেশ ॥
রাজহংস মন্দগতি হেম জিনি দেহজুতি
গজকুম্ভ চারু পয়োধরে।
কিবা তাহে অনুপাম মণি মুকুতার দাম
যেন গঙ্গা সুমেরুশিখরে ॥
হেম হারবর ছলে কিবা শোভে তার গলে
স্থির হইয়া সৌদামিনী বৈসে।
নিরুপম পরকাশ মুখে মন্দ মৃদু হাস
ভঙ্গি নব সিবার আসে ॥
কপালে সিন্দুরবিন্দু তাহে চন্দনের বিন্দু
প্রভাত কালের যেন রবি।
অধর বিম্বুক জ্যোতি তাম্বুলের বধ তথি
দুহার বদনে করে ছবি ॥
তিলফুল জিনি নাসা কোকিল জিনিয়া ভাষা
গজকুম্ভ চারু পয়োধর।
খঞ্জন গঞ্জন আখি অকলঙ্ক শশিমুখী
শিরোরুহ অসিত চামর ॥
অঙ্গদ বলয়া শঙ্খ ভুবনে উপমা বঙ্ক
মণিময় মুকুটমণ্ডল।
হাসিতে বিজলি খেলে কপালে কুন্তল লোলে
হেমমুখ কলিকা সুশোভন ॥
প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া উরিলেন মহামায়া
সৃষ্টি সৃজিতে কৈলা মন।
উমাপদহিতচিত রচিয়া নৌতুন গীত
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৭৭ পত্রের শেষ—
ভেট লয়্যা কাঁচকলা পশ্চাতে ভাড়ুর শালা
আগু২ ভাড়ুর গমন।
ফোটা কাটা মহাদম্ভ ছিড়া জোড়ে কোচা লম্ব
শ্রবণে কলম সুশোভন ॥
প্রণাম করিয়া বীরে ভাড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতাইয়া খুড়া২।
ছেড়া কম্বলে বসি মুখে মন্দ২ হাসি
ঘন২ দেই বাহু নাড়া ॥
খুড়া হে—
আল্যাম বসত আশে বসিতে তোমার দেশে
আগে আন ডাকিবে ভাড়ু দত্ত।
জতেক কায়স্থ দেখ ভাড়ুর পশ্চাতে লিখ
কুল শীল বিচারে মহত্ত্ব ॥

৫২৩। চণ্ডীকাব্য।

রচয়িতা—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। পত্র ৮০-১১৮, ১২১-১৩৩, ১৩৯-১৪৪, অসম্পূর্ণ। দুভাঁজ-করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্ক্তি, কোন কোন পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্ক্তি লেখা। পত্রসংখ্যা পত্রের মধ্যদেশে ও দক্ষিণে। শেষ পৃষ্ঠার লেখা কিছু অস্পষ্ট হইয়াছে। পরিমাণ ১৩৷৷০ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত থাকায় লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ক, চ, জ ও ল, এই কয়টি অক্ষরের আকৃতি প্রাচীন। পুথিখানি দেখিয়াও প্রাচীন মনে হয়। ৮০ সংখ্যক পত্রের আরম্ভ—

...কেহো নেত কেহো পাটশাড়ি।
কুসুম চন্দন দিল বাটা ভর্যা কড়ি ॥
নানা ধনে জামাতারে কৈল পুরস্কার।
দিলেন দক্ষিণা রত্ন শঙ্খ দশ ভার ॥
বিদায় করিয়া বর কন্যা চাপে দোলা।
পঞ্চ রত্ন হাথে দিল সাধুর মহিলা ॥
রাজপথে জায় সাধু নগরে নগর।
লহনা লইয়া কিছু শুনহ উত্তর ॥
ফোটা চোটা করিয়াছে ঔষধ প্রবন্ধে।
প্রাণ ছটফট করে ঔষধের গন্ধে ॥

সদাগর মনে২ করে অনুমান।
হৃদয়ে করিল তারে অল্পজ্ঞান॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

১২২ সংখ্যক পত্রে—

পয়ার॥

দেখিয়া সাধুর কোপ চিন্তিল লহনা।
বিধাতা আমার আজি পুরিল কামনা॥
স্বামীর সোহাগে তার গর্ব্ব হইয়াছে বড়ি।
দেখিব স্থহব আজি ভূমে গড়াগড়ি॥
আগে২ চলিল লহনা নারীজন।
পশ্চাতে চলিল সাধু বাণ্যার নন্দন॥
পূজাগৃহে উপনীত হইলা ধনপতি।
জয় দিয়া পূজে চণ্ডী খুলনা যুবতি॥
রোষযুত ধনপতি দেখি সন্নিধানে।
ঘট ছাড়ি চণ্ডিকা উরিলা গগনে॥

শেষ পত্র—

নায়ে তুল্যা সদাগর নিল মিঠা পানি।
বাহ২ বলিয়া ডাকিল ফরমানি॥
গরিজা বাহিয়া বাহিল ভাগীরথী।
……এড়াইয়া পাইল সরস্বতী॥
ব্রহ্মপুত্র পদ্মাবতী জেই বাটে গেলা।
বুড়া মন্তেশ্বর বাহি বাণিঞার বালা॥
উৎপন্ন হইল ডিঙ্গা নিমাইতীর্থের ঘাট।
… … …

——

৫২৪। চণ্ডীকাব্য।

রচয়িতা—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। পত্র ১-২৩ এবং শেষে পত্রাঙ্কশূন্য একটি পত্র, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে ১৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩৸০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১৯ সাল। আরম্ভ—

শ্রীদুর্গা॥

দ্রুতগতি চলে সাধু নায় দিএ ভরা।
নাঞি মানে সদাগর বসন্তের খরা॥
নায়া পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক।
ডাহিনে থাকিল দেশ আভুয়া মুল্লুক॥
বাহ বাহ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বামে শান্তিপুর ডাহিনে গুপ্তিপাড়া॥
উলাকে বাহিয়া সাধু মিষমার পাশে।
মহেশপুরার কাছে সাধুডিঙ্গা ভাসে॥
বাম ভাগে হালিসহর ডাহিনে ত্রিবেণী।
দুই কূলে জপ তপ কিছুই না শুনি॥
লক্ষ২ লোক একবারে করে স্নান।
রাশি হেম তিল ধেনু কেহ করে দান॥
রজতের ছিপে কেহ করয়ে তর্পণ।
গর্ত্তের ভিতরে কেহ করয়ে মনন॥
শ্রাদ্ধ করে কোন লোক জলের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে কোন লোক দেয় ধূপ দীপে॥
বুহিত বাহিয়া দ্রুত চলে সদাগর।
রচিল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবর॥

২৩ পত্রের শেষ—

ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজার জামাই॥
উদ্ধারিয়া দিলা বন্দী হইয়া মাতা পিতা।
যশে তিন লোক পুরে আমারে বিধাতা॥
গুণের সাগর তুমি দয়ার নিধান।
তোমা হইতে হৈল রায় বন্দীর প্রাণদান॥
তুমি শিশু আমি বৃদ্ধ শূদ্রজাতি।
এই হেতু রায় আমি না করি প্রণতি॥
উদ্ধারিলা বন্দী তুমি হইয়া মাতা পিতা।
তোমার যশের খ্যাতি ভুবনপূজিতা॥
সিংহাসনে রাজ্য কর দীর্ঘ পরমাই।
মাতা পিতা সুখে থাক হউক… ॥

ইহার পর পত্রাঙ্কশূন্য এক পত্রের উভয় পৃষ্ঠায় লিপিকর নিজের দীর্ঘ বিবরণ দিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হইল।—

গুরুপদে রাখি মন পুস্তকের বিবরণ
জেরূপে লিখন জেই মাসে।
লিক্ষকের পরমাই আজি কালি কিবা ভাই
স্থির নাহি জানি কৃষ্ণদাসে॥
... ...
জিলে বীরভোম দেখি মৌজে পাচথোপি লেখি
তার মধ্যে অতি সুসুধীর।
নরপতি...রাজন প্রয়াগ তস্য নন্দন
তার বংশ বেণীনাথ হাজরা।
তস্য পুত্র ভারথীবর সেই বংশের কোঙর
নাম তস্য রামেশ্বর হাজরা॥
অতি সুখ তার সনে একচিত্ত একমনে
লিখিলাম তাহার কারণে॥
... ...

ইতি পুস্তক সমাপ্ত সকাব্দা ১৭৩৪ সন ১২১৯ সাল ১৩ আশ্বিন...লিক্ষক শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ হাজরা...সাং পাচথোপী।

৫২৫। চণ্ডীকাব্য।

রচয়িতা—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। পত্র ৪৫-৭০, ৭২-৭৪, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪॥০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। পুথির মধ্যে চ অক্ষরের আকার পুরাতন।

৪৫ সংখ্যক পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার লেখা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠা হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল।—

লইয়া টাকার পাট চলে বীর গোলাহাট
পাছে ধায় জতেক কিঙ্কর।
সেবকে জোগায় পান বিয়নি বিচয় আন
বৈসে বীর দুলিচা উপর॥
কানে কলম হাতে দ্বাত আইল কায়স্থসুত
.. বীরে নোআইল মাথা।
রাহুত মাউত মাল জেবা ধরে অসি ঢাল
বীরের শুনিয়া আইল কথা॥
আনন্দে পূর্ণিত মন ভাঙ্গাইয়া চণ্ডীর ধন
কিনে বস্তু শত২ লেখা।
বিচারিয়া কেহ দেখে ভাণ্ডারে কায়স্থ লিখে
সায় কর‍্যা বান্ধ্যা দেই টাকা॥

৭৪ পত্র—

উভ মুখে সাধু ধায় কাটা খোচা ভোকে পায়
সঙ্গে দনাই দ্বিজবর॥
পায়রি এড়িয়ে করে সেতাবনি উচ্চস্বরে
উভ মুখে ধায় ধনপতি।
পগার কন্দর খানা উলু কাশ্যা নল বেণা
নাহি সাধু করে অব্যাহতি॥
নাহি সাধু জায় পথে দনাই পণ্ডিত সাতে
পাছু২ জায় অবহেলে।
সাত পাঁচ সখী মেলি খুল্লনা খেলেন ধুলি
পারাবত পড়িল আঁচলে॥
পায়রা আঁচলে ঢাকি চৌদিগ নেহালে সখি
জায় রামা আপন ভবনে।
সদাগর জায় পাছে পায়রা তাহারে যাচে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

৫২৬। চণ্ডীকাব্য।

রচয়িতা—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। পত্র ১-৪, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ ইতে ৮ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত

লেখা। পরিমাণ ১২ × ৪ ইঞ্চি। শেষ খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল নাই।

ঘট স্থাপনপূর্ব্বক চণ্ডীর আবাহন ও বন্দনা পত্র চারিটিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা—

শ্রীশ্রীসিংহবাহিনী নমঃ ॥

শুভ তিথি শুভ কালে পঞ্চম ধরিয়া তালে
শুভ ক্ষণে বারির স্থাপন।
…মহুরি তাল শঙ্খ বাজে করতাল
ঘন বাজে দুন্দুভি বাজন ॥
বামা দেয় জয়ধ্বনি সপ্তস্বরা……
… … …
প্রণয়োহ নারায়ণি সম্পুট করিয়া পাণি
অধিষ্ঠান হও পূজাঘটে।
স্মরণ করয়ে দাস তেজিয়া কৈলাসবাস
উর চণ্ডি আসর নিকটে ॥

ভণিতা—

রচিয়া ত্রিপদীছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্দ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

—

৫২৭। শিবায়ন—শিবের চাষ।

রচয়িতা—রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য। পত্র ১-৪, ৬, ১২, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১২॥০ × ৪।০ ইঞ্চি। লিপি-কাল নাই। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ॥ শ্রীশ্রীশিবদুর্গা শরণং ॥
জেন্যাছেন যোগিনী জগদীশ নাঞি ঘরে।
মহামায়া মোহ জান মহেশের ডরে ॥
ঢেকিরে ডাকিয়া বলে ঢঙ্গ কর্য্যা চল।
পারি নাই পার গড়ে পড়্যা আছি ভাল ॥
নারায়ণ কৈল মোরে নারদের হাথি।
ভাঙ্গা ধান গেল প্রাণ খায়্যা মায়্যার নাথি ॥
পুয়া হৈল পুরাতন আকস নাই নড়ে।
ঘসনে কুশল নাঞি পার পড়ে গড়ে ॥
ইত্যাদি।

ভণিতা—

রামেশ্বর রাচল রসিকরসোদয়।
হরপিরিতে হরি বল পাপ জাকু ক্ষয় ॥

১২ পত্রের শেষ—

শৈলসুতা শিলের উপরে রাখ্যা হাথ।
নির্ভয়ে নির্ঘাত মাল্য বার পাচ সাত ॥
গুড়া হয়্যা গেল নোড়া গায়ে হৈল ঘর্ম্ম।
শঙ্খে না বসিল দাগ শঙ্করের কর্ম্ম ॥
বড়২ পাথরে কাছাড় মারে নয়্যা।
বিস্তর পাথর গেল চুরমার হয়্যা ॥
বলে কর্ম্ম বাকা হৈল শাখা হৈল যম।
কুডার্য্যা কাটিতে কর করিল উদ্যম ॥

—

৫২৮। পদ্মাপুরাণ।

রচয়িতা—দ্বিজ বংশীদাস। পত্র ১-২২৯, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪।১ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৮ সাল। প্রথম পৃষ্ঠায় দশাবতার বন্দনার পর কবির আত্মপরিচয় এইরূপ,—

দিশা ॥

আদ্যে বন্দিব প্রভু এক নিরঞ্জন।
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন সেহি নারায়ণ ॥
বন্দ্যঘটি গাঞি ঘর রাড়ির প্রধান।
শাণ্ডিল্য গোত্র বলি যাহার বাখান ॥
গৌতম মুনির শাখা তৃতীয় প্রবর।
দামু ওঝার ধারা সামবেদতৎপর ॥
বংশবীজ পূর্ব্ব গোসাঞি গুরু চক্রপাণি।
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের জ্ঞানী ॥

রাড়া হতে আসিলেক লৌহিত্যের পাশ।
পাওআইড়…বজি বাস্থ গ্রামেতে নিবাস॥
সম্বন্ধ করিল রত্নাবতী ঠাকুরাণী।
তান পুত্র কালিদাস সর্ব্বত্র বাখানি॥
তাহান পুত্র পুরুষোত্তম অতি মহাশয়।
এক প্রজাপতি করি সর্ব্বলোকে কয়॥
দানে শীলে মর্য্যাদা সম্পদ অতিশয়।
বিজয়ানন্দন হইল তাহান তনয়॥
তাহান তনয় যাদবানন্দ মহাশয়।
দ্বিজ বংশীদাসে কহে তাহান তনয়॥
করি শঙ্করের পায়ে মা গো নমস্কার।
পদ্মার চরিত্র কিছু করিতে প্রচার॥
প…ণের কথা শুন একচিত্তে।
শক্তিরূপ করিয়া কহিব পুরাণের মতে॥
বামন হইয়া চাহো আকাশ ধরিতে।
পতঙ্গ হইয়া চাহো সমুদ্র তরিতে॥
গরুড় উড়িতে যেন কাক পাছে ধায়।
সিংহ ধাইতে শৃগাল পাছে যায়॥
দ্বিজ বংশীদাসে কহে যাদবানন্দসুতে।
হরের কুমারী বন্দো শুন একচিতে॥

পুথির শেষ—

রথে ভরে উষা গেলা আকাশ গমন।
গঙ্গাস্নান করি অঙ্গ করিলা শোধন॥
যেহি স্থানে হৈল গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।
ভোগবতী অলকানন্দা স্বর্গমন্দাকিনী॥
সেহি স্থানে স্নান করিলা আসন।
যোগবলে শরীর ছাড়িলা দুই জন॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বোল নারায়ণ॥

ইতি পর্দ্দপুরান পুস্তক সমাপ্ত॥ সকিয় পুস্তক শ্রীযুগলকিসোর রায়॥ বাড়ি মোকাম রৌহা। ……য়াস্বীনের ২৮ তারিখ গুরুবার হএ। মহা জে সপ্তমী করি সর্ব্বলুকে কএ॥ সেহি দিন পুথি সাঙ্গ তিন প্রহর গতে। বহু লুক আসিছিল পুজার বাড়িতে॥ হেনই সময় পুথি হইলেক সাঙ্গ। দসভুজা দেখি মনে হইলেক রঙ্গ॥ সনেতে সন ১২৩৮ সন।… সকাব্দা ১৭৫০ শাক সমাপ্ত॥

——

৫২৯। মনসামঙ্গল।

রচয়িতা—ক্ষেমানন্দ দাস। পত্র ১-৪৮, সম্পূর্ণ। মোটা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ৭ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪।০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৪ সাল।

পুথিখানি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। কেন না, ইহার ভাষা বাঙ্গালা; কিন্তু কায়েথী ও নাগরী অক্ষরের সংমিশ্রণজাত একপ্রকার লিপিতে লিখিত। এরূপ পুথি সচরাচর বড় দেখা যায় না। আরও একটি বিশেষ এই যে, এই মনসামঙ্গলের অন্যান্য পুথিতে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ, উভয় নামযুক্ত ভণিতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু আলোচ্য পুথির আগাগোড়া মাত্র ক্ষেমানন্দেরই ভণিতা আছে; কেতকাদাসের কোনরূপ উল্লেখ নাই। আরম্ভ—

আস্তিকস্য মুনের্ম্মাতা [ইত্যাদি শ্লোক]।
অথ মনসামঙ্গল লিখ্যতে॥
রাম দুলালিয়া রে যাদব দুলালিয়া।
ওরে কত দিন বেড়াবে গোপাল
হামাগুড়ি দিয়া॥

এই হইতে আরম্ভ করিয়া—

যমদূত আস্তে যখন বান্ধ্যে লয়ে যাবে।
সীতারাম বিনে তখন কার দোহাই দিবে॥

পর্য্যন্ত প্রায় দুই পৃষ্ঠাব্যাপী অংশের পরে গ্রন্থারম্ভসূচক দেবদেবীর বন্দনা এইরূপ—

বন্দিব শ্রীগণপতি শিবের নন্দন।
একদন্ত স্থূলতনু মুষিকবাহন॥
বন্দো প্রভু রঘুনাথ কমললোচন।
চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি আর বরুণ পবন॥
সাবধান হয়ে বন্দো গঙ্গা ভাগীরথী।
যাহার পরশে ভাই হয়ে মুখ্য গতি॥
বন্দো শিব ভোলানাথ করি নমস্কার।
কালকূট বিষ যেই করিল সংঘার॥
স্বর্গে ইন্দ্ররাজ বন্দো পাতালে বাসুকি।

... ...

গয়ে গদাধর বন্দো প্রয়াগে মাধব।
অযোধ্যাতে রাম বন্দো গোকুলে যাদব॥
বন্দিব শ্রীনন্ধার চান্দ বড় প্রতিআশে।
জার গুণে হরিনাম হইল প্রকাশে॥
উড়িষ্যাতে বন্দিব ঠাকুর জগর্নাথ।
এমন কুথায় শুনি নাহি বাজারে বিকায় ভাত॥
নীলাচলের পথে যাত্যে বড় লাগে দুখ।
সব দুখ দূরে যাবে দেখ্যে চান্দমুখ॥
আঠারনালাতে যাত্যে খায়ে বেতের বাড়ি।
বেতের বাড়ি খায়ে পাপী যায় গড়াগড়ি॥
জগর্নাথের মুখ দেখি দুস্থ পাসরিল।
কনচুরে জাএ জাতি (?) গড়াগড়ি দিল॥

... ...

আস্ত মা মনসা দেবী ঘটে কর ভর।
তুমার মঙ্গল গাইবেক অধম পামর॥
আমার আসরে আস্ত দেবী মা মনসা।
গায়ে দিবে বল মাতা তুমারি যে আশা॥
আমার আসর ছাড়্যে মা অন্যের আসরে জায়।
দোহাই মা শিবের গো গণেশের মাথা খায়॥
মনসা বসিল আসি আমার আসরে।
কার্ত্তিক গণেশ আইল দুই সহোদরে॥
বন্দো উমা কাত্যায়নী করিএ ভকতি।
সাবধান হয়্যা বন্দ দেবী সরস্বতী॥

... ...

রোহিণী যোগিনী বন্দো যক্ষ প্রেত ভূত।
কার নাম জানি নায়ি আছয়ে বহুত॥
তুমি মোর ভগিনী তুমার আমি ভাই।
আসরে করিলে ঘা মনসার দোহাই॥
দোহাই না মান যদি মোরে কর ঘা।
তবে শিক্ষাগুরুর মাথাতে পাখাল বাম পা॥

... ...

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণপদে করি নমস্কার।
মনসামঙ্গল গীত করিব উচ্চার॥
ক্ষেমানন্দ শিশু বলে করিএ মিনতি।
আসরে করহ খেলা দেবী পদ্মাবতী॥

গ্রন্থারম্ভ—

শুভ ক্ষণে বন্দো দেবী মনসার চরণ।
ও মা কৈলাস ছাড়িএ গো আসরে দেহ মন॥
শুন শুন সর্ব্বজন করি নিবেদন।
মনসার মঙ্গল গীত করহ শ্রবণ॥
চান্দ সদাগর তার চাম্পা নগরে বাস।
মনসার সঙ্গে তেহোঁ করিল বিবাদ॥
দেবী বলে চান্দ বান্যা আমার বাক্য ধর।
·· পুষ্প জলে জে মনসার সেবা কর॥
এতেক শুনিএ চান্দ কোপ কৈল মনে।
চেংগমুড়ীর পাখানি আমি পূজিব কেমনে॥

ভণিতা—

মনসার চরণতলে ক্ষেমানন্দ গায়।
চান্দ সদাগর ভাবে কি হবে উপায়॥

পুথির শেষ—

আইল সকল বান্যা চান্দের ভবনে।
ব্রাহ্মণ ভোজন আগে করাল্য তখনে॥
দক্ষিণা দিলেন চান্দ জত দ্বিজগণে।
একে একে বিদায় সবে কইলা চান্দের স্থানে॥
কুটুম্বের ভক্ষ্য ভোজ্য হইল ততপর।
অনেক সম্মান করে চান্দ সদাগর॥
সব বান্যা বিদায় হএ করিল গমন।
তাহাদিগে চান্দ বান্যা কৈল সম্ভাষণ॥
অবিজ্ঞা না কর্য়া ভাই বলিএ সভারে।
অবিজ্ঞা করিলে দুস্থ পাইবে সে নরে॥
মনসার চরণে আমার মজ্যে গেল চিত্ত।
ভাসানের গীত বল হইল সমাপ্ত॥
মনসামঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দে গায়।
বিপদে পড়িলে দেবী রাখিবে আমায়॥

লীখীতং শ্রীপতীত পট্টনাএক সাকীম ডীমডীহা পরগনে নাখদা চাকলে পঞ্চকোট॥ জথা দীস্টং [ইত্যাদি]। পুস্তকমীদং শ্রীছীরু মাঝী সাকীম রুহড়া পরগনে নাখদা॥ ইতী সন ১২২৪ সাল তারীখ ১৪ শ্রাবন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৩৬৩ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়—

বিবরণ	টাকা
গত বৎসরের জের	৩,৫০০৲
চাঁদা	৭,০০০৲
প্রবেশিকা	২০০৲
গ্রন্থবিক্রয়	৫,০০০৲
বিজ্ঞাপন	১৫০৲
পৌরপ্রতিষ্ঠানের সাহায্য	৫০০৲
প. ব. সরকারের সাহায্য	৩,২০০৲
গ্রন্থ-মুদ্রণ — ২০০০৲	
পত্রিকা-মুদ্রণ—১২০০৲	
এককালীন দান	৫০০৲
স্থায়ী তহবিলের সুদ	৩০০৲
কার্য্য-পরিচালনার আয়	৭০০৲
বিবিধ	২০৲
সুদ	৮০৲
গ্রন্থ তালিকা সংকলনে	
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য	৫,০০০৲
ঘাটাত	৩,৬৫০৲
	২৯,৮০০৲

ব্যয়—

বিবরণ	টাকা
গ্রন্থ-মুদ্রণ	৭,০০০৲
পত্রিকা-মুদ্রণ	১,২০০৲
বিবিধ-মুদ্রণ	৩০০৲
বিজ্ঞাপন	২০০৲
পুস্তকালয়	
(পুস্তক খরিদ তহবিল)	১,০০০৲
আলো ও পাখা	২০০৲
টেলিফোন	২০০৲
চাঁদা আদায় খরচ	৭০০৲
ডাকখরচ	৫০০৲
দপ্তর সরঞ্জাম	২০০৲
হাওলাত শোধ	১,০০০৲
আসবাব	৪০০৲
বেতন, ভাতা :—	
সাধারণ	৬,৭০০৲
গ্রন্থাগার	২,৬০০৲
পুথিশালা	১,২০০৲
চিত্রশালার ব্যয়	২০০৲
মন্দির সংরক্ষণ তহবিল	৫০০৲
প্রঃ ফাঃ তহবিলে পরিষদের দান	৫০০৲
বিবিধ ব্যয়	১০০৲
পাথেয়	১০০৲
গ্রন্থ তালিকা সঙ্কলন-ব্যয়	৫,০০০৲
	২৯,৮০০৲

বঙ্গীয়-সাহিত্য-

১৩৬২ বঙ্গাব্দের ৩০এ চৈত্র তারিখের

সাধারণ তহবিল			
গত উদ্বর্ত্তপত্র হইতে আগত	১,৮৩,৮৮৪॥৶১০		
বাদ ; আয় ব্যয় মূলে	৩,০২৭৵ ৯		
	১,৮০,৮৫৬৸৵ ১		
যোগ ; ক্রীত ও সংগৃহীত পুস্তক	৪৮৭ ৵০		
„ পুথি	৩৫৫৲	১,৮১,৬৯৯৲ ৻১	
কর্ম্মচারিগণের জামিন	১৫০৲		
বিবিধ আমানত	১৪৲		
অগ্রিম চাঁদা	২১০॥০		
বিবিধ দেনা	৯১৮।০		
স্থায়ী তহবিল হইতে	১,০০০৲	২,২৯২৸০	
বিভিন্ন তহবিলের দেনা			
ঝাড়গ্রাম	৮৬৫৲		
বাদ ; পাওনা			
দুঃস্থ-সাহিত্যিক তহবিলের দরুণ ৭৩।০			
লালগোলা তহবিল হইতে ২৫৫৸৵০	৩২৯ ৵০	৫৩৫৸৵০	১,৮৪,৫২৭॥৵১
			১,৮৪,৫২৭॥৵১

হিসাব-পরীক্ষকদ্বয়ের মন্তব্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৬২ বঙ্গাব্দের ৩০এ চৈত্র তারিখের উদ্বর্ত্তপত্র ও উক্ত বঙ্গাব্দের আয়ব্যয়ের হিসাব আমরা যথাযথভাবে পরীক্ষা করিয়াছি। আমাদের মতে, উক্ত উদ্বর্ত্তপত্র ও আয়ব্যয়ের হিসাব নির্ভুল ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে। পরিষদ্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী পরিষদের সমুদয় আর্থিক অবস্থা উদ্বর্ত্তপত্রে সঠিকভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী
বি. এ. এফ. সি. এ,
চার্টার্ড একাউণ্টাণ্টস্

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
বি. এসসি. এফ. সি. এ.
চার্টার্ড একাউণ্টাণ্টস্

১৪-৪-৬৩

বঙ্গীয়-সাহিত্য-

বিবিধ গচ্ছিত তহবিল ও

			১,৮৪,৫২৭॥৵ ১
জের—			
গত উদ্বর্ত্ত পত্র হইতে আগত			
গচ্ছিত তহবিল হইতে	৭৯,০৪৫॥/ ৫		
স্থায়ী " "	১৬,২৪৬৸৵১১		
	৯৫,২৯২॥ ৪		
যোগ ; আয়ব্যয় মূলে	৩,৭৭৬৸৵ ৩	৯৯,০৬৯।৵ ৭	
কাগজের মূল্য দেনা (ঝাড়গ্রাম)	৮৪০৲		
লালগোলা তহবিলের দেনা			
সাধারণের নিকট	৩২৯ ৵ ০		
ঝাড়গ্রামের নিকট	১৪৲		
রকফেলার ফাউণ্ডেসন			১,০৫,২৫২॥ ৭
প্রদত্ত বৃত্তি দেনা	৫,০০০৲	৬,১৮৩ ৵ ০	
মন্দির সংরক্ষণ তহবিল—			
গত বৎসরের জের	৩,৩৯৯৲		
সাধারণ তহবিল হইতে	৫০০৲		
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দান	১০,০০০৲		
বিবিধ আয়	৫৬॥⁄ ০		
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট দেনা	৬১॥৵ ৩	১৪,০১৭।/ ৩	
বাদ ; মেরামত খরচ	১৩,৭১১॥৵ ৩		
	২৬৭৸৵ ০	১৩,৯৭৯॥ ৩	৩৭৸/০
পুস্তকালয় পুস্তক খরিদ তহবিল—			
পুস্তকালয় ; গত বর্ষের জের	১২৬ / ০		
সাধারণ তহবিল হইতে	১,০০০৲	১,১২৬ / ০	
বাদ ; পুস্তক খরিদ ও বাঁধাই		৭৯৪৸ ৬	৩৩১। ৬
পুস্তকালয় আমানত তহবিল			
গত বৎসরের জের	২,৮৫৫৲		
১৩৬২ বঙ্গাব্দে জমা	১,২০৭৸৵ ০		
সুদ	৮।/ ০	৪,০৭১ ⁄ ০	
বাদ ; ১৩৬২ বঙ্গাব্দে ফেরত	৬৫৫৲		
বিবিধ ব্যয়—	/০	৬৫৫ / ০	৩,৪১৬ ৵০
প্রভিডেণ্ট ফণ্ড তহবিল—			
গত বৎসরের জের	২,৫৮১৲		
কর্ম্মচারীর চাঁদা	৪৩১॥/ ০		
কার্য্যালয়ের দান	৪৩১॥/ ০		
সুদ	৮৮॥⁄ ০	৩,৫৩২৸/ ০	
বাদ ; মৃত বিশ্বনাথ কাহারের দেনা শোধ		১৯৩।৵ ৬	৩,৩৩৯।৵৬
			২,৯৬,৯০৪৸ ৮

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৩৬২, ৩০শে চৈত্র তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার আয়-ব্যয় বিবরণ

সাধারণ তহবিল

ব্যয়	টাকা	আয়		টাকা
বেতন ভাতা ইঃ	৪,৫২৩ ॥৵০	চাঁদা		৭,৩৪৬ ॥০
পুস্তকালয়	৩,৪৭১ ৸৴০	প্রবেশিকা		১৭৩৲
পুথিশালা	৬৩৫ ॥৴০	গ্রন্থ বিক্রয়		৯,৫৪৯ ॥৵০
গ্রন্থ-মুদ্রণ	৬,৭১৫ ৵ ৫	ঐ খরচ আদায়		৫৩ ৸৴৩
পত্রিকা মুদ্রণ	১,৫৭৩ ॥৶ ৩	পুস্তক বিক্রয় বিভাগের		
চিত্রশালার খরচ	৫৭ ।৵ ৬	কার্য্য পরিচালনার আয়		১,৪১০ ॥ ৩
বিবিধ ব্যয়	৪৩১ ৸৵০	পত্রিকা বিক্রয়		৬৭১ ৶৬
দপ্তর সরঞ্জাম	১৭১ ॥৵০	বিবিধ আয়		১০০ ॥ ৬
গাড়ী ভাড়া	৫০ ॥৵ ৩	ঘর ভাড়া		৩৩০৲
চাঁদা আদায় খরচ	৯৩০ ৸০	এককালীন দান		
বিবিধ মুদ্রণ	২২৭ ৸ ৩	বিবিধ	৫০০৲	
আলো ও পাখা	১৭২ ৶৯	কলি. পৌর-প্রতিষ্ঠান	৫০০৲	
ডাক ব্যয়	৩৩৩ ।৵ ৯	প. ব. সরকার	১,২০০৲	
বিক্রয় কর	॥৴০	” ”	২,০০০৲	
ট্যাক্স	১,০৩৪ ৵০		৪,২০০৲	৪,২০০৲
মন্দির সংরক্ষণ তহবিল চালান	৫০০৲	স্থায়ী হইতে (সুদ)		৫০০৲
কাগজের মূল্য	২,৬৫৩ ॥৵ ৬	সুদ		৮১ ৸৵০
বিজ্ঞাপন	৭৫৲	প্রতিষ্ঠা উৎসব		৩৬ ৶৬
পূর্ব্ব বৎসরের মজুদ গ্রন্থ	৪৩,৫৯৪৲	বৎসরের শেষে মজুদ গ্রন্থ		৪৪,১৭১ ৸৴৬
ঐ কাগজ	৩৪৯ ৶৬	” কাগজ		৯৯২৲
ক্ষয়ক্ষতির জন্য মূল্য হ্রাস	৪,৯৫৩ ॥৴ ৯	পুস্তক-প্রকাশ বিভাগের চলতি		
প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে দান	৫৩১ ॥৴০	কাজ		৩৮৯ । ৬
টেলিফোন	১৬৭ ৶০	ব্যয়াধিক্য (Balance)		৩,০২৭ ৸৴৯
	৭৩,০৩৪ ৴৯			৭৩,০৩৪ ৴৯

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৩৬২, ৩০শে চৈত্র তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার আয়-ব্যয় বিবরণ

গচ্ছিত তহবিল সকল

গ্রন্থ মুদ্রণ (ঝাড়গ্রাম)	৬,৫১৪ ৸০ ৬	গ্রন্থ বিক্রয় (ঝাড়গ্রাম)	৬,৬০২ ।৶ ৩
বিজ্ঞাপন „	৫৩৪৲	ঐ খরচ আদায় ”	১৯ ৸৵ ৬
বিবিধ ব্যয় „	/০	গ্রন্থ বিক্রয় (লালগোলা)	১,৩৫৬ ॥৵০
কাগজ খরচ „	৩,২২৮ ।৶ ৩	ঐ খরচ আদায় ”	৪ ॥৶০
গ্রন্থ মুদ্রণ (লালগোলা)	১,১৯৯ ।০	সুদ (ঝাড়গ্রাম)	৬৮ ৸০
কাগজ খরচ „	৪১৯ ৵ ৯	„ (বিবিধ)	১,৪১৯ ।৵০
সাহায্য (দুঃস্থ সাহিত্যিক)	৩১৩৲	এককালীন দান	৪৭৲
বিবিধ ব্যয়	২৬ ৵০	বৎসরের শেষে মজুদ	
স্থায়ী হইতে সাধারণে	৫০০৲	গ্রন্থের মূল্য	৩৭,৭৯০ ।৵ ৬
পুরস্কার	১৫০৲	বৎসরের শেষে মজুদ	
পূর্ব্ব বৎসরের মজুদ গ্রন্থ	৩০,৯৬৬ ৵ ৬	কাগজের মূল্য	১,২৩৫ ।/০
„ „ কাগজ	১,৪৮৯ ।৵০	গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগের	
সমতার জন্য (Balance)	৩,৭৭৬ ৸৵ ৩	চলতি কাজ	৫৭২ ৸০
	৪৯,১১৭ । ৩		৪৯,১১৭ । ৩

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৩৬২ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিলের জমা, খরচ ও উদ্বৃত্তের বিবরণ

তহবিলের নাম	গত বৎসরের জের	আয়	মোট	ব্যয়	উদ্বৃত্ত	কোং কাগজ	মজুদ পুস্তক	কাগজ ষ্টক	পুস্তক-প্রকাশ বিভাগের চলতি কাজ
মহাভারত আদিপর্ব্ব	৯৪।৶ ০	—	৯৪।৶ ০	—	৯৪।৶ ০	—			
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	৩৮।৵ ৯	১২৲	৫০। ৯	১০।৵ ০	৩৯৷৵ ৯	৪০০৲			
রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি	৩২ / ৭	১৫৲	৪৭ / ৭	৪৷৵ ০	৪২ ৶ ৭	৫০০৲			
কাশীরাম দাস স্মৃতি	২৯।৵ ৬	২৫। ০	৫৫ ৵ ৬	৪৷৵ ০	৫০। ৬	৮০০৲			
হুন্ন-সাহিত্যিক ভাণ্ডার	৫৬।৵১০	৪৪৭। ০	৫০৩।৵১০	৩২৬।/ ০	১৭৭।/১০	১০,৯০০৲			
স্বর্ণকুমারী দেবী	৬৭৵ ১১	৬৲	৭৩ ৵১১	৫০। ০	২২।৵১১	২০০৲			
অক্ষয়কুমার বড়াল	১১৷৵১০	৭৲	১৮৷৵১০	—	১৮৷৵১০	২০০৲			
ঐতিহাসিক অনুসন্ধান	১০৬৷৶১০	৩০৲	১৩৬৷৶১০	১৲	১৩৫৷৶১০	১,০০০৲			
জগদীশ বসু	৪৮০।৵ ১	৯০৲	৯৩০।৵ ১	১৲	৯২৯।৵ ১	৩,০০০৲			
লীলা দেবী	১০২।/ ০	৯৲	১১১।/ ০	১০১৲	১০।/ ০	৩০০৲			
ব্রজেন্দ্র-গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশ	২,৫৬০।৵ ০	৩৮।৵ ০	২,৫৯৯৲	—	২,৫৯৯৲	—			
স্থায়ী তহবিল	৩৯২।৵১১	৪৬৯। ০	৮৬১৷৵১১	৫৪৫। ০	৩১৬।৵১১	১৪,৭০০৲			
লালগোলা	৩,২৬২।৶ ৪	১৩,৯৮৪।৶ ৯	১৭,২৪৬৷৶ ১	৮,৬০৫।৵ ৯	৮,৬৪১। ৪	১৩,০০০৲	৪,১২১৲	৭০১৲	৫৭২৷০
ঝাড়গ্রাম গ্রন্থ প্রকাশ তহবিল	৮,৮৯৯।৵ ০	৭,৬৬৮৷৵ ০	১৬,৫৬৮৲	১১,৪২৭৷ ৬	৫,১৪০ ৶ ৬	—	৩৩,৬৬৯।৵ ৬	৫৩৪।/০	
মোট	১৬,৪৯৫ / ৭	২২,৮০২।৶ ৯	৩৯,২৯৭।/ ৪	২১,০৭৮।৵ ৩	১৮,২১৯ ৶ ১	৪৫,০০০৲	৩৭,৭৯০।৵ ৬	১,২৩৫।/০	৫৭২৷০

প্রমথ চৌধুরী

প্রবন্ধসংগ্রহ

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক নির্বাচিত

পঞ্চাশটি প্রবন্ধ

প্রথম খণ্ড ॥ সাহিত্য। ভাষার কথা

দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ভারতবর্ষ। সমাজ। বিচিত্র

প্রথম খণ্ড মূল্য ছয় টাকা, বাঁধাই সাত টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য পাঁচ টাকা, বাঁধাই ছয় টাকা

●

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত।
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
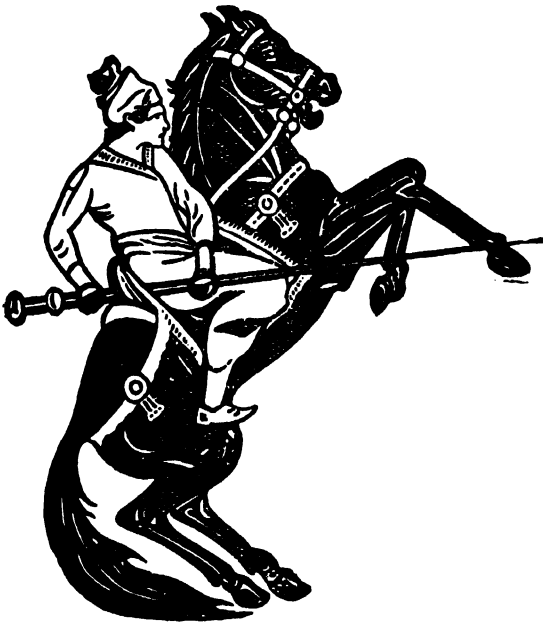
দ্বিষষ্টিতম বর্ষ । চতুর্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বিষষ্টিতম বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা

॥ বিষয়-সূচী ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
১৩৬৩

বিদ্যাপতির পদে মধুর রস

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

বিদ্যাপতি শৃঙ্গাররসের কবিতা রচনায় যৌবন কালের অধিকাংশ ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শিবসিংহের পিতা দেবসিংহ, পিতৃব্য হরিসিংহ, শিবসিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা পদ্মসিংহ, অর্জ্জুনসিংহ প্রভৃতির রাজ্যকালে কবি যে সব পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া ভণিতা হইতে প্রমাণিত হয়, তাহাতে অনুপম কবিত্ব থাকিলেও, ভক্তিভাবে উদ্দীপ্ত মধুররসের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সব কবিতায় দৈহিক সৌন্দর্য্য ও সম্ভোগের চিত্র উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে, কিন্তু দয়িতের সুখের জন্য আত্মোৎসর্গে যে অনুরাগের চরম সার্থকতা, তাহার কথা ততটা পরিস্ফুট হয় নাই। দুই একটি উদাহরণ দিলে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

শিবসিংহনামাঙ্কিত অনেকগুলি কবিতায় দেখা যায় যে, নায়ক, নায়িকার দেহের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু বিদ্যাপতির এই যুগের লেখায় নায়িকার পূর্ব্বরাগ সম্বন্ধে মাত্র দুইটী কবিতা এ যাবৎ সংগৃহীত হইয়াছে। উহার মধ্যে ৩৩ সংখ্যক পদটীতে রাধিকা বলিতেছেন—

জমুনক তিরে তিরে সাঁকড়ি বাটী।
উবটি ন ভেলিহু সঙ্গ পরিপাটী॥
তরুতর ভেটল তরুন কহ্নাই।
নয়নতরঙ্গে জনি গেলিহু সনাই॥
কে পতিয়াএত নগর ভরলা।
দেখইতে সুনইতে মোর হৃদয় হরলা॥
পলটি ন হেরল গুরুজন লাজে।
বচন মোঞে চুকিলিহু সখিহ্নি সমাজে॥
এতদিন অছলিহু অপনে গেয়ানে।
আবে মোরা মরম লাগল পচবানে॥
নিঠুর সখি বিসবাস ন দেই।
পরক বেদন পর বাটি ন লেই॥

যমুনাতীরের সঙ্কীর্ণ পথে তরুতলে তরুণ কানাইয়ের সঙ্গে রাধার দেখা হইল; কানাইয়ের নয়নের তরঙ্গে যেন রাধা অবগাহন স্নান করিলেন—এই উপমা অতুলনীয়। রাধা শ্রীকৃষ্ণকে ফিরিয়া দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেও গুরুজনের ভয়ে দেখিতে পারিলেন না; অন্যমনস্কা হইয়া পড়িলেন; সখীদের কথার উত্তর দিতে গোলমাল হইয়া গেল—এক কথার উত্তরে অন্য কথা বলিলেন। অতএব তিনি আত্মসচেতন হইলেন যে, তাঁহার মর্ম্মে পঞ্চবাণের আঘাত

লাগিয়াছে; কিন্তু তিনি যে প্রেমে পড়িয়াছেন, তাহা সখীরা বিশ্বাস করেন না; তাঁহার বেদনার অংশ অন্যে গ্রহণ করে না, এও তাঁর আর এক দুঃখ। যেখানে অপরে কি করিল না করিল, তাহার উপর এত নজর, সেখানে মধুর রসের উদ্দিষ্ট আত্মভোলা অনুরাগ জাগে নাই বুঝিতে হইবে।

রাধিকার পূর্ব্বরাগবিষয়ক অপর পদটী মিত্র মজুমদার সংস্করণের ৩৪ সংখ্যক পদ। ইহা অমরুশতকের ভাব লইয়া লিখিত হইলেও, কবিত্বরসে ভরপুর। মাধবের সঙ্গে দেখা হইল, রাধিকা নিজেকে সম্বরণ করিবার জন্য মুখ নীচু করিলেন, নয়ন চুরি করিয়া পাছে দেখিয়া ফেলে, সেই জন্য বিশেষ যত্ন লইয়া তাহাকে নিবারণ করিলেন, কিন্তু চকোর যেমন চাঁদের দিকে উড়িয়া যায়, তেমনি প্রিয়তমের মুখচন্দ্রের সুধা পান করিবার জন্য নয়ন ধাবিত হইল। তথাপি সেখান হইতে জোর করিয়া চোখ হঠাইয়া মাধবের পায়ের দিকে রাখিলেন। কিন্তু চরণকমলের মধু পান করিয়া নয়ন যেন মাতাল হইয়া গেল—তাহার আর নড়িবার ক্ষমতা নাই, তথাপি বারংবার পক্ষ বিস্তার করিতে লাগিল মাধবের মুখ দেখিবার জন্য :—

অবনত আনন কএ হম রহলিহু
বারল লোচন চোর।
পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল
জনি সে চাঁদ চকোর॥
ততহু সঞো হঠে হটি মোঞে আনল
ধএল চরণ রাখি।
মধুপ মাতল উড়এ ন পারএ
তইঅও পসারএ পাখি॥

অমরুর "তদ্বক্ত্রাভিমুখং বিনমিতং দৃষ্টিঃ কৃতা পাদয়োঃ" শ্লোকের কবিত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা মূল কবিতার সৌন্দর্য্যকে পরাজিত করিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু মনে হয়, উপমাবাহুল্যে অনুরাগিণীর সহজ মধুর ভাবটি যেন চাপা পড়িয়াছে; তাই পাঠকের মনে উহা অনুরাগের ছোপ লাগাইতে পারে না।

কবি পরিণত বয়সে রাজসভার আবহাওয়া হইতে দূরে বসিয়া যখন নিছক মনের আনন্দে গীতিকবিতা লিখিয়াছেন, তখন অনুরাগের সুর গভীর ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া শ্রীরাধার মনে অনুরাগের সঞ্চার হইবে; তাঁহার অন্তরলোকে দয়িতের যে মধুর মূরতি ফুটিয়া উঠিবে, তাহাই পাঠকের চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া 'পরানুরক্তি ঈশ্বরে' জাগাইবে, ইহাই তো উজ্জ্বল রসের সাহিত্যের প্রস্থানভূমি। কিন্তু রাজনামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে ২২টি পদে নায়িকার বয়ঃসন্ধি ও তারুণ্যের বর্ণনা থাকিলেও, একটি পদেও শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা নাই। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, যে বিদ্যাপতির জন্মের বহু পূর্ব্বে সংগৃহীত সদুক্তিকর্ণামৃত, জহ্লনের সদুক্তিমুক্তাবলী ও শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে নায়িকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশদ বর্ণনামূলক শ্লোক বহু সংখ্যায় সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু নায়কের রূপবর্ণনার একটি শ্লোকও

ধৃত হয় নাই। আজকাল সিনেমায় রূপবান্ অভিনেতার কদর, সুন্দরী অভিনেত্রীর চেয়ে কম নহে; কিন্তু মধ্যযুগে কাব্যচর্চ্চা করিবার মতন শিক্ষা ও সুযোগ উচ্চশ্রেণীর পুরুষদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল; তাই শৃঙ্গাররসের কবিরা ও সুভাষিতসংগ্রহকারগণ পুরুষের রূপের বর্ণনা দিবার সামাজিক প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

মিত্র-মজুমদার সংস্করণের ৩৫ সংখ্যক পদে 'নীলকলেবর পীতবসনধর' ইত্যাদি শব্দে কবি ভক্তরসিকের মনে যে আশা জাগাইয়াছিলেন, ভণিতায় "শিবসিংহ রায় তোরা মন জাগল, কানু কানু করসি ভরমে" বলিয়া তাহা নিষ্ঠুর ভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিলেন। মিথিলা ও নেপালে পুথিতে লিখিত বা লোকমুখে সংগৃহীত এমন একটি পদও পাওয়া যায় নাই, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা আছে। বাংলাদেশে সংরক্ষিত বিদ্যাপতির পদসমূহের মধ্যে এই বিষয়ে মাত্র দুইটী পদ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটিতে (মিত্র-মজুমদার, ৬৩০ সংখ্যক) কবি প্রচলিত প্রথানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত কমল, চন্দ্র, তমাল, বিদ্যুৎ, নবপল্লব, বিম্বফল, শুকচঞ্চু, খঞ্জন, সর্প প্রভৃতির উপমা দিয়াছেন। রসসৃষ্টি অপেক্ষা প্রহেলিকার দিকে যেন কবির ঝোঁক অধিক। এই পদটী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে উদ্ধৃত করিলেও, রাধামোহন ঠাকুর ও বৈষ্ণবদাস তাঁহাদের সংগ্রহে স্থান দেন নাই।

অপর একটি পদ (মিত্র-মজুমদার, ৬২৯ সংখ্যক) কোন প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থে পাওয়া যায় নাই; সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কোন স্থান হইতে উহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই একটি মাত্র পদেই বিদ্যাপতির চিত্তমুকুরে শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়—

অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীতবসনপরা সৌদামিনি রেহ॥
সামর ঝামর কুটিলহি কেস।
কাজরে সাজল মদন সুবেস॥
জাতকি কেতকি কুসুম সুবাস।
ফুলসর মনমথ তেজল তরাস॥

এ স্থানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, 'বর্হাপীড়' ও 'স্বাধরে ন্যস্তবেণুর' কোন উল্লেখ এখানে নাই, যদিও পূর্ব্বোল্লিখিত পদটীতে (৬৩০), 'তাপর সাপিনি ঝাঁপল মোর' শব্দে ময়ূরপুচ্ছের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

রাজসভার আবহাওয়ায় যে সব পদ রচিত হইয়াছে, তাহাতে বংশীধ্বনির ইঙ্গিতের নিতান্ত অভাব। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে রচিত একটি পদে (২৫৩ সংখ্যা) কেবল মুরলী-ধ্বনির কথাই নহে, নন্দকিশোরের বন্দনার কথাও আছে। কবিচিত্তের ক্রমবিকাশের ধারা বুঝিবার পক্ষে এই সূত্রটী বিশেষ মূল্যবান্। নগেন্দ্রবাবু বিদ্যাপতির প্রায় সকল পদকেই মধুররসের পদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; তাই তিনি এটিকে তাঁহার সঙ্কলনে প্রথম স্থান দিয়াছিলেন।

পদটীর অকৃত্রিমতায় সন্দেহ করা চলে না; কেন না, উহা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মিথিলার কবি লোচন তাঁহার রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মিথিলার আধুনিক লেখকেরা জোর করিয়া বলেন যে, বিদ্যাপতি স্মার্ত্তপথাবলম্বী শিব উপাসক ছিলেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন না। পদটীতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভক্তির সুন্দর নিদর্শন রহিয়াছে—

নন্দক নন্দন কদম্বেরি তরুতরে
ধিরে ধিরে মুরলি বোলাব।
সময় সঙ্কেত নিকেতন বইসল
বেরি বেরি বোলি পঠাব॥
সামরী তোরা লাগি
অনুখনে বিকল মুরারি॥
জমুনাক তির উপবন উদবেগল
ফিরি ফিরি ততহি নিহারি।
গোরস বিকে নিকে অবইতে জাইতে
জনি জনি পুছ বনবারি॥
তোঁহে মতিমান্, সুমতি মধুসূদন
বচন সুনহ কিছু মোরা।
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরযৌবতি
বন্দহ নন্দকিশোরা॥

ভাগবতের যে কৃষ্ণ 'জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং' গীতগোবিন্দের যে মাধব 'নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুং', তিনিই এখানে শ্রীরাধার সহিত মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ বেণুনিনাদ করিয়া দয়িতাকে আহ্বান করিতেছেন। আর ব্রজরসের উপাসনায় দূতীর স্থান গ্রহণ করিয়া বিদ্যাপতি শ্রীরাধাকে উপদেশ দিতেছেন—"সুন্দরি! তুমি বুদ্ধিমতী, মধুসূদনও সুমতি," অতএব কুলশীল গৌরবকে তুচ্ছ করিয়া নন্দকিশোরকে ভজনা কর।

শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বেণুনাদ শুনিয়া শ্রীরাধার মনে কি ভাব জাগে, তাহা রাজসভার কবি অনুভব করিতে পারেন নাই। কিন্তু দুঃখদুর্দ্দিনের অগ্নিপরীক্ষায় বিশুদ্ধীকৃতচিত্ত বিদ্যাপতি তাহা বুঝিতে পারিয়া লিখিয়াছেন—

কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁসি-নিসাস-গরলে তনু ভোর॥
হঠসয়ঁ পইসএ শ্রবনক মাঝ।
তহিখণ বিগলিত তনুমন লাজ॥
বিপুল পুলক পরিপূরএ দেহ।
নয়নে না হেরি, হেরএ জনু কেহ॥
গুরুজন সমুখ হি ভাবতরঙ্গ।
জতনহি বসন ঝাঁপি সব অঙ্গ॥

লহু লহু চরণ চলিএ গৃহমাঝ।
দইব সে বিহি আজু রাখল লাজ ॥
তনুমন বিবস খসএ নিবিবন্ধ।
কী কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ ॥—(মিত্র-মজুমদার, ৬৩৩)

রাধিকা কুলের বধূ; তিনি কানাইয়ের বেণুর আহ্বান শুনিতে চাহেন না; তিনি জানেন যে, শুনিলেই তাহার ডাকে সাড়া দিতে হইবে; কিন্তু শুনিতে না চাহিলে কি হইবে? ঐ বংশীধ্বনি যে চণ্ডীদাসের ভাষায় 'দুপুর্য়্যা ডাকাতি' (প. ৩. ৮২৭); সে জোর করিয়া কাণের ভিতর প্রবেশ করিল। যদি বাঁশীর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বঁধুয়াকে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে 'অমিয়সাগরে সিনান' হইত; কিন্তু বঁধুর কাছে ছুটিয়া যাইবার উপায় নাই; তাই বিচ্ছেদের গরলে যেন সমস্ত তনু আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কিন্তু বঁধু আমাকে ভালবাসে, আমাকে পাইবার জন্য তাহার মন আকুল হইয়াছে, এই কথা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে যে তনু-মন-লজ্জা সব বিগলিত হইল; স্থূল কঠিন যাহা কিছু ছিল সব যেন তরলীকৃত হইল; বিপুল পুলকে দেহ ভরিয়া গেল। চক্ষুর সম্মুখ হইতে ঘর-সংসার, পুরজন, গুরুজন, সব যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল— 'নয়নে না হেরি'। কিন্তু পরক্ষণেই জ্ঞান হইল—সামনে যে গুরুজন আছেন, তাঁহাদের সমক্ষে এ ভাবতরঙ্গ প্রকাশ পাইলে বঁধুয়ার সহিত মিলিত হইবার সকল আশাই বিদূরিত হইবে; তাই শ্রীরাধা কোন রকমে বসন দিয়া পুলকরোমাঞ্চিত দেহ আবৃত করিয়া ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া মুখর কবি বিদ্যাপতির যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ধন্দ শব্দের অর্থ সংশয়পূর্ণ করিয়াছেন; কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সংস্কৃত দ্বন্দ্বশব্দজ স্থির করিয়া ধাঁদা লিখিয়াছেন। পদের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সংশয় অপেক্ষা ধাঁদা অর্থই সমীচীন মনে হয়।

রাজনাম বিহীনপদগুলির মধ্যে শ্রীরাধার অনুরাগের আরও সাতটী উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া যায় (মিত্র-মজুমদার ২৩৮, ২৪০, ২৪১, ২৪৩, ২৬৭, ৬৩১, ৬৩২)। এই পদগুলির মধ্যে চারিটি রক্ষিত হইয়াছিল নেপালে; একটি মাত্র মিথিলায় এবং দুইটি বাংলা দেশে। মিথিলার পদটীর তুলনায় নেপালের পদগুলি গভীরতর ভাবের দ্যোতক; আর বাংলা দেশে রক্ষিত পদ দুইটি যেন সাধকের নিকট সাত রাজার ধন। ২৩৮ সংখ্যক পদটী নেপালের পুথি হইতে লওয়া; উহাতে—

সামর সুন্দর এঁ বাট আএল
তাঁ মোরি লাগলি আঁখি।
আরতি আঁচর সাজি ন ভেলে
সব সখীজন সাখি ॥

নব অনুরাগ ও লোকলজ্জার মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে; লজ্জা মুহূর্তের তরেও জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল বলিয়া শ্রীরাধা 'কঠিন হিরদয় ভেদি ন ভেলে' বলিয়া অনুশোচনা করিলেও, পরক্ষণেই বলিতেছেন—

স্থরপতি-পাএ লোচন মাগও
গরুড় মাগও পাঁখী।
নন্দেরি নন্দন মৈঁ দেখি আবও
মন মনোরথ রাখী॥

লজ্জাহীনা হইয়া সামরসুন্দরকে দেখিয়াছিলাম, এই তো আমার লজ্জা; কিন্তু দুই নয়নে দেখিয়া তো তৃপ্তি হইল না। সুরপতি ইন্দ্রের সহস্র নয়ন; তাঁহার নিকট হইতে যদি ঐ হাজার নয়ন ধার পাই, তবে একবার প্রাণ ভরিয়া প্রিয়তমকে দেখিয়া লই; কিন্তু তিনি তো এখন সামনে নাই, দেখিব কি করিয়া? বিষ্ণুর বাহন গরুড়; তাহার পক্ষ সকলের চেয়ে দ্রুতগামী; উহা যদি পাওয়া যায়, তবে হয় তো আমার কৃষ্ণদর্শনলালসা পূর্ণ হয়। দয়িতের অদর্শন যে এক মুহূর্ত্তও সহ্য হইতেছে না, 'নিমেষেণ যুগায়িতং,' তাই গরুড়ের পাখা যদি পাই, তবে এই ক্ষণেই সামরসুন্দরের কাছে যাইয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে ধারকরা হাজার নয়ন দিয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখি।

স্বল্পাক্ষরে গভীর ভাবের দ্যোতক এমন পদ বিদ্যাপতির পদাবলীতেও খুব বেশী নাই; তবুও ইহাতে কিছু অলঙ্কার আছে। রাজরাজড়ার ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রথম জীবন যাপন করিয়াছেন বলিয়া বিদ্যাপতি তাঁহার কবিতাসুন্দরীকে নিরাভরণ করিয়া লোকসমাজে বাহির করিতে লজ্জা বোধ করেন। কিন্তু এ যুগে যেমন কোন সুললিতদেহা তুষারধবলা, নিরাভরণা তন্বী তরুণী মণিবন্ধে একটি সোনার হাতঘড়ি বাঁধিয়া অপরূপ শোভায় প্রকটিত হন, তেমনি পদকল্পতরুধৃত ৬৩১ সংখ্যক পদটী একটি মাত্র ছোট্ট উপমার সহিত আবির্ভূত হইয়া রসিকজনের মন প্রাণ হরণ করিয়া লয়:—

পাসরিতে শরির হোয়ে অবসান।
কহিতে ন লয় অব বুঝহ অবধান॥
কহই ন পারিঅ সহন ন জায়।
বলহ সজনি অব কি করি উপায়॥
কোন বিহি নিরমিল ইহ পুন নেহ।
কাহে কুলবতি করি গঢ়ল মোর দেহ॥
কাম করে ধরিয়া সে করায় বাহার।
রাখএ মন্দিরে এ কুল আচার॥
সহই ন পারিঅ চলই ন পারি।
ঘন ফিরি জৈসে পিঞ্জর মাহা সারি॥
এতহুঁ বিপদে কিয় জীবএ দেহ।
ভণই বিদ্যাপতি বিষম এ নেহ॥

এ কি বিষম অনুরাগ! কর্ত্তব্যবোধে ইহা ভুলিতে চাহি, কিন্তু ভুলিব—এ কথা ভাবিতে গেলেও যে দেহের অবসান হয়। এ প্রেম কেমন, তাহা বলিতে পারি না; যদি বলিবার মতন

ভাষা পাইতাম, তবে হয় তো মনের আগুনে গুমরাইয়া গুমরাইয়া এত কাঁদিতে হইত না; কিন্তু এ যে গুহ্যাতিগুহ্য হৃদয়রহস্য; ইহা বলাও যায় না, সহাও যায় না। দয়িতের সহিত মিলিত হইবার জন্য মনোভব জোর করিয়া আমাকে বাহিরে ঠেলিয়া দিতেছে, আর কুলধর্ম্ম যেন ঘরে বাঁধিয়া রাখিতেছে। দুই দিক্ হইতেই সমান জোরে টান পড়িতেছে, টানাটানিতে শরীর ছিঁড়িয়া গেল, আর তো সহ্য করিতে পারি না! প্রিয়তমের নিকট ছুটিয়া যাইতে পারিলে বড় ভালো হইত, কিন্তু—

সহই ন পারিঅ চলই ন পারি।

কেবল মনের চাঞ্চল্যবশে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ঘরের মধ্যে বার বার পায়চারি করিতেছি।

"খন ফিরি জৈসে পিঞ্জর মাহা সারি।"

পিঞ্জরের মধ্যে সারীকে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে; বাহিরের নীলঘন আকাশ তাহাকে ডাক দিতেছে, তাহার বাহিরে যাইবার উপায় নাই; তাই শুধু খাঁচার মধ্যে বারংবার ঘুরাফিরা করিতেছে। আক্ষেপানুরাগের এমন একটি পদের তুলনা পদকল্পতরুতে সংগৃহীত বৈষ্ণব মহাজনদের অসংখ্য পদের মধ্যেও পাওয়া দুরূহ।

নেপাল পুথিতে সংরক্ষিত মিত্র-মজুমদার সংস্করণের ২৪০ সংখ্যক পদে অনুরাগিণী রাধার মনোভাব মাত্র দুইটী সাধারণ উপমা—সূর্য্য ও কমলিনী, চন্দ্র ও কুমুদিনী দিয়া অনন্যসাধারণ অনুভূতির সহিত চিত্রিত হইয়াছে:—

দরসনে লোচন দীঘর ধাব।
দিনমণি তেজি কমল জনি জাব॥
কুমুদিনী চাঁন্দ মিলন সহবাস।
কপটে নুকাবিঅ মদন বিকাস॥

সূর্য্যাস্তের সময় কমল তাহার সমস্ত পাঁপড়িগুলি খুলিয়া দেয়; অপস্রিয়মান প্রিয়তমকে যেন কমলিনী তাহার দৃষ্টি দূর দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া, যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটুও দেখা যায়, ততক্ষণ দেখিয়া লয়। তেমনি অনুরাগিণী রাধা বিদায়ের সময় নয়নকমল বিস্ফারিত করিয়া দয়িতকে দেখে; দেখিতে দেখিতে তাহার দেহে স্বেদ, পুলক, অশ্রু প্রভৃতি মদন-বিকাশ ভাবের আবির্ভাব হয়; সে তখন অতি সযতনে তাহা লুকাইবার চেষ্টা করে। কেন না, সে কমলিনীর মতন প্রকাশ্য দিবালোকে তপনের সহিত মিলিত হইতে পারে না। রাত্রিকালে সংগোপনে যেমন কুমুদিনী চন্দ্রের সহিত মিলন করে, তেমনি গোপন-মিলন তাহার কাম্য। মাধবকে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার লোকলজ্জা আজ নিজ মহিমা ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তাহার অন্তরের এই যে ব্যাকুলতা, ইহা সখীকে বুঝাইবে কেমন করিয়া? কেবল একটি কথায় সে তাহা প্রকাশ করিয়াছে—

"একসর সব দিস দেখিঅ কানু"

যে দিকে চোখ ফিরাই, সব দিকে কেবল এক কানাইকেই দেখিতেছি, আর কিছুই চোখে

পড়ে না; আর তাহার "দরসনে লোচন দীঘর ধাব।" যে অনুরাগিণী সমস্ত জগৎময় শুধু কৃষ্ণকেই দেখিতেছে, তাহাকে যাঁহারা প্রাকৃত নায়িকা এবং তাহার স্রষ্টাকে কেবল শৃঙ্গাররসের কবি বলেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের করুণাধারা বর্ষিত হউক, এই প্রার্থনা করি।

বিদ্যাপতি শিবসিংহের সভাকবিরূপে ২৫টি ও পরবর্ত্তী কালে ৩৫টি অভিসারের পদ রচনা করিয়াছেন। শেষোক্ত ৩৫টি পদের মধ্যে মাত্র দুইটী বাংলা দেশে পাওয়া গিয়াছে। বাংলাদেশ গোবিন্দদাসের অভিসারের পদের যেরূপ আদর করিয়াছে, বিদ্যাপতির পদের তাদৃশ সমাদর দেখায় নাই। বিদ্যাপতির তরুণ বয়সে রচিত অভিসারের পদের মধ্যে গতানুগতিক ধারায় বর্ষাভিসার, শুক্লাভিসার, তিমিরাভিসার, দিবাভিসার প্রভৃতি আলঙ্কারিক রীতির পদ আছে, কিন্তু অন্ততঃ দুইটী মর্ম্মস্পর্শী পদরত্নেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখি, শারদ পূর্ণিমার সন্ধ্যায় বংশীধ্বনিতে কৃষ্ণগৃহীত-চিত্তা হইয়া গোপীগণ যমুনাকূলের কুঞ্জে অভিসারে যাইতেছেন। শ্রীচৈতন্যপদাশ্রিত বৈষ্ণব কবিরাও শ্রীরাধাকে অভিসারিণী করাইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণকে অভিসার-মিলনে পাঠান নাই। নায়কের অভিসারে শৃঙ্গাররসের পুষ্টি হয়, আর নায়িকা যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার আকুল আগ্রহে অভিসারিকা হন, তখন পাঠক ব্রজের গোপীর ভাব অনুসরণ করিয়া মনে করিতে পারেন যে, তিনি নিজেও যেন অভিসারিকার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন। শিবসিংহের নামাঙ্কিত ৮৫ সংখ্যক পদে কবি কানাইকেই অভিসারে পাঠাইয়াছেন; কেন না, "মধু ন আব মধুকর পাস"; ঐরূপ ৮৭ সংখ্যক পদেও "আপন কানু করব অভিসার।" অন্যান্য সব পদে নায়িকার অভিসারই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ৮৯ সংখ্যক পদে তরুণ কবি অভিসারিকার উদগ্র উৎকণ্ঠার পরিচয় না দিয়া, তাহার দেহের শোভা ও প্রতি অঙ্গের সহিত অলঙ্কারশাস্ত্রে কথিত উপমা লাগাইয়াছেন—

> করিবর রাজহংস জিনি গামিনি
> চলিলহুঁ সঙ্কেত গেহা।
> অমলা তড়িতদণ্ড হেম মঞ্জরি
> জিনি অতি সুন্দর দেহা॥

সুন্দর দেহের কথা মনে উঠিতেই তাহার নখশিখ বর্ণনা আরম্ভ হইল। তাহার কুন্তলের শোভা পরাজিত করিয়াছে মেঘ, তিমির ও চামরকে; অলকা মধুকর ও শৈবালকে; ভ্রূ কন্দর্পের ধনু, মধুকর ও সর্পকে; কপাল অর্দ্ধচন্দ্রকে; চক্ষু কমলিনী, চকোর, সফরী, ভ্রমর, হরিণী ও খঞ্জনকে; নাসা তিলফুল ও গরুড়ের চঞ্চুকে; কর্ণযুগল গৃধিনীকে; মুখ স্বর্ণমুকুর, চন্দ্র এবং কমলকে; অধর বিম্বফল এবং প্রবালকে; দন্ত মুক্তা, কুন্দ ও দাড়িম্ববীজকে হারাইয়া দিয়াছে। উপমার আতিশয্যে প্রাণ যেন হাঁফাইয়া উঠে।

৯২ সংখ্যক পদে (মিত্র মজুমদার সংস্করণ) রাধা কৃষ্ণ, যমুনা, বৃন্দাবন প্রভৃতির কোন কথা নাই। কোন নায়িকা পবনের মতন দ্রুতবেগে অভিসারে চলিতেছেন—

জনি অনুরাগে পাছু ধরি পেললি
কর ধরি কাম তিড়লী

মনের অনুরাগ যেন তাঁহাকে পিছন হইতে ঠেলিয়া দিতেছে, আর কামদেব হাত ধরিয়া টানিয়া লইতেছে। পদের বাকী অংশে তিমিরাভিসারিকার চিরাচরিত বর্ণনা। ১৩ ও ১৪ সংখ্যক পদও রাধাকৃষ্ণের সম্পর্কবর্জ্জিত তিমিরাভিসারের পদ; কিন্তু শেষোক্তটীতে কবি দৈহিক সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া নায়িকার মনের ব্যাকুলতার ব্যঞ্জনাময় বর্ণনা দিয়াছেন—

হেরহ পছিম দিস কখন হোয়ত নিস
গুরুজন নয়ন নিহারি।
বিনু কারণ গৃহ করহ গতাগত
মূদি নয়ন অরবিন্দা।
পুলকিত তনু বিহসি অকামিক
জাগি উঠলি সানন্দা॥

নায়িকা একবার গুরুজনের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে—তাঁহারা তাহার ভাবসাব লক্ষ্য করিতেছেন কি না; আর পশ্চিম দিকে বারংবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিতেছে—কখন্ সূর্য্য অস্ত যাইবে, রাত্রি হইবে। বিনা কাজে চোখ বুঁজিয়া পুনঃ পুনঃ ঘর হইতে বাহিরে, বাহির হইতে ঘরে যাতায়াত করিয়া অন্ধকারে অভিসার করিবার অভ্যাস করিতেছে; থাকিয়া থাকিয়া দেহ পুলকিত হইতেছে; অকস্মাৎ হাসিয়া যেন জাগিয়া উঠিতেছে।

১৫ সংখ্যক পদও প্রাকৃত নায়িকার শুক্লাভিসারের; জ্যোৎস্না রাত্রে অভিসারে বাহির হইতে হইলে বড্ড বেশী সাহসের প্রয়োজন হয়। সাহসিকা মনকে দৃঢ় করিয়া বলিতেছে—"আজ আমি ঘর, গুরুজন, কাহারই ভয় করিব না; কেন না, আমি কথা দিয়াছি, এবং সে কথার খেলাপ করিব না"—"বচন চুকব নহী॥"

চাঁদনে আনি আনি অঙ্গ লেপব
ভূসন কএ গজমোতী।
অঞ্জন বিহুন লোচন জুগল
ধরত ধবল জোতী॥
ধবল বসনে তনু ঝপাওব
গমন করব মন্দা।
জইও সগর গগন উগত
সহসে সহসে চন্দা॥
ন হম কাহুক ডীঠি নিবারবি
ন হম করব ওতে।
অধিক চোরী পর সঁও করিঅ
ইহ সিনেহ ক সোতে॥

ইহা সদুক্তিকর্ণামৃতিধৃত বাণের নিম্নলিখিত শ্লোকের ভাবানুবাদ—

মলয়জপঙ্কলিপ্ততনবো নবহারলতাবিভূষিতাঃ
সিততরদন্তপত্রকৃতবক্ত্ররুচো রুচিরামলাংশুকাঃ।
শশভৃতি বিততধাম্নি ধবলয়তি ধরামবিভাব্যতাং গতাঃ
প্রিয়বসতি ব্রজন্তি সুখমেব মিথো নিরস্তভিয়োভিসারিকাঃ॥

১০৪ সংখ্যক পদটীতেও রাধাকৃষ্ণের কোন প্রসঙ্গ নাই। তবে দুর্দ্দিনাভিসারিকার এটি একটি অতি মনোরম কথাচিত্র—

রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিস পরএ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন
সংসঅ পড় অভিসার॥

রজনী এত অন্ধকার, যেন মনে হইতেছে, সে তমিস্রা উদ্গিরণ করিতেছে। পথে ভীষণ সর্প, দুর্ব্বার বজ্রধ্বনি হইতেছে, মেঘ যেন রোষে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বর্ষণ করিতেছে। তথাপি নায়িকা আজ অভিসারে বাহির হইবেই। কেন না, সে কথা দিয়াছে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে পারিবে না। পথে যাইতে যাইতে সাপে তাহার চরণ বেড়িয়া ধরিল; অভিসারিকা ভাবিল, ভালই হইল, পায়ের নূপুর আর শব্দ করিবে না—বিস্মিত হইয়া সখী জিজ্ঞাসা করিল "ঠিক করিয়া বল তো সুমুখি, তোমার প্রেমের সীমা কত দূর?"

চরণ বেঢ়িল ফণি, হিত মানজি ধনি
নেপুর ন করএ রোর।
সুমুখি পুছওঁ তোহি সরূপ কহসি মোহি
সিনেহক কতদূর ওর॥

শিবসিংহের রাজসভায় বসিয়া কবি অভিসারের অন্ততঃ এমন একটি পদ লিখিয়াছিলেন, যাহাতে শৃঙ্গাররস মধুররসে প্রায় উন্নীত হইয়াছে। পদটী এত কাল মিথিলা, নেপাল বা বাংলার কোন প্রসিদ্ধ পদসংগ্রহে স্থান পায় নাই; অথচ বাংলার সাধক কাব্যরসিকেরা উহার সন্ধান জানিতেন। আমার মাতামহ নিত্যধামগত অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথিতে পদটী পাইয়াছি :—

ঘন ঘন গরজয়ে, ঘন মেহ বরিখয়ে, দশ দিশ নাহি পরকাসা।
পথ বিপথহুঁ, চিহ্নয়ে না পারিয়ে, কোন পুরয়ে নিজ আসা॥
মাধব আজু আয়লুঁ বড় বন্ধে।
সুখ লাগি আয়লুঁ, বহু দুখ পায়লুঁ, পাপ মনোমথ সন্ধে॥
কণ্টক পন্থয়ে, দুয় হাম তোরলুঁ, জলধর বরিখএ মাথে।
জত দুখ পায়লু, হৃদয় হাম জানলুঁ, কাহাকে কহব দুখবাতে॥
লাভকি লোভে, দুতর তরি আয়লুঁ, জীউ রহল পুনভাগি।
হেরইতে ও মুখ, বিসরল সব দুখ, এহেন কাহু জনি লাগি॥

ভনয়ে বিদ্যাপতি, স্থন বরযুবতী, ইহ স্থখ কো পয় জান।
রাজা সিবসিংহ, রূপনারায়ণ, লছিমাদেই পরমান ॥

ইহার শব্দঝঙ্কার, চিত্রণ-নৈপুণ্য এবং কবির সূক্ষ্ম রসানুভূতি, যাহা নায়িকার দুঃখকে সুখ বলিয়া উপলব্ধি করাইতেছে তাহা শিবসিংহনামাঙ্কিত কবিতাবলীর মধ্যে দুর্লভ। কিন্তু অভিসারিকা বারবার নিজের দুঃখ পাওয়ার কথা বলিয়া মাধবের আদর পাইবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া এবং বিশেষ করিয়া দয়িতের আনন্দের জন্য নহে, কিন্তু নিজের লাভের লোভে জীবন সংশয় করিয়া অভিসারে আসিয়াছে বলিয়া পদটীকে পারণত মধুর রসের পরিচায়ক বলিতে পারি না।

রাজসভার আবেষ্টনীর বাহিরে বসিয়া কবি অভিসারের দুইটী পদে অকৃত্রিম মধুর রস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উহার একটি (মিত্র-মজুমদার, ৬৩৬ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে—

নব অনুরাগিনি রাধা।
কিছু নহি মানএ বাধা ॥
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নহি মান ॥
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানএ ভার ॥
কর সয়ঁ কঙ্কণ মুদরি।
পথহি তেজল সগরি ॥
মণিময় মঞ্জির পায়।
দূরহি তেজি চলি যায় ॥
জামিনি ঘন আঁধিয়ার।
মনমথ হিয় উজিয়ার ॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
পেমক আয়ুধে কাট ॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরিয়ে আন ॥

মাধবের সহিত মিলনের উৎকণ্ঠায় শ্রীরাধা মণিময় হারকঙ্কণ, অঙ্গুরী, সব কিছু অলঙ্কার ভার মনে করিয়া পথেই ফেলিয়া দিয়া দ্রুতবেগে চলিতেছেন। পায়ের মঞ্জীরে মণি আছে বলিয়া তাহা হইতে আলোক বিকীর্ণ হইতেছে; সেই আলোকে পাছে লোকে তাঁহাকে দেখিয়া ফেলে, ভয়ে উহাও তিনি ফেলিয়া দিলেন। বাহিরের অন্ধকারে তাঁহার ভয় কি ? অন্তরলোক যে মন্মথ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। পথে বিঘ্ন যেন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; কিন্তু প্রেমের শাণিত অস্ত্রে সব কিছু তিনি কাটিয়া ফেলিতেছেন। প্রেমের বিভিন্ন ধরণের প্রকাশকে চিত্রিত করাই যাঁহার জীবনের ব্রত, সেই কবিও মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন—"এমনটি আর দেখি নাই—ঐছে না হেরিয়ে আন।"

তরৌণির পুঁথিতে প্রাপ্ত এবং লোকমুখ হইতে গ্রিয়ার্সন কর্তৃক সংগৃহীত ৩৩২ সংখ্যক পদটীতে বিদ্যাপতির মধুর রস আস্বাদনের দুই তিনটি অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

মাধব করিঅ সুমুখি সমধানে।
তুঅ অভিসার কএল জত সুন্দরি
　　কামিনি করএ কে আনে।
বরিস পয়োধর, ধরনি বারি ভর
　　রয়নি মহা ভয় ভীমা।
তইঅও চললি ধনি তুঅ গুণ মনে গুনি
　　তসু সাহস নহি সীমা ॥
দেখি ভবন ভিতি লিখল ভুজগপতি
　　জসু মনে পরম তরাসে।

সে সুবদনি করে ঝপইত ফনিমনি
বিহসি আইলি তুঅ পাসে ॥
নিঅ পহু পরিহরি সঁতরি বিখম নরি
আগরি মহাকুল গারী।
তুঅ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি
কিছু ন গুনল বর নারী ॥
ই রস রসিক বিনোদক বিন্দক
সুকবি বিত্তাপতি গাবে।
কাম পেম দুহু এক মত ভএ রহু
কখনে কী ন করাবে ॥

মাধব! সুমুখীর কামনা পূর্ণ করিও, তোমার অভিসারে সুন্দরী যাহা করিল, তাহা কামচালিতা কামিনীই পারে, অন্য আর কাহার সাধ্য? মেঘ বর্ষণ করিতেছে, ধরণী জলে থৈ থৈ করিতেছে, রজনী মহাভয়ে ভীমা। তথাপি তোমার গুণ স্মরণ করিতে করিতে সে চলিয়া আসিল; তাহার সাহসের সীমা নাই। যে সুবদনী ঘরের দেওয়ালে আঁকা সাপের ছবি দেখিলেও ভয়ে আঁতকাইয়া উঠে, সে কি না হাসিতে হাসিতে সাপের মণি হাত দিয়া ঢাকিয়া তোমার নিকট চলিয়া আসিল। তোমার অনুরাগের মধুর মদে মত্ত হইয়া সেই নারীশ্রেষ্ঠা নিজের স্বামীকে ছাড়িয়া, সম্মানিত কুলে কলঙ্ককালিমা লেপিবার গ্লানি স্বীকার করিয়া ভীষণ নদী সাঁতরাইয়া পার হইয়া আসিয়াছে, কোন কিছুই গ্রাহ্য করে নাই। এই যে রস, ইহার জ্ঞাতা, বিনোদক ও রসিক সুকবি বিত্তাপতি গান করিয়া বলেন—যখন কাম ও প্রেম, দুইই একমত হইয়া থাকে, তখন কি না ঘটাইতে পারে? এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, কবি ভণিতায় নিজেকে শুধু রসবিন্দক ও রসবিনোদক বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া রসিক বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে জাতরতি ভক্তগণকে রসিক নামে অভিহিত করা হইয়াছে :—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহু রহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ১।৩

বিত্তাপতি নিরর্থক শব্দ ব্যবহার করেন না; রসবিন্দক রসবিনোদক শব্দ ব্যবহার করার পরও যখন তিনি রসিক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্দিষ্ট রসিক জনের মধ্যে তিনি নিজেকে গণ্য করিতে চাহিয়াছেন। বলা অযৌক্তিক নাও হইতে পারে। জয়দেবও গীতগোবিন্দে "সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্" (৯।৯); জনয়তু রসিকজনেষু মনোরম-রতি-রসভাব-বিনোদম্ (১২।৯) প্রভৃতি দ্বারা মধুররসের উপাসকগণকে রসিক বলিয়াছেন। বিত্তাপতি কাম ও প্রেম শব্দ একই সাথে ব্যবহার করিয়াছেন; সুতরাং আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা কাম, আর দয়িতের প্রীতি ইচ্ছা প্রেম, এই পার্থক্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পূর্ব্বেই তিনি অবগত ছিলেন অনুমিত হয়।

এই অনুমান সত্য কি না, যাচাই করিতে হইলে দেখিতে হইবে, বিত্তাপতি শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বলিয়া এবং শ্রীরাধাকে পরাশক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কি না। বাংলা দেশে রক্ষিত কোন পদ হইতে ইহার প্রমাণ দিতে গেলে সংশয়বাদীরা বলিতে পারেন যে, গৌড়ীয়

বৈষ্ণবেরা বিদ্যাপতির পদে হস্তক্ষেপ করিয়া বিদ্যাপতির ঐ ভাবের কথা প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। তাই আমরা বাংলা দেশের নাগালের বাহিরে নেপালের পুথি হইতে দুইটি প্রমাণ উপস্থিত করিব। একটি বিরহের পদ, অপরটী ভাবসম্মিলনের পদ। ৫১৫ সংখ্যক পদটীতে শ্রীরাধা বলিতেছেন—

সেওল সামি সব গুণ আগর
　　সদয় সুদৃঢ় নেহ।
তহ্‌ সবে ষবে রতন পাব পাবএ
　　নিন্দহু মোহি সন্দেহ॥
পুরুষ বচন হো অবধান
　　ঐসন নাহি এহি মহিমণ্ডল
　　জে পরবেদন ন জান॥
নহি হিত মিত কোউ বুঝাবএ
　　লাখ কোটী তোহে সামী
　　সবক আসা তোহে পুরাবহ
　　হম বিবরহ কাঞী॥

সকল গুণেই যে সকলের অগ্রগণ্য (আগর), এমন সদয় স্বামীকে আমি সুদৃঢ় স্নেহের সহিত সেবা করিলাম। তাঁহাকে সেবা করিয়া অন্য সকলে পায় রত্ন, আর আমার ভাগ্য এমন যে, আমি পাইলাম অনিদ্রা। আমার চোখের ঘুম কে কাড়িয়া লইল? এই মহীমণ্ডলে এমন কি কেহ নাই, যে পরের বেদনা বুঝে? আমার কি এমন কুটুম্ব (হিত), বন্ধু (মিত) নাই, যে আমার হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলে যে, তুমি লক্ষ কোটি লোকের প্রভু, সকলের আশা তুমি পূর্ণ কর, শুধু আমাকেই কেন ভুলিয়া থাকিলে? এখানে কবি শ্রীরাধার সহিত নিজেকে মিলাইয়া দিয়া এমন করুণ ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন। এই ভাবে প্রতিধ্বনি পাই, সুপ্রসিদ্ধ "মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়" পদের—

"তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
　　জগ বাহির নহ মুঞি ছার।"

এই পদটী অবশ্য নেপাল বা মিথিলায় পাওয়া যায় নাই, কেবলমাত্র বাংলাদেশেই রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভাবের সহিত যখন অকৃত্রিম নেপাল-পুথির পদের সম্পূর্ণ মিল পাওয়া যাইতেছে, তখন ইহা বিদ্যাপতির রচনা নহে বলা যায় না। এই প্রার্থনার পদটীকে এ পর্য্যন্ত মিথিলাবাসী কোন পণ্ডিত প্রক্ষিপ্ত বলেন নাই। বিদ্যাপতির কৃষ্ণভক্তির এত বড় প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতেও কি করিয়া বলা যায় যে, তিনি সারা জীবন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত নায়ক কল্পনা করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন? এ যে অচলা নিষ্ঠা এবং পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

কিএ মানুস পসু পাখিয়ে জনমিয়ে
　　অথবা কীট পতঙ্গ।

করম বিপাক গতাগত পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥
ভনই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুআ পদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দিনবন্ধু ॥

এই পদটী অথবা কবিত্বাংশে ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 'তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম' পদটী মিথিলাবাসীরা পরবর্ত্তী কালের স্মার্ত্তপ্রভাবে বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের মনে এই সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, বিদ্যাপতি হয় তো সারাজীবনই নিছক শৃঙ্গাররসের কবিতা লিখিয়াছেন।

বিদ্যাপতির শেষ পৃষ্ঠপোষক ভৈরবসিংহের পৌত্র লখিমিনাথ কংসনারায়ণের সমসাময়িক মৈথিল কবি গোবিন্দদাস, যিনি বিদ্যাপতির তিরোধানের পঞ্চাশ বৎসর কালের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি কিন্তু বিদ্যাপতিকে ভক্তিরসের কবি বলিয়াই বন্দনা করিয়াছেন—

কবিপতি বিদ্যাপতি মতিমানে
জাক গীত জনচীত চোরায়ল গোবিন্দ-
গৌরি-সরস-রাস গানে।
ভুবন অছি জত ভারতি বানি
তাকর সার সার পদ সঞ্চয় বাঁধল
গীত কতহু পরিমাণি ॥

এই পদটী বাঙ্গালী গোবিন্দদাসের লেখা নহে; কেন না, ইহাতে বিদ্যাপতির হরগৌরীর পদেরও উল্লেখ আছে এবং বাংলা দেশে কবির একটিও হরগৌরীপদ পাওয়া যায় নাই।

বিদ্যাপতি শেষ জীবনে মধুররসের পদ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কর্ত্তৃক আস্বাদিত ও শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বারা প্রতিপাদ্য গোপীপ্রেমের উপলব্ধি তাঁহার হয় নাই। তিনি শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিরূপে গ্রহণ করেন নাই। "সেওল সামি সব গুণ আগর" পদে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, লীলার মাধুর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়াছে; তাই বাংলার বৈষ্ণবপদসংগ্রহে এই পদটী স্থান লাভ করে নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীরাধা নিত্যসিদ্ধা, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁহার প্রেম শিথিল নহে; কিন্তু বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁহার দৈন্যভাব প্রকাশ করাইয়াছেন। বিদ্যাপতির অনুভব অনুসারে যুগ যুগ ধরিয়া জপ ও তপস্যা করিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন। ৫৬৭ সংখ্যক পদে তাই সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—

"তপ তোর তরুন করুনে কানু আএল"

নেপাল-পুথিতে ৫৬৮ সংখ্যক পদটীতে শ্রীরাধা বলিতেছেন—

"কে মোরা জাএত দুরহুক দূর।
সহস সৌতিনি বস মাধুরপুর॥
অপনহি হাথ চললি অছ নীধি।
জুগ দস জপল আজে ভেলি সীধি॥
ভল ভেল মাই হে কুদিবস গেল।
চান্দ কুমুদ দুহু দরসন ভেল॥
কতএ দমোদর দেব বনমালি।
কতএ কহমে ধনি গোপ গোআরি॥
আজে অকামিক দুই দিঠি মেলি।
দেব দাহিন ভেল হৃদয় উবেলি॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরনারি।
কুদিবস রহএ দিবস দুই চারি॥

দূর হইতে দূরান্তরে কোথায় সেই মাধুর পুরে আমার প্রিয়তম ছিলেন; সেখানে কে যাইবে? যাইয়াই বা কি ফল, তিনি যে সেখানে আমার সহস্র সপত্নী দ্বারা বেষ্টিত থাকেন। দশ যুগ ধরিয়া আমি যে জপ করিলাম, আজ তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিলাম; সেই মহানিধি নিজে হইতেই আমার নিকট চলিয়া আসিলেন। বড় ভাল হইল যে, কুদিবস কাটিয়া গেল; কত দিনের বিরহের পর আজ চাঁদের সহিত কুমুদিনীর মিলন হইল। কিন্তু আমি কি তাঁহার যোগ্য! কোথায় তিনি বনমালী দেব দামোদর, আর কোথায় আমি গ্রাম্যা গোপিনী। আজ আমার দেবতা দাক্ষিণ্য দেখাইলেন; হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; অকস্মাৎ নয়নে নয়নে মিলন ঘটিল। বিদ্যাপতি বলেন, হে নারীশ্রেষ্ঠ, (তুমি গ্রাম্যা গোপিনীমাত্র নহ) দুর্দ্দিন দুই চারি দিনই থাকে।

বিদ্যাপতির এই ভণিতা হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অগ্রদূতরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতেই যাউন, আর দ্বারকাতেই যাউন, নিত্যলীলায় তিনি বৃন্দাবনেই বিহার করেন। যখন শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীরা বিলাপ করিতেছেন (১৩৩ সংখ্যক পদ):—

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি লেল॥
গোকুলে উছলল করুনাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহএ হিলোল॥
সুন ভেল মন্দির, সুন ভেল নগরী।
সুন ভেল দস দিস সুন ভেল সগরী॥

কৈসনে জাওব যামুন তীর।
কৈসে নেহারব কুঞ্জকুটীর॥
সহচরি সঞে জহাঁ করল ফুলবারি।
কৈসে জীয়ব তাহি নিহারি॥

তখন বিদ্যাপতি জোরের সহিত বলিতেছেন—বৃথা তোমাদের ক্রন্দন, নন্দনন্দন বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন? তোমরা তাঁহাকে কেমন ভালবাস, দেখিবার জন্য কৌতুক করিয়া কানাই এইখানেই লুকাইয়া আছেন—

বিদ্যাপতি কহ কর অবধান।
কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহু কান॥

দ্বিজ লক্ষ্মীকান্তের 'ধ্রুবচরিত্র'

শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী এম-এ.

কাব্য-প্রধান প্রাচীন বাংলা সাহিত্য—গীতি-প্রাণ। গোবিন্দের গীত বা 'গীতগোবিন্দ'ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্মারক। ইহার মধ্য দিয়াই বাংলা সাহিত্যের প্রাণ স্পন্দিত হইয়াছিল, অজস্র সম্ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের মাধ্যমে। গীত-গোবিন্দের পর বাংলা সাহিত্য বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়া বিস্তৃতি লাভ করে। অনুবাদ সাহিত্য, লৌকিক সাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য প্রভৃতি ধারাগুলিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুবাদশাখার বিস্তার মুখ্যতঃ ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিপুষ্ট সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলিকে আশ্রয় করিয়া। জয়দেবের গীত-গোবিন্দের মাঝখানে যে কৃষ্ণকে বাঙালীরা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাঁহারই নব নব রূপ বিভিন্ন ভাবে ক্রমে ক্রমে এই অনুবাদ গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়া ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের লীলা কীর্তনই এই গ্রন্থসমূহের প্রতিপাদ্য ('রামায়ণ' ছাড়া), ইহা বলিলে সম্ভবত অত্যুক্তি করা হইবে না। অনুবাদ শাখার সাহায্যে বাংলা সাহিত্য ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হইতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। চৈতন্যপরবর্তী বাংলা সাহিত্যেও উপরোক্ত ধারাগুলি আপন আপন মহিমায় সপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া বাংলা সাহিত্যের উন্নতি বিধান করিতেছিল, অবশ্য এই যুগে আমরা আর একটি নূতন শাখার সহিত পরিচিত হইলাম, তাহা চরিতশাখা। যাহা হউক, বর্তমান প্রবন্ধের সহিত একমাত্র অনুবাদ শাখা ব্যতীত প্রত্যক্ষ ভাবে অপরাপর শাখাগুলির বিশেষ যোগ নাই বলা চলে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণের আধিপত্য সহজেই চোখে পড়ে। গুণরাজ খানের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' হইতে যে কৃষ্ণ-কাব্যধারা আমাদের বিশেষ পরিচিত, তাহার বিস্তৃতি ষোড়শ, সপ্তদশ, এমন কি, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। শ্রীকৃষ্ণকে বাঙালী-চিত্ত কেবল পূজা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা তাঁহাকে একান্তরূপে আপনার করিয়া লইয়াছিল। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন বহু কবি। এই অসংখ্য কাব্যসমূহ—ভক্ত-হৃদয়ের অমল অঞ্জলি ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কৃষ্ণ-কাব্যধারার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে কৃষ্ণমহিমাজ্ঞাপক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য রচিত হইয়াছিল। এইরূপ কাব্য রচনার প্রবাহ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বেগবান্ ছিল।* কিন্তু এই সমস্ত কাব্যের বিস্তৃত পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় নাই। কীটদষ্ট তুলোট কাগজের মধ্যে যাহাদের অবস্থিতি, তাহাদের খোঁজ পাওয়া আজিকার দিনে খুব সহজলভ্য নয়। অবশ্য অনুসন্ধানের জন্য আমাদের জাতীয় সংস্থাগুলি যে বিশেষ সচেষ্ট এখনো পর্য্যন্ত হইয়াছেন তাহা বলা চলে না। যে সকল পুঁথি সংগ্রহ-শালায় পাওয়া যায়, তাহা আমাদের সৌভাগ্যের জন্যই বোধ হয়, কোন রকমে আসিয়া গিয়াছে, নয় ত কোন সন্ধানীর অনুসন্ধান-নেশার স্বাক্ষর হিসাবে এগুলি উপস্থিত রহিয়াছে।

* বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন।

বর্তমান আলোচনা দ্বিজ লক্ষ্মীকান্তের অপ্রকাশিত কাব্য 'ধ্রুব-চরিত্রে'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আলোচ্য পুঁথিখানি মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার কোন এক গ্রামাঞ্চল হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন আমার অগ্রজ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী। পুঁথিটির আকার ১২।০ × ৩।° ইঞ্চি। তুলোট কাগজে লেখা। সন ১২৬১ সালে অনুলিপিকৃত। আলোচ্য পুঁথির ভণিতা অংশ হইতে কবির কিছু পরিচয় জানিতে পারা যায়; তবে তাহা অত্যন্ত অল্প। ভণিতার ক্ষেত্রে কখনো দ্বিজ লক্ষ্মীকান্ত, কখনো বা দ্বিজ লক্ষ্মীনারায়ণ নামের উল্লেখ আছে। কবি হয় ত বা উভয় নামেই পরিচিত ছিলেন, এইরূপ হইতে পারে। দ্বিজ লক্ষ্মীকান্ত নামই অধিক বার ব্যবহৃত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত ভণিতাগুলির মধ্যেই তাহার প্রমাণ মিলিবে।

১। ধ্রুব কথা সুধা রস অমৃত বচন।
দ্বিজ লক্ষ্মীকান্ত রচে ভাবি নারায়ণ॥

২। সুনীতির দুঃখের কথা পাঁচালী প্রবন্ধে গাথা
শুন পুত্র শ্রীমধুসূদন।
বিপ্র ণতু (নও) পাড়া ধাম, লক্ষ্মীনারায়ণ নাম
দ্বিজবর করিল রচন॥

৩। ধ্রুব কথা সুধা রস অপূর্ব কাহিনী।
দ্বিজ লক্ষ্মীকান্ত রচে ভাবি বীণাপাণি॥

৪। গণেশ অমুজ হরি তস্য ভ্রাতা লালবেহারী
বিপ্র নতু পাড়াতে নিবাস।
তাহার সুতের সুত জ্ঞানশূন্য লক্ষ্মীকান্ত
ধ্রুব কথা করিল প্রকাশ॥

দ্বিজ লক্ষ্মীকান্তের পিতামহের নাম লালবেহারী এবং পুত্রের নাম শ্রীমধুসূদন। কবির পিতার নাম অজ্ঞাত থাকিয়াই গিয়াছে। নিবাস সম্পর্কে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রহিয়াছে। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ তাঁহার 'প্রাচীন বাংলা পুঁথির বিবরণ' নামক গ্রন্থে আলোচ্য কবি এবং কাব্যের এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। মুন্সী সাহেব কবির নিবাস সম্পর্কে লিখিয়াছেন—'চট্টগ্রামে 'নোয়াপাড়া' নামে এক গ্রাম আছে,—হস্তলিপিখানি ১২২১ মগীর লিখিত।' মুন্সী সাহেব চট্টগ্রামের এই 'নোয়াপাড়া'কে কবির নিবাসস্থল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু এই অনুমানের ভিত্তি যে যুক্তিহীন, তাহা একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে।* চট্টগ্রামকে যদি কবির নিবাসস্থল বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে এই কাব্যখানি যে এককালে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল, তাহা অনস্বীকার্য। কারণ, বর্তমান পুঁথিখানি মেদিনীপুরের কোন এক অখ্যাত গ্রামাঞ্চল হইতে সংগৃহীত, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। মুন্সী সাহেবের অনুমানকে যদি সত্য বলিয়া ধরা হয়, তবে চট্টগ্রাম হইতে

* এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ঘাটালের অনতিদূরবর্তী মন্ডলঘাট পরগণায় 'নওপাড়া' বলিয়া একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-প্রকাশিত 'ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা অংশে।

মেদিনীপুর পর্য্যন্ত অর্থাৎ অখণ্ড বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে ইহা সমাদৃত হইত, তাহা অস্বীকার করিবার আর উপায় থাকে না। কিন্তু এই অনুমান যে সত্য নয়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যায়। প্রথমতঃ যদি কাব্যের ভাষা বিচার করা হয়, তবে জোর করিয়া বলা চলে, এই কাব্যের জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্যত্র হইতে পারে না। কারণ, চট্টগ্রাম কেন, পূর্ববংগের ভাষা হইতেও ইহার পার্থক্য প্রচুর। দ্বিতীয়তঃ, এই কাব্য যদি বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বহুজনসমাদৃত হইত, তাহা হইলে মুন্সী সাহেবের পুঁথি এবং আলোচ্য পুঁথি ব্যতীত এই কাব্যের আরো বহু পুঁথি মিলিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই দুইখানি পুঁথি ব্যতীত, এই কাব্যের আর কোন পুঁথির সন্ধান মিলে নাই। অতএব, মুন্সী সাহেবের অনুমান যে কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, তাহা বলা বাহুল্য।

ধ্রুব-কথা বর্ণনার ক্ষেত্রে কবির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন এই কাব্যের মধ্যে সুপ্রচুর। কবি কাব্যের আখ্যানভাগ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিলেও পুরাণকেই যথাযথভাবে অনুসরণ করেন নাই। কবি কাব্যরচনার ক্ষেত্রে আখ্যানভাগ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিলেও আপনার সৃষ্টিক্ষমতাকে অব্যাহত রাখিয়া, লোকসংস্কৃতি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া সমগ্র কাব্যটিকে একটি বিশেষ মর্য্যাদায় মহিমান্বিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির যে সার্থক সমন্বয় এই কাব্যের মধ্যে দেখা যায়, তাহা এই কাব্যের কাহিনীর সহিত বিষ্ণুপুরাণের ধ্রুব-কাহিনীর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের বিশ্লেষণ করিলেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। কবি লক্ষ্মীকান্তের ধ্রুব-কথার কাহিনীটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিলাম।

রাজা উত্থানপাদের দুই পত্নী, প্রথমা সুনীতি এবং কনিষ্ঠা সুরুচি। কনিষ্ঠা সুরুচি মনে মনে ভাবেন—'গৃহমধ্যে সপত্নী রাখিব কেমনে,' কারণ—'উহার সন্ততি হইলে রাজত্ব পাইবে' যে! ইহা ছাড়া আরো একটি কারণ উল্লেখযোগ্য। প্রেমের ক্ষেত্রে নারী কোন প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে সহ্য করিতে পারে না। সুরুচির মনেও তাই ভয় হয়,—

"নৃপতির প্রিয় হবে সুনীতি সুন্দরী।
অপমান হৈয়া পাছে মন আগুনে মরি।"

সেইজন্য রাজার নিকট সুনীতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিলেন। নৃপতিও ক্ষণিক মোহে সুরুচির বাক্য সমর্থন করিয়া সুনীতিকে নির্বাসন দিলেন। অরণ্যমধ্যে গভীর দুঃখে সুনীতির দিন অতিবাহিত হয়। কিছু কাল পরে একদিন রাজা মৃগয়ার্থে ঐ অরণ্যমধ্যে গিয়া প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে সুনীতির কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর রাজা উত্থানপাদের ঔরসে সুনীতির পুত্র জন্মিল। সেই পুত্রের নামই ধ্রুব। ধ্রুবের পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তিনি মুনিবালকগণসহ রাজসন্দর্শনে চলিলেন। রাজা উত্থানপাদ প্রথম দর্শনেই ধ্রুবকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং পরে যখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ধ্রুব তাঁহারই সন্তান, তখন তিনি তাহাকে সিংহাসনের উপরে উঠিয়া আসিতে বলিলেন।

সিংহাসনে উঠিতে ধ্রুব করিল মনন।
বাড়াইয়া দিল ধ্রুব দক্ষিণ চরণ॥

ধ্রুব মুণির বাম পদ ভূমিতে রহিল।
গবাক্ষের দ্বার হৈতে সুরুচি দেখিল ॥
নয়ানে দেখিয়া রাণী অতি ক্রোধ মন।
ডাকিয়া বলেন ধ্রুব শুন রে বচন ॥
এত তেজ ধর তুমি কিসের কারণে।
দাসীর পুত্র হয়্যা বাঞ্ছা কর সিংহাসনে ॥
তব মাতা জন্মান্তরে কৃষ্ণ নাহি ভজে।
রত্নসিংহাসনে ধ্রুব উঠ কোন্ লাজে ॥

ধ্রুবের অন্তরের সাধ অপূর্ণ রহিল। তাই মাতার নিকট মনোদুঃখের কথা বেদনার রসে ঝরিয়া পড়ে,—

ত্রিভুবন মধ্যে কি মা নাহি বন্ধুজন।
তাহার নিকটে করি লজ্জা নিবারণ ॥

মাতা পুত্রকে আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে এক মাত্র 'লজ্জানিবারণকর্ত্তা শ্রীমধুসূদন।' এই প্রসঙ্গে সুনীতি ধ্রুবকে 'জটীল ও শ্রীকৃষ্ণের' কাহিনী বর্ণনা করিলেন।

জটিলনামক এক পিতৃহীন ব্রাহ্মণকুমার বিদ্যাশিক্ষার জন্য অরণ্যপথ অতিক্রম করিয়া প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যাইত। পাঠশালার গুরুমহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ সমাগত। সকল ছাত্রই কিছু না কিছু দ্রব্য আনিবার ভার লইল। জটিলের মাতা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আর এক ভাই আছেন। তাঁহার নাম শ্রীমধুসূদন। দুঃখের সময় তাঁহাকে ডাকিলে তিনি আসেন। জটিল যখন বনপথ অতিক্রম করিত, তখন তাহার খুব ভয় লাগিত। সেই সময় কাতর স্বরে 'মধুসূদন দাদা' বলিয়া ডাকিত। শিশুর পরম নির্ভরতার জন্য ভগবান্ স্বয়ং তাহার নিকট আসিতেন। শিক্ষকের পিতৃশ্রাদ্ধের সময় জটিল তাহার দুঃখের কথা মধুসূদন দাদাকে জানাইতে তিনি আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—'গুরুকে বলিহ দহি দিব তব ঠাঁই।' অবশেষে পিতৃশ্রাদ্ধের দিন আসিয়া গেল। শ্রীমধুসূদনপ্রদত্ত 'এক ভাঁড় দই লয়্যা' জটিল আসিল। গুরু এই অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু—

জটিল বলেন গুরু শুন মোর বাণী।
সহস্র ব্রাহ্মণ খায়াইব ত এখনি ॥

সত্য সত্যই 'সহস্র সহস্র লোক' খাইয়া গেল। 'যত চায় তত হয় দধি না ফুরায়।' বিস্মিত গুরু অবশেষে কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অরণ্যে আসিলেন, জটিলের মাতাও আসিলেন। অবশেষে দেখা দিলেন 'ভকতবৎসল হরি ভক্তের কারণে।' তিনি আসিয়া সকলকে বাঞ্ছিত মুক্তি দান করিলেন।

ধ্রুব তাঁহার মাতার নিকট উপরোক্ত কাহিনী শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সুনীতি কিন্তু হিংস্রজন্তুসমাকুল অরণ্যে ধ্রুবকে কিছুতেই পাঠাইতে রাজী নন। তবুও—

সুনীতি কাতর হয়্যা　　সন্তান কোলেতে লয়্যা
নিদ্রাগত হইল তখনি।
সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর রাতি　　উঠিলেন শিশুমতি
প্রদক্ষিণ করেন জননী ॥
চরণের ধূলি লয়্যা　　করপুটে দাণ্ডাইয়া
বিদায় মাগেন বারে বার।
প্রণাম করিয়া বলে　　জননীর পদতলে
যেন দয়া করেন গদাধর ॥

ধ্রুব অরণ্যে গিয়া, আরাধ্য পদ্মপলাশলোচনকে অন্তরের একান্ত আগ্রহে ডাকিতে লাগিলেন। নারদ আসিয়া মন্ত্র দিয়া গেলেন। ধ্রুবের দুশ্চর তপস্যা দেখিয়া দেবতাগণও ভীত হইয়া উঠিলেন। উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরীদেরও পাঠাইলেন। কিন্তু ধ্রুবের তপঃভ্রষ্ট হইল না। পরিশেষে বৈকুণ্ঠ হইতে লক্ষ্মী সহ শ্রীকৃষ্ণ ধ্রুবকে দর্শন দিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

দ্বিজ লক্ষ্মীকান্তের অপ্রকাশিত পুঁথি হইতে উপর্য্যুক্ত আখ্যান বর্ণিত হইল। বর্তমানে ইহার সহিত 'বিষ্ণুপুরাণে'র আখ্যানভাগের পার্থক্য নির্ণয় করা উচিত। কেবলমাত্র পার্থক্যনির্দ্দেশক অংশটুকু নিম্নে দেওয়া গেল।

"...ধ্রুবকে বিমাতার কঠোর বাক্য শুনিয়া অতিশয় কুপিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমাকে কে অবমাননা করিয়াছে? ধ্রুব তখন মাতৃসমীপে সকল বর্ণনা করিলেন। সুনীতি ইহা শুনিয়া পুত্রকে কহিলেন,—'বৎস! সুরুচি যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য,...যদি তোমার সুরুচির বাক্যে অতিশয় ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুণ্য কার্য্যের প্রতি যত্নশীল হও, তাহা হইতে অভিলাষ সিদ্ধ হইবে।' ধ্রুব মাতার কথা শুনিয়া মাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, 'সুরুচির বাক্য আমার হৃদয়ে শেল সম বিদ্ধ হইতেছে, মাতঃ! আমি অন্য কোন স্থান প্রার্থনা করি না, এরূপ স্থান প্রার্থনা করি, যে স্থান আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই।'

ধ্রুব মায়ের নিকট এই কথা বলিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বনে গমন করিলেন। ক্রমাগত পূর্বদিকে গমন করিতে করিতে কুশাসনে উপবিষ্ট সাত জন মুনিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, আমি উত্থানপাদতনয়, আমি অতিশয় নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের শরণাপন্ন হইলাম। মুনিগণ ইহা শুনিয়া কহিলেন, তোমার বয়ঃক্রম চারি বা পঞ্চ বৎসর হইবে এবং তোমার শরীরেও কোন প্রকার ব্যাধি নাই, অতএব নির্বেদের কারণ কি বুঝিতে পারিতেছি না। ধ্রুব এই সকল বৃত্তান্ত তাঁহাদের সমীপে জ্ঞাপন করিলেন।...ঐ স্থানে যে সাত জন মুনি ছিলেন, তাঁহারা সপ্তর্ষি। ইহাঁদিগের মধ্যে মরীচি কহিলেন,—তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা কর (কারণ, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে)। ক্রমে অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে বিষ্ণুর আরাধনার জন্য উপদেশ দিলেন। ধ্রুব ইহা শুনিয়া ঋষিদিগকে কহিলেন, বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হইলে আমায় কি কার্য্যের

অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং কোন্ মন্ত্র জপ করিতে হইবে। সপ্তর্ষিগণ ইহা শুনিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর এই মন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন,—

"হিরণ্যগর্ভপুরুষপ্রধান ব্যক্তরূপিণে।
ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বভাবিনে॥"

(বিষ্ণুপুরাণ, ১।১১।৫)

ধ্রুব এই মন্ত্র পাইয়া, ঋষিদিগকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, যমুনাতীরে মধু নামে এক পুণ্য বনে গমন করিলেন। শক্রঘ্ন এই স্থানে মধু রাক্ষসের পুত্র লবণ রাক্ষসকে বধ করিয়া মথুরা নামে পুরী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই তীর্থ সকল পাপনাশক, ধ্রুব এই স্থানে অনন্য-কর্ম্মা হইয়া ভগবদারাধনায় মনোনিবেশ করিলেন।" [বিশ্বকোষ—(নবম ভাগ), নগেন্দ্র বসু]

লোক-সংস্কৃতিপুষ্ট দ্বিজ লক্ষ্মীকান্তের ধ্রুবকাহিনী, বিষ্ণুপুরাণের কাহিনী হইতে কোন্ কোন্ অংশে পৃথক্, তাহা উপরোক্ত আলোচনা হইতে বোঝা যায়। নিম্নে এই পার্থক্যগুলিকে সুস্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ করিবার জন্য একটি তালিকা দেওয়া গেল,—

দ্বিজ লক্ষ্মীকান্তের কাহিনী	বিষ্ণুপুরাণের কাহিনী
(ক) সুরুচি কর্ত্তৃক ধিকৃকৃত হইয়া মাতার নিকট আশ্বাস লাভ ও জটিল এবং শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী শ্রবণ।	(ক) সুরুচি কর্ত্তৃক ধিকৃকৃত হওয়ার পর মাতার নিকট আশ্বাসের পরিবর্ত্তে নীরস উপদেশ লাভ।
(খ) সুনীতি শিশু পুত্রকে অরণ্যে তপস্যার জন্য পাঠাইতে রাজী নন, তাই ধ্রুব, মাতাকে নিদ্রিত দেখিয়া নিস্তব্ধ অন্ধকারে গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন।	(খ) ধ্রুব তাহার মাতার নিকট উপদেশ পাইয়া তপস্যার জন্য গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বনে গমন করিলেন। মাতৃহৃদয়ের এক ফোঁটা অশ্রুজলের চিহ্ন পর্য্যন্ত এখানে নাই।
(গ) দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক দীক্ষা লাভ।	(গ) সপ্তর্ষিগণের নিকট দীক্ষা লাভ।
(ঘ) আরাধ্য দেবতা—শ্রীকৃষ্ণ।	(ঘ) আরাধ্য দেবতা—বিষ্ণু।

পার্থক্যের প্রধান দুইটি (ক এবং ঘ) কারণ সম্পর্কে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, প্রথমটি জটিল ও শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী এবং অন্যটি বিষ্ণু ও কৃষ্ণসম্পর্কিত আলোচনা।

[ক] ধ্রুব কাহিনীর উৎপত্তিস্থল হিসাবে শাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতিকে নির্দেশ করা গেলেও জটিল এবং শ্রীকৃষ্ণের যে কাহিনী দ্বিজ লক্ষ্মীকান্ত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার জন্ম লোককথা হইতে। যে-মন গল্প শুনিয়া আনন্দ পাইতে চায়, যে-মন আপনার প্রিয় বস্তুকে আপনা আপনি বহু বার ধরিয়া আস্বাদ করিতে চায়, সেই মন হইতে জন্মলাভ করিয়াছে এই মধুর কাহিনী এবং এরূপ আরও বহুতর কাহিনী। ইহারা কোন শাস্ত্র পুরাণের অপেক্ষা রাখে না, ইহারাই এক নবতর শাস্ত্রের ধারক ও বাহক; সে শাস্ত্রকে লোকশাস্ত্র আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সে কালে সংস্কৃত পুরাণ প্রভৃতির মূল্য ছিল অপরিসীম, কিন্তু তাই বলিয়া এগুলির মূল্যও বড় অল্প ছিল না। কারণ, এগুলি যদি কোন অংশে হীন হইত,

তাহা হইলে সংস্কৃত শাস্ত্রের সহিত ইহারা সমপর্য্যায়ভুক্ত হইবার অধিকার কখনও লাভ করিতে পারিত না। দ্বিজ লক্ষ্মীকান্তের 'ধ্রুবচরিত্রের' ভিতর এই 'জটিল ও শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী' শাস্ত্রীয় গণ্ডির মধ্যে থাকিলেও, শাস্ত্রীয় শাসন ইহা মানিয়া লয় নাই; গণধর্মের উদার জয় ঘোষণা, ইহাকে নবতর মহিমায় ব্যঞ্জিত করিয়া, ইহার উপর নূতনতর মূল্য আরোপ করিয়াছে। ইহা একদিকে যেমন যুগস্পৃষ্ট কবিচিত্তের প্রতিফলন, অন্য দিকে অশাস্ত্রীয় আখ্যানের শাস্ত্র-মর্য্যাদা লাভের চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত,—এইখানেই ইহার সার্থকতা।

[ঘ] বিষ্ণুপুরাণের যে ধ্রুবকাহিনী আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ কোথাও নাই। ধ্রুব যখন তাঁহার অভীষ্ট দেবতার দর্শন পাইলেন, সেই সময়কার দুইটি শ্লোক বিষ্ণুপুরাণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে বিষ্ণুপুরাণবর্ণিত ধ্রুবকাহিনার অভীষ্ট দেবতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গবরাসিধরমচ্যুতম্।
কিরীটিনং সমালোক্য জগাম শিরসা মহাম্॥
রোমাঞ্চিতাঙ্গ সহসা সাধ্বসং পরমং গতঃ।
স্তবায় দেবদেবস্য স চলে মানসং ধ্রুবঃ॥—১।১২।৪৫।৪৬

'শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গধারী এই যে দেবতা, ইনি বিষ্ণু,—কৃষ্ণ নহেন। কিন্তু পরবর্তী কালে এই বিষ্ণুই যে শ্রীকৃষ্ণে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন, তাহার অন্যতম পরোক্ষ প্রমাণ দ্বিজ-লক্ষ্মীকান্তের কাব্যটি। ইহা যে লোক-সংস্কৃতির পরিণতিবিশেষ, তাহা অস্বীকার করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখি না।*

ধ্রুব-কথা বর্ণনায় কবির কাব্যত্ব প্রকাশ করার অবকাশ যে অত্যন্ত অল্প, তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিজ লক্ষ্মীকান্ত ব্যতীত অপরাপর ধ্রুবচরিত্রের কবিগণের মধ্যে কবিচন্দ্র, জয়ানন্দ এবং ভরত পণ্ডিতের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমান কাব্যখানিতে মাঝে মাঝে কবিত্বের যে স্পর্শ পাই, তাহা একেবারে মূল্যহীন নয়; বিশেষ করিয়া সুনীতির বারো মাসের দুঃখগাথা

---

* The Pauranic legends say that Krishna is the son of Devaki and Vasudeva, a scion of the Yadu or Vrsni race setteled about Mathura and that he had a brother named Baladeva or Sankarsana. Krishna is the son of Devaki as mentioned in the Chandogya Upanisad (III, 17·6). From the testimony of reliable historical records we find that there was a tradition about Krishna as a scion of the Yadu race in ancient time. From the Buddhist canonical work called Niddesa, from Patanjali's comment on Panini—IV, 3, 98 (vide JRAS 1910, P/168), and from the inscription found Ghosundi in Rajputana (Vide Luda's List of Brahmi Inscriptions no. 6) from the Besnagore inscription No—I (Ibid, no 669) as well as from the Nanaghat cave inscriptions No. I (Ibid, no, 1112). we find that from the time of Panini up to the 1st Century B. C. Vasudeva along with the Baladeva or Sankarsana was worshipped as god of gods, and that his worshippers were called Bhagavatas or Bhaktas. The doctrine advocated by three devotees was at that time called Ekantika Dharma, and in its background preached by Vasudeva Krishna. This faith mingled itself with the existing one in Narayana, Krishna and Visnu became identified.—(Post Chaitannya Sahajiya Cult—M. M. Basu),

অন্তরবমথিত বেদনার যথার্থ অভিব্যক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছে (পৃ. ২৫৭ দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত কাব্যখানির মধ্যে কয়েকটি 'ধুয়া' দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন,—

"মধুসূদন নাম ধর হে তুমি এ ভব সংসারে
পড়্যা রইলাম আমি"

মোট কথা, কবি পুরাণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া স্বীয় কল্পনার সাহায্যে যাহা পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা একান্তভাবে তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। নিছক অনুবাদ বা অনুকরণের পথ ধরিয়া কবি কাব্যরচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হন নাই, লোক-সংস্কৃতিপুষ্ট তাঁহার কবি-মন নবতর সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় আলোচ্য কাব্যখানি রচনা করিয়াছিল। কাব্যমূল্য নির্ধারণের কালে ইহাকে অবশ্য 'উচ্চমানের' বলিয়া অভিহিত করা যায় না বটে, তাই বলিয়া মূল্যহীন বলিয়া অপাংক্তেয় করিয়া রাখিলে যে সত্যাবলোপের অপচেষ্টা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

॥ শ্রীঃ ॥
অথ ধ্রুবচরিত্র লিক্ষ্যতে ॥
নম গণেশায় নমঃ ॥
নম সরস্বত্যৈ নমঃ ॥

ব্রহ্মশাপে পরীক্ষিত আছে মঞ্চপরে।
শ্রীমদ্ভাগবতবক্তা তাহার গোচরে ॥
শুকদেব গোস্বামী দিগম্বর বেশ।
পরীক্ষিত মুক্তি হেতু করয়ে প্রকাশ ॥
সপ্তাহ মধ্যেতে একদিন পরীক্ষিত।
শুকদেব বলে কহ ধ্রুবের চরিত ॥
পঞ্চম বৎসরের শিশু অতি সে অজ্ঞান।
কিরূপেতে হৈল সেহ কৃষ্ণপরায়ণ ॥
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত।
উত্থানপাদ নামে রাজা আছয়ে বিদিত ॥
সুনীতি তাহারি নারী আছয়ে সুধীর।
সন্ততি না হৈল রাজা ভাবিয়া অস্থির ॥
কত দিনান্তরে রাজা এক যুক্তি করি।
দ্বিতীয় বিবাহ কৈল সুরুচি সুন্দরী ॥
পরম রূপসী সেই কনিষ্ঠা রমণী।
তাহার বাঞ্ছিত কথা অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
নব যৌবন প্রাপ্ত হৈল সুরুচি সুন্দরী।
রূপের তুলনা তার দিতে নাহি পারি ॥
উর্ব্বশী মেনকা কিবা রম্ভা তিলোত্তমা।
দেবকন্যা নাগকন্যা না হয় গণনা ॥
উত্থানপাদ রাজা হৈল তার বশীভূত।
সুনীতি রমণী হৈতে তাহাতে প্রমত্ত ॥
যে বোল বলেন সেই না করে অন্যথা।
কেবলি তাহার গৃহে থাকেন সর্ব্বদা ॥
এইরূপ দেখিলেক সুনীতি রমণী।
বিধাতা স্মরিয়া শিরে করাঘাত হানি ॥
হায় বিধি কি লিখিলে আমার কপালে।
সতত আমার মন দহে দাবানলে ॥
সন্ততি না হৈল মোর এই সে কারণ।
আপনি বিবাহ দিলাম করিয়া যতন ॥
সে ধর্ম বর্জিত কৈল নৃপ চূড়ামণি।
বড়ই প্রমত্ত হৈল কনিষ্ঠা রমণী ॥
সদৃশ্য অগ্নিতে জলে দহে মোর কায়।
রাজভার্য্যা হৈয়া এ দুঃখ না সয় ॥
এই চিন্তা মনে মনে করে দিবানিশি।
দুখের উপরে দুখ দেয় সুরুচি রূপসী ॥
পরীক্ষিত বলে শুন পরীক্ষিত মুনি।
কি দুঃখ ঘটাহ তাহা বল দেখি শুনি ॥
ধ্রুবকথা সুধারস অমৃত রচন।
দ্বিজ লক্ষ্মীকান্ত রচে ভাবি নারায়ণ ॥

॥ পয়ার ॥

শুকদেব বলে তবে শুনহ রাজন।
সুনীতির বনবাস অপূর্ব্ব কথন ॥
একদিন সুরুচি ভাবেন মনে মনে।
গৃহমধ্যে সপতিনী রাখিব কেমনে ॥
অগ্রগণ্য সপতিনী অন্যথা না হবে।
উহার সন্ততি হইলে রাজত্ব পাইবে ॥
নৃপতির প্রিয় হবে সুনীতি সুন্দরী।
অপমান হৈয়া পাছে মন আগুনে মরি ॥
এই (১সপতিনী) পত্নী আমি গৃহে না রাখিব।
নৃপতিরে বুঝাইয়া বনে পাঠাইব ॥
এইমত যুক্তি করি সুরুচি সুন্দরী।
ক্রোধাগারে রহিলেন অতি ক্রোধ করি ॥
হেন কালে নৃপতি আইল অন্তঃপুরে।
গৃহমধ্যে দেখা নাহি পায় সুরুচিরে ॥
নিজালয়ে না দেখিয়া গেল ক্রোধাগারে।
ক্রোধান্বিত দেখি রাজা ভাবেন অন্তরে ॥
ভাবিয়া নৃপতি তবে জিজ্ঞাসে কারণ।
কি জন্যেতে দেখি আজি মলিন বদন ॥
কহ কহ প্রিয় সখি কহ ত স্বরূপ।
ক্রোধাগারে কেন আজি দেখি ক্রোধরূপ ॥
দুঃখ কিবা অনুরাগ না পারি বুঝিতে।
প্রাণ স্থির নহে মোর দেখি ক্রোধান্বিতে ॥
কে মন্দ বলিল তোরে বল সত্য করে।
সমুচিত ফল আমি দিব ত তাহারে ॥
সুনীতিরে ভিন্ন ভাব এই সে কারণ।
তব বশীভূত আমি হইয়্যাছি এখন ॥
বারেক সম্বর ক্রোধ কলহ কারণ।
তব বাক্য অন্যথা না করিব এখন ॥
পৃথিবী শাসিব আজি তোমার ক্রোধেতে।
কেবা মন্দ বৈল তোমায় বলহ তুরিতে ॥
এইমত ক্রোধ শান্তাইছে নৃপবর।
সুরুচি সুন্দরী তবে করেন উত্তর ॥
মম বাক্য অন্যথা না করিবে এখন।
তুমি সত্য কর আমি বলি বিবরণ ॥
এত বলি নৃপতিরে সত্য করাইল।
সুনীতির পক্ষে অলক্ষণ ঘটাইল ॥
ধীরে ধীরে বলে তারে সুরুচি সুন্দরী।
মন দিয়া শুন রাজা অতি যত্ন করি ॥
জ্যেষ্ঠ মহিষী তোমার সুনীতি রমণী।
কুবাক্য বলিয়া মোরে এই মনে গুনি ॥
এখন তাহারে কর বনমধ্যে স্থিতি।
তবে মনদুঃখ যাবে শুনহ নৃপতি ॥
নতুবা তেজিব আমি এ পাপ পরাণ।
এই পণ করিয়াছি শুনহ রাজন্ ॥
সুরুচির প্রেমে মগ্ন হইয়া নৃপতি।
বিভোল হইয়া ক্রোধ করে মূঢ়মতি ॥
অজ্ঞান হইয়া রাজা না কৈল্য বিচার।
সুনীতিরে বনবাস দিলেন সত্বর ॥
সুনীতি রমণী তাহা ভাবে মনে মন।
কিসের কারণে মোরে করিল বর্জ্জন ॥
কিছু দোষ করি নাই নৃপতির আগে।
বনবাস দিল মোরে কিবা অনুরাগে ॥
হায় বিধি কি লিখিলে আমার কপালে।
বিনা দোষে রাজা মোরে অপরাধী কৈল্যে ॥
সুরুচি মুখরা কৈল্য এতেক দুর্দ্দশা।
রাজভোগ হৈতে মোরে করিল নৈরাশা ॥
শিশুকাল হৈতে ভাল মন্দ নাহি জানি।
আমারে বর্জ্জন করাইল সপতিনী ॥
আপনি বিবাহ দিনু সন্তান কারণ।
ভূপতি বিচারি কৈল বন সমাপন ॥
রাজধর্ম্ম বর্জ্জিত করিল নরপতি।
স্ত্রীলোকের বোলে রাজা পাসরিল নীতি ॥
নৃপতির দোষ নাই বুঝিলাম অন্তরে।
কপাল দোষেতে আইনু অরণ্য ভিতরে ॥
কান্দিতে কান্দিতে তবে সুনীতি রমণী।
রমানাথ স্মরিয়া ভ্রমে একাকিনী ॥

১ সাংযোজন

ধ্রুবকথা সুধারস অমৃতের ধার।
দ্বিজবর লক্ষ্মীকান্ত পাঁচালি প্রচার॥

॥ পয়ার ॥

সুনীতি কাতর হয়্যা কান্দিতে কান্দিতে।
অরণ্যের প্রান্ত ভাগে গেলেন তুরিতে॥
তথাকারে কতগুলি ব্রাহ্মণ আলয়।
সভাকার পত্রের কুটীর শোভা হয়॥
আশ্রয় দেখিয়া তবে সুনীতি রমণী।
যেখানে আছেন সব ব্রাহ্মণ-পতিনি॥
সেইখানে গেল তবে কান্দিতে কান্দিতে।
নারীর কাছেতে নারী মিলে ভালমতে॥
ব্রাহ্মণরমণী তারে জিজ্ঞাসে কারণ।
কোথা হইতে আইলে তুমি বল বিবরণ॥
কোথায় বসতি কর বল সত্য কর্য়া।
একাকিনী ভ্রম কেন অরণ্য ভিতরে॥
রোদন করহ তুমি কিবা অভিমানে।
সত্য কর্য়া বল আমা সভা বিত্তমানে॥
সুলক্ষণা কন্যা তুমি অতি চমৎকারা।
রাজার মহিষী কিম্বা দেবতা অপ্সরা॥
চিনিতে না পারি তোমা করি নিবেদন।
নিজ পরিচয় দেহ সম্বর ক্রন্দন॥
এতেক জিজ্ঞাসা করে ব্রাহ্মণী সকল।
সুনীতি দুঃখের কথা কহিতে লাগিল॥
দেবতা অপ্সরা নহি আমি মানবিনী।
ললাটের দোষে বনে ভ্রমি একাকিনী॥
উত্থানপাদ নামে রাজা আছয়ে বিদিত।
তাহার মহিষী আমি কহিলাম নিশ্চিত॥
সন্ততি না হইল মোর এই সে কারণ।
বংশ হেতু পুনঃ বিভা করিল রাজন॥
সুরুচি সুন্দরী হৈল্য কনিষ্ঠা রমণী।
শিশুকালে প্রাণাধিক পালিলাম আপনি॥
যৌবন সময়ে সে হৈল রূপবান।
নৃপতি করিল তারে প্রাণের সমান॥
আমারে তাচ্ছিল্য করে নৃপতি মহাশয়।
সদৃশ অগ্নিতে যেন দহে মোর কায়॥
সে অনল সম্বরিনু মনে অনুমানি।
কালে বলবান হৈল—সুরুচি রমণী॥
শিশুকালে পালন করিনু তারে আমি।
যৌবনে চিনিল সেই আপনার স্বামী॥
নৃপতি বিভোল হইয়া সুরুচির বোলে।
অবিচারে অধীনিরে বনবাসী কৈলে॥
ললাটে লিখন ছিল কে খণ্ডাবে মোরে।
একাকিনী ভ্রমি আমি অরণ্য ভিতরে॥
কান্দিতে কান্দিতে আসি কাতর হইয়া।
এই স্থানে আইনু আমি আশ্রয় দেখিয়া॥
একে মনদুঃখে মোর দহিছে অন্তর।
সিংহ ব্যাঘ্র আছে যত অরণ্য ভিতর॥
কেহ না হিংসিল মোরে অভাগিনী বল্যা।
জীবনে নাহিক স্বাদ সদা প্রাণ জলে॥
মনের দুঃখেতে হইল্য অঙ্গ জরজর।
মম মনদুঃখ সব করিলাম প্রচার॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণী সব আশ্চর্য্য হইল।
সুনীতিরে মুনিপত্নী কহিতে লাগিল॥
নৃপতি আপনি যদি কৈল অবিচার।
যে হউক সে হউক ভয় নাহিক তোমার॥
আমাদের স্থানে থাক শুন রাজমহিষী।
সকলে পালিব তোমায় হয়্যা অবিনাশী॥
তোমার কুটীর কর্য়া দিব সকলেতে।
রাজমাতা বলিয়া ডাকিব ব্রাহ্মণেতে॥
সুনীতিরে প্রবোধিয়া ব্রাহ্মণী সকল।
নিজ নিজ পতিকে বিশেষ জানাইল॥
উত্থানপাদ নৃপতির মহিষী সুনীতি।
অবিচারে বনে পাঠাইল নরপতি॥
আকুল হইয়া আইল মো-সভার স্থানে।
আশ্বাস করিয়া তারে রেখেছি যতনে॥
কুটীর করিয়া সভে দেহত তাহারে।
পালন করিতে হইবে কহিলাম সভারে॥

শুনি সব দ্বিজবরে লাগে চমৎকার।
নৃপতিরে ভৎর্সনা করয়ে বারে বার॥
রমণীর বোলে রাজা রমণী তেজিলে।
অবিচারে সুনীতিরে বনচারী কৈলে॥
যে হোক সে হোক মোরা সুনীতি পালিব।
রাজমাতা বলে মোরা সকলে কহিব॥
এত বলি সন্নিকটে কুটীর করিল।
সুনীতিরে আনি সেই গৃহে সমাপিল॥
সুনীতি রহিল সব দ্বিজের নিকটে।
রাজমহিষী হয়্যা এই ছিল ললাটে॥
লক্ষ্মীনারায়ণ দ্বিজ ভাবি বীণাপাণি।
রচিলেন ধ্রুবকথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥

॥ ত্রিপদী॥

পরীক্ষিত নৃপমণি সুনীতির দুঃখ শুনি
জিজ্ঞাসিছে শুকদেব স্থানে।
কহ দুঃখ দেবমুনি হইয়া (রাজ) গেহিনী
এত দুঃখ সহিল কেমনে॥
শুকদেব বলে শুন পরীক্ষিত রাজন
ধ্রুবকথা অপূর্ব্ব বাখ্যান।
মন দিয়া যেই জন শুনে ধ্রুব বিবরণ
হয় তার বৈকুণ্ঠে পয়ান॥
সুনাতি রমণী হোতা হয়্যা অতি দুঃখযুতা
দিবানিশি ভাবে নারায়ণ।
হয়্যা রাজার মহিষী যার সঙ্গে শত দাসী
হইল তার পল্লবে শয়ন॥
বৈশাখে রবির খরা হইল খরতর ধরা
সুনীতির শরীর দাহন।
রতনপালঙ্কে বসি নিকটে শতেক দাসী
করিত যে চামর ব্যজন॥
সুরুচি সতিনী হৈতে বিভা দিল সে দুখেতে
করিলেক এতেক দুর্দশা।
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পতি সঙ্গে রঙ্গরস
তাহা মোর করিল নৈরাশা॥
প্রথম আষাঢ়ে জল কুটীরেতে নাহি স্থল
এই মোর হইল অবশেষে।
শ্রাবণে বরিষে ঘন বন্ধু জন নাহি হেন
নৃপতিকে বুঝায় বিশেষে॥
ভাদ্র মাসে ঝড় বাদলে ভিজে কাপড়
এই দুঃখ আমারে না সয়।
রাজার মহিষী আমি আমারে তেজিল স্বামী
দুঃখে হইল জীবন সংশয়॥
নিজালয়ে নরপতি আশ্বিনে অম্বিকামূর্ত্তি
পূজিতো যে অশেষ বিধানে।
ইবে দুঃখ অরণ্যেতে গোঙাইলাম কুটীরেতে
শিরে ধুলা উড়ে তৈল বিনে॥
কার্ত্তিক মাসেতে শীতে রতনের পালঙ্কেতে
তখন আমি সুখে ছিলাম ভাল।
দারুণ সতার পাকে এবে আমি মরি দুঃখে
শীত আচ্ছাদন না মিলিল॥
অগ্রায়ণ মাসেতে প্রজার সব ফসলেতে
তার সুখে সুখ নৃপতির।
পতির সুখেতে সুখ ভুঞ্জিলাম বহু সুখ
কত পুণ্য ছিল যে স্মরিব॥
সতিনী সাধিল বাদ ঘটাইল পরমাদ
বনে পাঠাইল বিবাদিয়া।
উদরে না মিলে অন্ন দিনে দিনে হলাম শীর্ণ
শীতে মোর জর জর হিয়া॥
বিধাতার নিরমিত পৌষে প্রবল শীত
না জানিতাম পতির সুখেতে।
এখন ভরসা ভানু নইলে হৃদয় জানু
নিবারণ করি এই শীতে॥
মকরে আসে বসন্ত সময়ে অতি দুরন্ত
গুঞ্জরয়ে ভোমরা সকল।
শুনি কোকিলের ধ্বনি উচাটন হয় প্রাণী
সতিনী ঘটালে অকুশল॥
ফাল্গুনেতে অলক্ষণ সদা মন উচাটন
পতি জন্যে পুড়ে দিবানিশি॥

একাকিনী কুটীরেতে মরিলাম বিরহেতে
সতিনী করিল বনবাসী ॥
আইল সে মধুমাস সুখেতে হৈল নৈরাশ
মলয়া মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীয়া মধুকর পিয়ে অতি মনোহর
এবে মোর কপাল হৈল মন্দ ॥
সুনীতির দুঃখের কথা পাচালি প্রবন্ধে গাঁথা
শুন পুত্র শ্রীমধুসূদন।
বিপ্রতুল পাড়া ধাম লক্ষ্মীনারায়ণ নাম
দ্বিজবর করিল রচন ॥

॥ পয়ার ॥

প্রতিদিন সুনীতির দুঃখ উঠে মনে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রামা রহিল সেখানে ॥
একদিন উত্থানপাদ মৃগয়া কারণ।
অরণ্যে যাইতে সৈন্য করিছে সাজন ॥
হয় হস্তী পদাতিক সঙ্গেতে লইল।
সহস্র সহস্র সেনা সাজন করিল ॥
পাত্র মিত্র লয়া নৃপ যায় মৃগয়াতে।
অশ্বপরে চাপিয়া রাজা চলে অরণ্যেতে ॥
সৈন্যগণকলরবে কিছুই না শুনি।
সুনীতি সহিত ধূলায় ঢাকিল দিনমণি ॥
ক্রমে ক্রমে চলে সৈন্য যুড়ে নয় আশা।
পথিক চলিতে নারে পথে লাগে দিশা ॥
উত্তরে চলিল সৈন্য অরণ্য ভিতর।
দেখিয়া নৃপতি বড় হরিষ অন্তর ॥
ক্রমে ক্রমে সৈন্যগণ অরণ্য জুড়িছে।
হরিষ হইয়া রাজা মৃগয়া করিছে ॥
সৈন্যগণ সকলেতে করিছে ভ্রমণ।
আনন্দ হইয়া ফল করিছে ভোজন ॥
তাল পিয়াল আর আম্বির খাজুর।
কামরাঙ্গা করঞ্জা খাইতে সুমধুর ॥
বকুল বিড়ঙ্গ আর পাকা হরিতকী।
নানা বর্ণের ফল খাইয়া সভে হইল সুখী ॥
সারি শুক গান করে সুমধুর বোলে।
মোহিত হইয়া সৈন্য বৈসে বৃক্ষতলে ॥
মৃগয়া করিতে হইল বেলা অবসান।
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন ॥
দেখিতে দেখিতে তবে হইল রজনী।
ঝড় বৃষ্টি হয় শুন অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
ঈশানে উঠিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তরে পবনে মেঘ করে সুরাসুর ॥
নিমিষেকে ষোড়াইল গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল ॥
দাবাশিলি ইসমান চারি মেঘের গর্জ্জন।
কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥
একে কৃষ্ণ পক্ষ তায় দেবতা দুর্যোগে।
অতি ঘোর অন্ধকার হইল রাত্রিযোগে ॥
আপনা আপনি কেউ না পায় দেখিতে।
বড়ই সঙ্কটে পড়িল অরণ্যেতে ॥
পলায় সকল সৈন্য প্রাণের ভয়েতে।
হয় হস্তী পদাতিক লইল বেগেতে ॥
কেহ পড়ে খাতে কার মাথা ভাঙ্গে গাছে।
চৌদিকে পলায় সেনা যার যথা ইচ্ছা ॥
পাত্র মিত্র সৈন্যগণ হারাইল নৃপতি।
অশ্বের উপরে রাজা ত্রাসযুক্ত অতি ॥
ঘোর অন্ধকার নিশি দেখিতে না পায়।
মনে মনে চিন্তা করে কি হবে উপায় ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা কাতর হইয়া।
ধীরে ধীরে যায় রাজা রথেতে চাপিয়া ॥
সঘনে চিকুর হানে অতি চমৎকার।
কুঝটি কুঝটিকায় আলো হয় একবার ॥
সেই আলো নিরখিয়া নৃপচূড়ামণি।
অশ্বেতে চড়িয়া রাজা চলেন আপনি ॥
কুঝটি হইলে রাজা ভাবে মনে মনে।
অতি ভয়ান্বিত হয়্যা ভরান সেখানে ॥
পুনরপি চিকুর হানয়ে যে সময়।
দেখিতে পাইল নৃপ সুনীতি আলয় ॥

সুনীতি আলয় ভূপ কভু নাহি জানে।
রমানাথ রক্ষা কৈল ভাবে মনে মনে॥
আমার এতেক দুঃখ কভু নাহি সয়।
প্রাণরক্ষা হৈল মোর দেখিয়া আলয়॥
ওই আলয়েতে যাই প্রাণ বাঁচাইতে।
রাত্র পোহাইলে রাজ্যে যাইব প্রভাতে॥
মনে মনে এই যুক্তি করিয়া নৃপতি।
অশ্বের উপরে চাপি যায় দ্রুতগতি॥
বিধাতা নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
সুনীতির রিক্ত পুণ্য হইল সুলক্ষণ॥
উাখনপাদ উত্তরিল কুটীরের দ্বারে।
কাতর হইয়া বলে কে আছ কুটীরে॥
একটুকু স্থল দেহ করি এই মিনতি।
প্রাণরক্ষা কর মোর আজিকার রাতি॥
উথানপাদ রাজা আমি মৃগয়া কারণ।
অরণ্যে আইনু লয়্যা সেনাগণ॥
দেবতা দুর্যোগে সৈন্য পলাইল ডরে।
একাকী ভ্রমিছি আমি অরণ্য ভিতরে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে মোর জীবন সংশয়।
সম্মুখে দেখিতে পাইলাম তোমার আলয়॥
প্রাণ রক্ষিবারে আইলাম তব বিদ্যমান।
স্থান দিয়া ভদ্যা(র্ত্ত) লোকের রক্ষা কর প্রাণ॥
সুনীতি সে সব বার্ত্তা সকলি শুনিল।
পতি আগমন দেখি বিস্ময় হইল॥
বিবরণ শুনিলেক নৃপতিমুখেতে।
কুটীরের দ্বার ঘুচায় যতনেতে॥
দুয়ার ঘুচায়্যা দিল বসিতে আসন।
আপনার শিরে কৈল বস্ত্র আচ্ছাদন॥
অশ্ব হৈতে রাজা সাভ্যায় নাম্বি* কুটীরে।
একাকী রমণী দেখি ভাবেন অন্তরে॥
মায়াবী রমণী কিবা না পারি বুঝিতে।
শিরে আচ্ছাদন দেখি না পারি বুঝিতে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা করিল জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কাহার নারী কহ সত্য ভাষা॥

সুনীতি রমণী তবে করেন উত্তর।
সুরুচির বোলে রাজা আপন পাসর॥
দোষাদোষ নৃপতি তুমি না কইলে বিচার।
বিনি দোষে আমারে করিলে দোষাচার॥
সুরুচির বোলে তুমি হইয়া মোহিত।
ধর্ম্ম নষ্ট করিলে তুমি পাসরিলে নীত॥
বনিতার বোলে তুমি বনিতা বর্জ্জিলে।
সুরুচি লইয়া তুমি আমায় পাসরিলে॥
পূর্ব্বে আমি ছিনু তোমার বড়ই আত্মীহ।
মোর সনে যুক্তি করি করিলে বিবাহ॥
পরম রূপসী পাইলে সুরুচি রমণী।
এবে মোরে ভিন্ন ভাব করিলে আপনি॥
তোমার বোলেতে তুমি নাহি পাসরিলে।
বিনি দোষে তুমি মোরে অরণ্যে পাঠালে॥
একাকিনী ভ্রমি আমি কান্দিতে কান্দিতে।
এই স্থানে লোকালয় পাইনু দেখিতে॥
কাতর হইয়া লোকালয়েতে আইনু।
সকল ব্রাহ্মণীকে বিশেষ জানইনু॥
ব্রাহ্মণীর মুখে শুনি ব্রাহ্মণ সকল।
তোমারে ভৎর্সনা করে হইয়া বিকল॥
ভৎর্সিয়া আশ্রয় দিল সব দ্বিজগণ।
রাজমাতা বল্যা মোরে করয়ে পালন॥
তোমার মহিষী আমি শুন হে রাজন।
পালঙ্কে বঞ্চিত হইনু পল্লবে শয়ন॥
নিজ দুঃখ নৃপতিরে সব জানাইল।
পরিচয় দিয়া মাথার বস্ত্র ঘুচাইল॥
পরিচয় পেয়া রাজা লজ্জিত হইয়া।
অধোমুখ থাকে নৃপ বিস্ময় গণিয়া॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা করেন উত্তর।
যে হকু সে হকু দোষ সহস্র আমার॥
ইহা শুনি সুনীতির হৃদয়ে উল্লাস।
নৃপতিকে বলে তুমি কুটীরেতে বৈস॥
ব্রাহ্মণপাড়াতে গিয়া কহি সমাচার।
দ্বিজপত্নী আনিবেক তোমার আহার॥

* সম্ভবত—'সত্বরে নামিয়া'

নৃপতিকে কুটীরেতে বসায়্যা সুনীতি।
দ্বিজের পাড়ায় তবে চলে দ্রুতগতি ॥
দ্বিজের বাটীতে তবে গিয়া উত্তরিল।
সকল ব্রাহ্মণীকে বিশেষ জানাইল ॥
উত্থানপাদ নরপতি মৃগয়া করিতে।
পাত্র মিত্র সৈন্য লয়্যা আইল অরণ্যেতে ॥
দেবতাদুর্য্যোগে সৈন্য পলাইল ডরে।
ভয়েতে নৃপতি আইল্য আমার কুটীরে ॥
কুটীরে বসায়্যা আইনু তোমা সভায় স্থানে।
নৃপতি দেখিতে সভে আইস মোর স্থানে ॥
শুনি সব ব্রাহ্মণীর আনন্দিত মন।
নৃপতি দেখিতে সভে করিল গমন ॥
সুনীতির কুটীরেতে সবে উত্তরিল।
ভূপতি দেখিয়া সবে হরিষ হইল ॥
ব্রাহ্মণীরা ভোজন করাইল নৃপতিকে।
সুনীতির কেশ বন্ধন করেন কৌতুকে ॥
উত্তম সাজায়্যা দিয়া রাজমহিষীরে।
সকল ব্রাহ্মণী যায় নিজ নিজ ঘরে ॥
কুটীরে নৃপতি আর সুনীতি রমণী।
পল্লবশয্যায় দুহে কৌতুকে কাহিনী ॥
রঙ্গরসে ঋতু রক্ষা কৈল নৃপমণি।
রাম রাম স্মরণে পুহাইল্য রজনী ॥
প্রভাতে উঠিয়া রাজা হরিষ অন্তর।
সুনীতিরে নানামতে বুঝাল্য বিস্তর ॥
প্রবোধিয়া নরপতি নিজ রাজ্য গেল।
ক্রমে ক্রমে পাত্র মিত্র সকলি মিলিল ॥
সভাসদে জিজ্ঞাসয়ে নৃপচূড়ামণি।
রজনী বঞ্চিলে কোথা কহ দেখি শুনি ॥
সভাসদ বলে তবে করি নিবেদন।
মৃগয়ার দুঃখকথা শুনহ রাজন ॥
কেহ বলে খাতে পড়ি ছিলাম রজনী।
প্রভাতে উঠিয়া আইলাম শুন নৃপমণি ॥
কেহ বলে বৃক্ষে মোর ভাঙ্গিয়াছে মাথা।
বস্ত্র বান্ধিয়াছি শিরে শুন দুঃখের কথা ॥
কেহ বলে কণ্টকেতে শরীর দাহন।
প্রভাতে সভায় আমি করিলাম গমন ॥
কেহ বলে উলু বনে বড় দুঃখ পাইনু।
প্রভাতে উঠিয়া আমি সভাতে আইনু ॥
এইরূপ সকলেতে করেন প্রকাশ।
মৃগয়া কারণ দুঃখ হইল পরিহাস ॥
মৃগয়াতে গিয়া হইল দুঃখ উপার্জন।
কহে বিপ্র লক্ষ্মীকান্ত করিল রচন ॥

॥ পয়ার ॥

পরীক্ষিত বলে তবে শুকদেব মুনি।
তদন্তরে কি হইল কহ দেখি শুনি ॥
শুকদেব বলে তবে শুন পরীক্ষিত।
অরণ্যে সুনীতির গর্ভ উপস্থিত ॥
দ্বিতীয় মাসের গর্ভ হইল কানাকানি।
ক্রমে ক্রমে জানিলেক সকল ব্রাহ্মণী ॥
তৃতীয় মাসেতে করে মৃত্তিকা ভক্ষণ।
চতুর্থ মাসে রাণীর ধূলাতে শয়ন ॥
পঞ্চম মাসের বেলা ব্রাহ্মণী সকল।
সুনীতিরে পঞ্চামৃত হরিষে খাওয়াইল ॥
ষষ্ঠম মাসেতে হয় সদাই আলস্য।
সাত মাসে সাধ খাইল হইয়া হরিষ ॥
উদর ডাগর হইল্য পূর্ণ অষ্ট মাসে।
নয় মাসে গব্ভা কৈল মনের হরিষে ॥
দশ মাসে পূর্ণ গর্ভ হইল সুনীতির।
প্রসববেদনায় রাণী হইল অস্থির ॥
ব্রাহ্মণী সকল আসি ধাত্রীকে আনিল।
সুনীতি রমণীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল ॥
সন্তানের সুআকৃতি অতি সুগঠন।
ললাটেতে রাজবজ্র অতি সুলক্ষণ ॥
চালের কাড়িয়া পত্র জ্বালালে আগুনি।
গোমুণ্ড স্থাপিয়া দ্বারে পূজে ষষ্ঠী বুড়ী ॥
হুলাহুলি দিয়া কৈল নাভির ছেদন।
তিন দিনে কৈল রাণী সুপত্র পাচন ॥

ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা কৈল্য জাগরণে।
অষ্ট কলাই তার কৈল্য অষ্ট দিনে ॥
নয় দিনে নক্তা কৈল মনের হরিষে।
ষষ্ঠীপূজা কৈল তার একুত্রিশ মাসে ॥
ধ্রুব নাম রাখিলেন পরিপূর্ণ মাসে।
মাস দুই তিতে দেয় জলটিয়া পাশে ॥
ছয় মাসে সন্তানেরে করায় ভোজন।
আনন্দিত হইয়া দেখে পুত্রের বদন ॥
বৎসর পূর্ণিত হইল ভ্রমি স্থানে স্থানে।
দ্বিতীয় বৎসর গেল আনন্দিত মনে ॥
তৃতীয় চতুর্থ বৎসর পূর্ণ হয়া যায়।
শিশুগণ সঙ্গে ধ্রুব ধূলিতে খেলায় ॥
কবিল স্তবন বেদ পঞ্চম বরিষে।
শ্রোতাগণ…বাড়ে দিবসে দিবসে ॥
পঞ্চম বৎসরের শিশু নাহি থাকে ঘরে।
ব্রাহ্মণের শিশু সঙ্গে যায় খেলিবারে ॥
দিগম্বর বেশধর অতি মনোহর।
প্রতিদিন খেলে সেই অরণ্য ভিতর ॥
এক দিন জিজ্ঞাসয়ে ব্রাহ্মণতনয়।
এই ধ্রুব তব পিতৃনাম কিবা হয়॥
ধ্রুব বলে শুন ভাই দ্বিজের নন্দন।
মাতার নিকটে জিজ্ঞাসিব বিবরণ ॥
জন্মিয়া পিতা আমি না দেখি নয়ানে।
কেমনে বলিব আমি তোমা সভা স্থানে ॥
এই কথা শুনি হাসে যত শিশুগণ।
খেলা ভাঙ্গি নিজালয় করিল গমন ॥
কুটীরেতে গিয়া ধ্রুব সুনীতিরে কয়।
কহ মাতা মম পিতৃনাম কিবা হয় ॥
খেলাস্থানে শিশুগণ জিজ্ঞাসিল মোরে।
নাম নাহি জানি লজ্জা পাইনু সত্বরে ॥
তেকারণে গৃহে আসি জিজ্ঞাসি তোমারে।
আমার পিতার নাম বল সত্য করে ॥
সুনীতি বলেন বাছা শুন মোর বাণী।
তব পিতা হয় উত্থানপাদ নৃপমণি ॥
তব বিধাতার বোলে মোরে দিল বন।
মৃগয়াতে আসি হৈল তোমার জনম ॥
মাতৃস্থানে ধ্রুব সব পাইল বিবরণ।
প্রভাতে উঠিয়া কৈল অরণ্যে গমন ॥
খেলাস্থানে শিশুগণে একত্রে মিলিল।
ধ্রুব নিজ পিতৃনাম বিশেষ কহিল ॥
শিশুগণ বলে ভাই শুনহ সত্বর।
তোমারে উলঙ্গ লয়্যা না খেলাব আর ॥
বসন পরিয়া যদি এস খেলাস্থানে।
মোরা সব খেলাইব তবে তোমার স্থানে ॥
এই কথা শুনি ধ্রুব কান্দিতে কান্দিতে।
মায়ের নিকট আইল বসন মাগিতে ॥
রোদন করিয়া বলে শুন গো জননী।
পরিবারে দেহ মোরে বসন একখানি ॥
শিশুগণ বলে মোরে উলঙ্গ দেখিয়া।
মোরা সব না খেলাব তোমারে লইয়া ॥
বসন পরিয়া যদি না আইস এই স্থানে।
এতেক বলিল তবে ধ্রুব চূড়ামণি।
সুনীতি বলেন আমি বড়ই দুখিনী ॥
দ্বিতীয় বসন নাই শুন বাছাধন।
সবে মাত্র একখানি আছে পরিধান ॥
তাহা শুনি ধ্রুব বড় কান্দিতে লাগিল।
সুনীতি রমণীর বড় দুঃখ উপজিল ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণী করিল উপায়।
আপন অঞ্চল ছিণ্ডি দিলেন তাহায় ॥
সুনীতি বলেন তবে শুন বাছাধন।
খেলিবারে যাহ ধ্রুব পরিয়া বসন ॥
বসন পাইয়া ধ্রুব আনন্দ অন্তরে।
খেলিবারে যায় তবে অরণ্য ভিতরে ॥
দুঃখিনীসন্তান নাহি জানে বিবরণ।
কান্ধেতে রাখিল বস্ত্র করিয়া যতন ॥
ব্রাহ্মণের শিশু সব দেখিয়া অঞ্চল।
হাস পরিহাস করে সকল ছাওয়াল ॥
শিশুগণ বলে শুন দুখিনীসন্তান।

রাজসম্ভাষণে আজি করিব গমন ॥
ধ্রুব সনে যুক্তি করে চলিল সত্বরে।
উপস্থিত হইল গিয়া রাজার দুয়ারে ॥
দিগম্বর বেশধর অঞ্চল কান্ধেতে।
শিশু সঙ্গে অগ্রভাগে হাসিতে হাসিতে ॥
রাজদণ্ড ললাটেতে আছয়ে লক্ষণ।
দ্বারি দেখি হইল্য চমকিত মন ॥
মনে মনে চিন্তে দ্বারী অরণ্য ভিতর।
শুনিয়াছি সুনীতির হয়্যাছে কুমার ॥
বুঝি সে সন্তান হবে মনে অনুমানি।
দুয়ার ছাড়িয়া দ্বারী দিলেন তখনি ॥
ব্রাহ্মণের শিশুগণে ছাড়িয়া না দিল।
নয়ানে দেখিয়া ধ্রুব দ্বারীকে বলিল ॥
শুন শুন দ্বারী ভাই করি নিবেদন।
শিশু সঙ্গে আমি হেথা কর্য়াছি গমন ॥
দুয়ার ছাড়িয়া দাও এই ভিক্ষা চাই।
রাজা সম্ভাষিতে যাই একত্রে সবাই ॥
ইহা শুনি দ্বারী তবে দ্বার ছাড়ি দিল।
সকল শিশুতে মেলি সভাস্থ হইল ॥
সুরুচি উদরে পুত্র উত্তম তার নাম।
তাহাকে লইয়া রাজা করেন পালন ॥
নৃপতির ধর্ম্ম এক আছয়ে প্রচার।
চতুর্দ্দিকে নিরখিয়া দেখে বারে বার ॥
দেখিল সভাতে দাঁড়াইল শিশুগণ।
আপন সন্তানে দেখে অতি সুলক্ষণ ॥
সুগঠন রাজদণ্ড আছয়ে ললাটেতে।
নিরখিয়া নরপতি ডাকিল কাছেতে ॥
ধ্রুবকে ডাকিয়া রাজা জিজ্ঞাসে সত্বরে।
কাহার তনয় তুমি বল সত্য করে ॥
নিজ পরিচয় দেহ শুন বাছাধন।
কোথায় বসতি তব কহ বিবরণ ॥
ধ্রুব চূড়ামণি বলে শুন নরপতি।
পরিচয় দিব তোমায় কর অবগতি ॥
নিজ নাম ধরে মোর জননী সুনীতি।
পিতা মোর হয় উত্থানপাদ নরপতি ॥
অরণ্যেতে স্থিতি মোর শুন মহাশয়।
মম পরিচয় এই কহিলাম নিশ্চয় ॥
শুনিয়া অন্তরে কান্দি কহেন রাজন।
আমি তব পিতা কোলে এস বাছাধন ॥
আনন্দিত হয়্যা রাজা শিশুর হাত ধরে।
ধ্রুবকে লইতে চায় সিংহাসন উপরে ॥
সিংহাসনে উঠিতে ধ্রুব করিল মনন।
বাড়াইয়া দিল ধ্রুব দক্ষিণ চরণ ॥
ধ্রুবমুনির বাম পদ ভূমিতে রহিল।
গবাক্ষের দ্বার হইতে সুরুচি দেখিল ॥
নয়ানে দেখিয়া রাণী অতি ক্রোধমন।
ডাকিয়া বলেন ধ্রুব শুন রে বচন ॥
এত তেজ ধর তুমি কিসের কারণে।
দাসীর পুত্র হয়্যা বাঞ্ছা কর সিংহাসনে ॥
তব মাতা জন্মান্তরে কৃষ্ণ নাহি ভজে।
রত্নসিংহাসনে ধ্রুব উঠ কোন লাজে ॥
জন্ম জন্মান্তরে আমি কৃষ্ণ আরাধিয়ে।
সিংহাসনে বৈসি আমি পতিরে লইয়ে ॥
অরণ্যেতে গিয়া কর কঠোর তপস্য।
তোমারে শ্রীকৃষ্ণ দয়া করিবেন অবশ্য ॥
বর লবে তোমার ওই দেহ পতন হবে।
বরেতে আমার গর্ভে জনম লইবে ॥
তবে সিংহাসনে যদি উঠিবারে পার।
নতুবা অরণ্যে বাস জন্ম জন্মান্তর ॥
এই কথা শুনি নৃপ ত্রাসযুক্ত অতি।
ধ্রুবেরে তেজিল তবে অতি শীঘ্রগতি ॥
বিমাতার বোলে আর পিতার বর্জ্জনে।
সভাতে বড়ই লজ্জা পাইল মনে মনে ॥
বিস্ময় গণিয়া ধ্রুব কান্দিতে কান্দিতে।
সকল শিশুরে লয়্যা আইল ত্বরিতে ॥
মাতার নিকটে বলে করিয়া রোদনে।
বড় লজ্জা পাইল্য গিয়া পিতৃসম্ভাষণে ॥
সভামধ্যে দাণ্ডাইনু সব শিশুগণ।
নৃপতি আমারে জিজ্ঞাসিল বিবরণ ॥

কাহার তনয় তুমি কোথায় বসতি।
কি নাম ধরহ তুমি বল শিশুমতি॥
তব মুখে পিতৃনাম শুনি চিত্ত শান্ত।
মম পরিচয় মাতা কহিনু তদন্ত॥
শুনিয়া নৃপতি বলে আমি তব পিতে।
হস্তেতে ধরিল মোরে ক্রোড়েতে লইতে॥
পিতৃবাক্যে দক্ষিণ পদ দিনু সিংহাসনে।
আমার বিমাতা সব দেখিলে নয়ানে॥
গবাক্ষের দ্বার হইতে বলে কুবচন।
দাসীর পুত্র হয়্যা ইচ্ছা যদি সিংহাসন॥
তব মাতা জন্মান্তরে কৃষ্ণ নাহি ভজে।
রাজসিংহাসনে তুমি উঠ কোন লাজে॥
নারায়ণ সেবি যদি জন্ম মোর উদরে।
তবে ত উঠিতে পার সিংহাসনপরে॥
এ কথা শুনিয়া পিতা কিছু না বলিল।
সিংহাসন হইতে ভয়ে আমারে তেজিল॥
কান্দিতে কান্দিতে আইনু তোমার গোচরে।
এহার উপায় মাতা বল শীঘ্র করে॥
ত্রিভুবন মধ্যে কি মা নাহি বন্ধুজন।
তাহার নিকটে করি লজ্জা নিবারণ॥
সুনীতি বলেন বাছা বলি যে তোমারে।
বন্ধুজন নাহি কেহ এ তিন সংসারে॥
করিল ভরসা পদ্ম-পলাশ-লোচন।
লজ্জানিবারণকর্ত্তা শ্রীমধুসূদন॥
লক্ষ্মীনারায়ণ দ্বিজ ভাবি বীণাপাণি।
রচিলেন ধ্রুবকথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥

॥ পয়ার ॥

ধ্রুব বলে শুন মাতা করি নিবেদন।
কারে উদ্ধারিল সেই শ্রীমধুসূদন॥
প্রকাশিয়া কহ মাতা তাহার চরিত্র।
তবে ত প্রত্যয় হব কহিলাম নিশ্চিত॥
সুনীতি বলেন তবে শুন যাদুমণি।
ভকতবৎসলকীর্ত্তি অপূর্ব্ব কাহিনী॥

জটিল নামে এক ব্রাহ্মণকুমার।
মাতা বিনে ত্রিসংসারে কেহ নাহি আর॥
অরণ্যের বাহিরে আছয়ে পাঠস্থান।
বিদ্যা শিখিবারে নিত্য করেন গমন॥
পঞ্চম বৎসরের শিশু কিছুই না জানে।
পাঠস্থানে যাইতে বনে ভয় হয় মনে॥
একদিন গৃহে আসি বলে জননীরে।
গুরুস্থানে যাইতে ভয় অরণ্য ভিতরে॥
যদি কেহ দয়া কর্য়া দাণ্ডায় আমারে।
তবে ত লিখিতে যাই নির্ভয় শরীরে॥
ব্রাহ্মণী বলেন তবে শুন বাছাধন।
ভয়ে রক্ষা করিবেন শ্রীমধুসূদন॥
তাহারে ডাকিলে তুমি দেখা পাবে তার।
অরণ্যের ভয়ে তোমায় করিবেন উদ্ধার॥
অজ্ঞান বালক কিছু বুঝিতে না পারে।
বিদ্যা শিখিবারে যায় হরিষ অন্তরে॥
অরণ্যমধ্যেতে গিয়া মনে হইল ভয়।
ডাকি বলে মধুসূদন রাখ এ সময়॥
ভক্তাধীন ভগবান জানিল অন্তরে।
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণ রহিতে না পারে॥
ভকতবৎসল হরি ভকতে সদয়।
জটিলেরে রক্ষা হেতু অরণ্যে উদয়॥
কেন ভাই জটিল ডাক রে বারে বারে।
অরণ্যের ভিতর ভয় নাহিক তোমারে॥
তব জ্যেষ্ঠ দাদা আমি কহিনু তোমারে।
অরণ্যে পাইলে ভয় ডাকিবে আমারে॥
প্রতিদিন দাণ্ডাইব কহিলাম নিশ্চয়।
বিদ্যা শিখিবারে যাও কিছু নাহি ভয়॥
আপনি বালক মায়া বুঝিতে না পারে।
নিতি নিতি দেখা পায় অরণ্য ভিতরে॥
গৃহে আসি জননীরে বলে বিবরণ।
অরণ্যেতে রক্ষা করে শ্রীমধুসূদন॥
আমারে কহিলেন তিহ তব দাদা হই।
কাননে দাণ্ডাব আমি কিছু ভয় নাই॥

ব্রাহ্মণী শুনিল তবে সন্তানমুখেতে।
মনে মনে চিন্তে রক্ষা করে রাখালেতে॥
প্রতিদিন যায় জটিল বিদ্যা শিখিবারে।
গুরুপিতৃশ্রাদ্ধ হবে কিছু দিনান্তরে॥
গুরু বলে শিশুগণে রাখহ বচনে।
পিতৃশ্রাদ্ধ হবে মোর এই সে কারণে॥
জনে জনে লহ ভার দ্রব্য আদি যত।
ব্রাহ্মণ ভোজন হইলে হব আমি মুক্ত॥
শুনি সব শিশুগণ মনে অনুমানে।
মরকাদি (?) পত্রের ভার নিল জনে জনে॥
লজ্জা পেয়া জটিল আইল নিজালয়।
জননীরে বলে তবে করিয়া বিনয়॥
জটিল বিশেষ কথা কহিল সকল।
ব্রাহ্মণী সকলি শুনি মনেতে চিন্তিল॥
জটিলেরে বলে তবে শুন বাছাধন।
মোর শক্তি নাহি, দিবে শ্রীমধুসূদন॥
এত শুনি জটিল চলিল অরণ্যেতে।
নারায়ণে ডাকিলেন কান্দিতে কান্দিতে॥
ভক্তাধীন দেখা দিল অরণ্য ভিতর।
খেদান্বিত হইয়া জটিল বলেন বিস্তর॥
গুরুপিতৃশ্রাদ্ধ হবে এই সে কারণ।
সকল শিশুতে করে দ্রব্য আয়োজন॥
লজ্জা পেয়া আইনু জননীর কাছে।
জননী কহেন ভগবান কোথা আছে॥
লজ্জা রক্ষা কর দাদা করি নিবেদন।
বলহ কি দিব আমি করি আয়োজন॥
শ্রীমধুসূদন বলে শুন মোর ভাই।
গুরুকে বলহ দধি দিব তব ঠাঁই॥
এই কথা শুনি জটিল গুরুস্থানে গেল।
দধি দিব ব'লে জটিল গুরুকে বলিল॥
গুরুপিতৃশ্রাদ্ধ দিনে সব শিশুগণ।
যার যে আছয়ে ভার করে আয়োজন॥
অধিক বিলম্ব হইল জটিল না আইসে।
গুরু বলে দধি নাই উদ্ধারিব কিসে॥

দ্বিতীয় প্রহর জটিল অরণ্য ভিতর।
মধুসূদন বলিয়া ডাকে বারে বার॥
বৈকুণ্ঠেতে জানিলেন শ্রীমধুসূদন।
এক ভাঁড় দধি লয়া করিল গমন॥
দধি দেখিয়া জটিল ভাবেন মনেতে।
এক ভাণ্ড দধি লয়্যা যাব কিরূপেতে॥
জটিলেরে ব্যথিত দেখিয়া নারায়ণ।
শিশুরে বলেন ভয় না কর এখন॥
এই দধি লয়্যা যাও গুরু বিদ্যমান।
সহস্র সহস্র দ্বিজ হইবে ভোজন॥
এত শুন দধি লয়্যা করিল গমন।
ভাণ্ড হাতে দেখি গুরু করে আস্ফালন॥
এই জন্তে জটিল তুই নিলি দধির ভার।
এতক্ষণে সর্ব্বনাশ করিলি আমার॥
জটিল বলেন গুরু শুন মোর বাণী।
সহস্র ব্রাহ্মণ খাওয়াইব ত এখনি॥
তবু না ফুরাবে দধি ভাণ্ডেতে আমার।
মধুসূদন দাদা দিলেন সারাৎসার॥
এই কথা শুনি গুরু মনেতে ভাবিয়া।
সকল ব্রাহ্মণ তবে দিল বসাইয়া॥
সহস্র সহস্র লোক ক্রমে খাইল।
যত চাহে তত হয় দধি না ফুরাল॥
এহা দেখি গুরু তখন বিস্ময় অন্তর।
জটিল সঙ্গেতে গেল অরণ্য ভিতর॥
আপন মাতাকে জটিল আনি অরণ্যেতে।
নারায়ণে ডাকে তবে কান্দিতে কান্দিতে॥
ভকতবৎসল হরি ভক্তের কারণে।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইল সেই অরণ্যে॥
ব্রাহ্মণী জটিল গুরু তিন জনে।
উদ্ধারিয়া লইয়া গেল হরি বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
সেই হরি ভরসা যে কহিলাম তোমারে।
তেঁহ বিনে কেহ ধ্রুব নাহি ত্রিসংসারে॥
ধ্রুবকথা সুধারস অপূর্ব্ব কাহিনী।
দ্বিজ লক্ষ্মীকান্ত রচে ভাবি বীণাপাণি॥

ধুয়া রাগিণী—ঝিঝুট

ঝাঁপতাল

মধুসূদন নাম ধর হে তুমি এ ভব সংসারে
পড়্যা রইলাম আমি।

॥ ত্রিপদী ॥

পরীক্ষিত নৃপমণি　　সবিস্ময় মনে গুণি
ধ্রুবকথা শ্রবণ করিয়ে।
কৃতাঞ্জলি হইয়ে বলে　　শুকদেবপদতলে
ধ্রুবকথা কহ প্রকাশিয়ে ॥
শুকদেব বলে বাণী　　পরীক্ষিত নৃপমণি
ধ্রুবকথা অমৃত বচন।
মন দিয়া যেই নরে　　এ কথা শ্রবণ করে
তারে কৃপা করে নারায়ণ ॥
ধ্রুব বলে শুন মাতা　　ও নামের গুণকথা
শুনিলাম তোমার মুখেতে।
কহ মাতা বিবরণ　　কোথা আছে সেই জন
যাইব তাহার উদ্দেশেতে ॥
সুনীতি প্রবন্ধ করি　　সন্তানে চাতুরী করি
বলে বাছা পূর্ণ নহে কাম।
নিগূঢ় কাননে স্থান　　সঙ্গে সিংহ ব্যাঘ্রগণ
পদ্মপলাশলোচন তার নাম ॥
দুধের বালক তুমি　　একলা কানন ভ্রমি
কেমনে পাইবে সেই জনে।
সে বড় কঠিন স্থান　　ব্যাঘ্রেতে করে ভক্ষণ
যাইতে না দিব সেই স্থানে।
পাইয়া নিগূঢ় তত্ত্ব　　হইল ধ্রুব উন্মত্ত
মনে মনে চিন্তয়ে অপার।
জননীরে না কহিব　　একলা অরণ্যে যাব
এই পণ করিলাম সার ॥
মনে মনে অনুমানি　　অস্ত হইল দিনমণি
উপস্থিত রজনী হইল।
সদা মন উচাটন　　করিলেন ভোজন
মাতা সুতে শয়ন করিল ॥
সুনীতি কাতর হয়্যা　　সন্তান কোলেতে লয়্যা
নিদ্রাগত হইল তখনি।
সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর রাত্তি　　উঠিলেন শিশুমতি
প্রদক্ষিণ করেন জননী ॥
চরণের ধূলি লয়্যা　　করপুটে দাণ্ডাইয়া
বিদায় মাগেন বারে বার।
প্রণাম করিয়া বলে　　জননীর পদতলে
যেন দয়া করেন গদাধর ॥
বড়ই কাতর হয়্যা　　জননীরে প্রণমিয়া
ডাকে পদ্ম-পলাশলোচন।
আমি অতি শিশুমতি　　না জানি ভকতি স্তুতি
কৃপা করি দিও দরশন ॥
দ্বিজ লালবেহারী সুত　　সেহ বড় গুণান্বিত
তার সুত লক্ষ্মীনারায়ণ।
কাতর হইয়া বলে　　গুণী জনার পদতলে
পিতার দুঃখ কর নিবারণ ॥

॥ পয়ার ॥

সার্দ্ধ দিপ্রহর নিশি বড়ই দুষ্কর।
…　…　…ঘোর অন্ধকার ॥
ধ্রুব বলে রমানাথ ঘৃণা না করিয়।
নিষ্কলঙ্ক নামে যেন কলঙ্ক না হয় ॥
প্রভু পলাশলোচন বলে হইল বাহির।
কোমল কণ্ঠেতে নাম জপে নিরন্তর ॥
ক্রমে ক্রমে প্রবেশিয়া অরণ্য ভিতরে।
প্রভু পলাশলোচন বল্যা ডাকে উচ্চস্বরে ॥
নিবিড় কাননে বৃক্ষ অতি সুশোভন।
তাল পিয়াল আর কদম্ব বন্ধন ॥
জাম্বীর খাজুর বট আর হরিতকী।
নারিকেল বদরি আর সভে আমলকী ॥
লাল বর্ণের বৃক্ষে শোভা হয়্যাছে কানন।
ঘোর রজনীতে ধ্রুব করয়ে ভ্রমণ ॥
বাহ্য জ্ঞান নাহি ধ্রুব একান্ত মনেতে।
পদ্ম-পলাশলোচন বলে কোমল কণ্ঠেতে ॥

নিঃশব্দ হইল ঘোর বন্ধ রজনাতে।
বৃক্ষের গলিত পত্র পড়িল ভূমেতে ॥
সেই শব্দ পাইয়া ধ্রুব চিন্তেন অন্তরে।
বুঝি নারায়ণ দয়া করিলেন মোরে ॥
ডেকে বলে প্রভু তুমি বড়ই কঠিন।
খানিক বিলম্বে ত্যাগ হতো মোর প্রাণ ॥
এই কথা বলি দেখে শব্দ নাহি আর।
পদ্মপলাশলোচন বল্যা ডাকে আর বার ॥
নাম শুনে সিংহ ব্যাঘ্র হইয়্যা পুলকিতে।
শুনিতে শুনিতে যায় ধ্রুবের সহিতে ॥
একান্ত মনেতে ধ্রুব করয়ে ভ্রমণ।
ডেকে বলে কোথা প্রভু পলাশলোচন ॥
যদি সম্মুখেতে দেখে সিংহ ব্যাঘ্রগণ।
মনে করে এই প্রভু পলাশ-লোচন ॥
জ্ঞানশূন্য অরণ্যেতে করয়ে ভ্রমণ।
আশ্চর্য্য ঘটিল এক শুন বিবরণ ॥
অরণ্য ভিতরে এক······ব্যাঘ্রবীর।

··· ··· ···

বাঘিনীর গর্ভ হইল অপূর্ব্ব কাহিনী।
শুনি ব্যাঘ্র গর্ভকথা মনে অনুমানি ॥
সাধ খাওয়াইবে বল্যা মনেতে করিল।
মনোনীত সাধ কথা কহিতে লাগিল ॥
বাঘিনী বলেন শুন পশুরাজেশ্বর।
নরমাংস খাইতে ইচ্ছা হইল আমার ॥
সেই ত সময়ে ধ্রুব অরণ্য ভিতর।
নারায়ণে······ডাল করে বারে বার ॥
শব্দ পেয়্যা ব্যাঘ্র বড় হরিষ হইল।
ধ্রুবের সম্মুখে গিয়া সন্ধান করিল ॥
একান্ত মনেতে ধ্রুব ডাকে নারায়ণে।
রক্ষা কর বিপাকে পড়িনু এতক্ষণে ॥
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণ কমলা সহিত।
কম্পবান আসন হইল আচম্বিত ॥
মর্ত্ত্যলোকে নিরখিয়া দেখে নারায়ণ।
কাননে এসেছে উত্থানপাদের নন্দন ॥
আমারে সাধন করে একা অরণ্যেতে।
বিপদে পড়্যাছে ব্যাঘ্র আছে সম্মুখেতে ॥
রক্ষাহেতু গদাধর গদাহস্তে লয়্যা।
মর্ত্ত্যলোকে উঠিলেন চতুর্ভূজ হয়্যা ॥
ধ্রুবের পশ্চাতে দাণ্ডাইল নারায়ণ।
সম্মুখে থাকিয়া ব্যাঘ্র করেন গর্জ্জন ॥
নিরখিয়া ব্যাঘ্র তবে এক লম্ফ দিল।
পশ্চাতে থাকিয়া প্রভু গদা দেখাইল ॥
গদা দেখি ব্যাঘ্র তবে ফিরিল ভয়েতে।
তিন বার এইরূপে রাখিল গদাতে ॥
ভক্তাধীন বলে ব্যাঘ্র বড় দুরাচার।
আমার সম্মুখে করে এত অহঙ্কার ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন ব্যাঘ্র শুন মত্তমতি।
যে মোরে ভজয়ে তার না থাকে দুর্গতি ॥
প্রাণভয় নাহি তার দুরন্ত শমনে।
ধ্রুবেরে হিংসিতে চাহ মোর বিদ্যমানে ॥

॥ পয়ার ॥

এতেক শুনিয়া ব্যাঘ্র জ্ঞান প্রকাশিএ।
বিষ্ণু দরশনে সেই গেল উদ্ধারিয়ে ॥
ধ্রুব রক্ষা কর‍্যা কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ।
বিপদ এড়ায়্যা ধ্রুব করেন ভ্রমণ ॥
পদ্মপলাশলোচন বিনে অন্য নাহি গণি।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হইল প্রভাত রজনী ॥
বৃক্ষতলে বসিল জপে নিরন্তর।
কুহু কুহু কোকিল করয়ে গুঞ্জর ॥
প্রভাতে সকল দ্বিজ স্নান করিবারে।
কোশাকুশী লইয়ে সভে যায় সরোবরে ॥
বীণাযন্ত্র লইয়া নানা ধরিয়া রাগিণী।
বিষ্ণু দরশনে যায় নারদ আপনি ॥
হেন কালে বসি ধ্রুব বৃক্ষের মূলেতে।
পদ্মপলাশলোচন বল্যা কোমল কণ্ঠেতে ॥
শব্দ পাইয়া নারদ ভাবেন মনে মনে।
আমার সমান কেবা আছে ত্রিভুবনে ॥

শ্রীকৃষ্ণসেবক আমি ব্যাপিত জগতে।
অঙ্গে কেবা ডাকে নাম কোমল কণ্ঠেতে ॥
ধ্যানমগ্ন হইয়া নারদ জানিল কারণ।
অরণ্যে এসেছে উত্থানপাদের নন্দন ॥
অনুরাগি হইয়া ধ্রুব বিমাতাবচনে।
শ্রীকৃষ্ণসাধনে একা আইলা কাননে ॥
জানিয়া নারদ আইল্য ধ্রুবের নিকটে।
মন শুনিবারে কথা কহেন কপটে ॥
শুন শিশুমতি ধ্রুব আমার বচন।
সিংহাসন ইচ্ছা হেতু আইলেন কানন ॥
মোর সঙ্গে চল পাবে রাজসিংহাসন।
একেলা কাননে কেন করএ ভ্রমণ ॥
এই কথা শুনি ধ্রুব নয়ন মেলিল।
নারদ দেখিয়া ধ্রুব প্রণাম করিল ॥
কান্দিয়া বলেন প্রভু শুন মোর বাণী।
এমন কঠিন তুমি ইহা নাহি জানি ॥
জননীমুখেতে আমি শুনি বিবরণ।
অরণ্য আসিয়া তোমার পাসরিনু স্মরণ ॥
মোরে রজনীতে যদি ব্যাঘ্রেতে খাইত।
ভক্তাধীন নামে তোমার কলঙ্ক রহিত ॥
যে হউক সে হউক যদি দিলে দরশন।
রাজসিংহাসন ইচ্ছা নহে মোর মন ॥
তোমার চরণ আমি হৃদে করি আশ।
নিজ গুণে কর প্রভু মহিমা প্রকাশ ॥
সবিশেষ বুঝিলেন আপনি নারদ।
ধ্রুবের মনেতে নাহি কিছু ভেদাভেদ ॥
পঞ্চম বৎসরের শিশু হইল একমন।
একা কাননেতে করে শ্রীকৃষ্ণসাধন ॥
চিন্তিয়া উত্তর করেন নারদ আপুনি।
আমার বচন শুন ধ্রুব চূড়ামণি ॥
একমনে তুমি যার করএ সাধন।
চিনিতে না পার আমি নহি সেই জন ॥
নারদ আমার নাম শুন শিশুমতি।
শ্রীহরিসেবক আমি জগতে খেয়াতি ॥
আমা হইতে পাবে তুমি সেই নারায়ণ।
উপদেশ মহামন্ত্র দিব ত এখন ॥
মন্ত্র জপ করি কর কঠোর তপস্যা।
তবে নারায়ণ দয়া করিবেন অবশ্য ॥
ধ্রুব বলে শুন প্রভু আমার বচন।
কৃপা করি যদি দিলে দরশন ॥
বুঝি দয়া করি হরি পাঠাইলেন তোমারে।
তপস্যার উপদেশ বলহ আমারে ॥
নারদ বলেন তবে চল সরোবরে।
স্নান করাইয়া মন্ত্র দিব তো তোমারে ॥
এ কথা শুনিয়া ধ্রুব সরোবরে গেল।
কটি ডুবাইয়া জলে দাণ্ডাইয়া রহিল ॥
নারদ বলেন স্নান কর শিশুমতি।
তোমারে সেবক করি রাখিব খিয়াতি ॥
অজ্ঞান বালক সেই কিছুই না জানে।
ধ্রুব বলেন স্নান করিব কেমনে ॥
শুনিঞা নারদ হইল বিস্ময় অন্তর।
চিন্তা করা মায়া প্রকাশিল গদাধর ॥
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র কিছু না পারি বুঝিতে।
ধন্য রমানাথ বলি নাম্বিল জলেতে ॥
আপনি লইল জল অঞ্জলি করিয়া।
অবোধ বালকে দিল স্নান করাইয়া ॥
ধ্রুবের সর্ব্বাঙ্গে কৈল মৃত্তিকা লেপন।
হরিনাম কত লেখে অঙ্গে আভরণ ॥
অষ্ট অক্ষর মহামন্ত্র দিলেন কর্ণেতে।
পত্রের কুটীর করি দিল অরণ্যেতে ॥
বোষ্টবের* চূড়ামণি ধ্রুবেরে করিল।
তপস্যা বর্ণন করি নারদ চলিল ॥
ডাকিয়া নারদ বলেন ধ্রুবের প্রতি।
কিরূপ ভাবনা করি কর অনুমতি ॥
ফিরিয়া নারদ বলে শুনহ বচন।
রূপের বর্ণনা আমি কহি বিবরণ ॥
নব দূর্ব্বাদল-শ্যাম ত্রিভঙ্গ মুরতি।
পিতাম্বর বেশ প্রভু শ্যাম শান্ত মূর্ত্তি ॥

* বৈষ্ণবের।

রূপের বর্ণনা করি গেলেন নারদ।
ওখানেতে সুনীতির ঘটিল প্রমাদ॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখে পুত্র নাই কোলে।
হা পুত্র হা পুত্র বলি কান্দে উচ্চরোলে॥
কান্দিয়া কাতর বড় হইল সুনীতি।
হেন কালে নারদ আইল শীঘ্রগতি॥
সুনীতিরে বলে তুমি না কান্দিয় আর।
ধ্রুবের চরিত্রকথা শুন সমাচার॥
বোষ্টবের চূড়ামণি করিয়া তাহারে।
সমাচার দিতে আমি আইনু তোমারে॥
তাহার তপস্যায় হরি হরিষ হইয়া।
তোমা সবাকারে প্রভু লবে উদ্ধারিয়া॥
শুনিয়া সুনীতি তবে সম্বরে রোদন।
হরিষে নারদ বিদায় করিল তখন॥
সুনীতি নিকট হইতে নারদ আপনি।
উত্থানপাদের নিকটে গেলেন তখনি॥
উত্থানপাদ নৃপতিরে কহে সমাচার।
ধ্রুব হইতে হবে তব বংশের উদ্ধার॥
বোষ্টবের চূড়ামণি করিনু তাহারে।
শ্রীকৃষ্ণ সাধন করে অরণ্য ভিতরে॥
শুনিঞা রাজন বড় হরিষ হইল।
সুনীতিরে বন হইতে গৃহেতে আনিল॥
সুনীতি অরণ্যদুঃখ কিছু পাসরিল।
লক্ষ্মীনারায়ণ ধ্রুবকথা বিরচিল॥

॥ পয়ার ॥

শুকদেব বলে তবে শুন পরীক্ষিত।
ধ্রুবের তপস্যা কথা অতি সুশোভিত॥
নারদমুখেতে ধ্রুব বিশেষ শুনিল।
অরণ্যেতে একা ধ্রুব তপ আরম্ভিল॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া ধ্রুব মন্ত্র জপ করে।
নাহিক ক্ষুধা তেষ্টা ধ্রুবের শরীরে॥
দুই তিন মাসে এক দিনেতে ভক্ষণ।
পক্ষান্তরে জলবিন্দু তুলসী পারণ॥
বিনি ঝড়ে খসি পড়ে বৃক্ষের গলিত পত্র।
তাহা ভক্ষণেতে থাকে দিন পাঁচ সাত॥
একান্ত পারণা ষট্ রাত্রি উপবাস।
পারণা করিল ধ্রুব সভে এক গ্রাস॥
... বাহু বক্ষপুটে এক পায়ে ভর।
মন্ত্র জপ করে ধ্রুব অষ্ট অক্ষর॥
পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে যে ভর দিয়া।
একাদশ ইন্দ্রিয় ধ্রুব নিগ্রহ করিয়া॥
কালিন্দীর তীরে উর্দ্ধ চরণযুগলে।
উর্দ্ধমুখে তপনতাপে সূর্য্য অগ্নিজ্বালে॥
শীতকালে কালিন্দীর জলে ডুবে রহে।
বরিষে সর্বাঙ্গ তিতে এত দুঃখ সহে॥
উৎকট তপস্যা ধ্রুব করে রাত্রি দিনে।
একান্তে শুইয়া ধ্রুব ভাবে নারায়ণে॥
ধ্রুবের তপস্যা দেখে যত দেবগণে।
তপভঙ্গ হেতু সভে ভাবে মনে মনে॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে লাগে চমৎকার।
না জানি এ ধ্রুব লয় কার অধিকার॥
ইন্দ্র বলে ধ্রুব আমার অধিকার লবে।
নারায়ণ দিবে ইহা বুঝি অনুভাবে॥
ব্রহ্মা বলেন আমার...পদ লয়।
ব্রহ্মপদ লিবে ধ্রুব জানিনু নিশ্চয়॥
কুবের বরুণ পবনাদি হুতাশন।
সভে বলে আমার পদ লিবেক এখন॥
চন্দ্র বলে সভাকার উচ্চ পদ আমি।
মোর পদ নিবে ধ্রুব মনে অনুমানি॥
ব্রহ্মা বলে শুন সভে আমার বচন।
তপ ভাঙ্গিবার হেতু দেখহ কারণ॥
বেশ্যা পাঠাইয়া কর এহার প্রতিকার।
রক্ষা হেতু এহা ভিন্ন যুক্তি নাহি আর॥
ইন্দ্র আদি দেব শুনি হরিষ হইল।
পঞ্চজন নৃত্য করে সভে ডাকাইল॥
উর্ব্বশী মেনকা পঞ্চচূড়া তিলোত্তমা।
রম্ভা আদি নৃত্য করে অপার মহিমা॥

সৌরভে মোহিত হয় মহা ঋষি মুনি।
রূপে ত্রিজগত আলো অপূর্ব্ব কাহিনী॥
ইন্দ্র বলে শুন রম্ভা আমার বচন।
পঞ্চ জনে মধুবনে করহ গমন॥
উত্থানপাদ নরপতি তাহার সন্তান।
ধ্রুব নাম ধরে সেই বড়ই অজ্ঞান॥
পঞ্চম বৎসরের শিশু আসি মধুবনে।
কঠোর তপস্যা করি ভাবে নারায়ণে॥
তুষ্ট হইয়ে ভগবান দরশন দিবে।
যে পদ ইচ্ছিবে ধ্রুব সেই পদ পাবে॥
পঞ্চ জন গিয়া তপ ভঙ্গ কর তার।
তবে দেবগণ সব পাইব নিস্তার॥
তপ ভঙ্গ কর গিয়া হয়্যা ত্বরাযুত।
সঙ্গে লহ কামদেব বসন্ত মারুত॥
উর্ব্বশী বলেন শুন দেবতাসমাজ।
মো সবার সঙ্গে আনি দেহ ঋতুরাজ॥
কামদেব আনি ইন্দ্র কৈল অনুমতি।
ধ্রুবতপোভঙ্গ হেতু যাহ শীঘ্রগতি॥
ইন্দ্রের বচনে কাম হইয়া ত্বরাযুত।
সঙ্গে নিল সহচর বসন্ত মারুত॥
ফুলময় ধনু ফুলময় পঞ্চ বাণ।
মধুকর কোকিল করয়ে সব গান॥
বসন্তেরে সঙ্গে লয়্যা বস্যা পঞ্চ জন।
ধ্রুবতপোভঙ্গ হেতু করিল গমন॥
রুনুঝুনু শব্দে হইল পৃথিবী মোহিত।
ক্রমে ক্রমে মধুবনে হইল উপস্থিত॥
অন্য যত মুনি আছে ধ্যানেতে বসিয়া।
... ...আছে লুকাইয়া॥
সৌরভেতে যত ঋষি হয়্যা অচেতন।
নিজ তপোভঙ্গ করি করে দরশন॥
উর্দ্ধমুখে আছে ধ্রুব এক চরণেতে।
শরীর হইয়াছে শীর্ণ তপনতাপেতে॥
পঞ্চ মাস অনাহারী কঠোর তপস্যা।
একান্ত মনেতে রুদ্ধ করিয়া নিঃশ্বাস॥

দেখিয়া বিস্ময় হইল বেশ্যা পঞ্চ জন।
পুত্রভাব জ্ঞান হইল করি নিরীক্ষণ॥
উর্ব্বশী বলেন শুন রম্ভা তিলোত্তমা।
ইহার তপস্যা কার দিতে নাহি সামা॥
বালক দেখিয়া মোর হইল এই জ্ঞান।
কোলে লইয়া উহারে করাই স্তনপান॥
এইমত শুনি বেশ্যা সকলেতে কয়।
মনে মনে মোসবার বাঞ্ছা এই হয়॥
প্রফুল্ল হৃদএ বালা নৃত্তকী সকলে।
যদি মোরা পুণ্য কর‍্যা থাকি কোন কালে॥
সেই পুণ্যফল ধ্রুবে দিলাম এক্ষণে।
তপস্যা করিয়া ধ্রুব পাবে নারায়ণে॥
পরাজয় হইয়া সব স্বর্গবিদ্যাধরী।
উলটিয়া যায় সবে ইন্দ্ররাজপুরী॥
হরিষ হইয়া বলে দেব সুরপতি।
কার্য্য সিদ্ধ কি করিলে কহ শীঘ্রগতি॥
বিদ্যাধরীগণ বলে শুন দেবরাজ।
ধ্রুব পরীক্ষিতে মোরা পাইনু বড় লাজ॥
দুধের বালক সে নাহি রসজ্ঞান।
মোসবারে দেখি কি সে ভঙ্গ হয় জ্ঞান॥
শুনিয়া ত দেবগণ বিস্ময় গণিয়া।
উপায় চিন্তিল এক রাক্ষসী আসিয়া॥
বিশেষ কহিল তারে ধ্রুবে পরীক্ষিতে।
ধ্যান ভঙ্গ কর গিয়া সুনীতি বেশেতে॥
ইন্দ্রের বচন শুনি রাক্ষসী চলিল।
সুনীতির বেশে মধুবনে উত্তরিল॥
চমকিত হইল ধ্রুবের তপস্যা দেখিয়া।
মায়া করি কান্দি কহে মনেতে চিন্তিয়া॥
বনবাসী হয়্যা কোলে পাইয়া তোমাধনে।
পতিশোকে নিবারিয়া ছিনু সে অরণ্যে॥
তোমা ধনে হারাইয়া কান্দিতে কান্দিতে।
মণিহারা ফণী হয়্যা ভ্রমি কাননেতে॥
তোমারে দেখিয়া আজি জুড়াল জীবন।
কোলে এস তপস্যায় নাই প্রয়োজন॥

কহে বিলাপিয়া কহে সকরুণ বাণী।
রাক্ষসের মায়া সেই অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
একান্ত মনেতে ধ্রুব ভাবে নারায়ণে।
মায়ারাক্ষসীর বাণী কিছু নাহি শুনে ॥
ত্রিসন্ধ্যা সময়ে ধ্রুব বিষম ধিয়ান।
সোনামুখে দেখিল মাতা করিছে রোদন ॥
দেখিয়া বিস্ময় ধ্রুব হইল মনেতে।
অসম্ভব মাতা কেন আইলা কাননেতে ॥
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র মায়া বুঝিলাম অন্তরে।
এই চিন্তা করি ধ্যানে বসিলা সত্বরে ॥
রাক্ষসী দেখিয়া হৈল চমকিত মন।
পরাজই হইয়্যা গেল অমরাভুবন ॥
রাক্ষসী মুখেতে ইন্দ্র সকলি শুনিল।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ ভাবিতে লাগিল ॥
ব্রহ্মা বলে আছে এক উপায় কারণ।
সবে মেলি যাই চল বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
এ কথা শুনিয়া সবে হইল্যা আনন্দিত।
ত্বরায় বৈকুণ্ঠে গিয়া হৈল উপনীত ॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া লক্ষ্মী করেন আহ্বান।
পশ্চাতে দেখিল ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥
লক্ষ্মী বলেন শুন আমার বচন।
কিবা অভিলাষে কৈলে গোলকে গমন ॥
ব্রহ্মা বলি··· ··· ···হইল সবার।
প্রভু গদাধর কথা কহ··· ··· ··· ।
কমলা বলেন নাহি জানি বিবরণ।
বড়ই চঞ্চল কিসে হইল নারায়ণ ॥
মধ্যাহ্ন সময়ে আসি কারণ আহার।
ভোজনান্তে গৃহে প্রভু নাহি থাকে আর ॥
সভা উচ্চ পদে বিশ্বকর্মারে লইয়া।
··· ··· ··· ···॥
কাহার জন্যেতে পুরী নির্ম্মাণ করায়।
বিশেষ··· ··· ··· ···॥
কি জন্যে এসেছ সবে বৈকুণ্ঠ ভুবন।
ব্রহ্মা বলে শুন মাতা করি নিবেদন ॥

অরণ্যে এসেছে উত্থানপাদের নন্দন।
পঞ্চম বৎসরের শিশু বড়ই অজ্ঞান।
পঞ্চ মাস অনাহারী ভাবে ভগবান ॥
তপস্যায় ভগবান সদয় হইবে।
যে পদ ইচ্ছিবে ধ্রুব সেই পদ দিবে ॥
পদ রাখিবারে সবে হয়্যা কম্পান্বিত।
প্রভুর নিকটে সবে আইল ত্বরিত ॥
কমলা বলেন শুন আমার বচন।
নির্ভয় হইয়্যা সবে করএ গমন ॥
মধ্যাহ্নে আইলে আমি কহিব বিশেষ।
তোমরা সকলে যাহ নিজ নিজ দেশ ॥
লক্ষ্মীর বচন শুনি যত দেবগণ।
নিজ নিজ দেশে সবে করিল গমন ॥
ওখানেতে নারায়ণ ভাবিয়া মনেতে।
ব্রহ্মালোক গোলোক সবার উপরেতে ॥
ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ করএ চমৎকার।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করএ ধ্রুবাগার ॥
সূর্য্যকান্ত মণি আর নীলকান্ত মণি।
নির্মাণ করয়ে দিয়ে পদ্মকান্তমণি ॥
ইন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক আর গোলোক।
সবা হৈতে উচ্চপদ হইল ধ্রুবলোক ॥
মধ্যাহ্ন সময়ে প্রভু অতীব ত্বরান্বিতে।
বিশ্বকর্ম্মা লইয়া আইলেন লক্ষ্মী নিকটেতে ॥
বসিয়া আছেন লক্ষ্মী হইয়া ক্রোধান্বিত।
দেখি ভগবান তারে জিজ্ঞাসে ত্বরিত ॥
কহ পিয়া কি জন্যে হয়্যাছে ক্রোধমন।
প্রকাশ করিয়া তুমি কহ বিবরণ ॥
লক্ষ্মী বলেন প্রভু তুমি বড়ই কঠিন।
তোমার শরীরে নাহি কিছু দয়া ক্ষীণ ॥
ভক্তাধীন ভগবান কে বলে তোমারে।
নিষ্ঠুর শ্রীকৃষ্ণ বলি ঘুষিবেক সংসারে ॥
উত্থানপাদ নৃপতির পুত্র মধুবনে।
পঞ্চ মাস অনাহারী আছে তব ধ্যানে ॥
দয়া না করিয়া আছ আপন কর্ম্মেতে।
তপস্যা করিয়া ধ্রুব মরিল প্রাণেতে ॥

নারায়ণ বলে শুন কমলা প্রেয়সী।
তার তরে উৎকণ্ঠিত আছি দিবানিশি॥
ধ্রুবলোক হইতেছে সবা উপরেতে।
পুরী নির্ম্মাইয়া তারে আনিব ত্বরিতে॥
লক্ষ্মী বলে শুন প্রভু আমার বচন।
তুমি গৃহে থাক আমি যাইব কানন॥
কোলেতে লইয়া স্তন পান করাইব।
পঞ্চ মাস অনাহারী তারে বাঁচাইব॥
লক্ষ্মীর বচন শুনি প্রভু নারায়ণ।
গরুড়ের নিকটেতে যাইল তখন॥
যাত্রা করিলেন ধ্রুবে দয়া প্রকাশিতে।
কমলা বলেন যাব তোমার সহিতে॥
প্রবঞ্চনা হরি তুমি…… ।
…করি ধ্রুব কর দিবে…… ॥
এ কারণ যাব আমি তোমার সংহতি।
ধ্রুববাঞ্ছা পূর্ণ করা…যাব শীঘ্রগতি॥
ভক্তাধীন বলে শুন আমার বচন।
এমন প্রকারে কোথা না হয় গমন॥
কমলা বলেন শুন গোলোকের পতি।
নিশ্চয় কহিলাম যাব তোমার সংহতি॥
লক্ষ্মীনারায়ণ দোহে একত্রে হইয়া।
গরুড়ে চাপিয়া বনে উত্তরিল গিয়া॥
গরুড়ে বলেন প্রভু আমার বচন।
ধ্রুবেরে ডাকহ দয়া করিব এখন॥
এ কথা শুনিয়া গরুড় ডাকে বার বার।
ডাক দিয়া কভু নাহি পাইল উত্তর॥
গরুড় বলেন প্রভু শুন মোর বাণী।
প্রাণেতে মরেছে ধ্রুব আমি এহা জানি॥
ভক্তাধীন বলে শুন গরুড় মহাবীর।
নিশ্চয় আমাকে ধ্রুব সঁপেছে শরীর॥
আশ্চর্য্য দে…হরির আপন নয়নে।
চেতন করাই দেখ এই ধ্রুব বনে॥
এত বলি সহিত কমলা দুই জনে।
ধ্রুবের সম্মুখে দাণ্ডাইল দুই জনে॥

যেরূপে ভাবনা ধ্রুব করএ অন্তরে।
সেইরূপ হরিলেন রূপ গদাধরে॥
অন্তরে না দেখি ধ্রুব সেই পিতাম্বরে।
রোদন করিয়া উঠে অতি উচ্চস্বরে॥
বহু বিলাপিয়া ধ্রুব করেন রোদন।
স্ব দৃশ্য নয়নে দেখে লক্ষ্মীনারায়ণ॥
শরীর হয়্যাছে শীর্ণ তপস্যা কারণ।
মনে করে পাইনু নারদের দত্ত ধন[১]॥

* * *

মধুবনে পাইনু ভগবান॥

শুনিয়া পুত্রের বাণী রাজা সবিস্ময় শুনি
মহানন্দ হইল অপার।
কোলে করিয়া সন্তানে চুম্বন করে বদনে
রাজ্যে দিল জয় জয়কার॥
আভরণ পরাইয়া গাত্রেতে চন্দন দিয়া
ব্রাহ্মণে করিল আশীর্ব্বাদ।
লয়ে ধ্রুব নিজ পুরে রত্নসিংহাসনোপরে
বসাইয়া করিল প্রসাদ॥
খেনেক লালন করি পাঠাইল নিজ পুরী
সুনীতির আপন গৃহেতে।
পাইয়া ধ্রুবের সাড়া দিয়া চন্দনের ছড়া
বাহির হইল কান্দিতে কান্দিতে॥
সুনীতি কাতর হইয়া হারা পুত্র কোলে পাইয়া
ধ্রুবমুখে করিল চুম্বন।
মস্তক আঘ্রাণ লইয়ে কান্দে বহু বিলাপিয়ে
জিজ্ঞাসে বিশেষ বিবরণ॥
ধ্রুব বলে শুন মাত বিশেষ কহিব বাত
মধুবনে করিনু গমন।
নারদের উপদেশে তপস্যা করিয়া শেষে
পাইনু পদ্মপলাশলোচন॥
ধ্রুবের বচন শুনি সুনীতি বিস্ময় গুণি
মনে করে বালকের মতি।
অন্য কেহ নাই সখা রাখালে দিয়াছে দেখা
ধ্রুব তারে করেছে ভকতি॥

১। ইহার পর ৩০ সংখ্যক পত্র নাই।

এই মনে অনুমানি সুনীতি বলেন বাণী
শুন পুত্র আমার বচন।[১]
* * *
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণ হইল উচাটন মন
ভক্তাধীন রহিতে না পারে।
মর্ত্ত্যলোকে নিরক্ষীয়ে ভকতে সদয় হইএ
উত্তরিলেন ধ্রুবের মন্দিরে ॥
গনেশ অনুজ হরি তস্য ভ্রাতা লালবেহারী
বিপ্র নতুপাড়াতে নিবাস।
তাহার সুতের সুত জ্ঞানশূন্য লক্ষ্মীকান্ত
ধ্রুবকথা করিল প্রকাশ ॥
॥ পয়ার ॥
শুকদেব বলে তবে শুনহ রাজন।
অপূর্ব্ব ধ্রুবের কথা শুনে যেই জন ॥
না থাকে দুর্গতি তার না থাকে দুর্গতি।
অনায়াসে হয় তার বৈকুণ্ঠেতে স্থিতি ॥
ধ্রুব বলে শুন মাতা করি নিবেদন।
নিরক্ষীয়া দেখ মাতা প্রভু নারায়ণ ॥
সুনীতির পাপচক্ষু না পায় দেখিতে।
ধ্রুবেরে বলেন তবে ভাবিয়া মনেতে ॥
রক্তবর্ণ কৃষ্ণচন্দ্র দেখেন নয়ানে।
তপস্যা করিয়া তুমি পাইলে নারায়ণে ॥
বুঝিলেন ধ্রুব সব জননীর মন।
শিশু বোধ করি মোরে করিল ছলন ॥
নারায়ণের বর কথা পড়িব মনেতে।
এই জন্মান্তরে মাতা পাবেন দেখিতে ॥
ধ্রুব বলে শুন মাতা আমার বচন।
মোরে কোলে করি দেখ প্রভু নারায়ণ ॥
ধ্রুবের বচনে তবে সুনীতি রমণী।
আপন সন্তানে কোলে লইল তখনি ॥
ধ্রুব পরশিয়ে দেখে শ্রীমধুসূদন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীবৎস লাঞ্ছন ॥
পরিধান পীতাম্বর কিরীট ভূষণ।
চতুর্ভুজ বেশ প্রভু দেব সনাতন ॥
সুনীতি দেখিয়া তবে আনন্দ অপার।
বিনয়ে বলেন মুক্ত কর গদাধর ॥
সন্তান তেজেতে দেখি তব শ্রীচরণ।
মহিমা প্রকাশি মুক্ত কর নারায়ণ ॥
ভক্তাধীন বলে শুন বচন আমার।
রাজ্যে থাক ষড়ত্রিংশ সহস্র বৎসর ॥
রাজার জননী হয়্যা থাকিবে এখন।
তদন্তরে ধ্রুবলোকে করিহ গমন ॥
উপদেশ কহি হরি গেল বৈকুণ্ঠেত।
সুনীতি সন্তান লয়ে হইল পুলকিত ॥
উত্থানপাদ নৃপতির কনিষ্ঠা রমণী।
সুরুচির পুত্র সব শুনিল কাহিনী ॥
উত্তম তাহার নাম শুনহ রাজন।
তপস্যা করিতে বনে করিল গমন ॥
দানবে বধিল সেই উত্তমের প্রাণী।
অন্বেষণে গেল তবে সুরুচি জননী ॥
আর না আইল ফিরে শুনহ নৃপতি।
সতিনী হিংসিতে তার বনে হইল স্থিতি ॥
তদন্তরে উত্থানপাদ করিল বিচার।
ধ্রুবেরে সঁপিল সব রাজ্যখণ্ডভার ॥
একেলা নৃপতি তবে ভাবিয়া অন্তরে।
তপস্যা করিতে গেল অরণ্য ভিতরে ॥
এখানেতে কর ধ্রুব প্রজারে পালন।
বিবাহ হইল তার অতি সুশোভন ॥
সন্তান হইল তার কত দিনান্তরে।
ষড়ত্রিংশ সহস্র বৎসর রাজ্য করে ॥
তদন্তরে রাজ্যখণ্ড সঁপিয়া সন্তানে।
ধ্রুবলোক যাত্রা হেতু ভাবে নারায়ণে ॥
পুষ্পরথ পাঠাইল দেব নারায়ণ।
জননী সহিত ধ্রুব করিল গমন ॥
ধ্রুবলোক গেল সবার উপরে।
ধ্রুবলোক বৈসে ধ্রুব সিংহাসনোপরে ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ পুরী মণিতে রচিত।
ধ্রুবের জননী দেখে হইল হরষিত ॥
এইরূপে হইল ধ্রুব কৃষ্ণ নারায়ণ।
যে গাওয়ায় গাওনায় যেবা করয়ে স্মরণ ॥
অনায়াসে যায় সেই বৈকুণ্ঠ ভুবনে।
রচিল পুস্তক দ্বিজ লক্ষ্মীনারায়ণে ॥

ইতি ধ্রুবচরিত্র সমাপ্ত ॥

সন ১২৬১ সাল তারিখ ১২ কার্ত্তিক। পঠনার্থে শ্রীগণেশ মা···লিখিতং শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। সাকিম—দাসপুর। পরগণে চেতুয়া। জেলা মেদিনীপুর।

১। এইখানে কয়েক পংক্তি কাটিয়া গিয়াছে।

হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

(? ১৮৩১—১৯০৬)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভূমিকা

পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মূল বাল্মীকি রামায়ণের সর্ব্বপ্রথম অনুবাদক বলিয়া প্রখ্যাত। তিনি সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিদ্ এবং বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এবং অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর মত হেমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তথা আদি ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করিয়া পরিপুষ্ট ও ফলপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল। উক্ত উভয় ব্যক্তির ন্যায় হেমচন্দ্রও তাঁহার সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য এবং বাংলা সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি আদি ব্রাহ্মসমাজের সেবায় পরিপূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্র-মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার স্থান সুনির্দ্দিষ্ট; কিন্তু বিরাট্ মহীরুহের আশ্রয়ে থাকায় তিনি সাধারণের দৃষ্টি হইতে কতকটা অন্তরালে পড়িয়া ছিলেন; আজিও যেন তিনি অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ মাত্র অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে গত হইলেও, হেমচন্দ্রের জীবন-কথা উপযুক্ত মালমশলার অভাবে যেন কতকটা ধোঁয়াটে হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি সমসময়ের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' তদ্‌রচিত গ্রন্থসমূহ, তাঁহার আশ্রিত পুত্রোপম ডাঃ শ্রীযুত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের* পত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি এবং অন্যান্য সূত্র হইতে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহার নিরিখে এখানে তাঁহার জীবন-কথা সম্বন্ধে কিছু বলা যাইবে।

বংশ-পরিচয় : জন্ম

হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যবংশীয়। দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলে তাঁহার জন্ম। হেমচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর কর্ত্তৃক উৎকল প্রদেশ আক্রান্ত হইলে আদি-নিবাস যাজপুর হইতে বঙ্গদেশে চলিয়া আসেন এবং যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে হোমড়া গ্রাম ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া সেখানে বাস করিতে থাকেন। কিন্তু সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি মানসিংহের হস্তে রাজা প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর রাজ্যে যেরূপ লুঠতরাজ ও বিশৃঙ্খলা সুরু হয়, তাহাতে তাঁহারা উক্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান মজিলপুর গ্রামে আগমন করেন।† মজা গঙ্গার গর্ভোত্থিত গ্রাম বলিয়া 'মজিলপুর' এই নাম। টোল চতুষ্পাঠী তথা সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য এই গ্রামের একদা প্রসিদ্ধি ছিল। হেমচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ

---

* ডাঃ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন : তিনি [হেমচন্দ্র] ছিলেন আমার 'বন্ধুশ্রেষ্ঠ, গুরু ও শিক্ষাদাতা'।

† বঙ্গে দাক্ষিণাত্য-বৈদিক—শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য। ২য় সং, পৃ. ২৩।

এখানে আগমনান্তর টোল-চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া সংস্কৃতবিদ্যা অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নিরত হন। এই বংশে কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিও জন্মিয়াছিলেন। গত শতাব্দীতে মজিলপুরনিবাসী হরানন্দ বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা এবং রসিকতাপ্রিয়তা সুবিদিত ছিল। তিনি মূল মহাভারত হইতে বিষয়বস্তু লইয়া 'নলোপাখ্যান' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারই পুত্র পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা এবং কবি ও সাহিত্যিক। পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন শিবনাথের জ্ঞাতিভ্রাতা। শিবনাথ 'আত্মজীবনী'তে হেমচন্দ্রকে একাধিক বার 'জ্ঞাতি-দাদা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের পিতা রামধন ভট্টাচার্য্য সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—হেমচন্দ্র, মথুর ও শ্রীনাথ।

প্রথম জীবন : শিক্ষা ও কর্ম্ম

হেমচন্দ্র কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন শেষ হইলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আনুকূল্যে সরকারী বিদ্যালয়-পরিদর্শক বিভাগে সহকারী পরিদর্শক বা সাব্-ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। দূরদেশে যাইতে হইবে বলিয়া কিছুকাল পরে তিনি ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করেন।

স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণের সহায়তায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহাভারতের অনুবাদ-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক ছিলেন; হেমচন্দ্রও অন্যতম অনুবাদক নিযুক্ত হন। মহাভারতের ১৭শ বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ শকে (১৮৬৬)। "অষ্টাদশ পর্ব্ব অনুবাদের উপসংহার" শীর্ষে কালীপ্রসন্ন ১৭শ খণ্ডের শেষে এই অনুবাদ-রচনার যে বিবরণ দেন, তাহার মধ্যে হেমচন্দ্রের উল্লেখ আছে। মৃত পণ্ডিত-অনুবাদকগণের কথা বলিয়া কালীপ্রসন্ন লেখেন :

"এখনকার বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রামসেবক বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সদস্যদিগকে মনের সহিত সকৃতজ্ঞ-চিত্তে বার বার নমস্কার করিতেছি। এই সমস্ত সুবিচক্ষণ কর্ণধারদিগের কৃপাবলেই আমি অনায়াসে মহাভারত-স্বরূপ সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম।"

অতঃপর তিনি "খণ্ডাকারে রঘুবংশ ও ভারতী অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েন ও পরে আদি ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষিদেবের নিকট পরিচিত হয়েন কিন্তু তখনও স্থায়ীভাবে ব্রাহ্মসমাজের সেবাব্রতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই।"*

হেমচন্দ্র ইহার পর বাল্মীকির রামায়ণ বাংলা ভাষায় অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। "বহুকাল ধরিয়া মহাভারতের অনুবাদ-কার্য্য সম্পাদন হইলে বিদ্যারত্ন স্বাধীনভাবে বাল্মীকি রামায়ণের সমূল সটীক ও সানুবাদ অতি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাই রামায়ণের

* 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা—পৌষ ১৮২৮ শক।

প্রথম অনুবাদ, যাহা বঙ্গদেশে প্রথম প্রকাশিত হয়। রামায়ণ প্রকাশের সময় বিদ্যারত্নের যশঃসৌরভ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। এবং তিনি বঙ্কিমবাবু, চন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রবাবু [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর] প্রভৃতি অনেকানেক মনীষিগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হয়েন। রামায়ণ প্রকাশের সময়ে ৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় পরলোক গমন করিলে বিদ্যারত্ন মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার কার্য্য গ্রহণ করেন। মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদ-কার্য্যে বিদ্যারত্নের জীবনের প্রায় ৩০ বৎসর অতিবাহিত লইয়া গেল।"* এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হেমচন্দ্র রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। "মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্। পূর্ব্বকাণ্ডম্" সংস্করণে ও সম্পাদনে হেমচন্দ্র আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সহযোগী ছিলেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পূর্ব্বে পরিচিত হইলেও, মহাভারত অনুবাদ সমাপ্তির (১৮৬৬) পর হইতেই হেমচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঐকান্তিক ভাবে মিলিত হইলেন। "ঐ দুই সংস্কৃত মহাকাব্য [মহাভারত ও রামায়ণ] অনুবাদে বিদ্যারত্নের সংস্কৃত রচনা ও বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ দক্ষতা জন্মিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই অনুকরণীয়। হেমচন্দ্র ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১৭৮৯ শক) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক পদে বৃত হন। এই পদে তিনি পূর্ণ দুই বৎসর কাল—চৈত্র ১৭৯০ শক পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পরে তিনি কয়েক বৎসর আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক, যন্ত্রাধ্যক্ষ, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক প্রভৃতি পদে দীর্ঘকাল কার্য্য করেন। বিভিন্ন বর্ষের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তাঁহার ঐ সব পদে নিয়োগের সংবাদ যথারীতি বাহির হয়। ইহার প্রধান প্রধান কয়েকটির বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক :	বৈশাখ ১৭৮৯ শক—চৈত্র ১৭৯০ ; বৈশাখ ১৭৯৯ শক—ভাদ্র ১৮০৬ শক
যন্ত্রাধ্যক্ষ :	আশ্বিন ১৮০৬ শক—বৈশাখ ১৮০৭ শক
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক :	জ্যৈষ্ঠ ১৮০৭ শক—অগ্রহায়ণ (?) ১৮১৪ ; বৈশাখ ১৮২১† হইতে মৃত্যুকাল (অগ্রহায়ণ ১৮২৮ শক) পর্য্যন্ত
আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক :	মাঘ ১৮০৪‡—ভাদ্র ১৮০৬ শক ; পৌষ(?) ১৮১৪—চৈত্র ১৮২০ শক

* 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'—পৌষ, ১৮২৮ শক।

† "শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন"—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' বৈশাখ ১৮২১ শক। বৈশাখ ১৮২৩ শক হইতে সহকারী সম্পাদকরূপে তাঁহার নাম পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

‡ প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের স্থলে।

হেমচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যরূপে দীর্ঘকাল সমাজের উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। মাঘোৎসবকালে প্রথম দশ দিনের বক্তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম বক্তা থাকিতেন। তাঁহার ধর্ম্মভিত্তিক বক্তৃতাগুলি বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইত। হেমচন্দ্রের রচনাও ছিল ধর্ম্মভিত্তিক। "আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ভাব যাহাতে সঙ্কুচিত না হয়, বিদ্যারত্নের লেখনীর তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল।"* হেমচন্দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকৃত "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি

হেমচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ছিল সুবিদিত। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে 'বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা'র অন্তর্গত দর্শনের পুথি সম্পাদনে নিযুক্ত করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে অনুভাষ্য নামক বেদান্তের টীকা তাঁহার সুনিপুণ সম্পাদনায় বাহির হয়। "৺পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরামর্শে তিনি কিছুদিন এশিয়াটিক সোসাইটির পুরান পুথির পাঠোদ্ধারে নিযুক্ত ছিলেন।"†

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 'ভড়জি'

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে হেমচন্দ্রের বিশেষ বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা ছিল। উভয়ে উভয়ের গুণে একান্ত মুগ্ধ ছিলেন। সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে সরস ও হাস্যপূর্ণ আলোচনায় শুধু নিজগৃহ নহে, পল্লীও সরগরম হইয়া উঠিত। এ সম্বন্ধে আমরা নিম্নরূপ বিবরণ পাইতেছি; দ্বিজেন্দ্রনাথ হেমচন্দ্রকে 'ভড়জি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন:

"৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভড়জি'র (বিদ্যারত্ন) সহিত আলোচনা না করিয়া নিজের লেখা প্রায় প্রকাশ করিতেন না। এই সব আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত এবং তর্জ্জন-গর্জ্জন ও কড়ি-ফাটান হাস্যে পাড়া সরগরম হইয়া যাইত। ইংরাজীতে অপণ্ডিত হইয়াও বিদ্যারত্ন পুরাদমে আলোচনা চালাইতেন। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষায় এ আলোচনা ছিল গজকচ্ছপের যুদ্ধের মত। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ একবার নিজে আসিতে না পারিয়া ৺হেমেন্দ্রনাথ সিংহের হাতে এক পত্র দিয়া পাঠান। তাহার এক স্থানে ছিল:—'এবার দ্বিজে গজে নয়, এবার সিংহে গজে বোঝাপাড়া।' 'ভড়জি' সম্বন্ধে ৺দ্বিজেন্দ্রনাথের আরও দুই ছত্র:—'ভড়জি'র অট্টহাসি বড্ড জমকালো, বুড়োর সদনে তাঁর আড্ডা জমে ভাল'।"

আবার পাই:

"দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন:—

---

* 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'—পৌষ ১৮২৮ শক।

† বর্ত্তমান লেখকের নিকট লিখিত ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পত্র। পরে শুধু 'পত্রাংশ' বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

'পাষাণ মূরতি-মন্দ, সর্দ্দারের প্রায়,
লাঠি হাতে ভাবে ভোর বাল্মীকির জয়।'

"তাঁহার 'ভাবে ভোর' অবস্থায় একটি সুন্দ photoও তুলিয়াছিলেন ৺গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ photo'র কোন কাপি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।"*

সাহিত্য-চর্চ্চা

হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ প্রকাশের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে কতকটা বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাইতেছে। মুদ্রণ-পারিপাট্যের প্রতি হেমচন্দ্রের আগ্রহ লক্ষণীয় :

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সংস্রবে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, এবং পরে ঐ সমাজের উপাচার্য্য হন। ব্রাহ্মসমাজ-লাইব্রেরীর আশ্রয়ে আসিয়া তিনি রামায়ণের রসমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হন। নানা স্থান হইতে পুঁথি সংগ্রহ করিয়া তিনি রামায়ণের পাঠোদ্ধার করেন এবং নানা পাঠান্তর ও টীকা সমেত সানুবাদ রামায়ণ প্রকাশ করিতে সংকল্প করেন। কিছু মাত্র মূলধন না লইয়া এই বিরাট্ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন, অথচ কাগজে ছাপাই-এ কোথায় কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহার মতে সস্তায় ছাপাইয়ে বিষয়বস্তুর অপমান করা হইত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য লইয়া মাসে মাসে কয়েক ফর্ম্মা করিয়া বাহির করিতে লাগিলেন মাসিক পত্রের আকারে। ইহার অর্দ্ধেকটায় থাকিত সংস্কৃত মূল ও টীকা, এবং বাকীটায় থাকিত অনুবাদ।"†

খণ্ডশঃ রামায়ণ প্রকাশে হেমচন্দ্রের উদ্যম দেখিয়া দ্বারকানাথ ভঞ্জ তাঁহাকে সটীক ও সানুবাদ রামায়ণ প্রকাশে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই অর্থ সাহায্যের ফল শুভ হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে মকদ্দমা হয়। উকীলের পরামর্শ মত হেমচন্দ্র অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত তাঁহাকে অর্পণ করেন। সমস্ত টাকা শোধ করিতে তিনি নিজেকে নিঃস্ব করিয়াছিলেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মূল বাল্মীকি রামায়ণের হেমচন্দ্র-কৃত সংক্ষিপ্ত অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত হিন্দুশাস্ত্র—ষষ্ঠভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

হেমচন্দ্রের সাহিত্য-চর্চ্চা শুধু সংস্কৃত বা বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। তিনি অধিক বয়সে পাশ্চাত্য দর্শনাদি আয়ত্ত করিবার জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। এ সম্বন্ধে জানিতে পারি :

"তিনি ইংরাজী নির্ভুল লিখিতে বা বলিতে পারিতেন না। কিন্তু পড়িয়া কষ্টে অর্থগ্রহ করিতে পারিতেন। এবং এইরূপ কষ্টে অর্থগ্রহ করিয়া শেষ বয়সে Abbott's Life of Nelson আদ্যোপান্ত পড়িয়াছিলেন।"‡

---

* পত্রাংশ। † পত্রাংশ। ‡ পত্রাংশ।

বিদ্যারত্নের ইংরেজী ভাষায় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সংস্কৃত কবিতা রচনা সম্বন্ধেও জানা যায়। তাঁহার—

"অপ্রকাশিত অনেকগুলি সংস্কৃত কবিতা আছে। সেগুলি বাস্তবিকই অতি সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী, ইহাতে আধুনিকতার গন্ধ লেশমাত্র নাই। বিদ্যারত্নের হৃদয় কবিত্বপূর্ণ ছিল, তিনি ইংরাজীও জানিতেন এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনাদির যথাযথ ভাবার্থ নিজ প্রতিভাবলে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"*

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার প্রমুখ বিদেশী প্রাচ্য-বিদ্যাবিদ্‌গণের সঙ্গেও হেমচন্দ্রের পত্রালাপ ছিল। হেমচন্দ্রকে দিয়া কোন কোন পুস্তক অনুবাদ করাইবার প্রস্তাবের কথাও আমরা এইরূপ পাইতেছি।

"অধ্যাপক মোক্ষমুলর তাঁহার একখানি গ্রন্থ অনুবাদ করিবার জন্য বিদ্যারত্নকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন। ঐ সময়ে চীন হইতে এক পণ্ডিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনিও বিদ্যারত্নের সঙ্গে আলাপ করেন ও অনুরূপ অনুরোধ করেন। ইহাদের মধ্যে চিঠিপত্র চলিয়াছিল।...এই চিঠিপত্রের ফলে কোন নূতন অনুবাদ হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। বোধ হয় হয় নাই।"†

ভারত-সঙ্গীত-সমাজ কর্তৃক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা ১৩০৮, আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে তেইশ সংখ্যায় হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন "রাগ-বিবোধ" নামক প্রসিদ্ধ সঙ্গীত গ্রন্থের তেত্রিশটি শ্লোকের অনুবাদসহ আলোচনা করেন। "ভরত-মুনি প্রণীত নাট্যশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত" শীর্ষে উক্ত বিখ্যাত নাট্য-শাস্ত্রখানির বিষয়বস্তু তিনি পৌষ ১৩০৮ সাল হইতে মধ্যে মধ্যে পনর সংখ্যায় উক্ত 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' প্রকাশিত করেন।

হেমচন্দ্র বিশিষ্ট সংস্কৃতবিদ্‌ হইলেও বাংলা-সাহিত্য-সাধকদের সবিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁহার উচ্চ ধারণা নিম্নের সরস উক্তিটিতে সুপ্রকট :

"একবার আমরা সরস্বতী পূজা করি। প্রতিমা কিনিয়া আনা হয়। আনিবার পর দেখা গেল দেবীর হাতে বীণা নাই। দেখিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন—'জোড়াসাঁকো থেকে আসবার পথে রবিবাবু বীণাটা কেড়ে নিয়েছে।' সেটা বোধ হয় ১৯০১ সাল, যখন রবীন্দ্র-লাঞ্ছনায় বঙ্গভাষা শতমুখী। তখনকার দিনে টুলো পণ্ডিতের মুখে ওরূপ উক্তি অপ্রত্যাশিত।"‡

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। ১৮৯৬ সন নাগাদ হেমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ছেলেমেয়েদের পাঠোপযোগী "সংস্কৃত শিক্ষা" দুই খণ্ড রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-জীবনীকার এ বিষয় লেখেন :

"কাব্য সম্পাদন ছাড়া অন্যান্য কাজের মধ্যে চোখে পড়ে ছেলেমেয়েদের জন্য গ্রন্থ সম্পাদন।

---

* 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'—পৌষ ১৮২৮ শক। † পত্রাংশ। ‡ পত্রাংশ।

পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সহায়তায় 'সংস্কৃত শিক্ষা' নামে দুই খণ্ড গ্রন্থ এই সময় প্রকাশিত হয় [৮ আগষ্ট ১৮৯৬]।"*

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

হেমচন্দ্র চরিত্র অংশে বিশেষ উন্নত ছিলেন। তাঁহার পুত্রপ্রতিম ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পত্র হইতে আমি বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি হেমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "তাঁহার দীর্ঘ-গৌর সুসমঞ্জস দেহ, প্রশস্ত ললাট, প্রকাণ্ড মাথা, বিশাল চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা এবং অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠ…সুগঠিত দুই চরণ সবকিছুই অনন্যসাধারণ মনে হইত। চিত্তের সারল্যে, দাক্ষিণ্যে, ঔদার্য্যে ও অলোভিতায় তিনি ছিলেন আমার কাছে আদর্শ মহাপুরুষ।"

তাঁহার নির্লোভতা ও সারল্যের নিদর্শনস্বরূপ ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের পত্র হইতে নিম্নের কয়েক পংক্তি উদ্ধারযোগ্য:

"তিনি ধনী হইবার আশায় বই ছাপান নাই। ছাপান বইগুলির অধিকাংশ দপ্তরীর কাছে যাইবার পূর্ব্বেই একে একে অদৃশ্য হইত। শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিজের জন্য একখানি কাপিও রাখিতে পারেন নাই। এজন্য কিন্তু তাঁহার মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। পাঁচ টাকা মূল্যের দ্রব্যের বিনিময়ে যে পাঁচটি টাকা পাইতে হইবে, এ তত্ত্ব তিনি বুঝিতেন না। আরও একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার,—৺দ্বারকানাথ ভঞ্জের সহিত তাঁহার যে মনোমালিন্য হইয়াছিল, তাহারও কোন লক্ষণ ভবিষ্যতে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ভঞ্জপরিবারের সহিত তাঁহার হৃদ্যতাই বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি।"

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ও (পৌষ ১৮২৮ শক) বিদ্যারত্ন-চরিত্রের এই দিক্‌টির সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। উপরন্তু, বিদ্যারত্নকে যে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত থাকায় নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, ইহাতে তাহারও উল্লেখ আছে। পত্রিকা লেখেন:

"বিদ্যারত্নের হৃদয় সারল্যে পূর্ণ ছিল। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহারাই তাঁহার বিরাট্ হৃদয়ের উদারতায় মুগ্ধ হইতেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে সময়ে সময়ে যে উপদেশ দিতেন, তাহাতে তাঁহার জ্ঞান ও হৃদয় উভয়েরই আশ্চর্য্য পরিচয় পাওয়া যাইত। ব্রাহ্মসমাজের জন্য বিদ্যারত্নকে প্রথম বয়সে অনেক ত্যাগ ও নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু চরিত্র ও সাধুতাবলে তিনি শত্রুরও শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন।"

---

* 'রবীন্দ্র-জীবনী'—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ১ম খণ্ড (১৩৫৩), পৃ. ৩৩৫। 'সংস্কৃত শিক্ষা' দ্বিতীয় ভাগ রবীন্দ্র রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ:

"সংস্কৃত শিক্ষা। / দ্বিতীয় ভাগ / শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। / বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদক / শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত। /…1896"

মৃত্যু

হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন শেষ জীবনে কিছুকাল পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী ছিলেন। এই সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-গোষ্ঠী তাঁহার পরিবারের জন্য পেন্সনের ব্যবস্থা করেন। ব্যক্তিগতভাবে যাঁহারা তাঁহাকে শেষ সময়ে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং চন্দ্রনাথ বসুর নাম বিশেষ স্মরণীয়। হেমচন্দ্র ১৯০৬ সনের ১০ই ডিসেম্বর (২৪ অগ্রহায়ণ ১৩১৩) প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (পৌষ ১৮২৮ শক) এক প্রস্তাব লেখেন। ইহার অনেকাংশ আমি এই প্রবন্ধমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। অন্যান্য কথার মধ্যে 'পত্রিকা' লেখেন, "হেমচন্দ্রের মৃত্যুতে আদি ব্রাহ্মসমাজের যে সমূহ ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।"

গ্রন্থাবলী : সংস্কৃত-বাংলা

কিরাতার্জ্জুনীয়। ভারবী। সংস্কৃতসহ বাংলা অনুবাদ। পৃ. যথাক্রমে ১৪৪, ১৭৬। ১৮৬৭

রঘু-বংশ। মল্লীনাথের টীকা সমেত সংস্কৃতসহ বাংলা অনুবাদ। পৃ. যথাক্রমে ৪+৬+৩৫৫ ; ৪+১৮৪+১১। ১৮৬৮

রামায়ণ। রামানুজের টীকাসহ সংশোধিত সংস্কৃত ও বাংলা। সটীক সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদ ৬৪ পৃষ্ঠা পরিমিত, প্রতি খণ্ডে ১৮৬৯-১৮৮৪ সনের মধ্যে প্রকাশিত।

বালকাণ্ড। ১৮৬৯-৭০

অযোধ্যাকাণ্ড। ১৮৭০

আরণ্যকাণ্ড। ১৮৭৪

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। ১৮৭৫

সুন্দরাকাণ্ড। ১৭৭৮

লঙ্কাকাণ্ড। ১৮৭৮-৮০

উত্তরাকাণ্ড। ১৮৮৪

প্রতিটি কাণ্ডের আখ্যাপত্রে, দ্বারকানাথ ভঞ্জের অনুমত্যনুসারে—এইরূপ উল্লেখ আছে। সংস্কৃতে লিখিত বালকাণ্ডের ভূমিকাটি এখানে উদ্ধৃত হইল :

বিজ্ঞাপনম্

দুর্দ্দান্তদৃপ্ত-দানব-দল-দলনোদ্দীপিত-কীর্ত্তের্বিকর্ত্তনকুলকুমারস্য রামস্য চারু-চরিত-চিত্রিতং বিচিত্রমিদং রামায়ণং মহৎপ্রমোদস্থানং ভরতবিষয়বাস্তব্যানাং বিদগ্ধ-বিদ্বজ্জন-পরিষদাম্। অপূর্ব্ববস্তু-রস-ভাববিশেষোদাররমণীয়েঽস্মিন্ দৃশ্যতে বিষয়ান্তরবাসিনামপ্যনল্পীয়ান্ আদরঃ। এতস্য তু কবি-কুলোপজীব্যস্য মহাকাব্যস্য বহুদিনাদারভ্য সৌলভ্য-মুপপাদয়িতুং মনসি মে মহান্ প্রযত্নঃ সমজনি। কিন্তু বহ্বয়াসকরং বহুব্যয়সাপেক্ষমিদমিতি নিরপেক্ষপ্রায়

এবাসম্। অথ অতীতে বহুতিথে কালে ধর্ম্মকামেন শ্রীমতা দ্বারকানাথতন্তেনাঞ্জসা মদীয়ং ভাবমবগম্য বিভাব্য চ চরিতবৈভবং প্রতিপাদ্যনায়কস্য আদিষ্টোঽস্মি সানুবাদং সটীকঞ্চ রামায়ণং প্রচারয়িতুম্। প্রারব্ধে চ কার্য্যবিস্তরে গ্রন্থস্যাতিতুস্তরতয়া আদ্বতেষস্মদ্দেশ-প্রচলিতেষু আদর্শেষু বিভিন্নপ্রায়ং পাঠপরিপাটীকমালোক্য সংশয়িতচিত্তবৃত্তিরভবং মতি-মকরবঞ্চ দাক্ষিণাত্যানাং পাশ্চাত্যানাং চ পুস্তকানামাশ্রয়ে। তত্রত্যাহি সর্ব্বে লিপিকরাঃ সংস্কার-বিরহাৎ সন্দর্ভস্য বৈষম্যমবৈষম্যং বা কিমপ্যলভমানঃ সুদর্শং কৃত্বৈবাদর্শং লিখন্তি। বঙ্গদেশেতু তদ্বৈপরীত্যমেব দৃশ্যতে। অত্র হি বহুষু শাস্ত্রেষু কৃতশ্রমাঃ প্রায়শঃ পণ্ডিতা এব লিপিকরাঃ। অতস্তে সংশোধনানুরোধেন স্বেচ্ছাতঃ স্বকপোলকল্পিতং পাঠমাকলয্য যোজয়ন্তি তেনৈব এতদ্দেশপ্রচলিতেষু তেষু গ্রন্থেষু পরস্পরবৈষম্যং শ্লোকাধিক্যমধ্যায়াধিক্যঞ্চ সমুপজাতম্। ন জানে কিমিদমনুষ্ঠিতং সন্দেহদোলায়িতধিয়া। অতোঽহমিদানীমভ্যর্থয়ে প্রেক্ষাবতামাভি-মুখ্যমিতি।

কলিকাতা
ব্রাহ্মসমাজস্থ
সংবৎ ১৯২৫। } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যস্য

সংস্কৃত

অনুভাষ্যম্। রামনারায়ণ-প্রণীত-বেদান্তসূত্রস্য বল্লভাচার্য্যকৃত-দ্বৈতাদ্বৈতপরং ব্যাখ্যানম্। ১৮৯৭।

এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালার অন্তর্গত। ইহার ভূমিকা ইংরেজীতে লিখিত। হেমচন্দ্র তিনখানি পুথির পাঠ মিলাইয়া এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। ভূমিকাটি এইরূপ :

"Vallabhacarya's 'Anubhasya' is an extremely rare work in this country. As the work however in which Vallabhacarya has tried to establish the Dwaitadwaita doctrine on the authority of the same philosophical principles, supported by Vedic texts and Natural Logic, which were used in the same way by Sankaracharya, to establish and promulgate his Adwaita doctrine, it deserves to be studied by all. In editing the 'Anubhasya' I have examined the three manuscript copies of it. One of this was received from Dr. Vandarkar, another from Pt. Ramnath Tarkaratna and the third from Damodar Das Varman. Of these the Mss. sent by Dr. Vandarkar is the most accurate. I have carefully considered the different readings given in these three Mss. and I shall consider my labour amply rewarded if the 'Anubhasya' as edited by me, meets with the approval of the public.

Hemchandra Vidyaratna."

ব্রাহ্মধর্ম্ম। সুগৃহীতনামধেয়স্য / মহর্ষের্দেবেন্দ্রনাথস্যাভ্যনুজ্ঞয়া / তদীয় সভাধ্যক্ষ শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্নেন / সংস্কৃতেন সংকলিতয়া বিবৃত্যা সহিতঃ / শক ১৮১৭ (বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে প্রদত্ত প্রকাশকাল—১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫)।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্কৃত অনুবাদ। দেশ-বিদেশের বিদগ্ধসমাজে ইহা সবিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে।

বাংলা

হিন্দুশাস্ত্র। ষষ্ঠ ভাগ। **রামায়ণ**। ১৮৯৬ ইং।

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রখ্যাত পণ্ডিতগণের দ্বারা বাংলা ভাষায় শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহের সংক্ষেপে অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করেন (১৮৯০-৯৭)। রমেশচন্দ্র ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। 'রামায়ণে'র সূচনায় তিনি নিজ স্বাক্ষরে নিম্নের ভূমিকাটি লেখেন :

"পণ্ডিতবর শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ইতিপূর্ব্বে মূল সংস্কৃত রামায়ণ এবং তাহার একখানি বিস্তীর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশে কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদের ন্যায় রামায়ণের উৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ আর একখানিও নাই। তাঁহার কৃত রামায়ণের এই সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বঙ্গীয় পাঠক মাত্রের নিকটই আদরণীয় হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া বাঙ্গালী পাঠকদিগের জন্য একখানি অতি আবশ্যকীয় ও উপাদেয় গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং আমাকে যারপরনাই অনুগৃহীত করিয়াছেন। শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত"

রচনার নিদর্শন

"অনন্তর শরৎকাল অতীত ও হেমন্ত সমুপস্থিত হইল। তখন রাম একদা রাত্রি প্রভাতে স্নানার্থ রমণীয় গোদাবরীতে যাইতেছেন, বিনীত লক্ষ্মণও কলশ লইয়া জানকীর সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। তিনি গমনকালে কহিলেন, প্রিয়ম্বদ ! যে ঋতু আপনার প্রিয়, এক্ষণে তাহাই উপস্থিত। ইহার প্রভাবে সংবৎসর যেন অলঙ্কৃত হইয়া শোভিত হইতেছে। নীহারে সর্ব্বশরীর কর্কশ হইয়াছে, পৃথিবী শস্যপূর্ণ, জল স্পর্শ করা দুষ্কর এবং অগ্নি সুখসেব্য হইতেছে। এই সময় সকলে নবান্ন ভক্ষণার্থ আগ্রহায়ণ নামক যাগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছে। জনপদে ভোগ্যদ্রব্য সুপ্রচুর, গব্যের অভাব নাই; জয়লাভার্থী ভূপালগণও দর্শনার্থ তন্মধ্যে সতত পরিভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন, সুতরাং উত্তরদিক তিলকহীন স্ত্রীলোকের ন্যায় হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। স্বভাবত হিমালয় হিমে পূর্ণ, তাহাতে আবার সূর্য্য অতিদূরে, সুতরাং স্পষ্টতই উহার হিমালয় এই নাম সার্থক হইতেছে। দিবসের মধ্যাহ্নে রৌদ্র অত্যন্ত সুখসেব্য, গমনাগমনে কিছুমাত্র ক্লান্তি নাই, কেবল জল ও ছায়া সহ্য হয় না। সূর্য্যের তেজ

মৃদু হইয়াছে, হিম যথেষ্ট, অরণ্য শূন্যপ্রায়, এবং পদ্ম নীহারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে রজনী তুষারে সতত ধূসর হইয়া থাকে, কেহ অনাবৃত স্থানে শয়ন করিতে পারে না, পুষ্য নক্ষত্র দৃষ্টে রাত্রিমান অনুমান করিতে হয়, শীত যৎপরোনাস্তি, এবং প্রহর সকল সুদীর্ঘ। চন্দ্রের সৌভাগ্য সূর্য্যে সংক্রমিত হইয়াছে, এবং চন্দ্রমণ্ডলও হিমাবরণে আচ্ছন্ন থাকে, ফলত এক্ষণে উহা নিঃশ্বাসবাষ্পে আবিল দর্পণতলের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না হিমজালে ম্লান হইয়াছে, সুতরাং উহা উত্তাপমলিনা সীতার ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু বলিতে কি তাদৃশ শোভিত হইতেছে না। পশ্চিমের বায়ু স্বভাবতই অনুষ্ণ, এক্ষণে আবার হিমপ্রভাবে প্রাতে দ্বিগুণ শীতল হইয়া বহিতে থাকে। অরণ্য বাষ্পে আচ্ছন্ন, যব ও গোধূম উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সূর্য্যোদয়ে ক্রৌঞ্চ ও সারস কলরব করাতে বিশেষ শোভিত হইতেছে। কনককান্তি ধান্য খর্জ্জুরপুষ্পের ন্যায় পীতবর্ণ তণ্ডুলপূর্ণ মস্তকে কিঞ্চিৎ সন্নত হইয়া শোভা পাইতেছে। কিরণ নীহারে জড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে দ্বিপ্রহরেও সূর্য্য শশাঙ্কের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাতের রৌদ্র নিস্তেজ ও পাণ্ডুবর্ণ, উহা নীহারমণ্ডিত তৃণশ্যামল ভূতলে পতিত হইয়া অতি সুন্দর হয়। ঐ দেখুন, বন্য মাতঙ্গেরা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সুশীতল জল স্পর্শ পূর্ব্বক শুণ্ড সংকোচ করিয়া লইতেছে। যেমন ভীরু ব্যক্তি সমরে অবতীর্ণ হয় না, সেইরূপ হংস সারস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গেরা তীরে সমুপস্থিত হইয়াও জলে অবগাহন করিতেছে না। কুসুমহীন বনশ্রেণী রাত্রিকালে হিমান্ধকারে এবং দিবাভাগে নীহারে আবৃত হইয়া যেন নিদ্রায় লীন হইয়া আছে। নদীর জল বাষ্পে আচ্ছন্ন, বালুকারাশি হিমে আর্দ্র হইয়াছে, এবং সারসগণ কলরবে অনুমিত হইতেছে। তুষারপাত, সূর্য্যের মৃদুতা ও শৈত্য এই সমস্ত কারণে জল শৈলাগ্রে থাকিলেও সুস্বাদু বোধ হয়। হিমে নষ্ট হইয়া মৃণালমাত্রে অবশিষ্ট আছে, উহার কেশর ও কর্ণিকা শীর্ণ, এবং জরাপ্রভাবে পত্র সকল জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে উহার আর পূর্ব্ববৎ শোভা নাই। আর্য্য! এই সময় নন্দীগ্রামে ধর্ম্মপরায়ণ ভরত দুঃখে সমধিক কাতর হইয়া জ্যেষ্ঠভক্তি নিবন্ধন তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি রাজ্য মান ও বিবিধ ভোগে উপেক্ষা করিয়া, আহার সংযম পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করেন। বোধ হয়, এখন তিনিও স্নানার্থ প্রকৃতিবর্গে পরিবৃত হইয়া সরযুতে গমন করিতেছেন। ভরত অত্যন্ত সুখী ও সুকুমার, জানি না, এই রাত্রিশেষে হিমে নিপীড়িত হইয়া কি প্রকারে সরযুতে অবগাহন করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ সত্যনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় মধুরভাষী ও সুন্দর; তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, বর্ণ শ্যামল ও উদর সূক্ষ্ম; তিনি লজ্জাক্রমে কখন নিষিদ্ধ আচরণ করেন না। সেই পদ্মপলাশলোচন ভোগসুখ তুচ্ছ করিয়া সর্ব্বাংশে আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি বনবাসী হইলেও তিনি তাপসের আচার অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার অনুকরণ করিতেছেন। আর্য্য! এইরূপ কার্য্যে স্বর্গ যে তাঁহার হস্তগত হইবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রবাদ আছে যে, মনুষ্য মাতৃস্বভাবের অনুসরণ করিয়া থাকে, ফলত তিনি ইহার অন্যথা করিলেন। হায়! দশরথ যাহার স্বামী, সুশীল ভরত যাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী কিরূপে তাদৃশ ক্রূরদর্শিনী হইলেন।

"ধর্ম্মপরায়ণ লক্ষ্মণ স্নেহভরে এইরূপ কহিতেছিলেন, এই অবসরে রাম কৈকেয়ীর অপবাদ সহিতে না পারিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতের ঐ কথা কও। মাতা কৈকেয়ীর নিন্দা কখনই করিও না। দেখ, আমার বুদ্ধি বনবাসে দৃঢ় ও স্থির থাকিলেও পুনরায় ভরত-স্নেহে চঞ্চল হইতেছে। তাঁহার সেই প্রিয় মধুর হৃদয়হারী অমৃততুল্য ও ও আহ্লাদকর কথা সততই আমার মনে পড়িতেছে। লক্ষ্মণ! জানি না, আমি আবার কবে ভরত প্রভৃতি সকলেরই সহিত সমবেত হইব!

"রাম এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপপূর্ব্বক গোদাবরীতে গিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত স্নান করিলেন। পরে সকলে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া উদিত সূর্য্য ও দেবগণের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ রুদ্র যেমন নন্দী ও পার্ব্বতীর সহিত স্নানান্তে শোভা পান, ঐ সময় রামেরও সেইরূপ শোভা হইল।"—আরণ্যকাণ্ড, পৃ. ৫৪-৮।

"হনুমান শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া জানকীরে দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলেন। অশোকবন কল্পবৃক্ষে সুশোভিত, তথায় দিব্য গন্ধ ও রস সততই নির্গত হইতেছে। ঐ বন নানারূপ উপকরণে সুসজ্জিত, দেখিবামাত্র নন্দনকানন বলিয়া বোধ হয়। উহার ইতস্ততঃ হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ, কোকিলেরা মধুরকণ্ঠে নিরন্তর কুহুরব করিতেছে। সরোবর স্বর্ণপদ্মে শোভমান, অশোকবৃক্ষ সকল কুসুমিত হইয়া সর্ব্বত্র অরুণশ্রী বিস্তার করিতেছে। ঐ স্থানে সকলরূপ ফল পুষ্পই সুলভ, নানারূপ উৎকৃষ্ট আসন ও চিত্রকম্বল ইতস্ততঃ আস্তীর্ণ রহিয়াছে। কাননভূমি সুবিস্তীর্ণ, বৃক্ষের শাখা প্রশাখা সকল বিহঙ্গগণের পক্ষপুটে সমাচ্ছন্ন, সহসা যেন পত্রশূন্য বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। পক্ষিগণ নিরন্তর বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উপবেশন করিতেছে, এবং অঙ্গসংলগ্ন পুষ্পে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিতেছে। অশোকের শাখা প্রশাখা সমস্তই পুষ্পিত; কর্ণিকার পুষ্পভরে ভূতল স্পর্শ করিতেছে; কিংশুক সকল পুষ্পস্তবকে শোভিত; কাননভূমি ঐ সমস্ত বৃক্ষের প্রভায় যেন প্রদীপ্ত হইতেছে। পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষ সকল কুসুমিত। কাননমধ্যে বহুসংখ্য অশোক নিরীক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে কোনটি স্বর্ণবর্ণ, কোনটি অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, এবং কোনটি নীলাঞ্জনতুল্য সুন্দর। ঐ অশোকবন দেবকানন নন্দনের ন্যায় এবং ধনাধিপতি কুবেরের উদ্যান চিত্ররথের ন্যায় সুদৃশ্য; বলিতে কি, উহা তদপেক্ষাও অধিকতর মনোহর; উহার শোভাসমৃদ্ধি মনে ধারণা করা যায় না। উহা যেন দ্বিতীয় আকাশ, পুষ্প সকল গ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। উহা যেন পঞ্চম সমুদ্র, নানারূপ পুষ্পই যেন রত্নশ্রী প্রদর্শন করিতেছে। ঐ অশোকবনে নানারূপ পবিত্র গন্ধ, উহা গন্ধপূর্ণ হিমাচল এবং গন্ধমাদনের ন্যায় বিরাজিত আছে। অদূরে অত্যুচ্চ চৈত্যপ্রাসাদ, উহা গিরিবর কৈলাসের ন্যায় ধবল, উহার চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র স্তম্ভ শোভিত হইতেছে; সোপান সকল প্রবালরচিত, এবং বেদিসকল স্বর্ণময়; উহা শ্রীসৌন্দর্য্যে নিরন্তর প্রদীপ্ত হইতেছে, এবং লোকের দৃষ্টি যেন অপহরণ করিতেছে। উহা গগনস্পর্শী ও নির্ম্মল।

"মহাবীর হনুমান ঐ অশোকবনের মধ্যে সহসা একটি কামিনীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি রাক্ষসগণে পরিবৃত; উপবাসে যারপর নাই কৃশ ও দীন। ঐ রমণী পুনঃ পুনঃ সুদীর্ঘ দুঃখনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। নানারূপ সংশয় ও অনুমানে তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়। তিনি শুক্লপক্ষীয় নবোদিত শশিকলার ন্যায় নির্ম্মল; তাঁহার কান্তি ধূমজালজড়িত অগ্নি-শিখায় উজ্জ্বল; সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য ও মললিপ্ত, পরিধান একমাত্র পীতবর্ণ মলিন বস্ত্র। তিনি সরোজশূন্য দেবী কমলার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার দুঃখ সন্তাপ অতিশয় প্রবল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল বারিধারা বহিতেছে; তিনি কেতুগ্রহনিপীড়িত রোহিণীর ন্যায় একান্ত দীন; শোকভরে যেন নিরন্তর হৃদয়মধ্যে কাহাকে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে প্রীতি ও স্নেহের পাত্র কেহ নাই, কেবলই রাক্ষসী; তৎকালে তিনি যূথভ্রষ্ট কুক্কুর-পরিবৃত কুরঙ্গীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে কালভুজঙ্গীর ন্যায় একমাত্র বেণী লম্বিত, তিনি বর্ষার অবসানে সুনীল বনরেখায় অঙ্কিত অবনীর ন্যায় শোভিত হইতেছেন।

"হনুমান ঐ বিশাললোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কারণে সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন। ভাবিলেন, কামরূপী রাক্ষস যে অবলাকে বলপূর্ব্বক লইয়া আইসে, তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ইনি অবিকল সেইরূপই লক্ষিত হইতেছেন।

"জানকীর মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন; স্তনযুগল বর্ত্তুল ও সুন্দর। তিনি স্বীয় প্রভাপুঞ্জে সমস্ত দিক্ তিমিরমুক্ত করিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠে মরকতরাগ, ওষ্ঠ বিম্ববৎ আরক্ত, কটিদেশ ক্ষীণ এবং গঠন অতি সুদৃশ্য। তিনি স্বসৌন্দর্য্যে স্মরকামিনী রতির ন্যায় জগতের প্রীতিকর। তিনি ব্রতপরায়ণা তাপসীর ন্যায় ধরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, এবং এক একবার কালভুজঙ্গীর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি সন্দেহাত্মক স্মৃতির ন্যায়, পতিত সমৃদ্ধির ন্যায়, স্খলিত শ্রদ্ধার ন্যায়, নিষ্কাম আশার ন্যায়, বিঘ্নবহুল সিদ্ধির ন্যায়, কলুষিত বুদ্ধির ন্যায়, এবং অমূলক অপবাদে কলঙ্কিত কীর্ত্তির ন্যায়, যার পর নাই শোচনীয় হইয়াছেন। তিনি রামের অদর্শনে ব্যথিত, এবং নিশাচরগণের উপদ্রবে নিপীড়িত। তিনি চপললোচনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন ও নেত্রজলে ধৌত, এবং পক্ষ্মরাজি কৃষ্ণবর্ণ ও কুটিল। তিনি নীল নীরদে আবৃত চন্দ্রপ্রভার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন।"—সুন্দরাকাণ্ড, ৭১-৭৪।

"অনন্তর একদা আমি হল দ্বারা যজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতেছিলাম। ঐ সময় লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে এক কন্যা উত্থিতা হয়। ঐ কন্যা ক্ষেত্র-শোধনকালে হলমুখ হইতে উত্থিতা হইল বলিয়া আমি উহার নাম রাখিলাম সীতা। এই অযোনিসম্ভবা তনয়া আমার গৃহেই পরিবর্দ্ধিতা হয়। অনন্তর আমি এই পণ করিলাম যে, যে ব্যক্তি এই হরকার্ম্মুকে জ্যা যোজনা করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই এই কন্যা দিব। ক্রমশঃ সীতা বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্তা হইল। অনেকানেক রাজা আসিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি উহাকে কাহারই হস্তে সম্প্রদান করি নাই।

"পরে নৃপতিগণ ঐ হরধনুর সার জ্ঞাত হইবার ইচ্ছায় মিথিলায় আগমন করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদিগকে শরাসন প্রদর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা উহা গ্রহণ কি উত্তোলন করিতে পারেন নাই। তপোধন! তৎকালে মহীপালগণের এইরূপ বলবীর্য্যের পরিচয় পাইয়াই অগত্যা তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। কিন্তু পরিশেষে যেরূপ ঘটে, তাহাও শ্রবণ কর।

"ভূপালগণ এইরূপ বীর্য্যশুল্কে কৃতকার্য্য হওয়া সংশয়স্থল বুঝিতে পারিয়া একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং আমিই এই কঠিন পণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি নিশ্চয় করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যাগ্রহণের মানসে মিথিলা অবরোধ করিলেন। নগরীতে বিস্তর উপদ্রব হইতে লাগিল। আমি দুর্গমধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু সংবৎসর পূর্ণ হইতেই আমার দুর্গের সমুদায় উপকরণ নিঃশেষিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম এবং তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া দেবগণের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলাম। অনন্তর তাঁহারা প্রীত হইয়া যুদ্ধার্থ আমায় চতুরঙ্গিণী সেনা প্রদান করিলেন। আমি ভূপালগণের সহিত পুনর্ব্বার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলাম। উভয় পক্ষে বিস্তর লোকক্ষয় হইতে লাগিল। পরে সেই নির্বীর্য্য সন্দিগ্ধবীর্য্য দুরাচার পামরেরাও অমাত্যগণের সহিত রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল।

"তপোধন! যাহার নিমিত্ত এত কাণ্ড হইয়াছে, সেই কোদণ্ড এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণকেও দেখাইতেছি। যদি রাম উহাতে জ্যা যোজনা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি ইঁহাকে কন্যাদান করিব। এ ধনু অষ্টচক্রের এক শকটের উপর লৌহনির্ম্মিত মঞ্জুষামধ্যে স্থাপিত ছিল। রাজার আদেশে আত দীর্ঘকায় পাঁচ সহস্র মনুষ্য কথঞ্চিৎ উহা আকর্ষণপূর্ব্বক আনিতে লাগিল।

"তখন মিথিলাধিপতি জনক রাম ও লক্ষণকে ধনু দেখাইবার উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি কৌশিককে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপুরুষগণ এই ধনু অর্চ্চনা করিতেন এবং যে সমস্ত মহাবীর্য্য মহীপাল ইহার সার পরীক্ষায় অসমর্থ হন, তাঁহারাও ইহার পূজা করেন। এই ধনুর কথা অধিক আর কি বলিব, মনুষ্য দূরে থাক, সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও উরগেরাও ইহা আকর্ষণ, উত্তোলন, আস্ফালন, এবং ইহাতে জ্যা যোজনা ও শর সংযোজন করিতে পারেন না। তপোধন! আমি সেই ধনুই আনাইলাম, আপনি উহা এই কুমারদ্বয়কে প্রদর্শন করুন।

"অনন্তর কৌশিক রামকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই হরধনু নিরীক্ষণ কর। রাম মহর্ষির আদেশে মঞ্জুষা উদ্ঘাটন ও ধনু নিরীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, আমি এই দিব্য ধনু করতলে স্পর্শ করিতেছি। এখন কি ইহা আমাকে উত্তোলন ও আকর্ষণ করিতে হইবে? মহারাজ জনক ও বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন রাম অবলীলাক্রমে ঐ শরাসনের মুষ্টিগ্রহণ ও সর্ব্বসমক্ষে তাহাতে জ্যা আরোপণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন। কোদণ্ড তদ্দণ্ডেই দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় একটি ঘোর ও

গভীর শব্দ হইল। পর্ব্বত বিদীর্ণ হইলে ভূভাগ যেমন কম্পিত হয়, চারিদিক্ সেইরূপ কাঁপিয়া উঠিল।

"জানকীর পরিণয়ে রাজা জনকের যে এত কাল সংশয় ছিল, তাহা অপনীত হইল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! আমি এই দাশরথি রামের বীর্য্য পরীক্ষা করিলাম। ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার অতি চমৎকার; আমি মনেও করি নাই যে, ইহা কখনও সম্ভব হইবে। এখন রামের সহিত সীতার বিবাহ হইয়া আমার একটি কুলকীর্ত্তি স্থাপিত হউক। বলিতে কি, এত দিনের পর আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমার দূতগণ রথে আরোহণপূর্ব্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় গমন করুক। বিনয়বাক্যে মহারাজ দশরথকে এই স্থানে আনয়ন এবং ধনুর্ভঙ্গ পণে রামের সীতালাভ হইল, এ কথা নিবেদন করুন। রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ যে নির্ব্বিঘ্নে আসিল, ইহারা গিয়া এই সংবাদ দিবে।" —হিন্দুশাস্ত্র, রামায়ণ, পৃ. ৩১-৩।

বাঙ্গলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য

অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৮)

চোর অনুসন্ধান

বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলির মধ্যে চোর অনুসন্ধান ও চোর ধরা প্রসঙ্গ দুইটি অত্যন্ত কৌতুকজনক। বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ভাবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। রাজার অস্পষ্ট উক্তিতে কোটাল প্রকৃত ব্যাপারটি কি, তাহা বুঝিতে পারিল না। গোবিন্দদাস, বলরাম ও মধুসূদন কোটালকে দিয়া সেই তথ্যটি জানিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই, সরাসরি তাহাকে চোর অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ প্রকৃত সংবাদ জানিবার জন্য কোটালের স্ত্রীকে রাণীর নিকট পাঠাইয়াছেন। দ্বিজ রাধাকান্ত এ বিষয়ে একটু বিশেষত্ব করিয়াছেন, আমরা পরে তাহা দেখাইতেছি।

ভারতচন্দ্রও গোবিন্দদাস প্রভৃতির ন্যায় কোটালকে দিয়া প্রকৃত তথ্য জানিবার চেষ্টা করেন নাই। তবে ভারতচন্দ্রের কোটাল রাজার ভাবগতিকে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল, তাই বলিতেছে—

পূর্ব শুভাশুভ ফলে জনম ধরণীতলে রসময়ী রাজকন্যা রূপগুণময়ী ধন্যা
কে পারে করিতে অনুমত। চোর বুঝি উপযুক্ত তাঁর।
পরে করে গেল সুখ আমার কপালে দুখ দুজনে ভুঞ্জিল সুখ আমার কপালে দুখ
ধন্য রে কোটালি খেদমত॥ এ বড় বিধির অবিচার॥"

চোর অনুসন্ধান প্রসঙ্গটি মোটামুটি এই কয় ভাগে ভাগ করা যায়:

(ক) কোটাল কর্তৃক প্রকৃত সংবাদ জানিবার চেষ্টা। (খ) কোটালের চোর অনুসন্ধান। (গ) সিন্দুর প্রসঙ্গ। (ঘ) সুড়ঙ্গ আবিষ্কার। আমরা একে একে এই প্রকরণগুলির আলোচনা করিতেছি।

(ক) কোটাল কর্তৃক প্রকৃত সংবাদ জানিবার চেষ্টা

গোবিন্দরাম এ প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন নাই। কৃষ্ণরাম লিখিতেছেন—

"বাঘাই কোটাল বড় হইয়া বিকল। ছয় দিন মধ্যে চোর দিব লয়্যা ধরি।
আপনার স্ত্রীর তরে কহিল সকল॥ শতেক সোয়ার দিল মহসিল করি॥
না জানি রাজার কিবা দ্রব্য গেল চোরে। রাণীর নিকটে তুমি করহ গমন।
সেই রাগে সবংশে বধিতে চায় মোরে॥ জানিয়া আইস গিয়া ইহার কারণ॥"

রামপ্রসাদের কাব্যে আমরা ইহার ঠিক প্রতিধ্বনি পাই—

কহিল বিরূপ ভূপ দুঃখে অঙ্গ দহে।
ঘৃণা বড় ঘরে গিয়া ঘরণীকে কহে ॥
সৃষ্টি লোপ হয় প্রিয়ে কার মুখ চাও।
এই ক্ষণে রাণীর নিকটে তুমি যাও ॥
বিদ্যার মন্দিরে কিবা দ্রব্য গেল চোরে।
সেই দোষে সবংশে কাটিবে রাজা মোরে ॥

কোটালঘরণী নানা উপঢৌকন লইয়া রাজ অন্তঃপুরে রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। রাণীকে প্রণাম করিয়া করপুটে দাঁড়াইয়া রহিল। রাণী তাহাকে দেখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বসিতে বলিলেন। তাহার পর—

"জিজ্ঞাসা করিলা রাণী কি কাজে আইলা।
করযোড় করি বলে কোটালমহিলা ॥
রাজার ভাণ্ডারে কিবা দ্রব্য চুরি গেল।
সত্য করি ঠাকুরাণী অবিলম্বে বল ॥
তবে সে দারুণ চোর পড়িবেক ধরা।
চিন্তায় কোটাল বড় হইয়াছে জরা ॥
রাণী বলে তোমারে বলিব আর কি।
গর্ভবতী হইয়াছে আই বড় ঝি ॥
এ কথা মুখের আগে আনিতে আমার।
মাথা যেন কাটা যায় কি বলিব আর ॥
বাহিরে প্রহরীতে কোটালের সেনা।
কেমনে অগম্য পুরে চোরে দিল হানা ॥

কৃষ্ণরামের কোটালের স্ত্রীর প্রশ্ন করার এই ভঙ্গীতে যেন কিছুটা সম্ভ্রমের অভাব রহিয়াছে, আর প্রশ্ন ও উত্তর, উভয়ই যেন "তড়িঘড়ি" শেষ হইয়াছে। রামপ্রসাদ এ স্থলে ব্যাপারটিকে অনেকটা স্বাভাবিক করিয়া আনিয়াছেন—

ভূমে লুটি প্রণমিল করি যোড়পাণি।
পরম দুঃখিতা রাণী না কহেন বাণী ॥
সে ধারা দেখিয়া তার হৃদে জন্মে ভয়।
সকরুণে কোটালমহিলা তবু কয় ॥
এক নিবেদন মাতা চরণে তোমার।
কৃপা করি কহ শুনি সত্য সমাচার ॥
কি দ্রব্য হইল চুরি রাজকন্যাবাসে।
জীয়ন্তে জীবনে মরা কোটাল হুতাশে ॥
বিশেষ জানিলে চোর তবে ধরা যায়।
নতুবা সবংশে নষ্ট হই এই দায় ॥
অধোমুখে কহে রাণী কি মোরে সুধাও।
মিলিবে সকল তত্ত্ব সেইখানে যাও ॥
সে বড় দারুণ কথা বাড়া কব কি।
অভিমানে মরমে মরিয়া রয়েছি ॥
পুনঃ কহে যোড়হাতে নিশিনাথ-দারা।
বিড়ম্বনা কর যদি তবে নাই চারা ॥
অবিচারে মহাপ্রাণিহত্যা বড় পাপ।
কি কারণে ঠাকুরাণী দেহ মনস্তাপ ॥
দুগ্ধপোষ্য নহি এত বুঝি কত কত।
ভাল ত না শুনি মা গো বল তুমি যত ॥
চোরে গেল দ্রব্য তার এত খেদ কেন।
ভাবক্রমে বুঝি কিছু অপকর্ম্ম হেন ॥
রাণী বলে সেই বটে কি জিজ্ঞাস আর।
বিদ্যাবতী গর্ভবতী এই সমাচার ॥
কহিবার এ কি কথা মৃত্যু ইচ্ছা হয়।
শুনিলা এখন তুমি যাও নিজালয় ॥

এই প্রসঙ্গে রামপ্রসাদ অনেকটা মনের স্বাভাবিক ভাবগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কোটালপত্নীর পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসায় বিরক্ত হইয়া প্রকৃত ব্যাপারটা বলিয়া তাহাকে গৃহে গমন করিতে বলা বিদ্যার মাতার পক্ষে শোভনই হইয়াছে।

ইহার পরে এই কথা শুনিয়া কোটালের ও তাহার পত্নীর কিরূপ মনোভাব হইল, তাহা

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ ভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং উভয় কাব্যের কোটালচরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণরাম—

"শুনি কোটালের নারী শিরে দিয়া ঘা।
অসম্ভব্য কথা শুনি এ কি আগে মা॥
শিহরিল তনু তার হৃদয় কাঁপিল।
রসনা বাহির করি দশন চাপিল॥
অবিলম্বে উত্তরিল আপনার ঘর।
কহিল সকল কথা পতির গোচর॥
কানে হাত কোটাল স্মরয়ে ধর্ম্ম ধর্ম্ম।
কেমনে বলিল রাজা ইহা মোর কর্ম্ম॥"

রামপ্রসাদ—

"দশনে রসনা চাপে চমকিয়া উঠে।
ষাম্য করাঙ্গুলি তুলি দিল নাসাপুটে॥
আর কিছু না কহিল গেল নিজবাসে।
কোতোয়াল শুনি বার্ত্তা মনে মনে হাসে॥
ভূপতিকে হেয়জ্ঞান কৈল নিশিনাথ।
রাম রাম বলি দুই কর্ণে দিল হাত॥"

আপাতদৃষ্টিতে রামপ্রসাদের বর্ণনাটি কৃষ্ণরামের ছায়া বলিয়াই মনে হয় বটে, তবে রামপ্রসাদের কোটালপত্নী ও কোটালের চরিত্রে প্রভুর বা প্রভুর পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা বা দাসজনসুলভ ভক্তি মোটেই ফোটে নাই, বরং কোতোয়াল রাজাকে যে মনে মনে অশ্রদ্ধাই করিত, তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, রাজারই নিজ উক্তি। রাজা কোটালকে বিদ্যার গর্ভের জন্য দায়ী করিয়া ও তাহা প্রকাশ্য সভায় বলিয়া বুদ্ধি বা সদ্‌বিবেচনার পরিচয় দেন নাই। রামপ্রসাদ পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে তাহাই বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদের কাব্যে কোটালের সেই উক্তিটি উদ্ধৃত করিতেছি—

ভূপতি কেবল অজ্ঞা যে জন লুটিল মজ্জা
এড়াইল সেই আমি চোর।*
কহিতে সরম করে কন্যার ছিনালি ধরে
গরদান লৈতে চায় মোর॥
রাজলক্ষ্মী থাকে যার সূক্ষ্ম বিবেচনা তার
অত্যাচার প্রতাপ প্রচণ্ড।
পূর্ব্বপুণ্যপুঞ্জ হেতু কৃপান্বিত বৃষকেতু
তেঁই ধরে শিরে ছত্রদণ্ড॥
নতুবা কি কোনরূপে এ ছার অধম ভূপে
কমলার কৃপাদৃষ্টি হয়।
মনেতে জন্মেছে অগ্নি যে বিদ্যা ধর্ম্মত ভগ্নী
কেমনে এমন কথা কয়॥
গ্রামের সম্বন্ধে যারে মা বলিয়া ডাকে তারে
সেই ভাব করণ কর্ত্তব্য।
এ আমি নেমকে পালা হায় হায় এ কি জ্বালা
রাজা বেটা বড় ত অভব্য॥

দ্বিজ রাধাকান্ত ব্যাপারটি ভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের রাজা কোটালকে ভৎ’সনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কি কারণে, তাহা কিছুই বলেন নাই। কেবল সে তাহার কার্যে অবহেলা করিয়াছে, এইটুকুমাত্র বলিয়াছেন। কোটাল ও তাহার সহকারিগণ যুক্তি করিতে লাগিল, রাজার এই অসন্তুষ্টির কারণ কি। কোটালের এক ভ্রাতা বলিল, প্রজারা যদি নালিশ করিত, তাহা হইলে অন্ততঃ তাহাদের পক্ষে কেহ একজন উপস্থিত থাকিত। অপর

* পূর্বোল্লিখিত ভারতচন্দ্রের কোটালের উক্তি দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তি বলিল, রাজ্যে কোন দ্রব্য প্রতুল বা অপ্রতুল হইলে রাজা তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেন। তার পর একজন প্রকৃত ব্যাপারটির ইঙ্গিত দিল।

"গোপনে কুকর্ম্ম কিছু হইয়াছে অখ্যাতি।
আমি বুঝিলাম সার কহ গো যুগতি ॥
দুর্ম্মুখ নামেতে এক কোটালের চরে।
এই কথা বটে সে কহিছে জোর করে ॥
এই হেতু নরপতি কুপিল আমারে।
এতেক কহিল আমি সভাকার তরে ॥
এতেক শুনিয়া তারে কহে দুরাশয়।
এই কথা সত্য বটে লইল হৃদয় ॥
রাজার কন্যার সখী অমলা কমলা।
আমি দেখিয়াছি তারে নিতে পাতখোলা ॥
এই কথা সত্য বটে ভাব অকারণ।
বুঝিয়া কামিনীচোরে কর অন্বেষণ ॥

(খ) কোটালের চোর অনুসন্ধান

রাজার নিকট হইতে তিরস্কৃত হইয়া কোটাল চোর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

রাজা প্রণমিয়া হইল কোটালের গমন।
হাটে নগরে কোটাল চাহে ঘন ঘন ॥
অলক্ষিতে থাকে চোর দেখিতে না পায়।
গাছে যেন পনস ফল জম্বুক ধরায় ॥
যেন পঞ্জরেতে শুক বাহিরে বিড়াল।
সুড়ঙ্গেতে হাঁটে চোর বাহিরে কোটাল ॥
রাত্রি দিবা চাহে কোটাল লাগ নাহি পায়।
প্রাণ উড়িল কোটালের পাইল বড় ভয় ॥
কি হইল পরমাদ কোথায় পাব লাগ।
পুনরপি বুদ্ধি করি হৈল ভাগ ভাগ ॥
কেহো রহিল নৌকায় পথেতে কথো জন।
হাটে ঘাটে মাঠে কেহো করেন ভ্রমণ ॥
আথারে পাথারে নগরে ঘরে ঘরে।
অলক্ষিতে চোর রহে নারে ধরিবারে ॥"

এদিকে মালিনী সুন্দরকে সাবধান হইয়া থাকিতে উপদেশ দেয়। সুন্দর বলেন—

… … …
নহে যদি ঐ মনে থাকি কতো কাল।
আপনে যদি দেখা দিই ধরিবারে পারে ॥
তবে না পাইবে লাগ মরিবে কোটাল ॥

এদিকে সময় উত্তীর্ণ হইলে নৃপতি কোটালকে তলব করিলেন। রাজা কোটালের প্রাণদণ্ড দিতে উদ্যত হইলে সে মিনতি করিয়া বলিল, চোর মানুষ নহে, মানুষ হইলে ধরা পড়িত। রাজা শান্ত হইয়া সভাসদ্ লইয়া যুক্তি করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণরাম এখানে সম্ভবতঃ গোবিন্দদাসের নিকট কিছু ঋণী। তাঁহার কোটাল, চোর কিরূপে সুরক্ষিত পুরীতে প্রবেশ করিল, তাহা বুঝিতে পারিল না। অনুমান করিল, শূন্যমার্গে—না হয় সুড়ঙ্গপথে যাতায়াত করে। তাহার পর—

ডাকিয়া সকল সেনা　ঠাই ঠাই দিল থানা
　　হাট ঘাট নগর ভিতরে।
কেহ রহে বনপথে　খড়্গ লইয়া হাতে
　　কেহ উঠে গাছের উপরে ॥
বিদ্যা আদি সখীগণে　কিছুই নাহিক জানে
　　চৌদিক বেড়িয়া রহে পুরী।
চলে খাড়া জামাজোড়া　তুরকি টাঙ্গন ঘোড়া
　　কতেক বেড়ায় ঘুরি ঘুরি ॥

কেহ অবধূত হই সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া ছাই
দিগম্বর জটাভার শিরে।
কেহ বা সন্ন্যাসী হয় দণ্ড কমণ্ডলু লয়
ভ্রমি বুলে বাজারে বাজারে॥
কার বা ফকীর বেশ মুড়াইয়া মাথার কেশ
বেঁকা ঠেঙ্গা ছাগলের ছড়ি।
ফুকরে চেতনমুখী সেই জন সদা সুখী
ভিক্ষাছলে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥

কেহ বা পাটনিপটে রহিল নদীর তটে
পার করে যত আইসে যায়।
কূটবুদ্ধি কোতোয়াল যুকতি করিল ভাল
সিরজিল শতেক উপায়॥
নগরিয়া লোক যত হইল আনন্দহত
নিশি নহে পুরের বাহির।
দূরে গেল নাট গীত সবে অতি তরাসিত
যাবত কোটাল নহে স্থির॥

চোর ধরার সমস্ত ব্যাপারটি রামপ্রসাদ অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি কোটালের চোর অনুসন্ধানের পূর্ব্বে "কোটালিনী কর্তৃক কালীর স্তুতি ও প্রসাদপুষ্প নাথে প্রদান" শীর্ষক একটি প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে অনুপ্রাসের ঘটা দেখাইয়াছেন—

"কোটাল-কামিনী হেথা পূজে ভদ্রকালী।
করপুটে কহে মা গো এ কি ঠাকুরালী॥
ভাল মন্দ কভু মোর প্রভু নাহি জানে।
অপরাধ করে কেহ কেহ মরে প্রাণে॥
দয়া কর দাসে দয়াময়ি দাক্ষায়ণি।
দনুজদলনি দুর্গে দুর্গতিনাশিনী॥
* * *

তুষ্টা মহামায়া তার ঐকান্তিক ভক্তি।
ভয় নাই শ্রবণে শুনিল দৈবউক্তি॥
অচিরে অবশ্য ধরা পড়িবেক চোর।
সে কিন্তু মনুষ্য নহে বরপুত্র মোর॥
দেবী অনুকূল ফুল পাইল প্রসাদ।
হাস্যযুতা বিধুমুখী হৃদয়ে আহ্লাদ॥
যত্নে সেই ফুল দিল প্রাণনাথহাতে।
ভক্তি করি কোতোয়াল রাখে নিজ সাথে॥"

ইহার পর রামপ্রসাদ "কোটালের চোর অন্বেষণে সজ্জা" নামক প্রসঙ্গে হিন্দী বুলি ও অতি অশ্লীল গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ করিয়া কাব্যের রসকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। আর একটি প্রসঙ্গে রামপ্রসাদ "সহরে চোর ধরণার্থ কোটালের দৌরাত্ম্য" বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার নবাবী আমলে নগরবাসিগণকে মধ্যে মধ্যে কি পীড়ন সহ্য করিতে হইত তাহার আভাস পাওয়া যায়—

"চোর হেতু ঘরে ঘরে বিষম বেসাতি করে
বিদেশীকে বেন্ধে মারে কোড়া।
যাহার বাটীতে থাকে ইটে খাড়া করে তাকে
কোটালিয়া বিনষ্টের গোড়া॥
শুষ্ক হয় সব লোক দিবারাত্রি ভাবে শোক
উৎপাতের সীমা কিছু নাই।
শিষ্ট লোক যত ছিল আগেভাগে পলাইল
দূরাদূরে গেল ঠাঁই ঠাঁই॥

গাদাও সহর তায় কত লোক আইসে যায়
সদা দেখা পথিকের সাতে।
ফটকেতে রাখে বন্দি কে বুঝে তাহার ফন্দী
সাবল তাওইয়া দেয় হাতে॥
মাগ্যা খায় যারা যারা তা সবার অন্নমারা
ভয়ে কেহ সহরে না ঢোকে।
পড়্যা পড়্যা থাকে মাঠে কত বা নদীর ঘাটে
তস্তসারা মাছি পড়ে মুখে॥
... ...

এদিকে সুন্দর ছদ্মবেশে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন কোতোয়াল তাঁহার নিকট গিয়া নিজ দুঃখ নিবেদন করিলে—

"হাসি কহে গুণনিধি অচিরে তোমাকে বিধি বাক্য মিথ্যা নহে মোর ধরা পড়িবেক চোর
অবশ্য হবেন অনুকুল। ভয় নাই হের ধর ফুল॥"

আনন্দিত হইয়া কোটাল ফুল লইয়া প্রণাম করিল। ইহার পর রামপ্রসাদ কোটালের চরগণের ছদ্মবেশে চোর অন্বেষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বৈষ্ণবদিগের প্রতি মনের সাধ মিটাইয়া কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

দশ বিশ জনে ধরে ব্রজবাসি-বেশ।
কত সব চুল কত মুড়াইল কেশ॥
কটিতে কৌপীন মাত্র তাহাতে গিরস।
সদা করে কেবল ভক্ষণ নাম রস॥
গৌড় রাজ্যে গৌড়াগুলা চলে যে যে ঠাটে।
সেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে মাটে॥
খাসা চীরা বহির্ব্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে।
চিকণ গুধড়ী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে॥
মুঞ্জ-গুঞ্জ-ছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব।
দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট।
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট॥
এক এক জনার ধুমড়ী দৃষ্টি দুটি।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটি॥
ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে।
বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে॥
সে রসে রসিক নবশাক লোক যত।
উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত॥
সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী।
ভালমতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি॥
গোষ্ঠীশুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজীর কাছে।
মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে॥
নানা রস ভুঞ্জায় শোয়ায় দিব্য খাটে।
শেষে মেয়ে পুরুষেতে পত্র শেষচাটে॥
বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়।
ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায়॥
কেমন কলির কর্ম্ম কব আর কি।
মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝি॥
শতাবধি জনে হয় খাসা রামানন্দী।
অঙ্গ সঙ্গোপনে তারা ভাল জানে সন্ধি॥"

বলরাম কোটালদিগের চোর অন্বেষণ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে প্রজার উপর অত্যাচারের কোন বর্ণনা নাই। কোটাল রাজার নিকট হইতে অন্তঃপুরে পর্যন্ত অনুসন্ধান করিবার অনুমতি পাইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বিদ্যার পুরী ঘিরিয়া ফেলিল। সমস্ত ঘর পাঁতি পাঁতি করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। শেষে—

অশ্রুমুখে কোটাল বিদ্যারে পুছে বাণী।
কোন জাতি বটে চোর কহ ঠাকুরাণি॥
কোন জাতি বটে চোর কহ না আমারে।
নহে আমার বংশের বধ লাগিব তোমারে॥
কোটালের কথা শুনি বিদ্যা কোপে জ্বলে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করি কোটালেরে বলে॥
কোথা গেল দাসীগণ কোথা গেল চেড়ি।
মুখ ভাঙ্গ কোটালের দিয়া ঝাঁটার বাড়ি॥
মিথ্যা বাদ বলে মোরে কোথা আছে চোর।
কহে পুরুষের সনে দেখা আছে মোর॥"

তিরস্কৃত হইয়া কোটাল কোন্ পথে চোর আসে যায়, অনুচরগণকে অনুসন্ধান করিতে বলিল। তাহার পর দশ বার জন রক্ষক রাখিয়া নগরে অনুসন্ধান করিতে গেল।

বলরাম এখানে ভারতচন্দ্র ও সম্ভবত রামপ্রসাদ উভয়ের কাব্যকে অনুসরণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র সরাসরি কোটালকে দিয়া বিদ্যার গৃহ অনুসন্ধান করাইয়াছেন। বলরামও তাহাই করাইয়াছেন এবং সেখানে সন্ধান না পাইয়া, কোটাল—

"করিয়া যোগীর সাজ ভ্রময়ে সহর মাঝ আর যত সঙ্গিগণ নানা বেশে অনুক্ষণ
স্থানে স্থানে প্রতি ঘরে ঘরে। ফিরে তারা নগরে নগরে।"

কোটালের সঙ্গিগণের পত্নীগণ নাপিতানীর বেশে বাড়ী বাড়ী গিয়া নারীদের সভায় কথাবার্তা হইতে চোরের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। মধুসূদনও কোটালের দলবল কর্তৃক নগর অনুসন্ধানের বর্ণনা করিয়াছেন—

"সন্ন্যাসীর বেশ ধরি রাজার তনয়। কোথা আছে দুষ্ট চোর পাইব কোথায়
কোটালের আগে আগে চলিল নির্ভয় ॥ সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে বলে হায় হায় ॥
সুন্দরের যত মায়া কোটাল না জানে। শুনিয়া সুন্দর তাই হাসে মনে মনে।
না পায় চোরের দেখা ভাবে মনে মনে ॥ এইরূপে ভ্রমণ করএ প্রতিদিনে ॥"

গোবিন্দদাসের কোটালের ন্যায় মধুসূদনের কোটালও নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে চোরের অনুসন্ধান করিতে পারে নাই। রাজা তাহার প্রাণদণ্ড দিবেন বলিয়া শাসাইলে সে বলিল—

"তোমার নন্দিনী বিদ্যা চোর তার ঘরে। সেইরূপে চর দিবে অন্তর বাহিরে।
কেমন সাহসে যাব বিদ্যার মন্দিরে ॥ নির্ভয়ে যাইবি তুঞি বিদ্যার মন্দিরে ॥
তথায় না গেলে চোর ধরিতে না পারি। নিয়ম করিল বেটা আর সপ্তরাতি।
সমুচিত কর রায় নিবেদন করি ॥ ইহার ভিতরে দিব চোরেরে ঝাটিতি ॥
বীরসিংহ রায় বলে শুন রে কোটাল। ইহা যদি নহে তবে বধিব জীবন।
যেমতে পারিস চোরে ধরিতে তৎকাল ॥ এই যে নিশ্চয় তোরে কহিল কথন ॥"

তাহার পর মধুসূদন রামপ্রসাদের অনুসরণে সন্ন্যাসিবেশী সুন্দরকে দিয়া কোটালকে আশীর্বাদ করাইয়াছেন।

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ একজন ব্রাহ্মণ-বিধবাকে কোটালের চর করিয়া বিদ্যার গর্ভপাতের জন্য তাহার নিকট পাঠাইয়াছেন। এই পরিকল্পনাটি অবশ্য কৃষ্ণরামের, রামপ্রসাদ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণরামের কাব্যে সেই রমণীটির নাম কলাবতী ব্রাহ্মণী এবং রামপ্রসাদের কাব্যে বিদুব্রাহ্মণী। কোটাল ঐ ব্রাহ্মণীকে বিদ্যার নিকট পাঠাইল—কাহার ঔরসে বিদ্যার গর্ভ হইয়াছে, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে। ব্রাহ্মণী গিয়া বিদ্যাকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া বলিল—চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই, সে গর্ভপাত করাইবার ঔষধ জানে। যাহার ঔরসে গর্ভ, তাহার নাম বলিতে হইবে এবং সে আসিয়া হাত পাতিয়া ঔষধ লইবে। চতুরা বিদ্যা বুঝিলেন, এ রমণী কোটালের চর এবং বিদ্যার ইঙ্গিতে সখীগণ তাহার গালে চুণকালী দিয়া মারধোর করিয়া ধাক্কা দিতে দিতে বাড়ীর বাহির করিয়া দিল।

এই প্রসঙ্গটি আর কোন কাব্যে নাই। কোটাল নিগৃহীতা ব্রাহ্মণীকে কিছু পুরস্কার দিয়া সন্তুষ্ট করিল। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের কাব্যে ইহার পর কোটালের সহোদর বিদ্যার মন্দির

সিন্দুরমণ্ডিত করিবার পরামর্শ দিয়াছে এবং সেই সূত্রে কোটাল রাজার নিকট বিদ্যার মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি লইয়াছে।

দ্বিজ রাধাকান্ত সমস্ত ব্যাপারটাই অন্য ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা তাহা পরে দেখাইতেছি।

(গ) সিন্দুর প্রসঙ্গ

ভারতচন্দ্র ও রাধাকান্ত ব্যতীত সকল কবিই সিন্দুর সাহায্যে কোটালের চোরের সন্ধান জানিবার কথা লিখিয়াছেন। এই সিন্দুর প্রসঙ্গের প্রথম আবিষ্কর্তা কে এবং কি ভাবে তাহা কাব্যে প্রবেশ করিল, তাহা দেখাইতেছি। গোবিন্দদাসই সর্বপ্রথমে সিন্দুরের উল্লেখ করিয়াছেন, কোটালগণ যখন চোরের অনুসন্ধানের কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তখন বৃদ্ধ কোটালের ভাস্কর নামে একজন অনুচর প্রস্তাব করিল যে, তাহার মাথায় এক যুক্তি আসিয়াছে। সেই জন্য তাহার মিতা দিবাকর রজককে ডাকিয়া আনা আবশ্যক। রজক উপস্থিত হইলে কোটাল তাহার সহিত যুক্তি করিতে লাগিল। ভাস্কর বলিল, গভীর নিদ্রাকালে আলিঙ্গনবদ্ধ রমণীর ললাটস্থ সিন্দুর কামী যুবার বস্ত্রে লাগিবার সম্ভাবনা আছে। তাই সমস্ত রজককে ডাকিয়া বলিয়া দেওয়া হউক যে, কোন পুরুষের বস্ত্রে সিন্দুররেখা দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহার বিচার করিয়া দেখিলে চোর ধরা পড়িবার সম্ভাবনা আছে।

"মিতা যতেক রজক আছে আনিবা আপন কাছে　এমন ধরিবা তাহে　যে জন একত্র হয়ে
　　সভে কহিবা বিবরণ।　　তারবস্ত্রে সাক্ষী পাও যদি।
অঘোরে সিন্দুর রেখ　জানিবা যে পরতেক　কেবা হয় পরদেশী　কেবা হয় সহ দেশী
　　বিচারিয়া করিবা যতন॥　　বিচারিয়া করিবা অবধি॥"

এই পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন ও ইহাতে সফলকাম হওয়ার বিশেষ কোন সম্ভাবনা দেখি না। অথচ গোবিন্দদাস এই পন্থা অবলম্বন করিলেন কেন, তাহা বুঝিলাম না। প্রথমতঃ বিদ্যা, সুন্দরের সহিত গান্ধর্বমতে বিবাহিতা হইলেও প্রকাশ্যে সীমন্তে সিন্দুর দিতে পারিতেন না। তাহার পর স্ত্রীপুরুষের একত্র শয়নে বস্ত্রে সে সিন্দুরের দাগ লাগিবেই, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? বিদ্যা যদি ললাটে সিন্দুর বিন্দু দিয়া থাকেন, তাহা সুন্দরের বস্ত্রেই বা লাগিবে কেন? গোবিন্দদাস সম্ভবতঃ চণ্ডীদাসের—

"চাঁচর কেশের　চিকণ চূড়া　সিন্দুরের দাগ　আছে সর্ব্ব গায়
　　সে কেন বুকের মাঝে।　　মোরা হলে মরি লাজে॥"

খণ্ডিতা রাধার এই সকল উক্তি হইতেই ধরিয়া লইয়াছেন যে, রতিলম্পট নায়কের অঙ্গে নায়িকার ললাটের সিন্দুরচিহ্ন লাগা স্বাভাবিক এবং তাহা সে বস্ত্রে মুছিতে পারে। যাহা হউক—

দৈবের ঘটন কভু খণ্ডন না যায়।
বস্ত্র তুলি যাএ এখন নিরখিয়া চায়॥
সকল বস্ত্র নিরখিয়া চাহিল এক এক।
সুন্দরের বস্ত্রে দেখে সিন্দুরের রেখ॥
সিন্দুরের রেখ আর লাগিছে কজ্জল।
পাইয়া হরিষ বড় হইলা সকল॥"

রজক কোটালের নিকট বস্ত্র লইয়া আসিয়া দেখাইল। কাহার বস্ত্র, তাহা কোটাল জানিতে চাহিলে রজক বলিল—

"মালিয়ানী বস্ত্র আনি দেয় নিত্য নিত্য।
পতি সুত নাহি তার কহিলাম তত্ত্ব॥"

ইহা অপেক্ষা কি আর ভাল প্রমাণ থাকিতে পারে? সুতরাং কোটালগণ মালিনীর গৃহে হানা দিল। গোপনে থাকিয়া তাহারা মালিনীর গৃহে খট্টায় উপবিষ্ট সুন্দরকে দেখিল। মালিনীর গৃহে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেই সুন্দর সুড়ঙ্গপথে অন্তর্হিত হইলেন।

কষ্টকল্পিত হইলেও গোবিন্দদাসের এই কাহিনীর মধ্যে রোমান্স আছে এবং তাহার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কৃষ্ণরাম প্রভৃতির সিন্দুরপ্রসঙ্গ একেবারে অন্য প্রকার।

কৃষ্ণরাম বলিতেছেন, কলাবতী ব্রাহ্মণীর চেষ্টা বিফল হইলে—

"কোটালের সহোদর নাম তার শক্তিধর
ভাবিয়া সবায় বলে ডাকি।
ধরহ আমার বোল বিদ্যার মন্দিরে চল
বসনে সিন্দুর দিয়া রাখি॥
চোরের বসন মাঝে সিন্দুর লাগিলে লাজে
দিবে নিয়া রজকের বাড়ী।
আনিয়া রজক চয় বড় দেখাইয়া ভয়
তাহারে না দেয় যেন ছাড়ি॥"

তাহার পর বাঘাই রাজার অনুমতি লইয়া বিদ্যার মন্দিরে তল্লাস করিতে গেল। সখীগণকে লইয়া লজ্জায় অধোমুখী নৃপবালা বাহিরে চলিয়া গেলেন। কোটালগণ বিদ্যার রঙীন বসনে সিন্দুর লাগাইয়া দিল।

কৃষ্ণরামের কাব্যে সিন্দুরপ্রসঙ্গটি সুন্দর মানাইয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদ বীভৎস পরিকল্পনা করিয়াছেন। বাঘাইয়ের ভ্রাতা তাহাকে বলিতেছে—

"যত বুদ্ধি পাও দাদা মনে নাহি ধরে।
সবে মেলি যাই চল রাজকন্যাঘরে॥
সিন্দুরে মণ্ডিত কর রাজকন্যাগৃহ।
নিতান্ত মিলিবে চোর নাহিক সন্দেহ॥"

কোটাল রাজার অনুমতি চাহিলে রাজা অনুমতি দিলেন, 'কোন রকমে চোর ধরিয়া দাও'।

"তখনি পঞ্চাশ মোণ আনিল সিন্দুর।
পাঁচ সাতজন গেল রাজকন্যা-পুর॥
কোটালে সম্মুখে দেখি চমকিত রামা।
সখী সঙ্গে স্থানান্তরে গেলা গুণধামা॥
কূটবুদ্ধি কোতোয়াল কত জানে ফন্দী।
সিন্দুরে মণ্ডিত কৈল না রাখিল সন্ধি॥
খট্টাদি যতেক ছিল বিচিত্র ভূষণ।
সিন্দুরে মাখিয়া রাখে রজনী রাজন॥"

তাহার পর যে সরোবরে রজকগণ বস্ত্র কাচে, তাহার নিকটে অলক্ষিতে অনুচর রাখিল। কোটাল চলিয়া গেলে বিদ্যা ঘরে আসিয়া দেখিলেন, "গৃহ, খট্টা যাবদীয় বিচিত্র বসন, সকলি সিন্দুরমাখা।" যে বিদ্যা ভারতের পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার কি এই সহজ বুদ্ধি হইল না যে, কোটাল সিন্দুর লেপিয়া সুন্দরকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে? এই প্রকার স্থূল প্রক্রিয়ায় চোর ধরিবার চেষ্টায় সুন্দরও বিদ্যার ন্যায় বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমতী যুবক যুবতী যে প্রতারিত হইলেন, ইহাই আশ্চর্য!

যথাকালে সুন্দর আসিলেন, বিদ্যা তাঁহাকে সিন্দুরলিপ্ত গৃহ দেখাইলেন, সুন্দর আস্ফালন করিলেন—

"সহস্র বৎসর যদি ভ্রমে নিশানাথ।
তথাচ কদাচ তার নাহি হব হাত॥"

প্রভাতে বস্ত্রে সিন্দুর দেখিয়া সুন্দর হীরাকে বলিলেন—

"নিশি গেলে বস্ত্রখানা দিও ধোপাবাড়ী।
সংগোপনে কাচে যেন দুনা দিব কড়ী॥"

কোতোয়াল যে রজকের কার্যবিধি লক্ষ্য রাখিবার জন্য চর রাখিতে পারেন, তাহাও কি সুন্দর বুঝেন নাই?

বলরামদাস কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের অনুকরণে কোটালকর্তৃক সিন্দুরের ফাঁদে চোর ধরার পরিকল্পনা করিয়াছেন। কোটাল একজন অনুচরকে বণিকের গৃহ হইতে প্রচুর সিন্দুর কিনিয়া আনিতে পাঠাইল এবং বিদ্যার গৃহ সিন্দূরমণ্ডিত করিল। বলরামের বিদ্যা কোটাল কর্তৃক তাহার গৃহ যে সিন্দুরমণ্ডিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করেন নাই। সুন্দর সুড়ঙ্গের পথে মালিনীগৃহে ফিরিতে বস্ত্রে সিন্দুরের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং মালিনীকে সেই বস্ত্র রজকের ঘরে কাচিতে দিতে বলিলেন; তিনি ঐ সিন্দুর দেখিয়াও সাবধান হইলেন না। রজক যখন সেই সিন্দুরমণ্ডিত বস্ত্র কাচিবার উপক্রম করিল, তখন কোটালের চর তাহাকে ধরিল।

মধুসূদনও যথারীতি পূর্ববর্ত্তিগণের ন্যায় সিন্দুরপ্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে কিছু নূতনত্ব নাই। আমরা এইবার দ্বিজ রাধাকান্ত তাঁহার কাব্যে এই প্রসঙ্গটি কি ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি লিখিয়াছেন যে, কোটাল রাজার তিরস্কারের কারণ বুঝিতে পারে নাই। পরে একজন অনুচর বিদ্যার সখীকে পাতখোলা কিনিতে দেখিয়াছে বলায় তাহারা ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। তাহার পর তাহারা পরামর্শ করিতে লাগিল কিরূপে সেই চোরকে ধরা যায়—

"হেন কালে কহে এক কোটালের চর।
সিন্দুরে মণ্ডিত কর কামিনীর ঘর॥
অবশ্য রজকবাটী দিবে তার বাস।
নিশানে ধরিব চোর কিসের তরাস॥

কোটাল কহেন কিছু নহে এহ মত।
ইজার পরিলে রাখে প্রস্রাবের পথ ॥
রাজাধিরাজের কন্যা গৃহিণী যাহার।
দ্বিতীয় বসনখানি নাই কি তাহার ॥
হেন কালে কহে এক আর অনুচর।
চলহ রজনীযোগে রূপসীর ঘর ॥
কেহ বিদ্যারূপ সাজ কেহ সহচরী।
অবশ্য আসিবে চোরে ধরিবারে পারি ॥

শুনিয়া কোটাল ঠাট হাসে খল খল।
বুঝিলাম তুমরা যে বড়ই পাগল ॥
অকৃত্রিম কৃত্রিম এ জ্ঞান নাই যার।
সে কি করিবারে পারে এমতি দুস্তার ॥
রাজাধিরাজেন্দ্র বীরসিংহ অধিকারী।
তার পুরী প্রবেশি রূপসী করে চুরি ॥
এ চোর নির্বুদ্ধি নহে বুদ্ধের সাগর।
অপূর্ব্ব পুরুষ হবে রাজার কোঙর ॥"

এখানে দ্বিজ রাধাকান্তের কোটাল কৃষ্ণরামও রামপ্রসাদের সিন্দূরের ফাঁদ ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যার ছদ্মবেশে সুন্দরকে ধরিবার ফাঁদ, উভয় পন্থাকেই নিন্দা করিয়া, নিজে একটি নূতন মতলব সৃষ্টি করিবার ভূমিকা করিয়াছে। আমরা পরে তাহার সেই মতলবটির বিষয় আলোচনা করিব।

ভারতচন্দ্র সিন্দূরপ্রসঙ্গ আদৌ উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার কোটাল রাজার অনুমতি লইয়া সরাসর বিদ্যার ভবনে খানাতল্লাসী সুরু করিয়া দিল এবং পালংক টান মারিয়া সরাইতেই সুড়ঙ্গের পথ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

(ঘ) সুড়ঙ্গ আবিষ্কার

সিন্দুরপ্রসঙ্গের উপসংহারে গোবিন্দদাস লিখিতেছেন—কোটালগণ রজককে পুরস্কার দিয়া বিদায় দিল। এ দিকে—

আপনার গৃহে রজক করিলা গমন।
যথা যত রজক ছিল আনি ততক্ষণ ॥
বিরলে বসিয়া সব কহিলা কথন।
শুনিয়া রজক সব গৃহেতে গমন ॥
*　　*　　*
দড়োদড়ি করি সর্ব্বে গেলা যার ঘর।
দৈবযোগে বিথড়ে এখন গেলা দিবাকর ॥

দৈবের ঘটন কভু খণ্ডন না যায়।
বস্ত্র তুলি যাএ এখন নিরখিয়া চায় ॥
সকল বস্ত্র নিরখিয়া চাহিল এক এক।
সুন্দরের বস্ত্রে দেখে সিন্দুরের রেখ ॥
সিন্দুরের রেখ আর লাগিছে কজ্জল।
পাইয়া হরষ বড় হইলা সকল।"

তাহার পর রজক সেই বস্ত্র লইয়া কোটালের নিকটে গেল কোটাল তাহাকে সেই বস্ত্রের কে মালিক জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—

মালিয়ানী বস্ত্র আনি দেয় নিত্য নিত্য।
পতিসুত নাহি তার কহিলাম তত্ত্ব ॥"

কোটালগণ তখন গিয়া মালিনীর বাড়ী ঘিরিয়া ফেলেন এবং অন্তরাল হইতে খট্টার উপর উপবিষ্ট সুন্দরকে দেখিতে পাইল। তাহারা যখন মালিনীর ঘরে প্রবেশের উদ্যোগ করেন তখন সুন্দর সুড়ঙ্গের মধ্যে আত্মগোপন করিলেন। কোটালগণ সুন্দরের রন্ধন ও ভোজনের

চিহ্নাদি দেখিতে পাইয়া মালিনীকে চোরের সন্ধান জিজ্ঞাসা করেন সে অস্বীকার করিল ; কোটাল তল্লাস করিতে করিতে সাজি তুলিতেই সুড়ঙ্গের দ্বার দেখিতে পাইল। সুড়ঙ্গের মুখে প্রহরী বসাইয়া কোটাল রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন ও সাবধানে সুড়ঙ্গ পাহারা দিতে বলিলেন, রজনী প্রভাতে সুড়ঙ্গ খুঁড়িবার ব্যবস্থা হইল। সুন্দর গিয়া বিদ্যার সখীগণের মধ্যে ছদ্মবেশে লুকাইয়া থাকিলেন।

কৃষ্ণরাম লিখিতেছেন বিদ্যার গৃহে সিন্দুর মণ্ডিত করিয়া—

"রজক সভায় তবে বলিল কোটাল। ধরিয়া না আন যদি দোহাই রাজার ॥
চোর না পাইয়া দেখ মোর এই হাল ॥ এমন প্রকারে যদি চোর লাগ পাই।
বসনে সিন্দুর মাখা যে পাবে যাহার। তুষিব অনেক ধনে সত্য শুন ভাই ॥

এদিকে সুন্দর বিদ্যার গৃহে রাত্রি কাটাইয়া মালিনীর ঘরে আসিয়া বস্ত্রে সিন্দুর চিহ্ন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও মালিনীকে বস্ত্রটি কাচিতে দিলেন।

মাল্যানি দিলেন লইয়া রজকের বাড়ি। এতেক বলিয়া গেল আপন আলয় ॥
সকালে কাচিয়া দিবে আমি দিব কড়ি। বসনে সিন্দূর দেখি রজক কৌতুকে।
আসিয়াছে মোর বাড়ি বহিনি তনয়। উত্তরিলা গিয়া কোতোয়ালের সমুখে ॥

রামপ্রসাদ রজকের সহিত কোতোয়ালের ষড়যন্ত্রের কথা লেখেন নাই তাঁহার রজক কিছু সন্দেহ না করিয়াই কাপড়টি কাচিতে আরম্ভ করিয়াছিল এমন সময় কোটালের চর আসিয়া তাহাকে সিন্দুরলিপ্ত বস্ত্র কাচিতে দেখিয়া গ্রেপ্তার করিল।

রমণী লইয়া সুখে বঞ্চিলা রজনী। অন্য ঠাঁই যে পাও দ্বিগুণ দিব আমি।
উষাকালে উঠে গেলা কবি শিরোমণি ॥ প্রকাশ না হয় যেন বুদ্ধিমান তুমি ॥
বসনে সিন্দুর মাখা দেখি কবিবর। * * *
হীরা প্রতি কহে মাসি এক কর্ম্ম কর ॥ প্রভাতে রজক গেল সরোবর তীর।
নিশি যোগে বস্ত্রখানা দিও ধোপা বাড়ী। আগে ভাগে সেই বস্ত্র করিল বাহির ॥
সংগোপনে কাচে যেন দুনা দিব কড়ী ॥ কোটালের অনুচর আছিল নিকটে।
এত বলি স্বীয় কর্ম্মে চলিলা সুন্দর। সিন্দূরের চিহ্নে বুঝে চোরের এ বটে ॥
সন্ধ্যাকালে যায় হীরা রজকের ঘর ॥ দৌড়ে যেয়ে ঘাড় ধরে দেয় পাক নাড়া।
চুপে চুপে কহে কথা বিরলে ডাকিয়া। তখনি কাপড় দিয়ে বান্ধে পিঠ মোড়া ॥
গুপ্তে একখানি বস্ত্র দিবে হে কাচিয়া ॥ ঢেকাইয়া নিল যথা কোতোয়াল আছে।
সিন্দুরের চিহ্নিত বস্ত্র ফেল্যে দিল কাছে ॥

কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন কোটাল রজককে আলিঙ্গন দিল তাহার পর সসৈন্যে মালিনীর গৃহ ঘেরাও করিল। এখানে কোটাল ও মালিনীর মধ্যে বাক্‌যুদ্ধটি কৌতুকপ্রদ—

কোটাল রুষিয়া বলে ধরিয়া আটুনি। রাজকন্যা গর্ভবতী প্রাণ যায় মোর।
চোরেরে হাজির কর শুন ল কুটনি ॥ বসিয়া কৌতুক দেখ তুমি পোষা চোর ॥
ফুল দিয়া বিদ্যারে আপনি যুক্তি দিলা। জীতে যদি সাধ থাকে আন বিদ্যমান।
কোথায় থাকিয়া বর আনি মিলাইলা ॥ নহে শূলে বসাইয়া কাটিব নাক কান ॥

মাল্যানী রুষিয়া বলে মুখে নাহি টুটে।
কুবুদ্ধি পাইল বুঝি কোটালের বটে ॥
এত কটু বল তুমি কি দোষ আমার।
লুটিয়া লইলা ঘর দোহাই রাজার ॥
পতি পুত্র নাহি মোর যুবা নহে ঝি।
আপনি যুবতী নহি কারে ভয় কী ॥
রাজার নিকটে গিয়া শিখাইব তোমা।
অবলা পাইয়া ধর মিছামিছি আমা ॥
সারা রাতি থাক তুমি রাজার সহরে।
তোমার রমণী কত নর করে ঘরে ॥
তুমি কারো বহু নিলা কার নিলা ঝি।
আমারে কুটুনী বল কব আর কি ॥"
* * *
সিন্দুর ভূষিত বস্ত্র দিল কোতায়াল।
কুটুনী হারামজাদী ইহা কার বল ॥
আটুনি ধরিয়া আর চোরেরে লুকায়।
এখনি বধিব তোরে লুকায় লুকায় ॥ (১)
ভয় পাইয়া মাল্যানী উত্তর তবু করে।
অনেক দিনের বস্ত্র ছিল মোর ঘরে ॥
রজস্বলা হইয়া পরি দিন দুই তিন।
না বুঝিয়া বল তুমি সিন্দুরের চিন ॥"

রামপ্রসাদ কোটাল ও মালিনীর বাক্‌যুদ্ধটি হিন্দুস্থানী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে।

মধুসূদন চক্রবর্ত্তীর কাব্যে সুন্দরকে বিদ্যা সিন্দুরের কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু—

সিন্দুরের কথা শুনি নিষেধ না মানে।
এ দোষ নাহিক তার দোষ পঞ্চবাণে ॥

সুন্দর সিন্দুর মাখা বস্ত্র মালিনীকে দিলেন গোপনে রজকের কাছে কাচিতে দিতে। রজক কাপড় কাচিয়া যখন মেলিয়া দিয়াছে তখন বস্ত্রে সিন্দুরের আভা দেখিয়া কোটাল রজককে ধরিয়া ফেলিল। পঞ্চাশ চাবুক মারিতে রজক স্বীকার করিল যে, মালিনী তাহাকে সেই বস্ত্র কাচিতে দিয়াছে। কোটাল গিয়া মালিনীর ঘর ঘেরাও করিল। মধুসূদন কোটাল ও মালিনীর মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ বর্ণনা করেন নাই মার খাইয়া মালিনী সব স্বীকার করিয়া ফেলিল।

বলরাম লিখিতেছেন কোটাল বিদ্যার গৃহ সিন্দুরমণ্ডিত করিয়া চলিয়া গেলে সুন্দর যখন বিদ্যার গৃহে আসিলেন বিদ্যা সুন্দরকে জানাইলেন যে গর্ভের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে এবং সুন্দরকে পলাইতে উপদেশ দিলেন, উভয়ে রোদন করিলেন—

সুন্দর বলেন প্রিয়ে না কাঁদিহ আর।
তোমা লাগি ভদ্রকালী যে করে আমার ॥
যদি নাহি মোর তরে রাখে ভদ্রকালী।
সুঙরিয়া মোর তরে দিও জলাঞ্জলি ॥"

সুন্দর মালিনীর গৃহে আসিয়া লক্ষ্য করিলেন যে তাঁহার বস্ত্রে সিন্দুর লাগিয়াছে তিনি মালিনীকে বস্ত্রখানি কাচিবার জন্য রজকের গৃহে লইয়া যাইতে বলিলেন। মালিনী ভাগিনার বস্ত্র বলিয়া রজককে তাহা কাচিতে দিল। কোটালের চর রজকের গৃহে সকল বস্ত্র পরীক্ষা করিতে গিয়া সেই সিন্দুরলিপ্ত বস্ত্র পাইল। মারের চোটে রজক স্বীকার করিল যে মালিনী সেই বস্ত্র আনিয়া দিয়াছে। কোটাল গিয়া মালিনীর গৃহে চড়াও হইল। সুন্দর তাহা দেখিয়া ভীত হইয়া সুড়ঙ্গ-পথে বিদ্যার গৃহে পলাইয়া আসিলেন।

"বিদ্যা বলে প্রাণনাথ ধর নারীবেশ।
সকল সখীর মাঝে করহ প্রবেশ ॥"

এদিকে দুর্বার কোটাল মালিনীর ঘর বেড়িয়া তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। ভয়ে মালিনী কাঁদিয়া বলিল,

"ভাগিনা আমামার　　বৈদেশী কুমার
শুইয়াছে ঘরে দেখ ॥"

কোটাল মালিনীর কথা শুনিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া কুমারকে দেখিতে পাইল না। মালিনীকে সত্বর কোথায় ভাগিনা আছে দেখাইতে বলিল। খুঁজিতে খুঁজিতে খাটের তলে সুড়ঙ্গের পথ আবিষ্কৃত হইল। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ভারতচন্দ্রের কাব্যেও বিদ্যার খাটের তলে সুরঙ্গপথ ছিল। কোটাল সুরঙ্গের দ্বারে জনচারেক প্রহরী রাখিয়া বিদ্যার গৃহে গিয়া চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল।

জানিল নিশ্চয়　　আর কিবা ভয়　　এতেক বলিয়া　　ঘরে প্রবেশিয়া
বিদ্যা যত বড় সতী।　　দেখায় সুলঙ্গ পথ।
কাছে রাখি চোর　　প্রাণ বধে মোর　　লাজকুল খাইয়া　　রাজসুতা হৈয়া
লঘু দোষে নরপতি ॥　　করিলি এই মহৎ ॥"

তাহার পর কোটাল তাহার সঙ্গিগণকে বলিল যে বিদ্যার সখীগণের মধ্যেই চোর আছে। শুনিয়া দেখিল দশ জন সখী ও বিদ্যাকে লইয়া এগারো জন রহিয়াছে। তাহার পর দ্বারের সম্মুখে একটি খন্দক কাটিয়া তাহা লংঘন করিয়া সকলকে ঘর হইতে বাহির হইতে বলিবে এই পরামর্শ করিল তাহাতে যে পুরুষ সে দক্ষিণ পা আগে বাড়াইবে এইভাবে চোর ধরা পড়িবে।

দ্বিজ রাধাকান্ত একেবারে নূতনভাবে চোরধরা প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছে। এই বিস্তারিত প্রসঙ্গের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি—

বিদ্যা সুন্দরকে গর্ভ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে জানাইলে তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন বিপত্তিকালে একজন সখার প্রয়োজন। এই ভাবিয়া বিদ্যার ভ্রাতা বিজয় সিংহের সহিত সন্ন্যাসী-বেশে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। বিজয় সিংহ ইহাতে প্রথমে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন, পরে আলাপ করিয়া খুশী হইলেন, দুজনের বন্ধুত্ব হইল। সুন্দর ক্রমশঃ নিজগুণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন নৃত্য গীত, ক্রীড়া সকল বিষয়েই ঔৎকর্ষ দেখাইয়া রাজকুমারকে মুগ্ধ করিলেন। সর্বদাই উভয়ে কাব্যচর্চা করেন। এদিকে কোটাল চোরকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বুঝিতে পারিয়া ফাঁদ পাতিল, এক বৃক্ষতলে বসিয়া একটি সরোবরের সংকেত করিয়া চারিদিকে চারিটি ঘাট করিল পশ্চিমে ভেক, পূর্বে সর্প, দক্ষিণে ছাগ ও উত্তরে ব্যাঘ্র অংকিত করিল। পরস্পর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না এবং কেহ কাহারও পথ লংঘন করিবে না অথচ সকলেই জল পান করিবে। এই ধাঁধা সমাধা করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিল। সুন্দর—

"সৃজিল দুহার পথ জলের উপর।　　উপরে করিল পথ এমতি ভাবিঞা।
দক্ষিণে ভেকের গতি সর্পের উত্তর ॥　　ছাগলের পশ্চিম শার্দ্দলের পূর্ব দিঞা ॥"

সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল কোটাল লোকটিকে চিনিয়া রাখিল। কোটাল তখন আর একটি ফাঁদ পাতিল সুন্দরের সাহস পরীক্ষা করিবার জন্য, বিজয়সিংহের সভাগৃহের বাহিরে অকৃত্রিমের মত একটি কৃত্রিম সর্প নির্মাণ করিয়া রাজার ভাণ্ডার হইতে একটি মণি আনিয়া তাহার মাথায় রাখিল। প্রভাতে বিজয় সিংহ সভায় আসিলে কোটাল বলিল প্রাচীরের বাহিরে একটি ভীষণ সর্প রহিয়াছে তাহার মাথায় একটা মণি আছে। সকলে আসিয়া সর্প দেখিল বিজয় সিংহ বলিলেন যে মণিটি আনিতে পারিবে উহা তাহার হইবে। কেহই সাহস করিল না কালীকে স্মরণ করিয়া সুন্দর তাহা আনিয়া দিলেন। কোটালের আর সন্দেহ রহিল না। এইবার কোটাল শেষ চেষ্টা করিল, বিজয়সিংহের সভায় আসিয়া প্রশ্ন করিল 'প্রেম' বড় না 'প্রাণ' বড়। সকলেই বলিল 'প্রাণ' বড় সুন্দর যুক্তিদ্বারা ও নানা পৌরাণিক উদাহরণ দিয়া প্রমাণ করিলেন 'প্রেম' বড়। কোটাল সুন্দরের পিছু লইয়া তাঁহার বাসস্থানের সন্ধান লইল এবং রাত্রে বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। এদিকে সুন্দর সুড়ঙ্গপথে বিদ্যার নিকট আসিলেন এবং সেই দিন বিপরীত রতি প্রার্থনা করিলেন। অনেক আপত্তির পর বিদ্যা সম্মত হইলেন। রাণী স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রে বিদ্যার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুন্দর তাড়াতাড়ি পলাইতে গিয়া অন্ধকারে নিজের বস্ত্র ভাবিয়া বিদ্যার শাড়ী পরিয়া পলাইয়া গেলেন। রাণী বিদ্যার পরণে পুরুষের বসন দেখিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিলেন এবং সেই বস্ত্র লইয়া আসিয়া রাজাকে দেখাইলেন। এদিকে কোটাল দরজার ফাঁক দিয়া সুন্দরের ঘরে আড়ি পাতিতেছিল। সুন্দরকে বিদ্যার বস্ত্র পরিয়া আসিতে দেখিয়া দরজায় ধাক্কা দিল, দরজা খুলিতেই সুন্দরের চুল চাপিয়া ধরল। মালিনী ব্যাপার কঠিন বুঝিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু উপায় নাই কি করিবে। কোটাল জানিতে চাহিল এ বস্ত্র মালিনীর নাতি কোথায় পাইল। তখন—

বিমলা বলেন সত্য নিবেদন করি। তুষ্ট হৈয়া বস্ত্রখানি দিয়াছেন মোরে॥
যেদিন কন্দর্প পূজা করিল সুন্দরী॥ নাতিটি পরিয়া তাহা আপন বসন।
অপূর্ব কুসুমহার দিলাম তাহারে। দিয়াছেন কালি সব রজক ভবন॥

মালিনীর কথা শুনিয়া হাসিয়া কোটাল ঘরে ঢুকিয়া বাঘছাল ঢাকা সুরঙ্গপথ আবিষ্কার করিল মালিনীর তখন আর কথা জোগাইল না।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

৫৩০। মনসামঙ্গল।

রচয়িতা—ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস। পত্র ২-৩৪, অসম্পূর্ণ। দু-ভাঁজ করা শাদা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৬ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৬×৫।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৯ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকালী ॥ নম গনেসায় নম ॥
... ... সঙ্গীত
আর গলে গজমতি হার
অভরণ মণি রত্ন কত রবি শশী পরাভূত
আর চরাচর গণ জত ॥
নারায়ণ সঙ্গে যথা আছেন জগতি মাতা
তেজ দেবি বৈকুণ্ঠ নগর ॥
অবল তনয় ডাকে পদছায়া দেহ মোকে
...আমার কণ্ঠের উপর ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি মিশাইয়া বাকবাণী
কণ্ঠে বসি বল সুবচন ॥
রাগ সঙ্কা তাল মান কিছু আমার নাহি জ্ঞান
তব পদে লইল শরণ ॥ ইত্যাদি ॥

তৃতীয় পত্রের শেষ হইতে চতুর্থ পত্রের কয়েক পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত একটি অসম্পূর্ণ 'আত্মকথা' আছে। এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

শুন ভাই আত্মকথা দেবী হইলা বরদাতা
সহায় পূর্ব্ব বিষহরি।
বলভদ্র মহাকায় চন্দ্রবংশ সম হয়
তাহার তালুকে ঘর করি ॥
তাহার রাজত্ব শেষ চলি গেলা স্বর্গদেশ
তিন পুত্রে দিয়া অধিকার।
শ্রীযুত আস্কন্ন´রায় প্রেমের অবধি তায়
বলে রণে বিজয় জাহার ॥
তিন পুত্র অল্পবয় প্রসাদ গুরু মহাশয়
তালুকের করেন লেখাপড়া।
তাহার কলম যশে প্রজা নাহি চাষ চষে
সকল ঘর হইল কাথড়া ॥
রণে পড়ে বারা খাঁ বিপাকে ছাড়িল গাঁ
যুক্তি করি জননী জনক।
দিন কথক ছাড়ি জাই তবে সে নিস্তার পাই
দেয়ানে হইল বড় ঠক ॥
শ্রীযুত আস্কন্ন´রায় অনুমতি দিলা তায়
যুক্তি দিল পলাবার তরে।
শুনহ মাতুল তুমি উপদেশ বলি আমি
গ্রাম ছাড় রাত্রির ভিতরে ॥
প্রসাদ তাহার পুত্র ইঙ্গিত পাইবামাত্র
পলাইবে শঙ্কর মণ্ডল।
প্রসাদ হরিষ হইয়া যুক্তি দিলা আশ্বাসিয়া
ধান্য কিছু...... ॥

ইহার পরেই লিপিকর, রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভণিতা—

১। পঞ্চ দেবতার পায় ক্ষেমানন্দ দাস গায়
আসরেতে হও অধিষ্ঠান ॥
২। রচিলা কেতকাদাস মনসার পায়।
হরি হরি বল ভাই বন্দনা হইল সায় ॥

শেষ—

প্রবোধ করিয়া তারে জয় বিষহরি।
বেহুলা লখাই লইয়া জান স্বর্গপুরি।
এত বলি বিষহরি দুহার ধরে হাতে।
জয় দেবি জয় দিয়া উঠে পুষ্পরথে ॥

দেবী দুহার হাতে ধরি দিল দিব্যজ্ঞান।
জয় দিয়া আকাশে উঠিল রথখান॥
পৃথিবীমণ্ডলে দেবী দিয়া শুভ দৃষ্টি।
স্বর্গবাসে গেলা দেবী খ্যাতি থুইয়া সৃষ্টি॥
কৃষ্ণের স্থানে দুহারে কৈল সমর্পণ।
রতিপতি দেখি পুত্র হরিষ বদন॥
দেবতাসভায় দুহারে সমর্পণ করি।
সেজুয়াশিখরে গেলা জয় বিষহরি॥
রত্নসিংহাসনে দেবী বসিলেন গিয়া।
সখীগণ দেয় শ্বেত চামরের বা॥
ক্ষেমানন্দে বিরচিল মনসামঙ্গলপ্রকাশ।
সাঙ্গ হইল দেবীর পূজার ইতিহাস॥
গায়নে বায়েনে মাঙ্গিয়া লই বর।
জর্ম্মে২ গাই জেন মঙ্গল তোমার॥
রচিল কেতকাদাস ভাবিয়া বিষহরি।
মঙ্গল হইল সায় বল হরি হরি॥

বর্ণ[া]বুদ্ধি দোষ লইবেন না লিখিতং শ্রীজগতচন্দ্র সিংহ পুত্র শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সিংহ মজুমদার মহাশয়ের পৌত্র ৺রামকিসোর সিংহ মজুমদার মহাশয়ের সাং পউখড়ার জাগুলীর কপিলেস্বর আমলে মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত গিরিষচন্দ্র রায় রাজা ইন্দ্র রায় বাহাদুর দ্বিজ সাং শ্রীপাট কৃষ্ণনগর জেলা নদীয়া শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের নায়েব শ্রীযুক্ত নবাব গেবনর মিণ্টু লাড সাহেব আমলে সন ১২২৯ বার সও উনত্রিষ সাল বাঙ্গালা সকাব্দা সন ১৭৪৪ সাল মাহ অগ্রহায়ণ তারিখ ৩০॥

৫৩১। মনসার ভাসান।

রচয়িতা—ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস। মোট ৯ নয়খানি পাতা। তন্মধ্যে ৩ তিনখানিতে পত্রাঙ্ক নাই। অবশিষ্ট ৬ ছয়খানি পাতা ২২ ও ২৪ হইতে ২৮ পত্রাঙ্কযুক্ত। পাতা কয়খানি পুরাতন ও জীর্ণ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৮ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩।০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ২২ পত্র হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল।—

আমি নাহি জানি চেঙ্গ মুড়ি কানি
দুঃখ দেই নানা পাকে।
হইল ভরা বুড়ি ঝাঁপ দিঞা পড়ি
জল খাই নাকে মুখে॥
প্রভুর বচনে কান্দে সকরুণে
পুত্র রক্ষিবার সাধে।
ছয় পুত্র মৈল ভরা ডুবি হৈল
দেবী মনসার বাদে॥

ভণিতা—

১। ক্ষেমানন্দের বাণী রক্ষ নারায়ণী
কায়েস্থ জতেক আছে।
২। কথো রাত্রি গেলে বিধি হেন কালে
লিখিতে আইল ভালে।
মনসা চরণে ... ...
কেতকাদাসে বলে॥

৫৩২। ষট্‌কবি মনসা।

রচয়িতা—গুণানন্দ সেন, পণ্ডিত জানকীনাথ, ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, রতিদেব। পত্র ৩৭-৩৮, ৪৩, ৪৫-৫১, ৫৩-৫৮, ৬৯-৯৭, ১০১-১২৮, ১৩২-১৩৪, ১৩৭, ১৪৪, ১৪৮-১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬-১৯২, অসম্পূর্ণ; আদি, মধ্য ও শেষ অংশ খণ্ডিত। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৪ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১২॥০ × ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

ছয় জন কবির রচিত মনসামঙ্গলের সংগ্রহ 'ষট্‌কবি মনসা' নামে পরিচিত। আলোচ্য পুথি আদি, মধ্য ও শেষ অংশে খণ্ডিত বলিয়া, ইহাতে পাঁচ জন কবির

ভণিতা দেখা যায়। খণ্ডিত অংশে হয় ত অন্য কবির ভণিতা ছিল। পুথিতে পঞ্চ কবির ভণিতা এইরূপ,—

১। ভণে গুণানন্দ সেনে মনসার বর।
বিবিরে কোলেতে লইআ কান্দিল বিস্তর॥ ৪৭।১ পত্র

২। পণ্ডিত জানকীনাথ মনসার দাস।
সেবকবৎসলা দেবী পূর্ণ কর আশ॥
—৫৪।১ পত্র

৩। ষষ্ঠীবর সেনে কহে জেবা আছে ললাটএ
খণ্ডাইতে না পারে কোন জনে॥
—৫৮।১ পত্র।

৪। গঙ্গাদাস সেনে কহে সরস পয়ার।
ভব তরিবারে হরি বোল বারে বার॥
—৫৮।২ পত্র।

৫। বাজারিয়া লোকে চাহে কান্দে দেবী মনসাহে
রতিদেবে রচিল পয়ার॥
—৯৩।২ পত্র॥

৪৩ পত্র হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল।—

প্রথমে চলিল কাজি মিরবহর রাজু।
আঠার হাজার পাইক জার বাম বাজু॥
শত হাজার পাইক দক্ষিণ বাজু লরে।
ধানুকের ঠাট জথ চলে ঘোরে॥
হাতে জে আসা বারি কিতাপ কোরান।
সাহামানি দোলাখান করিল জে জোগান॥
দোলাতে চরিআ কাজি খসাইল মোজা।
সেই দিন জুম্মাহা বার পেকাম্বরি রোজা॥
সির দাড়ি ধরি কাজি বোলে ভাল২।
জ[ব]মন করিব আজি সব রাখোআল॥
... ...
ভূতপূজা খণ্ডাইব খাবাইয়া গাই॥

প্রথমে সাজিল কাজি মির বহরালি।
পাএ রাঙ্গা মাথাএ টুপি গলাএ হেজুলি॥
বর কাজি ছোট কাজি কাজি তের লাক।
হিঙ্গুলা খেদাইয়া ভাত খাইলে লাগ॥
... ...
তোভা২ বোলে রে জথ সব কাজি।
বনের গাচ ভূত বোলে রাখোয়াল পাজি॥
জথ সব কাজি বোলে শুন ছাওাল।
কথা আছে হিন্দু ভূত ঝাটে বান্ধি আন॥
চোক্তার পাতা আনি দিল কাজি সবের হাতে।
ইজার ফাটিয়া মার্গে লাগিল ঘষিতে॥
মার্গে ঘষি চোক্তাপাতা পোরে অনুক্ষণ।
তোহবা২ বোলে রে জথেক কাজিগণ॥
... ...
হোচলে ঘষিতে ঘষে কাজি বর২।
ভূত ঘষি কাজি সবে করে ধরফর॥
তোভা২ কাজি সবে বোলে বারে বার।
হিন্দুর ভূতের লাগ পাইলে নাহিক নিস্তার॥
ইত্যাদি।

১৯২ পত্রের শেষ অংশ এইরূপ,—
সপ্ত দিনের মরা জে মণ্ডিত হইছে কাএ।
তা দেখিয়া সাহের কৈন্যা বর চিন্তা পাএ॥
জলেতে লামাই কৈন্যা সাজাই লখারি।
খারি ভরি অস্থি ধোএ সাহের কুমারি॥
অস্থি ধুইতে ঘিলাচাকি পরিলেক জলে।
ঘিলাচাকি গিলিলেক রাঘব বোয়ালে॥
অন্তরিক্ষে থাকি বোলে জয় বিষহরি।
কেনে হেন দুষ্কর্ম্ম করিলা সুন্দরি॥
সুরপুরী জথনে লখাইরে জিআই।
ঘিলাচাকি খুজিলে ততক্ষণে পাই॥
অস্থি পাখালিআ কৈন্যা লইল যত্ন করি।
ত্রিমুখা নদীর বাকে মিলে তরাতরি॥

তিন বর্ণ জল দেখি না পারি চিনিতে।
না পারিল জাইতে আদ্মি দেবতাপুরীতে॥

৫৩৩। ধর্ম্মমঙ্গল—হস্তিবধ পালা।

রচয়িতা—সীতারাম দাস। পত্র ১-১৪, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩×৪।০ ইঞ্চ। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥ শ্রীশ্রীবংসিধারি ঠাকুর জিউ॥
জয় রাম……অনাদি ভগবান।
ইন্দ্যাসের দেহ বন্দিব সাবধান॥
নম দুর্গা মহামায়া জয়স্তি মঙ্গলা।
সাবধানে শুন হস্তিবধ পালা॥
কামারের ঘরেতে লাউসেন বীরবর।
মহামদ লয়্যা কিছু শুনিব উত্তর॥
…মহামদ গৌউড়ে পাতর।
দরবার ভাঁগিয়্যা পাত্র জান নিজ ঘর॥
ঝারিখণ্ডি বাজনা পড়িছে ঝম২।
বকসিয়্যা পাকি ধায় জেন কাল যম॥
বাজার বাহিয়্যা পাত্র করিল গমন।
ভিতর গউড়ে গিয়্যা দিল দরশন॥
দক্ষিণবাজারে দেখে কালিকার রথ।
দু সারি বকুলগাছ তলা দিয়্যা পথ॥
কামারের পাড়ায় দিলেক দরশন।
নায়্যা…কামারের নাছ দিয়্যা গন॥
সেইখানে উত্তর্যাছে লাউসেন রায়।
হেন কালে মহামদ চারি দিগে চায়॥
পাটশালে দু ভাই টঙ্গাছে ফলাখান।
লাউসেন কর্পুরে পাত্র দেখিবারে পান॥
রূপের ঝলক জেন কৃষ্ণ বলরাম।
ঘোড়া খেঁচ্যা মহামদ হল্য আগুয়ান॥
—ইত্যাদি।

নিম্নোদ্ধৃত ভণিতায় গ্রন্থরচয়িতা গ্রন্থ-রচনার সময় লিখিয়া গিয়াছেন।—

সীতারাম দাস গান ধর্ম্মপদতলে।
এই পুথি হইল হাজার চারি সালে॥

শেষ অংশ—

পাত্র হল্যা লাজে কালি পুত্রে দেন গালা-গালি
এখুনি মরণ হকু তোর।
পালি তোকে রাজভোগে তরাবি বিপদ যোগে
লাজে মাথা কাটাইলি মোর॥
কামদেব পুত্র কয় মনে নাঞি করে ভয়
সর্ব্বকালে না জায় সমান।
জয় পরাজয় কথা সকল করেন ধাতা
শশকে কেশরী সমাধান॥
লাউসেন মহাশয় সে পাল্যা বক্‌সিস হয়
ধর্ম্মতেজে প্রলয় বিক্রম।
তার রথে চড়িবারে এত তেজ কেবা ধরে
অতঃপর হইল… ॥
ঘর গেল তাহার নন্দন।
ধর্ম্মের চরণে চিত এইখানে রহিল গীত
হরি২ বল সর্ব্বজন॥
কালি সেন দেশ জাব ময়না জাইগিরি পাব
আর লব ডোম তের জন।
সর্ব্ব[লোক] জাও ঘর গীতি রহিল অতঃপর
সীতারাম দাস বিরচন॥
ইতি হস্তিবধ সমাপ্ত॥

৫৩৪। ধর্ম্মমঙ্গল—কানড়ার পালা।

রচয়িতা—ঘনরাম। পত্র ১-১০, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৪×৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥
কানোড়ার পালা লিখ্যতে।
ধর্ম্মবলে লাউসেন জিনি কামরূপ।
নিজ দেশে সুখাবেশে ময়নার ভূপ ॥
অন্তরে জানিলা প্রভু অখিলের পতি।
কলিকালে পুহু পারা না হল্য বাযুতি ॥
হনুমানে বলেন বচন সম্বোধন।
পূজা প্রকাশিতে গেলা কশ্যপনন্দন ॥
এবে সে হইল মত্ত মায়ামোহপাশে।
ধন জন ধরণী রমণী রঙ্গরসে ॥
হনু বলে পদতলে নিবেদন করি।
গৌড়ে পাঠায়্যা দেহ স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
ভ্যস্তরে (?) তুষিব বুড়া ভূপতির চিত।
অনঙ্গে অবশ রাজা হইব মোহিত ॥
জরাকালে যুবক জনার মনশূল।
বিবাহ কারণ রাজা হইব পাগল ॥
অনুমতি দিব তায় মূর্খ মহামুদ।
কানোড়া বিবাহ হেতু বাড়িব আপদ ॥

নিম্নোক্ত কয়েক স্থলে গৌড়নৃপতির সামন্তরূপে বার ভূঞার উল্লেখ দেখা যায়।—

১। বার ভূঞা বেষ্টিত বস্যাছে নরপতি।
সমুখে সাক্ষাৎ সূর্য্য ধরামর জতি ॥
২। রূপে গুণে অনুপাম কুলপদ্ম পুষা।
বার ভূঞা ভূপতি ভুবনে যার ভূষা ॥
৩। বর হইয়া চলে রাজা সুতা বাঁধা হাতে।
বার ভূঞা বেষ্টিত চলিল সাথে২ ॥

নিম্নোক্ত ভণিতায় ঘনরাম তাঁহার বাসস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন।—

রামচন্দ্রপদদ্বন্দ্ব বন্দনাভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী ॥

৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পত্রে 'দ্বিজ কবিরত্ন' নামের দুইটি ভণিতা আছে; এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

১। প্রবোধ পাইয়া মনে আনাল্য বেগারিগণে
দ্বিজ কবিরত্ন রস গান ॥—৪ পত্র।
২। কুচক্র ভাবিয়া পুন বলে মহামদ।
বিরচিল কবিরত্ন ভাবি ধর্ম্মপদ ॥
—৬ পত্র।

শেষ—

কৈলাস হইতে দেবী দিলা এই গণ্ডা।
এক চোটে যে জন করিবে দুই খণ্ডা ॥
সে হবে কানড়ার পতি ঈশ্বরী আদেশ।
কানড়ার মনে এই প্রতিজ্ঞা বিশেষ ॥
এত বলি গণ্ডা গায়ের খোলে পট।
সমুখে বসিল দাসী করিয়া দাপট ॥
অনুপাম গণ্ডা সংসারে নাঞি দেখি।
বার ভূঞা চাঞা দেখে অনিমিখ আঁখি ॥
দৈবের ঘটন সভে করে অনুমান।
দেখ্যা শুন্যা শুখাইল রাজার বয়ান ॥
হরি গুরু ইত্যাদি পালা সোমাপ্ত ॥

৫৩৫। ধর্ম্মমঙ্গল।

রচয়িতা—গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্র ১৭-৪৩, অসম্পূর্ণ। দু-ভাঁজ করা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩॥০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৭১ বঙ্গাব্দ। ১৭শ পত্রের আরম্ভ—

অর্ব্বুদ রাজায় জড় হয় যদি তবে গড়
নারিবেক নিতে লঙ্কাজিতে।
ঘাটাইয়া কাল সাপ মহাপাত্র পাবে তাপ
তবে জে তোমার নহে চিত্তে ॥
শুনিঞা ভাটের ভাষ পাত্রের হইল ত্রাস
কহে ময়না জিনিব কেমনে।
কামদেব জোড় করে কহে মহাপাত্রবরে
মন কর মোর নিবেদনে ॥

আছয়ে উপায় সিন্দা নিশচোর বটে ইন্দা
ডাকায়্যা তাহারে দেহ পান।
ধর্ম্মপদসরসিজে ভাবিয়া গোবিন্দ দ্বিজে
বিরচিল ধর্ম্মের গুনান॥
নেচাড়ি॥
ইন্দারে আনিল পাত্র করিঞা সন্ধান।
দিব্য বাস ভূষণ প্রসাদ জলপান॥
পাত্র বলে ময়নায় নিন্দ্যাটি দেহ ভাই।
তোমার প্রসাদে গড় জিন্যা গৌড় জাই॥
তোমার নিদাঁটি দেবাসুর নাগে লাগে।
কুকুর বিড়াল পঞ্চ লোক নাহি জাগে॥
পার্ব্বতীর পুত্র তুমি জানি পূর্ব্বাপর।
সকল গুণের গুণী গুণের সাগর॥

ভণিতা—

১। আছিলা মউর ভট্ট সুকবি পণ্ডিত।
পয়ার প্রবন্ধে রচে অনাদ্যের গীত॥
ভাবিয়া তাহার পথ পদশতদল।
রচিল গোবিন্দ দ্বিজ ধর্ম্মের মঙ্গল॥

২। হাকণ্ডে চলিলা প্রভু হনুর কথায়।
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্ম্মের কৃপায়॥

শেষ অংশ—

কলিকালকথা কহিলেন হনুমান।
শুনিঞা সঙ্কোচ সভাকার হল্য জ্ঞান॥
চারি কন্যা বলে স্বর্গ চল ত্বরাপর।
কলিকথা শুনিঞা কাঁপিল কলেবর॥
পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া লাউসেন।
সস্ত্রীক সহিত শীঘ্র স্বর্গকে গেলেন॥
শ্বেত রথে শূন্যপথে সুবাহক হনু।
বৈকুণ্ঠ গেলেন সভে ধরি দেবতনু॥
নায়াদিত্য (?) প্রতি প্রভু করে সন্নিধান।
সস্ত্রীক সহিত স্বর্গে দিল রম্য স্থান॥
চারি নারী সঙ্গে সেন গেলা স্বর্গবাস।
অতঃপর পূর্ণ হল্য স্বর্গ ইতিহাস॥
উচ্ছাহবর্দ্ধন বাসকর সেহ্বামর।
সভে হরি বল রামাগণ দেহ জয়॥
নিরঞ্জনপদ প্রণমহ সভে তূর্ণ।
দ্বাদশ দিনের সুসঙ্গীত হল্য পূর্ণ॥
ঘটে বিসর্জ্জন দিয়া পুষ্প শিরে ধর।
নায়কের মনোভীষ্ট ধর্ম্ম পূর্ণ কর॥
হরি হরি বলহ সকল বন্ধুজন।
রচিল গোবিন্দ সাঙ্গ ধর্ম্মসংকীর্ত্তন॥

শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নমো নমঃ॥ গ্রন্থলিপি সাঙ্গ। ইতি শ্রীধর্ম্মরাজের গিত জাগরন আর স্বর্গ আরোহন শিক্ষা সমাপ্তাঃ॥ গিত শিক্ষা শ্রীগোপাল সর্ম্মার ত্রিতিয় পুত্র শ্রীসাফলরাম সর্ম্মন সাং পরমানন্দপুর॥ লিখিতং শ্রীনারায়নদাস বৈষ্ণব সাং পরমানন্দপুর॥ সন ১০৭১ সাল॥ তারিখ ১৫ পৌষ রোজ যুক্রবার দিবসে তিথি যুক্লপক্ষে পুর্ন্নিমা দিনে লিক্ষা সমাপ্তঃ॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]॥ বিষ্ণুপুরকে তেলঙ্গা আইল্য॥

শেষোক্ত বাক্যের প্রতি ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫৩৬। লক্ষ্মীচরিত্র।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-৩, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি করিয়া লেখা। পরিমাণ ১১।০ × ৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৯৩ সাল। আরম্ভ—

প্রণমহ নারায়ণ শ্রীলক্ষ্মীপতি।
তদন্তরে প্রণমহ দেবী সরস্বতী॥
গণেশ দেবতা বন্দ ইন্দ্র দেবতারে।
চন্দ্র সূর্য্য প্রণমহ বিদিত সংসারে॥
অষ্ট লোক প্রণমহ গুরুর চরণ।
হর গৌরী প্রণমহ জত দেবগণ॥

ব্যাসদেব প্রণমহু জত মুনিগণ।
অষ্ট অঙ্গে প্রণাম করু পিতার চরণ ॥
সরস্বতী মায়ে কৃপা কর একবার।
লক্ষ্মীর চরিত্র কিছু করিএ প্রচার ॥
জার ঘরে লক্ষ্মী দেবী থাকে সর্ব্বক্ষণ।
জেবা দোষে লক্ষ্মী দেবী পুরুষ তেজেন ॥
তাহার বিধান কিছু শুন সাবধান।
লক্ষ্মীর চরিত্রকথা করিএ রচন ॥

শেষ—

শুক্ল বসন পৈন্হে জেই নিত্য অভিলষি।
শুন প্রভু সর্ব্বক্ষণ তথা আমি বসি ॥
অনুক্ষণ পতিব্রতা হএ জেই জন।
দুই কুল উদ্ধারি উদ্ধারিব আপন ॥

ইতি সন ১১৯৩ সাল লেখীতং শ্রীবদন থাআল···।

৫৩৭। লক্ষ্মীচরিত্র।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-৫, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৯ সাল।

আরম্ভ—

নম গণেশায় নমঃ ॥ অথ লক্ষ্মীর চরিত্র ॥
গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী।
সাবিত্রী বেদমাতা চ পঞ্চধা প্রকৃতিঃ স্থিতা ॥
প্রণমহু নারায়ণী লক্ষ্মী কান্তবতী।
তদন্তরে প্রণমহু দেবী সরস্বতী ॥
গণেশ দেবতা বন্দ গৌরীর নন্দন।
হর গৌরী প্রণমহু জত দেবগণ ॥
লোকপাল বন্দ আর ইন্দ্র দেবরাজ।
চন্দ্র সূর্য্য প্রণমহু দেবতা সমাজ ॥
···　···　···　···　···　···

লক্ষ্মীর বৃত্তান্ত কহি শুন সাবধানে।
স্থিরমন হইয়া শুন চিত্ত অভিমানে ॥

শেষ—

লক্ষ্মীর চরিত্র জেই লিখিয়া রাখএ।
ধনে ধান্যে পুত্রে পৌত্রে সেই জন বাড়এ ॥
তার ঘরে লক্ষ্মী দেবী সদা অধিষ্ঠান।
অন্তকালে সেই জনের হএ দিব্যজ্ঞান ॥
লক্ষ্মীরে স্মরণ করি জে কর্ম্ম করএ।
তাহার সকল কার্য্য সর্ব্বসিদ্ধি হএ ॥

ইঃ সন ১২২৯ সাল বাঙ্গালা মাহে ১০ মাগ রোজ বোদ বার এক প্রহর উদন ইদং পুস্তক সমাপ্ত ॥ লিখিতং শ্রীসুকুর রাএ···পং দোআ ···এই পুস্তক শ্রীমুহননাথ···আর এক সমাচার সোন মন দিআ : মুহননাথে পুস্তক নিলা মল্ল দক্ষিণা দিআ : য়জোদ্ধাকাণ্ড পুস্তক আর গএর···। সকল পর্য্যাতে নিলা লক্ষির কথন ॥

৫৩৮। লক্ষ্মীচরিত্র।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-৪, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১১ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৩৯ সাল।

পূর্ব্বে এই নামীয় যে দুইখানি পুথির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, আলোচ্য পুথিখানিও সেইরূপ। তবে বর্ত্তমান পুথির প্রথম দিকে কতক অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে কিছু নূতন অংশও দৃষ্ট হয়। শেষ—

লক্ষ্মীর চরিত্র জেবা লিখিয়া রাখএ।
ধনে ধান্যে পুত্রে পৌত্রে সে জন বাড়এ ॥
তার ঘরে লক্ষ্মী দেবী সদা অধিষ্ঠান।
অন্তকালেত তার হএ দিব্যজ্ঞান ॥
লক্ষ্মীর চরিত্রকথা হইল সমাধান।
লক্ষ্মী দেবী কহিলা কথা শুনিলা ভগবান ॥

ই পুস্তি লক্ষির চরিত্র হইল সমাপ্ত সহয়ক্ষরে শ্রীমোহনরাম দেব মোকাম জুড়হাট শ্রীহর-গোবিন্দ দত্ত লিখাইলেন সন ১২৩৯ বাঙ্গলা মাহে ১১ জৈষ্ট রোজ বুদবার বেলা আন্দাজি তুই প্রহর সমএ পুস্তক সমাপ্ত মোতাবিকে সন ১৮৩২ ইঙ্গরেজি মাহে ২৩ মেই সন ১৭৫৪ সকাব্দা।

৫৩৯। লক্ষ্মীচরিত্র।

রচয়িতা—ভরত পণ্ডিত। পত্র ১-৪, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪॥০×৫॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৪ সাল। আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ ॥
অথ লক্ষিচরিত্র লিক্ষতে ॥
প্রণমোহ নারায়ণ লক্ষীকান্তপতি।
তদন্তরে প্রণমোহ দেবী সরস্বতী ॥
গণপতি প্রণমোহ দেবীর নন্দন।
হর গৌরী প্রণমোহ জত দেবগণ ॥
অষ্ট লোকপাল বন্দো ইন্দ্র দেবরাজ।
চন্দ্র সূর্য্য বন্দিলাম দেবের সমাজ ॥
ব্যাসদেব মুনি বন্দো জত ঋষিগণ।
আত্মগুরু বন্দিলাম দেব নারায়ণ ॥
সরস্বতী মাতা বন্দো করোঁ নমস্কার।
লক্ষীর চরিত্র কিছু করিব প্রচার ॥

শেষ—

ভক্তিভাবে এই কথা শুনে জেই নরে।
জর্ম্মে২ লক্ষী দেবী থাকেন তার ঘরে ॥
এহ লোকে সুখী থাকে পরলোকে মুক্তি।
লক্ষীর চরণে তার জর্ম্মে২ ভক্তি ॥
তাহাকে জে প্রীত বাসে প্রভু গদাধর।
এ সব কহিলু আমি কি কহিব আর ॥
শ্রীহরিচরণে জে করিয়া নমস্কার।
লক্ষীচরিত্র কিছু করিব প্রচার ॥
ভরথ পণ্ডিত বলে বন্দি নারায়ণ।
প্রবন্ধ করিয়া বিরচিল শ্রীলক্ষীপুরাণ ॥

ইতি শ্রীলক্ষিচরিত্র সমাপ্তঃ ॥ সন ১২৪৪ সাল জেলা বালেস্বর সাকিম পটী মতিগঞ্জর বাজারে ওর্ত্ত দিগে লিখিত নফরচন্দ্র বসু শাকীন ইন্দাব তারিখ ১ পৌউষ ॥

৫৪০। সূর্য্যব্রতপাঁচালী।

রচয়িতা—দ্বিজ কালিদাস। ১০ ইঞ্চি লম্বা, ৭।০ ইঞ্চি চওড়া খাতা আকারের পাঁচটি পাতা। প্রথম ও দ্বিতীয় পাতা ছাড়া অন্য তিন পাতায় পত্রাঙ্ক নাই। পাতাগুলি অতি পুরাতন, গলিত ও ছিন্ন। এক এক পাতায় ২৮ পঙ্ক্তি লেখা। প্রথম পাতার আরম্ভ অতি কষ্টে এইরূপ পড়া গেল।—

ওঁ নমো গনেসা···
······সহিতে সাবিত্রি···
··· ··· ···
সুজ্য চরণ বন্দ···কার···
ব্রত পাঞ্চালী চাহিএ রচিবার।
কৃপা করি দিবাকর দেহ এই বর ॥
পদবন্দে পাঞ্চালী হউক মনোহর।
দ্বিজ কালীদাসে কহে আদিত্যচরন।
দাসেরাশ পূর্ণ কর হইঞা কৃপামন ॥

দ্বিতীয় পত্র হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল।—

রাজা বোলে এই বটে কাহার তুহিতা।
সত্য করি মোর স্থানে কহ মর্ম্মকথা ॥
করজোরে মহাদেবী বোলে রাজার থরে।
তোমার নন্দিনী এই দেখ ত সত্বরে ॥

রাজা বোলে প্রভাতে জেবা আইসে
　　মোর দ্বারে।
সর্ব্বথাএ এই কৈন্যা দিবাম তাহারে॥
এথ শুনি মহাদেবী বিষাদিত মন।
অন্ন জল ত্যাগ করে ভূমিতে আসন॥

শেষ অংশ না থাকায় লিপিকাল প্রভৃতি নাই।

৫৪১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—গুণরাজ খান। পত্র ১-৪৫, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পংক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১২×৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২১০ সাল।

পুথিখানি 'রামায়ণ—আদিকাণ্ড' নামে নির্দ্দিষ্ট হইলেও ইহা বাল্মীকি-রচিত রামায়ণের অনুবাদ নহে এবং আদিকাণ্ডও সম্পূর্ণ নহে। পাশা খেলায় হারিয়া পাণ্ডবগণ যখন বনবাস আশ্রয় করেন, তখন একদিন ক্ষুধার্ত্ত দুর্ব্বাসা ঋষি অন্নার্থী হইয়া বহু শিষ্য সহ যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হন। যুধিষ্ঠির অন্নদানে অসমর্থ ও শাপভয়ে ভীত হইয়া মনে মনে ভগবান্ কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে ভগবান্ আসিয়া শিষ্যগণের সহিত ঋষির ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন,—মহাভারতে বর্ণিত এই ঘটনা আলোচ্য পুথির প্রথম হইতে ষষ্ঠ পত্র পর্য্যন্ত আছে। তাহার পরে সপ্তম পত্রের বিষয় এইরূপ—

পুণ্যকথা শুনিবারে রাজার হবিলাস।
গোবিন্দেত জিজ্ঞাসিলা করি জুড় হাত॥
কহ প্রভু নারায়ণ কথা কুতুহল।
স্থানভ্রষ্ট হইআ থাকে যে রাজা সকল॥
কুন বুদ্ধি হইলে পায় রাজ্য সিঙ্গাসন।
কুন বুদ্ধি কৈলে হয় বিপক্ষ নিধন॥
পুনরপি নিজ রাজ্য পায় কেনমন॥
পুণ্যকথা শুনিলে পাষণ্ড জায় দূরে।
পুণ্যকথা বিনে আর কি আছে মধুর॥
শুনিবারে ইচ্ছা করি রাম অবতার।
দশরথের ঘরে রাম জন্মিলা কি প্রকার॥
তুমার শ্রীমুখের বাণী শুনিবারে চাম।
আজ্ঞা কর জগন্নাথ চান্দমুখ চাম॥
রাজার মুখেত শুনি এই সব বাণী।
কহএ রামের কথা দেব চক্রপাণি॥

প্রথম পত্রের উর্দ্ধ অংশে পরবর্ত্তী কালে কেহ 'ইতিহাস পুথি' লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাড়কা রাক্ষসীর বধের পরেই পুথি শেষ হইয়াছে। কবি অনেক স্থলে পুরাণপ্রচলিত মত পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন কথা বলিয়াছেন। ভণিতা—

মুই ত অভাগী নারী ভিক্ষা মাগি পায়ে ধরি
　　গুণরাজ কবির বিরচন॥
গুণরাজ খানে বোলে　শ্রীরামের পদতলে
　　সংক্ষেপে গাইল রামায়ণ॥

পুথির শেষ পত্রের লেখা এতই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, গ্রন্থের নাম, লেখকের নাম-ধাম প্রভৃতি কিছুই পড়া যায় না। শুধু 'সন ১২১০' এই লেখাটুকু পড়া যায়।

৫৪২। রামায়ণ—উত্তরকাণ্ড।

রচয়িতা—গঙ্গাদাস সেন। পত্র—অঙ্কহীন ২ পত্র, ৬, ৮, অঙ্কহীন ১ পত্র, ১০-১৩, ১৫-২২, অঙ্কহীন ৩ পত্র, ২৬-৩৩, ৩৭-৪৭, অঙ্কহীন ৩ পত্র; আদি, মধ্য ও শেষ খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ।

এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৮ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৷৷০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ—

…ঘরে২ লোকে কিবা বোলে॥
নগরে২ রাম বুঝিতে কারণ।
দূত সম্বোধিয়া রাম বলিলা বচন॥
নিঃশব্দ হইয়া সব নগরে বেড়াইয়।
ভাল মন্দ কিবা কহে নিশিতে শুনিয়॥
সত্য কথা কহিয় আসি না করিয় ভয়।
কীর্ত্তি অপকীর্ত্তি লোকে রাত্রিতে কিবা কয়॥
এই কথা কহিলা রাম কমললোচন।
আসিয়া বিদায় করিলা জত দূতগণ॥

ভণিতা—

গঙ্গাদাস সেনে কহে সরস্বতীর সুত।
সীতার করুণ কথা রচিল অদ্ভুত॥

পুথিতে গঙ্গাদাসের ভণিতার সংখ্যা তিনটি। তাহা ছাড়া ১৫ সংখ্যক পত্র হইতে অন্য একজন কবির ভণিতা আছে, তাঁহার নাম দ্বিজ রাঘব। এই ভণিতার সংখ্যাও তিন।

দ্বিজ রাঘবে গাহে গীত রামায়ণ।
একবারে নিলা বিধি ভাই তিন জন॥

প্রাপ্ত অংশের শেষ—

মুনি বোলে সীতা তুমি চলি জাও ঘর।
দুই পুত্র হইছে তোমার বড় ধনুর্দ্ধর॥
রাক্ষস বানর রাম জিনিল ত্রিভুবন।
হেন রাম জিনিয়াছে তোমার নন্দন॥
মুনি বোলে লব কুশ শোন দুই ভাই।
রথ সমেৎ… … স্থল জাই॥
হনুমান জাম্বুবান আর বিভীষণ।
দুই শিশু সঙ্গে মুনি গেলা তপোবন॥

৫৪৩। রামচন্দ্রের অভিষেক।

রচয়িতা—পণ্ডিত ভবানীনাথ। পত্র ১-১৯৩, ১৯৫-২৭৩, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তি লেখা। পরিমাণ ১৪৸০ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫৭ সাল। আরম্ভ—

শ্রীনম গণেশায় নম॥ শ্রীশ্রীরাম॥

প্রণমোহ নারায়ণ দেব নিরঞ্জন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ নম কুমার লক্ষ্মণ॥
গণেশ দেবতা বন্দোম দেবী সরস্বতী।
মহেশচরণ বন্দম দেবী ভগবতী॥
বিশ্বামিত্র মুনি আর শতানন্দ ঋষি।
জাহার প্রসাদে জ্ঞান হয়ে রাশি২॥
এক দিন যুধিষ্ঠির নৈমিষ কাননে।
প্রণাম করিয়া বোলে ব্যাসের চরণে॥
কোন মতে রামচন্দ্রে অভিষেক কৈল।
চক্রসলা কোন মতে লক্ষ্মণে জিনিল॥
বিস্তারিয়া কহ মুনি সর্ব্বসমাচার।
শুনিতে সে সব কথা বহার্দ্য (?) আমার॥

নিম্নলিখিত ভণিতাগুলিতে গ্রন্থরচনা বিষয়ে কিছু সংবাদ অবগত হওয়া যায়—

পণ্ডিত ভবানীনাথে রচিল পয়ার।
ইতিহাস ভবসিন্ধু পাপ তরিবার॥
জয়চন্দ্র নরপতি পুণ্যবন্ত বর।
সভাতে ভবানীনাথ নানা শাস্ত্রে দর॥
তাকে বোলে নরপতি কর পদবন্দ।
লাচারি প্রবন্ধে কহে করিয়া সুছন্দ॥
বোলেন ভবানীনাথে রামচন্দ্র বন্দি মাথে
জয়চন্দ্র রাজার আদেশে॥

কোন কোন বিষয়ের শেষে নিম্নলিখিত সমাপ্তিবাক্য আছে।—'ইতি রামচন্দ্রের অভিষেকে উত্তর দিগে শত্রুয়ের যুদ্ধ সমাপ্ত॥'

শেষ—

ব্রহ্মা আদি দেবগণ করিল বিদাএ।
আপনা নগরে চলি রাজা সব জাএ॥
জনে২ রাজাগণে করি নমস্কার।
নিজ সৈন্য সঙ্গে চলে ঘরে আপনার॥
করজোরে জিজ্ঞাসিল বীর ধনঞ্জএ।
রামায়ণ এই কথা কোন হেতু হএ॥
ব্যাস বোলে এই কথা শোন মহাশএ।
রাবণ বধের হেতু অবতীর্ণ হয়ে॥
সুধা সম ইতিহাস রাম অভিষেক।
মহারোগ খণ্ডে পাপ জাএ পরতেক॥
জেই জনে শোনে রাম ইতিহাসকথা।
নাহিক যমের দায় কহিলাম সর্ব্বথা॥

ইতি রামচন্দ্রের য়ভিসেক সমাপ্ত॥ ইতি সন ১২৫৭ তারিখ ২২ শ্রাবন॥ রোজ বুধবার॥

৫৪৪। রামাভিষেক।

রচয়িতা—দ্বিজ ভবানীনাথ। পত্র ১০১-১৫৮, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে ১৫ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৪৷৷০ × ৫৷৵০ ইঞ্চি। আদি ও অন্ত খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। প্রাপ্ত অংশের আরম্ভ—

সেই সব জন আইসে বৈকুণ্ঠভুবন॥
দানবিবরণ এবে শুনহ রাজন।
অন্নদান সম দান নাই ত্রিভুবন॥
অন্নমূলে রক্ষা হএ জথ চরাচর।
অন্নমূলে জথ ধর্ম্ম শুনহ ঈশ্বর॥
জীবের জীবন অন্ন শুন মহামতি।
অন্নদান প্রাণদান শুনহ সম্প্রতি॥
অন্নদান করে জেই পুণ্য শুন তার।
শ্রীমন্ত বলবন্ত ধৈর্য্যবন্ত আর॥
নিত্য অতিথিতে অন্ন জেবা করে দান।
কলিকালে ভাগ্যবন্ত সেই মহাজন॥
অতিথিরে অন্ন দিলে ব্রহ্মপুরে জাএ।
অন্নদান সম দান আর দান নহে॥
অনেক দুষ্কর পাপ জাহা হোতে নাশ হএ।
অন্নদান মহাদান শুন মহাশএ॥

ভণিতা ও বিষয়সমাপ্তিবাক্য—

জয়চন্দ নরপতি আদেশ শুনিআ।
রচিল ভবানীনাথে ব্যাসপোতা চাহিআ॥
ইতি শ্রীরামচন্দ্র অভিষেকে ভরথপ্রতিজ্ঞা জমালয়বিজয় সমাপ্ত॥

শেষ অংশ—

শ্রীরামের মাথে ছত্র ধরে দেবরাজ॥
... ... মিলিল সভাত।
মুনিগণে বেদপাঠ করেন তথাত॥
বেদমন্ত্রে জেবা আছে এহার বিধান।
মুনিগণে ভালমতে করিল বাখান॥
নির্ম্মল গঙ্গার জল পূর্ণকুম্ভ হোতে।
আনিয়া অভিষেক কৈল শ্রীরাম মাথেতে॥
সমুখে রমণীগণ দেয়ান্ত জয়কার।
রবাব পিনাক বাদ্য শুনিতে সুসার॥
বেণু ঘণ্টা কবিলাস ঝাঝরি মৃদঙ্গ।
ঢাক ঢোল কাংস্য আদি বাদ্য নানা রঙ্গ॥
গন্ধর্ব্বে গাএ গীত নাচে বিদ্যাধরী।
নারীগণে গীত গাএ হৈআ সারি২॥

৫৪৫। রামাভিষেক—লক্ষ্মণদিগ্বিজয়।

রচয়িতা—দ্বিজ ভবানীনাথ। পত্র ১-১৩, ২৭-২৮, ৩৮-৫৩, ৫৫-৭০, ৭৩-৭৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৭৷৷০ × ৬ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। আরম্ভ—

নমো গণেশায় ॥

প্রণমোহ নারায়ণ দেব নারায়ণ।
শ্রীরামচরণ বন্দম বন্দম লক্ষ্মণ ॥
গণেশ দেবতা বন্দ দেবী সরস্বতী।
মহেশচরণ বন্দম দেবী ভগবতী ॥
বিশ্বামিত্র মুনি বন্দম শতানন্দ ঋষি।
জাহার প্রসাদে জ্ঞান হএ রাশি২ ॥
এক দিন যুধিষ্ঠির নৈমিষ কাননে।
প্রণাম করিয়া বোলে ব্যাসের চরণে ॥
কোন মতে রামচন্দ্রে অভিষেক কৈল।
চক্রশালা কোন মতে লক্ষ্মণে জিনিল ॥
বিস্তারিয়া কহ মুনি সর্ব্বসমাচার।
শুনিতে সে সব কথা রহস্ত আমার ॥

ভণিতা—

জয়ছন্দ নরপতি পুণ্যবন্ত বড়।
সভাতে ভবানীনাথ নানা শাস্ত্রে দড় ॥
তাকে বোলে নরপতি কর পদবন্দ।
লাচাড়ি প্রবন্ধে কহ করিয়া সুছন্দ ॥

শেষ অংশ—

শ্রীরামের বাঞ্ছাসিদ্ধি লক্ষ্মণবিজএ।
একচিত্তে শুনে যদি পাপ হএ খএ ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে কৈল ধর্ম্মের স্থাপন।
শুনিলে ইসব কথা পাপ বিমোচন ॥
সহস্র নামের ফল রামনামখানি।
হেন রামনাম লৈতে আলস্ত না জানি ॥
ইতি শ্রীরামচন্দ্র অভিষেক।
লক্ষ্মণবিজয় জত অক্ষেপ (?) ॥
শ্রীরামের ইতিহাস।
আদরশ দৃষ্টে লিখি রামানন্দ দাস ॥

... ...

এহি অমৃতকথা শুনে জেই জন।
ভক্তি করি লিখি অতি জ্ঞানহীন ॥
এহি বিজয়কথা শুনি জে হএ অন্যমন।
অঘোর নরকে তার হএ গমন ॥
জেবা গাহে জেবা শুনে এহি ইতিহাস।
অন্তিম কালে স্বর্গে জাএ বৈকুণ্ঠেত বাস ॥
পুস্তক লিখাএ ধর্ম্মনারায়ণ।
তাহার আপদ তরাএ দেব নিরঞ্জন ॥

ইতি লক্ষণদিকবিজয় সমাপ্ত ॥ শ্রীরামানন্দ কর প্রগনে অথরা আবাদ মৌজে হাজিপুর ॥

৫৪৬। রামাভিষেক—লক্ষ্মণদিগ্‌বিজয়।

রচয়িতা—দ্বিজ ভবানীনাথ। পত্র ১-৪১, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৫ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৫৷৷০ ইঞ্চি। শেষ খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। আরম্ভ—

৺ নমো গনেসায় ॥ নম সরস্বত্যৈ নম ॥
নমো রামচন্দ্রায় নম ॥
প্রণমোহ নারায়ণ দেব নিরঞ্জন।
শ্রীরাম দেবতায় বন্দোম বীর লক্ষ্মণ ॥
গণেশ দেবতা বন্দো আর সরস্বতী।
মহেশ্বর বন্দো আর দেবী ভগবতী ॥
বিশ্বামিত্র মুনি আর শতানন্দ ঋষি।
জাহার প্রসাদে জ্ঞান হএ রাশি রাশি ॥
এক দিনে যুধিষ্ঠির নৈমিষকাননে।
প্রণাম করিআ বোলে ব্যাসের চরণে ॥
কোন মতে রামচন্দ্রে অভিষেক কৈল।
চন্দ্রশালা লক্ষ্মণে জে কেমতে জিনিল ॥
বিস্তারিআ বোল মুনি সর্ব্বসমাচার।
শুনিতে সে সব কথা অভন্ত (?) আক্ষার ॥

ভণিতা—

জয়ছন্দ নরপতি পুণ্যবন্ত বর।
সভাতে ভবানীনাথ নানা শাস্ত্রে দর ॥

তাকে বোলে নরপতি কর পদবন্দ।
লাচারি প্রবন্ধে বোলে করিয়া স্বছন্দ ॥

৪১ পত্রের শেষ—

দুই লক্ষ রথী পরে লক্ষ্মণের বাণে।
শকুন শৃগাল সব মাংস ধরি টানে ॥
রক্তের সরোবর হইল রথ নাহি চলে।
ঝাকে ঝাকে পরে সৈন্য দেখে…বলে ॥
পলাএ সকল সৈন্য হারিআ সংগ্রাম।
যম হেন মানিলেক লক্ষ্মণের বাণ ॥
নাক হস্ত বিদারিল হনুমন্তে চাহে।
রক্তে ভাসি মহা মহারথী…রাএ ॥

৫৪৭। রামের স্বর্গারোহণ।

রচয়িতা—ভবানী দাস। পত্র ১-৫০, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১৩ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। পরিমাণ ১৪৷৷৹ × ৪৸৹ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫৯ সাল। ১ হইতে ২০ সংখ্যক পত্রের বাম দিকের কতক অংশ নাই এবং কতিপয় পত্রের লেখা একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। বন্দনা অংশের পর এইরূপ আছে—

গঙ্গার সমীপে এক মথুরা নামে গ্রাম।
তাহা … … নী দাস নাম ॥
শিশুকাল হতে করএ এহি বৃত্তি।
সরস্বতী কণ্ঠে সদা ভাবয়ে প্রবৃত্তি ॥
… … … হল ইসব প্রকাশ।
শ্রীরামস্বর্গারোহণ করিতে প্রকাশ ॥

ভণিতা—

এহি মতে জার জেহি দেশে চলি জাএ।
দাস ভবানী বোলে শ্রীরামের পাএ ॥

পুথিতে মুকুন্দ দত্ত নামক আরও এক ব্যক্তির ভণিতা আছে। যথা—

রামপদাম্বুজে ভনে দত্ত মুকুন্দ হীনে
লীলা তোমার না জাএ বুজন ॥

শেষ অংশ—

যথাতে আছেন প্রভু রাম নারায়ণ।
তথাতে গাহস্তি গীত জত ভক্তগণ ॥
এহি মতে স্বর্গে রাম কৈলা আরোহণ।
চারি ভাই একত্রে বৈসেন বন্ধুগণ ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ নিমন্ত্রণ নীতা।
জনকনন্দিনী বামে বসিলেন সীতা ॥
আনন্দে শ্রীরাম তবে নিমন্ত্রণ করি।
সর্ব্বলোক আনন্দে বল হরি২ ॥
এহি সমাধান হৈল স্বর্গে আরোহণ।
জেহি শুনে একচিত্তে স্বর্গেত গমন ॥
হনুমানে বলে প্রভু দেহ দরশন।
ই বলিয়া হনুমান মুদিল নয়ন ॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি দিলা দরশন।
প্রতীত পাইল বীর পবননন্দন ॥
স্বর্গ আরোহণ শুন একচিত্ত মনে।
অবশ্য হইব তার স্বর্গেত গমন ॥
দাস ভবানী বলে অমৃতলহরী।
পুস্তক হইল সাঙ্গ বল হরি২ ॥

ইতি শ্রীরাম সর্গারূহন সমাপ্তঃ॥ অজ্ঞানে লিখিল পুতি জানিয় কারন। পড়িতে পণ্ডিত জনে করিবা শুদন॥ অবুদের দুষ কিছো না ধরিবা মন। অক্ষর না হয় ভাল জানিবা কারণ॥ শ্রীগুরূচরণে সবে সদাএ কর আশ। সক্ষর লিখিল শ্রীচন্দ্রকিযুর দাষ॥ ইতি সন ১২৫৯ সন। তেরিখ ৩ পোষ রোজ বৃহস্পতিবার বেলা এক প্রহর সমএ পুস্তক সমাপ্ত হইল।

৫৪৮। গজেন্দ্রমোক্ষণ।

রচয়িতা—ভবানীদাস। পত্র ১-১৬, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১৪ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। হস্তাক্ষর স্থন্দর। প্রতি পত্রের দক্ষিণ ও বাম অংশের লেখা মুছিয়া গিয়াছে। পরিমাণ ১৫×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৬১৫ শকাব্দ। আরম্ভ—

৭ নমো গণেশায় ॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ পুস্তক লিখ্যতে ॥
প্রণমহো নারায়ণ গোলকের ধাম।
তাহার প্রাণপ্রিয়া বন্দো রাধা জার নাম ॥
চন্দ্রাবলি আদি বন্দো জত গোপীগণ।
একভাবে বন্দো মুঞি সভার চরণ ॥

কবির বাসস্থান ও পরিচয়—

পাণ্ডুয়া গ্রামে বসত সর্ব্বলোকে জানে।
সৌকালিন ঘোষ তেহোঁ বিদিত ভুবনে ॥
সে স্থানে · য়ে দণ্ডবৎ প্রণাম।
সম্প্রতিক বন্দো বিরাট গ্রাম ॥
সভার চরণে করিয়ে বিনয়।
গজেন্দ্রমোক্ষণ নামে করি[ব] পঞ্চালি ॥
বাঙন···মনে ধরিতে চাহে চান্দ।
ভাগবতশাস্ত্র করি পাচালি ছাদ ॥

ভণিতা—

গজেন্দ্রমোক্ষণ ভবানীদাস কয়।
জেবা জনে শুনে তার ঘুচে ভবভয় ॥

শেষ—

ভক্তিভাবে জেবা শুনে বিষ্ণু অবতার।
ইহলোক পরলোক দুই লোকে নিস্তার ॥
ভবানিদাসে কহে শুন সর্ব্বজন।
সংসার তরিবে যদি ভজ নারায়ণ ॥
হরি নারায়ণ রাম কৃষ্ণ গুণনিধি।
ভজ রাধাকৃষ্ণ অবধি ॥

যথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। শ্রীবাসুদেব শর্ম্মণঃ অক্ষরমিদং ॥ ইতি গজেন্দ্রমোক্ষন পালা সমাপ্তঃ সকাব্দা ১৬১৫ ॥

৫৪৯। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতার নাম নাই। পত্র ১-৩৬, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। নানা লিপিকরের হস্তাক্ষর। পরিমাণ ১৪॥০×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৫ সাল। আরম্ভ—

৭ নমো গণেশায় ॥
ই পুস্তক অরণ্যকাণ্ড লিক্ষতে ॥
প্রণমহো নারায়ণ দেব ভগবান।
জাহার প্রসাদে খণ্ডে পাপপরিত্রাণ ॥
হেন জে রামের নাম শুনে বা শুনায়।
কোটি অশ্বমেধফল সমসর পায় ॥
ব্রহ্মাদেবে সমুছিল বালমিক মুনি।
সাত কাণ্ড রামায়ণ তাহান কাহিনী ॥
শ্লোকবন্দে শিষ্যস্থানে করিল জ্ঞাপন।
সংক্ষেপে কহিব কিছো সীতার হরণ ॥
পৃথিবীর ভার দেখি দেব নারায়ণ।
সূর্য্যবংশে হইলা দশরথের নন্দন ॥
এক বিষ্ণু চারি অংশ বধিতে রাবণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্নন ॥

পুথির মধ্যে অনেক ভণিতা আছে, কিন্তু তাহাতে কবির নাম পাওয়া যায় না। সেগুলি সবই প্রায় নিম্নোদ্ধৃত ভণিতার অনুরূপ—

অরণ্যকাণ্ডের শেষ মধুর পয়ার।
রামপদ বিনে মোর গতি নাহি আর ॥

তবে নিম্নোদ্ধৃত ভণিতার 'শ্রীরামচরণে' এই বাক্যটিতে কবির নাম ব্যক্ত হইয়াছে, অথবা

'রামচন্দ্রের চরণে কবি বলিতেছেন,' এইরূপ উহার অর্থ হইবে, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন॥ ইহাও চিন্তনীয় যে, পুথির মধ্যে এইরূপ ভণিতা আর নাই। যথা—

স্ত্রী পুত্র শান্তি কয় আমি আর জিবার নয়
জিতে আর না করিয় মায়া।
শ্রীরামচরণে ভনে অজ্ঞানে কি মহিমা জানে
শরণ লইল দেও পদছায়া॥
—৯১ পত্র।

শেষ—

হনুমানে সঙ্গে লইয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সুগ্রীবের দরশনে করিলা গমন॥
সুগ্রীব ভেটিতে রাম করিল গমন।
অরণ্যকাণ্ডের কথা হইল সমাধান॥
অরণ্যকাণ্ডের কথা মধুর পয়ার।
শ্রীরামচরণ বিনা গতি নাহি আর॥

ইতি অরণ্যকাণ্ড পুস্তক সমাপ্ত॥ সক্ষর শ্রীযুগলকিশোর দাস সাকিম রৌহা পরগনে ভাওাল হিস্যে ॥/০ নওানী॥ জথা দৃষ্টং [ইতাদি]। ইতি সন ১২৪৫ সন তেরিখ ২৫ আসাড় রোজ রবিবার বেলা চারি দণ্ড থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত শকাব্দা ১৭৬০ শক॥

৫৫০। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—অদ্ভুত আচার্য্য। পত্র ১-৫, ৮-৩৯, ৪১--৪৭, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পংক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৫×৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৮ সাল। আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীরামঃ॥
রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং [ইত্যাদি]।
ভাটালি রাগ॥ দিশা॥
প্রণমহো রঘুপতি কিবে হয়।
জে নাম স্মরণে আপদ দুঃখ না রয়॥
প্রণমহো রামচন্দ্র পুরুষ প্রধান।
সাত কাণ্ড রামায়ণ মুনির পুরাণ॥
··· বাল্মীক মুনি ত্রিভুবন ভূষিত।
ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান তিনে সুপণ্ডিত॥
রাম জন্মাবারে ছিল ষাটি সহস্র বৎসর।
তাহাতে রচিল মুনি মধুর অক্ষর॥
শিরেত লইয়া বন্দিব মুনির চরণ।
পদবন্ধে পুণ্যকথা কহিব রামায়ণ॥

মধ্য—

খর বোলে ভগ্নার মোর করিল বিড়ম্বন।
রামের মাংস শূর্পণখাক করামু ভোজন॥
খরের আজ্ঞায় চলে চৌদ্দ···।
পাছে জায় শূর্পণখা তাহার সংহতি॥
যাত্রা করিয়া জায় জত রাক্ষসগণ।
নানা অমঙ্গল দেখে বীর ততক্ষণ॥
বামে সর্প দেখে বীর দক্ষিণে শৃগাল।
বিনে যুদ্ধে কাটা মুণ্ড ভুমিতে জায়
গড়াগড়ি॥
পাছে থাকি রণচণ্ডী বোলে কাট কাট।
সম্মুখে গৃধিনী পক্ষী মারে পাখার সাট॥

ভণিতা—

রাক্ষস মারিয়া বাণ ভ্রমে বসুমতী।
অদ্ভুত আচার্য্যের কবিত্ব মধুর ভারতী॥

শেষ—

এত বলি কবন্ধক স্বর্গে আরোহণ।
সুগ্রীব দেখিতে চলিল রাম লক্ষ্মণ॥
দেখি দেবগণ হৈলা আনন্দ।
শুভ ক্ষণে মিতালি করিল রামচন্দ্র॥

বিনে অপরাধে সাগর জাইব বন্ধ।
সবংশে কাটা জাইবে রাজা দশকন্ধ॥
অদ্ভুত আচার্য্যে মুখে বোলে রামচন্দ্র।
বিধাতা করি হেন জত দৈব প্রবন্ধ॥
কবন্ধের মুখে কথা শুনিয়া কৌতুকে।
দুই ভাই গেল তবে পর্ব্বত উপুমুখে (?)॥
দুই ধানুকী গেল সুগ্রীব উদ্দিশে।
দেবগণ আনন্দিত হইল বিশেষে॥
শুভ ক্ষণে গেল সুগ্রীব সম্ভাষণে।
অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত হইল এহি হইতে॥

সন ১২২৮ সাল তারিখ ২৫ আসাড় শনিবার দেড় প্রহর বেলা উজোনে ইতি।

৫৫১। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—অদ্ভুত আচার্য্য। পত্র ২-৭, ২১-৪০, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৫৸০ × ৫ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৮ সাল। আদি, মধ্য ও শেষ খণ্ডিত। ২য় পত্রের আরম্ভ—

তৃতীয় কাণ্ডে রাম করিলা ঘোর রণ।
শুনিলে সম্পদ্ বাড়ে দুঃখ বিমোচন॥
রাজ্যখণ্ড লয়া ভরত আইলা দেশে।
তিন জনা রামচন্দ্র চলিলা বনবাসে॥
পাদুকা লইয়া ভরত করিলা গমন।
চিত্রকূট পর্ব্বতে রহিলা নারায়ণ॥
একত্র হইয়া যুক্তি করে মুনিগণ।
রাবণ বধের হেতু আইলা ঘোর বন॥
এথা যদি রহিলা রাম পর্ব্বত উপরে।
তবে ত নহিল বধ রাজা লঙ্কেশ্বরে॥

ভণিতা—

রজনী বঞ্চেন রাম রঘুপতি।
অদ্ভুত আচার্য্য কবি মধুর ভারতী॥

৪০ পত্রের শেষ—

বরিষা কালেত রাম জাগিয়া রজনী।
আকুল রামের তনু ভেকের নাদ শুনি॥
ভ্রমরঝঙ্কার নানা পুষ্প সুগান্ধত।
পশ্চিমে উদয় চন্দ্র পূর্ব্বেত মার্ত্তণ্ড॥
নিশি শেষ হৈল কোকিলে কাড়ে রাও।
সর্ব্বক্ষণ বহে মলয়া গিরি বাও॥

চতুর্থ পত্রের শেষে—

সন ১২২৮ সাল আরম্ভ হইল ১৫ আসাড়।

৫৫২। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—অদ্ভুত আচার্য্য। পত্র ১-২৬, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৫ হইতে ১১ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৪ × ৪৸০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৩ সাল। আরম্ভ—

৶৭ নমো গণেশায়॥

অথ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড পুস্তক লিক্ষতে॥
প্রণমহো রামচন্দ্র রঘুবংশনাথ।
সুরাসুরপতি রাম মাধব সাক্ষাত॥
জানকী হরিয়া যদি নিলেক রাবণ।
সীতাকে বিচারেন রাম সহিতে লক্ষ্মণ॥
ঋষ্যমূকে গেলা প্রভু সীতা দরশন।
সীতা অন্বেষণে ভ্রমেন কমললোচন॥
মহাশোকে ব্যস্ত হইয়া রঘুবংশনাথ।
বৃক্ষ অগ্রে সুগ্রীবেকে দেখি অকস্মাত॥

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত।

৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত।